

মঃ
স্বঃ. পঃ. ডঃ

P27204

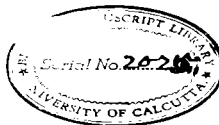
আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র।

শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত।

চতুর্থ বর্ষ।



দ্বিতীয় খণ্ড।

(কার্তিক হইতে চৈত্র)

১০৬২ স্রাবণবার টাট হইতে সম্পাদক

কর্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩০ নং নিমন্তলা বাট ষ্ট্রট, অলাপতি এসে

জে. এ. সূদাৰ দ্বাৰা মুদ্রিত।

অবশ্যের বর্ণানুক্রমিক সূচী ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

অ

অনলময়গী (কবিতা)

বিজয়কৃষ্ণ বোম

আ

আত্মা (কবিতা)

বলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

আবার বিবাহ (গল্প)

কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উ

উৎসাহী প্রতি (কবিতা)

নগেন্দ্রনাথ বোস

ঈ

ঈশ্বরানী (কবিতা)

কালিদাস রায়

ক

কর্ণের দান (কবিতা)

মাণিক ভট্টাচার্য্য

কবি বিহারীগাল

নবকৃষ্ণ বোম

কবির কৈফিয়ৎ (কবিতা)——

কালবীধু (কবিতা)

কালিদাস রায়

কিশোরীচাঁদ মিত্র

মদনমোহন বোম

কোলাপের পূর্ণিমা (কবিতা)

রমণীমোহন বোম

গ

গদ্যভ্রমণ

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

গানপেথ (কবিতা)

বলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চ

চিত্রমিলন (কবিতা)

কালিদাস রায়

চিত্রসাহী (কবিতা)

ঈশ্বরী লাবণ্যময়ী বসু

জ

জন্মকূহি (কবিতা)

স্বপ্নীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জ্যোৎস্নাময়ী (ঐ)

জীবেন্দ্রকুমার দত্ত

ଭକ୍ତର କବିତା)	୭
ଭୂମି ଓ ଆମି (କବିତା)	ଜୀବେନ୍ଦ୍ରକୂମାର ନନ୍ଦ
	ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଯଜ୍ଞସିଂହାର
	୫
	ସମ୍ପାଦକ
	୬
ନବୀନଚକ୍ରର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର	ସରୋଜବାସିନୀ ଓଷ୍ଠୀ
	୭
ମଣିରାଜା	ସମ୍ପାଦକ
ମାମ (କବିତା)	ସମ୍ପାଦକ ୧୫ଟି ପାଠ୍ୟାଳୟ
ଆଜ୍ଞାପିତ ନିମ୍ନ (ଗଳ୍ପ)	କାଳୀପ୍ରସାଦ ବେହେରା
ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ	ବିପିନବିହାରୀ ଓଷ୍ଠୀ
ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ	ନବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯୁଗୋପାଧ୍ୟାୟ
ପୁରାତନ (କବିତା)	ଜୀବେନ୍ଦ୍ରକୂମାର ନନ୍ଦ
ଆତ୍ମୀୟ ଓଷ୍ଠୀର ଅଭିନୀତି	ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ସାମନ୍ତ
ଆତ୍ମୀୟ (ଗଳ୍ପ)	ସରୋଜବାସିନୀ ଓଷ୍ଠୀ
ଆତ୍ମୀୟ (ଗଳ୍ପ)	ନିରଂଜନା ଦେବୀ
ଆତ୍ମୀୟ (କବିତା)	ସମ୍ପାଦକ
	୮
କରମୀ ବିପ୍ଳବର ଇତିହାସ	ରେଭେନ୍ସା ସ୍କୋଲ
	୯
ସମ୍ପାଦକ	କାଳୀପ୍ରସାଦ ବେହେରା
ସମ୍ପାଦକ (କବିତା)	ସମ୍ପାଦକ
ବାଞ୍ଛନା ଶାସ୍ତ୍ରର 'ନ' ଶ୍ଳୋ	ସୋମକେଶ ଯୁକ୍ତାନ୍ତୀ
ବାଞ୍ଛନାର ଶାସ୍ତ୍ର	ସମ୍ପାଦକ
ବାଞ୍ଛନା (କବିତା)	ସମ୍ପାଦକ
ବିଭୂଷଣ ଶାସ୍ତ୍ର	ନବୀନୋପାଧ୍ୟାୟ
ବିଭୂଷଣ	ଆତ୍ମୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର
ଭକ୍ତକଥା ଓ ନାରୀର ଗାହ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର କଳକଳତା ଓଷ୍ଠୀ	
ବାଞ୍ଛନା ଓ ଭକ୍ତର ଆତ୍ମୀୟ	ସରୋଜବାସିନୀ ଓଷ୍ଠୀ

ক	
ত্রিভব ও সাহিব (কবিতা)	সংযোগকৃত মূলোপাখ্যান
প্রথম কবিতা)	নাগিনী যোহন মূলোপাখ্যান
খ	
ময়নাগর	অতুলচন্দ্র যতাপাত্র
মাতুলের (কবিতা)	দশমকুমার চট্টোপাধ্যায়
মুহুরাখানা (গল্প)	হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ	
রাবারাশী (গল্প)	কালীপ্রদ বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপ ও গুণ (কবিতা)	অমিল চন্দ্র দত্ত
ঘ	
লক্ষী মা (কবিতা)	কালিদাস রায়
ঙ	
জ্ঞানবিরহে (কবিতা)	সম্পাদক
বরংকুমার লাখিড়ী	সম্পাদক
চ	
সকীত যাহাওয়া	নেপাল চন্দ্র রায় ৭৮০, ৯৫৭
সেন্ট পকামং	সম্পাদক ৬০৯
সমালোচনা	৭০২, ৮২১, ৯৬৯, ৬১২
সত্য (কবিতা)	কালিদাস রায় ৯৬৮
সর্বমত্য গহিতম্ (গল্প)	কালীপ্রদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮৭
সংগ্রহ	৬৭১, ৭২৪, ৭৮০, ৬৯৮, ৯৬৪
আগত (কবিতা)	সম্পাদক ৬১৯
সিদ্ধান্ত পথে (কবিতা)	দারদাশ্রয় স্বতী তীর্থ ৭২৩
সুজন ও স্বর্জন (কবিতা)	অবোধনাথ বসু কবিতাবলি ৬৮১
সেহের বন্ধন (গল্প)	ভাগদাস চট্টোপাধ্যায় ৬৬৫
স্বতি (কবিতা)	মানিক চট্টোপাধ্যায় ৭৮৬
সংসর্গ	বতীজনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৯৫

৬

হরিষ্যর হইতে লক্ষণ কোলা	ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়
হতাশা ও আশা (কবিতা)	লগৎপ্রসন্ন রায়
জন্মের মূল্য (গল্প)	হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

৭

কথা (গল্প)	মণীন্দ্র ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়
--------------	-----------------------------

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী ।

অ

অম্বোচনাথ বসু

সুজন ও হৃৎকন (কবিতা)

অতুল চন্দ্র মহাপাত্র

মহনাগড়

অনিল চন্দ্র দত্ত

রূপ ও গুণ (কবিতা)

কনকলতা গুপ্তা

ব্রতকথা ও নারীর পাহারা পদ্য

কালিদাস রায়

লক্ষী মা (কবিতা)

চিত্রমিলন

কাল বীধু

সত্য

অতুরালী

কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজাপতির নির্মল (গল্প)

দক্ষমতান্ত্রগহিতম্

রাগারোগী

বরণ

আবার বিবাহ (গল্প)

কপৎপ্রসন্ন রায়

হত্যা ও আশা (কবিতা)

কীবেন্দ্র কুমার দত্ত

কোৎসাম্বারী (কবিতা)

কীৰ্ত্তনমালা

পুৰাণেশ্বৰ (কবিতা)

১৫৫

নগেন্দ্ৰনাথ সোম

উল্লসিত প্ৰতি (কবিতা)

ননীগোপাল মজুমদার

বিক্ৰমাদি চাক্ৰ

নবকৃষ্ণ শোষ

কলি বিবাহী লাল

নগেন্দ্ৰনাথ যুগোপাধ্যায়

পুৰাতন পুনৰাবৰ্ত্তন

নলিনীমোহন যুগোপাধ্যায়

ভ্ৰম (কবিতা)

নিৰুপমা দেবী

প্ৰতাপ (গল্প)

নৈপাল চন্দ্ৰ বৰ

সকলিত মাগাখা

প্ৰমথনাথ বৰ

বিক্ৰমপুৰ

বসন্ত কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়

অৰ্দ্ধা (কবিতা)

গানেশ্বৰ (কবিতা)

মাতৃশ্ৰেষ্ঠ (কবিতা)

পাপ (কবিতা)

বিজয়রূক্ষ ঘোষ

অনন্তমঞ্জরী (কবিতা)

বিপিন বিহারী স্তব

পুরাতন প্রদত্ত

বিকৃতি ভূষণ মজুমদার

ভূমি ও আমি (কবিতা)

সোমেশ্বর মস্তকী

বাদনা সান্তোষ

মণী প্র ভূষণ মজুমদার

কথা (গল্প)

এনাপ্রবাস

কিশোরী চাঁদ মিত্র

বাসনা (কবিতা)

মাসিক ভট্টাচার্য

কর্ণের দান (কবিতা)

স্মৃতি (কবিতা)

যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সংসর্গে (কবিতা)

যোগীন্দ্রনাথ সমালঙ্কার

প্রাচীন ভারতে অর্থনীতি

রমণীমোহন ঘোষ

কোজাগর পূর্ণিমা (কবিতা)

৭

ললিতমোহন মজুমদার

হৃদিহারে হইতে লক্ষণ সোণা

লাংগাময়ী বসু

চন্দ্রাবতী (কবিতা)

শশিভূষণ মুনোপাধ্যায়

গদ্য ভ্রমণ

সন্তোষ কুমার মুনোপাধ্যায়

ভিতর ও বাহির (কবিতা)

সরোজবাসিনী গুপ্তা

নবী-চন্দ্রের রক্তচরিত্র

সম্পাদক

মন্মথ পঞ্চানন্দ

বিক্রেতাস্থান রায়

পল্লীশ্রদ্ধা

শ্রামবিবরণ (কবিতা)

দ্বাগত (কবিতা)

প্রেমবিকাশ (কবিতা)

বাঙ্গালার বিস্তার

বসন্ত (কবিতা)

শরৎ কুমার গারিড়ী

সাতদাশদাদ স্বাতিতীর্থ

সিদ্ধেশ্বর পণ্ডে

অরেন্দ্রনাথ ঘোষ

করামি বিপ্লবে ইতিহাস

৬০১, ৬২৬, ৭৮৪ ও ৯৩৫

অরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ

৭১৫, ৮৬৩, ৯৫৫ ও ১০৪৮

অক্ষয় চন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্মভূমি (কবিতা)

৮২৪

হরপ্রসাদ মুনোপাধ্যায়

মৃতা অজ্ঞান (গল্প)

কদম্বের মৃগা (গল্প)

প্রতিদান (গল্প)

— — —

কবির টেকশিফট (কবিতা)

— — —



পল্লী রক্ষা ।

সহরের বাহ্যিক যুরোপীয় সভ্যতার—বিশেষতঃ যুরোপীয় সামাজিক অবস্থার—অবস্তান্তরী ফল । কিন্তু ভারতে তাহা নহে । তাই যে বাঙ্গালার যুরোপীয় প্রভাব সন্নিবেশিত, অধিক পরিণত হয় সেই বাঙ্গালারও দেশ-বাসীদের মধ্যে নতকরা ২৫ জন পল্লীগ্রামে এবং কেবলমাত্র ৫ জন সহরে বাস করে । আমাদের সভ্যতা “বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতিমূলক” নহে । সে সভ্যতা সহরেই পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় । রাধাকমল বাবু বলিয়াছেন—

“আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত দেখা যায় । ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ । বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতির উপর ভারতবর্ষের জাতীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত নহে । প্রকৃতির জন্ম-নিকেতনের প্রভাব হেতু আমাদের দেশ কৃষিকার্যে উন্নতি লাভ করিয়া অতি প্রাচীন কালেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল । পাশ্চাত্য-জগতে সহরগুলি যেদ্রুপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা পুষ্ট হইয়াছে, আমাদের দেশের গ্রাম-গুলি সেদ্রুপ কৃষিকার্যের উন্নতির দ্বারা বিশেষ পুষ্ট লাভ করিয়াছে । এ জন্ত ভারতবর্ষের সভ্যতা পল্লীগ্রামেই বিকাশ লাভ করিয়াছে—সহরে, রাজধানীতে নহে । আধুনিক ইউরোপের সমস্ত বড় বড় সামাজিক, বৈবাহিক এবং ধর্ম-সংক্রান্ত আন্দোলনগুলি সহরে উদ্ভূত হইয়া সেখানকার চিন্তা এবং কর্মজীবনের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে পল্লীগ্রামে পৌছিয়া থাকে । আমাদের দেশে ইহার ঠিক বিপরীত । আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সমস্ত আন্দোলনগুলি পল্লীগ্রামের চিন্তা দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত । আমাদের দার্শনিক দর্শন এবং বিজ্ঞানের সভ্যসমূহ তপোবনেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল । বশিষ্ঠ, কপিল, বিশ্বামিত্র, শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া নানক, গুরুগোবিন্দ, রামদাস, তুকারাম, কবীর, চৈতন্য পর্য্যন্ত, ঈশ্বারা ভারতবর্ষের শিক্ষা-গুরু, ঈশ্বাদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের অন্তরতম প্রাণ আশ্রয়-প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহার সকলেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আপনাদিগের সাধনায় সফলতা লাভ করিয়াছিলেন । ভারতীয় সভ্যতার বৈচিত্র্য পল্লীজীবনের চিন্তা এবং কর্মপ্রণালীর দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে ।”

প্রাচীন ভারতে নূতন চিন্তার স্রোত পল্লীর ছায়ামুকুটে সাধকের ও ভাবকের জ্বর উৎসে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িত । “পল্লীগ্রামে যে ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ হইয়াছিল, তাহার ফলে সহর-গুলিও অনতিবিলম্বে নূতন ভাবে অল্পপ্রাণিত হইয়া উঠিত । ভারতবর্ষের প্রধান নগরগুলি অবিকাংশই দেবতার আবাসভূমি, পবিত্র তীর্থ-ক্ষেত্র । বৎসর বৎসর অসংখ্য তীর্থযাত্রীগণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পল্লীসমূহ হইতে যখন সেই সকল নগরীতে উপস্থিত হইত, তখন নানাবর্ণমতাবলম্বীদের মধ্যে নূতন নূতন বিষয়ের আলোচনা হইত, নূতন বিজ্ঞান এবং দর্শনবাদের যীমানা হইত, যাহা সভ্য তাহা গৃহীত এবং তাহারই প্রচার হইত । এইরূপে মহানগরী এবং তীর্থক্ষেত্রসমূহেই ভারতবর্ষের সমস্ত চিন্তা এবং কর্মেয় আন্দোলনগুলির লুপ্তলা ও সমন্বয় সাধিত হইত । ভারতবর্ষের সমস্ত মহাপুরুষগণ সাধু এবং বিষ্ণু-মতলীর নিকট তাঁহাদিগের সভ্য জ্ঞাপন করিবার জ্ঞাত এই সকল স্থানকেই শ্রেষ্ঠ স্থান মনে করিতেন । অসংখ্য নরনারীর চিন্তা এবং কর্মজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদিগের সভ্যগুলি এইরূপে একটা বিচিত্র এবং অসীম শক্তি লাভ করিত, তখন প্রচার-কার্যের আর কোন বিষয় থাকিত না । মহাবি বশিষ্ঠের ধর্মজীবনের সহিত অধ্যয়নগরী এবং যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত মিথিলানগরী বিশেষ সংশ্লিষ্ট । বৌদ্ধধর্মপ্রচারের হুচনা পাটলিপুত্র নগরীতেই হইয়াছিল, বাবা নানক এবং গুরুগোবিন্দের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে অমৃতসহরনগরী, তুকারাম এবং রামদাসের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে পুণা ও সত্যান-নগরী এবং চৈতন্তদেবের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সৌড়নগরী ও শ্রীধামক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট । পল্লীগ্রাম এবং নগর-জীবনের মধ্যে একপ ভাবের আদান প্রদানের সচ্ছ থাকায় আমাদের দেশে সভ্য আবিষ্কার এবং সভ্য-প্রচারের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল ।”

কিন্তু বর্তমান কালে সহর ও পল্লীগ্রামের সে সচ্ছ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে । “ভারতবর্ষের পল্লীগ্রামে সম্পূর্ণ নূতন নূতন শক্তিপুঞ্জের আবির্ভাব হইয়াছে ।” আর “পল্লীগ্রামগুলি সমস্ত বিষয়ে সহরের অল্পগামী হইবার জ্ঞাত ব্যস্ত । সহরে যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতিপত্তি, সমস্ত গ্রামগুলি তাহাই অনুকরণ করিবার জ্ঞাত লালারিত । পল্লীগ্রাম এবং নগরের পূর্নকার ভাব-বিনিময়ের সচ্ছ আর নাই । নগরগুলি এখন বৃষ্টিভাঙ্গল এবং পল্লীগ্রাম গহার অল্পগামী যাত্র ।”

গ্রাধাকমল বাবু আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—“আমাদের একটা বিশেষ চূড়ান্ত এই যে,—ইউরোপ তাহার কত শতাব্দীর বিপুল প্রয়াস, হুঃ এবং সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশের ফলে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা নকল করিতে পারিলেই আমরা আমাদের দত্ত মনে করি। সে অবস্থায় উপস্থিত হইবার জন্য সমাজের কিরূপ বল এবং সামর্থ্য আবশ্যক তাহা ভাবিয়া দেখি না। সে অবস্থায় আমাদের সমাজ তত্পরযোগী ব্যবস্থা করিয়া বিকাশলাভ করিতে পারিবে কি না, তাহা চিন্তা করিবার অবসর থাকে না। আরও হুঃবের বিষয় এই যে—ইউরোপের সেই অবস্থা ইউরোপীয় সমাজের পক্ষেই সুখ-স্বাস্থ্য এবং শান্তিদায়ক কি না এবং মানব-সত্যতার কত দূর পরিপোষক, তাহা আমাদের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের দেশে বৈষয়িক অবনতি হইয়াছে, অমনি আমরা ইউরোপের অর্ধোৎপাদন-প্রণালীগুলি নকল করিয়া চারিদিকে কলকারখানা খুলিতেছি। ইউরোপ বাণিজ্য-ব্যবসায় দ্বারা ধনী হইয়াছে, অমনি আমরা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সহরে আসিয়া উপস্থিত। ইউরোপীয় সভ্যতা নগর-জীবন-গঠনকেই তাহার একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, এই জন্যই পল্লীজীবনের প্রতি আমাদেরও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে, নাগরিক জীবনকে আদর্শ মনে করিয়া আমরাও স্বকীয় সমাজের আমূল পরিবর্তন করিতেছি। ফলতঃ, তারতবর্ষ আধুনিক ইউরোপকে অনুকরণ করিয়া তাহার পল্লী-জীবন বিসর্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে; ইহাতে কেবলমাত্র যে তাহার সভ্যতা-বিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে তাহা নহে, পরন্তু ইহাতে আমাদের বিশেষ অমঙ্গল ঘটবার সম্ভাবনা আছে। ইউরোপকে এ বিষয়ে অনুকরণ করিতে যাওয়া আমাদের যে একটি জাতীয় প্রকৃত-বিকৃত এবং ইতিহাসবিরুদ্ধ কাজ হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

“আমাদের দেশে আধুনিককালে কতকগুলি সহর নির্মিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের সঙ্গে আমাদের এখনও রাসায়নের কোন সংযোগ হইতে পারে নাই। ইউরোপ হইতে আমরা আমাদের সহরে সভা, সমিতি, ইউনিয়ন, ক্লাব, লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপালিটি সমস্ত লইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এগুলির সেতু প্রাণ নাই। উহাদিগকে আমরা আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি নাই।

“তারতবর্ষের সমাজ ইউরোপীয় সভ্যতাকে এখনও আপনার নিগূঢ় প্রাণ-

শক্তিহার। নিষেধ করিয়া লইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের নগরজীবনের ইউরোপীয় নগরজীবনের অন্ধ এবং হুড় অহুঙ্করণ হইয়াছে মাত্র।

“অন্তদেশের মাটি হইতে শিকড় উৎপাটন করিয়া কোন গাছকে যদি সম্পূর্ণ বিতন্ত্রস্থানে আনা যায়, সে ঐ নূতন মাটির রস আকর্ষণ করিতে না পারিয়া নিশ্বেদন হইয়া পড়ে। ইউরোপীয় বিবিধ অমূল্যবস্তুরিও আমাদিগের দেশে আনিয়া সেই অবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষের সনাতন ভূমির সঙ্গে উহাদিগের কোন পরিচয় হয় নাই এবং কখন হইবে কি না তাহা বলা যায় না। অবিকৃত, আমাদের স্বকীয় মনুষ্যত্বটুকুও হারাইতে বলিয়াছি। ইউরোপীয় সভ্যতার বাহু জড় অশ্বকে সহজে অহুঙ্করণ করিবার ফলে আমাদিগের বিশেষত্ব—সামাজিক জীবনের নির্ভা-সংযম, আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যক্তিগত জীবনের তত্ত্ব, প্রেম ও বৈরাগ্য ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ভগবানে অবিশ্বাস, অর্থপৈশাচিকতা, গৃহঘটনের লৈলিপল্য, চরিত্রহীনতা, বিলাস-প্রিয়তা প্রভৃতি পাপ আমাদিগের নাগরিক জীবনকে আক্রমণ করিয়াছে।”

ইহার পর রাধাকমল বাবু বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে,—“পল্লীজীবন এবং নগর-জীবন সম্পূর্ণ বিতন্ত্র পথে বিকাশ লাভ করে। পল্লীগ্রামে জাতির বৈবয়িক এবং সামাজিক জীবনের সমস্ত উপাদান এবং উপকরণগুলি উৎপন্ন হয়। পল্লীগ্রামে সনাতনের নিত্য আহ্বারের সংস্থান হয়। পল্লীগ্রামের প্রকৃতিজাত বস্তু সহরে আনীত হইলে, সহর তাহার কলকাত্তবানার সাহায্যে উচ্চ হইতে নানা প্রকার দ্রব্য এবং বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করে। এইরূপ নিত্যনৈমিত্তিক অভাবমোচনোপযোগী দ্রব্যাদির উপকরণ যোগাইয়া পল্লীগ্রামগুলি বেক্রম বৈবয়িক জীবন যাপনের সহায় হয়, সেক্ষেপ সামাজিক জীবনের উপাদানগুলিও পল্লীগ্রামের আব-হাওয়াতেই উৎপন্ন হয়। নগর এই সমস্ত উপকরণগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া সনাতনের চিন্তা এবং কর্মের পতি ও প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দেয়। নগরে শক্তির ব্যবহার এবং বিকাশ, কিন্তু শক্তির জন্ম পল্লীগ্রামে। পল্লীগ্রামই ভাদুকতার জন্মভূমি, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রেই বিরটি এবং মহনীর তাব-আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠ স্থান। পল্লীগ্রামে চতুরতা প্রব্রণ্ড পায় না,—নিষ্ঠা, প্রেম, সংযম, মহত্ব, পবিত্রতা এবং সত্যানুসার, মানব-হৃদয়ে সমস্ত দেবতাবগুলি পল্লীগৃহেই অঙ্কুরিত হয়। গ্রামের চিন্তার মধ্যে স্বভাবতই একটা সরস মৌলিকতা এবং ভাবপ্রবণতা লক্ষিত হয়, যাহার জন্ম তাহার অনেক সময়ে অসীম শক্তি লাভ করে। ব্যস্তবিক, যে সমস্ত দিপুল আন্দোলন অতীতকাল হইতে পৃথিবীর

বন্ধ আলোড়িত করিয়া মানবজীবনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া আসিতেছে, সেই সমস্তই সর্ব্বের কর্তব্য ব্যস্ততা হইতে অনেক দূরে পল্লীজন্যের নিম্নতর জোড়ে লাগিত হইয়াছিল। * * * পল্লীগ্রামই সভ্য জগতের অন্তর্ভুক্তি।"

"ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রাণ এখনও পল্লীগ্রামে কিয়ৎ পরিমাণে সজীব রহিয়াছে, পল্লীবাসীদিগের মধ্যে ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শগুলি এখনও বিস্তৃত। * * * কিন্তু

আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের চরিত্রবোধে পল্লীসমাজ এখন কঠোর দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত। পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রাভাব এখন তাহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্যবোধে ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার আদর্শ মলিন হইয়া পড়িয়াছে। নানা উপায়ে এই দারিদ্র্য মোচন করিয়া ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক জীবনের সমুদায় আদর্শকে জগতের সমক্ষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। ইউরোপের বিজ্ঞান এবং ভারতবর্ষের বৈরাগ্য ভবন সম্মিলিত হইয়া একটা মহাজীবনের সূচনা করিয়া দিবে। প্রাচ্য ও প্রাচ্যের সেই মহামিলনের কেন্দ্রস্থল হইবে, ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম।"

ভারতবর্ষের এই পল্লীগ্রামগুলিকে কিরূপে নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হইবে—কিভাবে গ্রামের উন্নতি সংসাধিত করিতে হইবে তাহাই এখন বিবেচ্য। রাধাকমল বাবু ভারতবাসীর "মজ্জাগত" সমবার প্রেরণার ভিত্তির উপর পাশ্চাত্য সমবায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পল্লীগ্রামে যৌথ ঋণ-দান-মণ্ডলী, যৌথ বিক্রয়-মণ্ডলী, যৌথ শ্রমভাণ্ডার, যৌথ ক্রয়-মণ্ডলী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার মত শিক্ষিত যুবকদিগকেই এ কার্যের শুরুভার গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এখন আমাদেরকে আমাদের পুরাতন জিনিসই নূতন নামে চালানিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" কর্তব্য সাধনের অস্ত "শিক্ষিত ব্যক্তিকে এখন পল্লীতে বাস করিতে হইবে, হাটে হাটে ভ্রমণ করিতে হইবে, পল্লীবাসীকে দেশবিদেশের ব্যবসাবাগিণী এবং শিল্পকর্মের কথা শুনাইতে হইবে, তাহাদের আর্থিক, নৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা নানা উপায়ে উন্নত করিতে হইবে। গ্রামের রাস্তায় বাটে প্রত্যেক লোককে সাদরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, গ্রামের বাহ্য উন্নতির নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।" তাঁহাদিগকে পল্লীবাসীর অভাবমোচনের চেষ্টা করিতে হইবে; লোক-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে

হইবে। তাহার পর “এই উপায়ে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত যখন জনসাধারণের সতীতরতর ভাব-বিনিময় হইতে থাকিবে, তখন শিক্ষিত সমাজ আপামর জনসাধারণের সুখ দুঃখ, আনন্দ-আজাদ, বর্ষ কৰ্ম প্রভৃতি আর অবজ্ঞার চক্রে দেখিবেন না। তখন তাঁহারা বুঝিবেন, পল্লীসমাজই ভারত-বর্ষের জাতীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত। যুগযুগান্তর কাল ধরিয়া ভারতবর্ষের উপর যে চিন্তাশ্রোত অব্যাহতভাবে বহিয়া আসিতেছে সে শ্রোত সহরের আফিস আদালত কলকারখানার মধ্যে আবিল এবং নিউজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পল্লীসমাজে এখনও তাহা নিগ্রাবিল এবং প্রবল। তখন পল্লীজীবনের শান্তি, সরলতা, প্রেম, আধ্যাত্মিকতা এবং আনন্দ তাহাদিগের জাতীয় জীবনের একমাত্র অপূর্ণ সম্পদ বলিয়া বোধ হইবে। ইহার ফলে পল্লীজীবনে গৌরব বোধ জন্মিবে, সমগ্র সমাজ ভারুকতার দ্বারা অভি-ভূত হইয়া পড়িবে, দেশের সর্বত্র শীতাই একটা বিপুল আন্দোলন হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন প্রকৃত জন-নাগরকগণ দেখা দিবেন। অসংখ্য জনসাধারণের দুঃখদারিত্ব মোচন এবং শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া তাহারা তাহাদিগের পিতাবরূপ হইবেন। * * * জনসাধারণের সমস্ত আশা-ভরসা আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ এই জন-নাগরকগণের জীবনে অতিব্যক্ত হইবে। কতশত বৎসর ধরিয়া যে বেদনা অব্যক্ত ও অশুট ছিল তাহা এখন প্রকাশের সুযোগ পাইবে। এত দিন ধরিয়া ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায় পান্ডিত্য জগতের নিকট যে বিজ্ঞানশিক্ষা লাভ করিতেছিল তাহা এখন সার্বক হইবে। গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কৃষিশিক্ষাবিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানাগার খোলা হইবে এবং সমবেত প্রণালীতে কৃষি এবং শিল্পকার্য পরিচালিত হইতে থাকিবে। লোকশিক্ষা এবং সমবায় অঙ্গুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন চলিতে থাকিবে। পান্ডিত্য বিজ্ঞান ভারতবর্ষের পল্লীবাসীর দারিত্র্য মোচন করিবে। ভারতীয় পল্লীবাসীর আধ্যাত্মিক জীবন তখন নূতন ভাবে অঙ্গুষ্ঠানিত হইয়া উঠিবে।”

রাধাকমল বাবুর উৎসাহদীপ্ত তরুণ হৃদয়ে যে আশা অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা কলবতী হউক ; দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহার ভাবে অঙ্গুষ্ঠানিত হইয়া দেশের কল্যাণকর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া শিক্ষার সার্বকতা সংসাধিত করুন। তিনি “পল্লীপ্রাণ” বঙ্গের পল্লীগুলির দুর্দশার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে অতিরিক্তের চিহ্নমাত্র নাই। বরং একেই সত্য কল্পনাকে পরাভূত করে। “বাঙ্গালা দেশের সমস্ত পল্লীগ্রামে শিবমন্দির, কালীমন্দির

প্রকৃতি দেবালয় এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, গ্রামের হরিসতার জন্ত টানার খাতায় অনেক টাকা বাকী পড়িতেছে, কবকতা, যাত্রাগান, কবির গান প্রকৃতি উৎসাহ অভাবে ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। পুষ্করিণীর পঙ্কজার হয় না, পানীর জল পানার তরাত হইয়াছে, নদীগুলি সংস্কার অভাবে ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। * * * সমস্ত দেশ এখন বন-জঙ্গলময় হইয়া পড়িয়াছে, জলসরবরাহ একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অসংখ্য গ্রাম একসঙ্গে উন্নয়ন হইয়া যাইতেছে। যে সমস্ত লোক কোন প্রকারে গ্রাম ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার আশ্রয় পাইতেছে। অনেক গ্রাম একত্রে এখন একেবারেই লোকশূন্য। যে গ্রামে প্রায় কুড়ি ত্রিশটি টোলে শাস্ত্রজ্ঞগণ অধ্যাপনা করিতেন, বিভিন্ন জেলা এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্রেরা আসিয়া যেখানে শিক্ষালাভ করিত, যে গ্রাম বারো মাসে তেরো পার্শ্বের যুধিরিত থাকিত, দুর্গা এবং কালীপূজার সময় প্রায় দুই তিন শত বাড়ীতে মহোৎসব হইত, বারোয়ারী পূজার বিশুল সমারোহ জনসাধারণের হৃদয়ে বল এবং মনে আনন্দ সঞ্চার করিত, হরিনাম কীর্তন, রামায়ণ এবং চণ্ডীর গান জ্যোৎস্নানাত রজনীকে আরও মধুর করিয়া তুলিত, সে গ্রাম এখন নিশুন্ধ, নিরানন্দ,—শূণ্য ব্যাঘ্রের রক্তভূমি। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন গ্রামে কোস এক জীবন মহামারী গ্রামকে স্রশানে পরিণত করিয়াছে। মাঝে মাঝে বনজঙ্গলের ভিতর হইতে দুই একটা পশুনোমূষ কোঠা বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়, উহাদিগের ওচ্চাবহান করিবার জন্ত কেহই সেখানে বাস করে না। যে সকল গ্রাম একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নাই তাহাদিগেরও ক্রমাবনতি হইতেছে। অবিকালে গ্রামের কুবি এবং প্রজীবনগণকে অসহ্যভাবে অনশনে থাকিতে হয়।”

তিনি পল্লীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন কয় বৎসর পূর্বে একজন বাকালী কবি পল্লীর সেই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দের শারদীয়া মহা নবমীর দিন ‘পল্লীবিলাপ’ খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হয়। কাব্যে কবির নাম ছিল না। কিন্তু, আমি তাঁহাকে জানিতাম। আজ যখন তিনি লোকান্তরিত তখন বীরেন্দ্র নাথের নাম প্রকাশে আর সজোচের কারণ দেখি না। * তিনি লিখিয়াছিলেন—

* বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ যশোর জিলার বিদ্যাসন কালীগ্রামবাসী ছিলেন। দুবক বীরেন্দ্রনাথ কোন দূর সম্পর্কীয় হইলেও কত চিকিৎসার জন্ত খাঁর অদ্বৈত হৃৎকান করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ‘বন্ধে মাতরম্’ পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাব্য করিতে করিতে বিনুতিক। রোগে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার দেহান্ত হয়।

"শারদীয়া দুর্গাপূজা,—ঘাটো, গীত, অভিনয় ;
 বারোগারী—মরোৎসব ; কঙন আবির্ভাব ;
 গাছন-ভজনগান—কান্ডেশ্বনি, ঢাক ঢোল,
 করতালি, উচ্চহাস্য, ভাঙব-আনন্দরোল,
 ছিল যত এই স্থানে সুবিশাল নিদর্শন,
 হুরায়েছে এবে, সব নিরানন্দ অশুকণ !
 চন্দ্রমাল্যোতিকভাতি শারদ বিমলাকাশে
 ঢাকিয়াছে কালমেঘে অকাল পবনোচ্ছ্বাসে !
 মাধবী-রজনী-বীণা-মধুর-মিলন-গান
 হইয়াছে, হা অদৃষ্ট, অকস্মৎ অবসান !
 কি দুর্দ্দশা ! ছিল যথা বাসগৃহশ্রেণী কত
 কোলাহল মুখরিত মধুকর-চক্রমত,
 ধানকত' জীর্ণ ঘর রহিয়াছে সেথা আলি,
 বিরিয়াছে চারিদিকে তৃণভ্রমররাশি ।
 ঘনীর প্রাসাদচূড়া ভাঙ্গিয়া পড়েছে ভূমে,
 মন্দির, প্রাচীর, স্তম্ভ, সকলি যেদিনী চূমে !
 ভাঙ্গিয়াছে বাধা ঘাট, নিবিড় নৈবালদল
 করিয়াছে জলাশয় সমগ পঙ্কিলতল ।
 জনঘাতাঘাতস্ত্র পল্লীগণগুলি পাশে,
 দু'ধারে বিরিছে বনে, বিকট কণ্টক হাসে !
 লুপাল নকুলগণ নির্ভয়ে বেড়ায় ফিরি',
 চিংকারে পেচকদল জঘুতরুতল বিরি' ।
 তটিনীজীবনরেখা হইয়াছে পরিকীর্ণ,
 মধুর চপল গতি হইতেছে দিন দিন ;
 নাই কুলু-কুলুধ্বনি বন্ধা জলতৃণদলে
 যৌগ মধুবেদনায় লুটিছে শয়নতলে !
 যে হয়েছে কৃতবিদ্ব (৭) লভেছে সম্পদ বল,
 সেই করিয়াছে ভিটা স্বাপদভ্রমণস্থল !"

রাধাকমল বাবু পল্লীরক্ষার কবায় যন দিয়া বঙ্গালীর ধন্যবাদ অর্জন করি-
 রাছেন। কিন্তু পান্ধাত্য সভ্যতার দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি দিয়া ও পান্ধাত্য

অর্থবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে অত্যধিক মন দিয়া তিনি আমাদের পট্টীনাদের সৰ্ব্বপ্রধান কারণের কথা অধিক বলেন নাই । তিনি জমীদার সম্প্রদায়ের উপর অগ্রসর । কিন্তু “সম্বন্ধিশালী নগরীর ঐক্যের জন্ত” তাঁহাদের অর্থ কেন ব্যয়িত হয় ? মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণকে তিনি দেশত্যাগের জন্ত তিরস্কার করিয়াছেন । কিন্তু কেন—

“কেহ আছে হরিবারে, কেহ কত্ৰা অন্তরীপে,

চক্ষুরে বসতি কারো, কেহ আশ্রয়ান ধীপে ”

তাহা তিনি বলেন নাই । আমাদের পট্টীন সৰ্ব্বনাশের সৰ্ব্বপ্রধান কারণ যে তাঁহার মত হুশিক্ত ব্যক্তির দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছে, তাহা নহে । তিনি ম্যালেরিয়ার প্রকোপহৃদ্ধির কথা বলিয়াছেন । কিন্তু এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপহৃদ্ধিই যে বাঙ্গালার গ্রামগুলির অবনতির সৰ্ব্বপ্রধান কারণ—আর সেই কারণ দূর করিতে না পারিলে যে পল্লীরক্ষার কোন উপায়ই করা যাইবে না, সে কথা তিনি যেমন করিয়া বলিবেন, আশা করিয়াছিলাম, তেমন করিয়া বলেন নাই । ইহাই আমাদের দুঃখ ।

ভ্রম ।

অসীম তোমাতে মনে সসীম কল্পনা করি' ;

নিগুণ শগুণ ভাবি', দয়া চাই তব হরি ।

নিজে যত করি পাপ,

পাই তা'রি অহুতাপ,

দোষায়োপ করি তবু নির্জিকার ভাষণপরি ।

ভূমি দেব সব জান—ভূমি ত' চেতনাময়—

মায়িক জগতে বিঘা অম্বুত্যা জরাতর ;—

আজি ভেঙ্গে দাও ফুল,

অকূলে মিলাও কুল,

বলিনু করিয়া যাক তোমার স্বরূপ হরি' ।

ঈশলিনীমোহন মুখোপাধ্যায় ।

মৃত্যু-আস্থান ।

অনন্ত সমুদ্রের মাঝখানে ছোট ছোট দুইটি দ্বীপ ! আত্মীয়হীন ভাই-বোনের মত কাছাকাছি । তাহার চারিপাশে অনন্ত নীল সমুদ্র । মাথার উপর সোমাহীন আকাশ, বহু দূরে অনন্ত সমুদ্রের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ ! দ্বীপ দুইটির মাঝখানে চুঙ্গীর মত সরু খাল তাহাদের মিলনের একমাত্র বাধা ! সে খালের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ নাই, ঘূর্ণ্য নাই ; আছে কেবল যেতদন্তী জলধোঁটকের আনন্দ-কেলী, মধুর হাস্য ! আর ছিল তাহাদের পাহাড়ের গায়ে আনন্দ-নর্ত্তন ।

জানি না কতকাল দ্বীপ দুইটি এই অনন্তের মধ্যে সন্ত হইয়া আছে । তবে ইহা সত্য যে, এক সময়ে সে দুইটি একটি দ্বীপই ছিল । দুইটি দ্বীপের পাশা-পাশি পাহাড় দুইটি এক দিকেই ঢালু, ইহার যথার্থ্য প্রমাণ করিতেছিল । পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে রুস্ত কারের চক্রের মত জং ঘুরিতেছিল ।

দ্বীপটি কত শত শতাব্দী পূর্বে কি এক অজ্ঞাত কারণে দুইভাগের বাটালী-কাটা কাঠের মত কোন অজানা লোকের দ্বারা বিধা বিভক্ত হইয়াছিল । চিরদিনের মত তাহাদের মধ্যে একটা অগম্য বাধা পড়িয়া গেল । মূলময়ূক্ত দুই সিংহের মত বন্ধনযুক্ত সমুদ্র এক দিক দ্বিভেদে অন্য দিকে ছুটিয়া চলিল ।

বিবিলিপি অথগুনীর । অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে একখানি সহায়হীন আত্মীয়-হীন জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল । যাত্রিদল কে কোথায় ভাসিয়া গেল তাহার ঠিক গ্রহিল না । ভাসিতে ভাসিতে জন লফোর্ড আর মলি আর্নেস্ট আসিয়া সংজাহীনভাবে সেই দ্বীপের মধ্যে একপাশে আসিয়া ঠেকিল । সাধের জয়-ভূমি কোথায় পড়িয়া রহিল তাহার ঠিক গ্রহিল না ! জনহীন আত্মীয়হীন নামহীন এক দ্বীপে আসিয়া তাহাদের জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল । দ্রুত চেতনা ফিরিয়া আসিলে তাহারা আগ্রহ-দ্বীপকে নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম করিল । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সেই নন্দনকাননের পাতায় পাতায় তাহাদের প্রণয়-কাহিনী ফুটিয়া উঠিতে লাগিল । সারা জগৎটা যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল ;—তাহাতে দেন রেহ-শ্রীতি-প্রেম মাধান । আহা জগৎ এত সুন্দর ! রঞ্জিত লভাপাতা নিরায় নিরায় প্রেমকাহিনীমাধান প্রণয়-কবিতায় ভরা !

যে বীপটিতে তাহারা বাস করিতে লাগিল তাহার নাম হইল, মলিবীপঃ; আর তাহারা পাহাড়টির নাম রাখিল, আর্শেই পাহাড়; আর পানের বীপ ও পাহাড়ের নাম রাখিল—জনবীপ ও লফোর্ড পাহাড়। মাঝের খালের নাম রাখিল, চন্দী খাল।

মলিবীপে সবুজ ঘাসে ঢাকা একশত জমি। সবুজ মধ্যমলের মত সেই ঘাসের উপর যখন প্রাতঃসূর্য্যের দ্বিচ্ছ ক্রিয় পড়িত তখন শেঙলি সোণার রেবার মতই সুললিত দেখাইত; রাত্রিতে চাঁদের দ্বিচ্ছ ক্রিয়পাতে সেটি আরও সুললিত হইয়া উঠিত; ছায়া ও অন্ধকারের মধুর মিলন সুখশ্রী মধ্যমলের মত সুললিত দেখাইত। সেই ধরার নন্দনে পাড়াইয়া তাহারা দুইজনে এক দিন বিস্তর ভ্রমণ করিল; তাহার পর দুই জনে দুই জনের হাত বরিয়া বলিল,—

“আমি জন, তোমার গ্রহণ করিলাম, মলি!”

“আমি মলি, তোমার গ্রহণ করিলাম, জন!”

সেই হইতে সে জায়গাটি বাসর-ঘর নামে অভিহিত হইত। এমনই করিয়া তাহাদিগের একটি কায়ে বীপের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইল; কিন্তু সে সব কবার উল্লেখ এ স্থানে না করাই ভাল।

জনবীন সে বীপে তাহাদের একটিমাত্র ভয় ছিল,—যদি কেহ তাহাদের উদ্ধার করে! বিবাহের পূর্ব্বের দুই মাস আর পরের তিন মাস ইহাই তাহাদিগের একমাত্র ভাবনার বিষয় হইয়াছিল।

মলি বলিত,—“অবশ্য এক দিন না এক দিন আমরা আমাদের সুসভ্য জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইব; কিন্তু দুই বৎসরের পূর্ব্বের কথাই যাইব না। কি বল জন?”

প্রত্যুত্তরে জন বলিত,—“দশ বৎসরের আগে কখনই যাইব না।”

সে বীপ হইতে যে কখনও ফিরিবার আশা নাই জন কখনও তাহা মলিকে বলিত না। মলির সেই সদানন্দ মনে ভাবনার সোকা চাপাইয়া সে তাহাকে নিরানন্দ করিতে চাহিত না। কেবল অদৃষ্টের উপরই তাহাদিগের ফিরা না ফিরা নির্ভর করিতেছিল।

কিন্তু বীপে তাহারা অতি-আনন্দেই দিন কাটাইতেছিল। বৃষ্টি কষ্টের প্রথম মানব আদাম ও ইভের জ্ঞান-ফল ভক্ষণের পর কোন লোক এত সুখে দিন কাটায় নাই। সে বীপের সকলই তাহাদিগের সুখের হেতু ছিল।

প্রথমতঃ জীবনে তাহাদের কেন বন্ধন ছিল না, সংসারে আপন বলিতে

দুইজনের কেহই ছিল না। দ্বিতীয়তঃ জীবনের এই নূতন অধ্যায় তাহাদের মনের মধ্যে একটা মাদকতা আনিয়া ফেলিয়াছিল। তৃতীয়তঃ নূতন জীবন তাহাদিগকে অচিন্ত্যপূর্ণ উপায়ে স্বীকরিয়াছিল; প্রেম, প্রীতি ভাল-বাসায় তাহাদের হৃদয় ভরিয়া ভুলিয়াছিল।

পিতৃমাতৃহীন মলি বালোই সরকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ফিলিপাইন দ্বীপে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতে আসিয়াছিল; আর পনের বৎসর বয়স হইতে শ্রোতের মুখের ত্বকের মত অনন্ত সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। জনের কোন বাড়ী ছিল না কোন সংসার-সঙ্গিনীর কথাও কখন তাহার মনে উঠে নাই। মলিরও কোন বাড়ী ছিল না, কিন্তু একজন জীবন-সঙ্গীর অভাব চিরদিনই তাহার হৃদয়ে অমুতৃত হইত। মলিদ্বীপের নূতন বাধা দর তাদের বড় আদরের বস্তু হইয়াছিল;—কেন না জারগা তখন নূতন।

যখন তাহারা প্রথম দ্বীপে আসিল তখন ষাটের ভাবনাই তাহাদিগের প্রধান ভাবনা হইয়া দাঁড়ইল;—অল্প কথা ভাবিবার সময় তাহাদের বড় ছিল না। ক্রমে ক্রমে যখন সে ভাবনার এক প্রকার শেষ হইয়া গেল তখন আশুপ রাখিবার ভাবনাটাই তাহাদের প্রধান ভাবনা হইল।

প্রতি দিন প্রকৃতিতে সমুদ্রের আনীত দান খুঁজিবার জন্য তাহারা সমুদ্রের তীরে ঘুরিয়া বেড়াইত। যখন তাহাদের জাহাজখানি ভুবিয়া গেল তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে অনেকগুলি আবস্তক দ্রব্য মলিদ্বীপে ভাসিয়া আসিল। প্রথম দশ দিন জন ও মলি অনবরত কবর খুঁড়িয়া মৃতদেহ সমাধিস্থ করিতে ব্যস্ত ছিল;—গোর দেওয়াই মলি দ্বীপের প্রথম কার্য্য হইল। তাহার পর কাঠ, কয়লা, আসবাব, তাঁরু খাটাইবার জিনিষপত্র প্রভৃতি নিয়ত ভাসিয়া আসিতে লাগিল। জন ও মলি সাগ্রহে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া লইল;—বেসকল অনাবস্তক জিনিষ আসিয়াছিল সেগুলিও সময়ে উত্তোলিত হইল। তাহার কয়েক দিন পরে জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তক ভাসিয়া আসিয়া মলিদ্বীপে লাগিল।

সেখানি ভুলিয়া রৌদ্রে শুকাইবার পর এক দিন মলি সানন্দে বলিয়া উঠিল,—“জন! এ স্থানেও আমরা সাহিত্যচর্চা করিতে পারিব। যখন অল্প কোন কাণ্ড থাকিবে না তখন এখানি আমাদের বন্ধুর কাণ্ড করিবে।”

দেখিতে দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেল;—কিন্তু বহি পড়িবার অবসর মলির এক দিনও হইল না। তবে উপাসনার বহিধানা দিনান্তে একবার

না পড়িলে নহে, তাই সেখানি পড়া হইত। তাহাদের জীবনই রোমান্সে পূর্ণ, উপন্যাস তাহাদিগকে আর কি নূতন দেখাইবে ?

ছুই জনে সমস্ত দিন নানাবিধ কাম করিয়া কিছুকণ মাছধরাই ও নীকারে কাটাইত। তাহাদের আর একটি কাম ছিল,—সন্ধ্যাবেলা পাহাড়ের উপর বসিয়া নিত্য ছুইজনে রক্তরবির অন্তগমন দেখিত। সারা আকাশ লিন্দুর ছড়ান,—ছোট বড় নানা রকমের পাখীর কলরবে তাহারা তন্ময় হইয়া পড়িত। ক্রমে ক্রমে সেই মধুর মৃদু চক্ষুর সম্মুখ হইতে মুছিয়া যাইত, আর একখানি অন্ধকারের ঘনিকা সারা আকাশটা ঢাকিয়া দিত। তখন তাহাদের হৃৎ চৈতন্য ফিরিয়া আসিত; ছুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া বসে ফিরিয়া যাইত।

জন এমনই নিঃসঙ্গ অবস্থায় আজ প্রায় বিশ বৎসর সোনার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। জগতের আর কিছু তাহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এত দিন পরে তাহার সে বেগ মিটিয়াছে;—আজ বলি আর মলিষীপ তাহার কাছে সম্পূর্ণ নূতন।

মলির একটা কেমন অভ্যাস ছিল; সে সর্বদাই বলিত,—“আজন্ম কাল আমার কোন কামই করা হইল না; বাহাতেই হাত দিই তাহাতেই উণ্টা ফল দাঁড়ায়। কি ফলগেই আমি জন্মিয়াছিলাম!” অথবা আধুনিক জীলোকের মত বিধাতার দোষ দিয়া সে মাঝে মাঝে বলিত,—“পোড়া বিধি আমার পুরুষ করিল না কেন? আমার জীলীবনটাই বুঝা গেল।”

বাস্তবিক মলির জীবনে এতদূর হইবার দুইটি কারণ ছিল; প্রথম তাহার পারিবারিক অবস্থা, দ্বিতীয় মলির নিজের স্বভাব। গার্হস্থ্য-জীবনে তাহার আদৌ পারদর্শিতা ছিল না; তাহার পৈতৃক অধীরতা সকল কর্ণেই তাহাকে বাধা দিত। ঠিক শিমূল ফুলটির মত তাহার বাহিরটা বড় সুন্দর; কিন্তু ভিতরে শুণের লেশমাত্রও ছিল না। তবু সে নিরাশ হয় নাই; কার্যো পটুতা লাভের লক্ষ্যে সে সর্বদা উত্তম ও অধ্যবসায়সহকারে কার্য্য করিত। এক সময় সে কলেজেও পড়িয়াছিল; কিন্তু এখন তাহার সারা মস্তিষ্কটি বুজিয়া দেখিলেও তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ কলেজে পড়িবার লক্ষ্য তাহাকে একটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, আজন্মের রেহমর স্থান—সেই জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বিদেশে আসিতে হইয়াছিল। ইহার ফলে তাহার জন্ম ভিন্ন-দিনের মত ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। হায় অবশেষ!

তাহার মন চিরদিনই উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ ; সে আকাঙ্ক্ষা দূর করিতে হইলে যন্ত্রিক ও হস্ত উভয়কেই নিখুঁত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু মলির জীবনে এমন কোন কাৰ্য্য আইসে নাই যাহাতে এই উভয়ই নিখুঁত থাকিতে পারে।

বীপের এই নূতন জীবন তাহার মনকে সৰ্ব্বদাই কার্য্যে নিখুঁত রাখিয়াছিল ; হস্তশাস্ত্রিনী মলির জীবনে এই প্রথম শাস্তি।

সে জনকে প্রায়ই বলিত ;—“আর যদি এক বৎসর আমি দেশে থাকিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া ফেলিতাম। সে একথেকে জীবন আমার অসম্ভব হইয়াছিল।”

এই নূতন জীবনে তাহার আরও একটা উপকার হইয়াছিল—সে অনেকটা কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল,—গৃহিণীপনার তাহার একটা পারদর্শিতাও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

সে মাঝে মাঝে জনকে বিজ্ঞাপন করিত,—“আচ্ছা, জন ! আমি তোমার এত ভালবাসি কেন জান ? তাহার কারণ তোমার উপর আমার এখন পূর্ণ অধিকার ; তোমার ভালবাসায় ভাগ বসাইবার কেহ নাই। এখন তুমি আমার ; আমি তোমার। আমাদের মধ্যে আর কেহই নাই। যদি এই বীপে আর একজন মানুষ থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তোমার এতটা ভালবাসিতে পারিতাম না।”

উত্তরে জন শুধু হাসিত। ইহাতে জনের মনে এতটুকুও কষ্ট হইত না ; এবং তাহার কাছে মলির সৌন্দর্য্য আরও কুটিয়া উঠিত।

যখন তাহাদের জাহাঙ্গির ডুবিয়া গেল, তখনকার সহিত তুলনা করিলে মলির আকৃতির বাস্তবিকই এখন অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। তখন সে ছিল “গুবড়া” মেয়ে, কটা চুল, মুখ লাবণ্যহীন, কপালে দুই একটা চিত্তার রেখা ; কিন্তু এখন আর সে সব কিছু ছিল না, তাহার মুখে স্বিড লাবণ্যও দেখা দিয়াছিল। তাহার প্রতিজ্ঞাও অনেকটা পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার সেই হলুদ রক্ত দিন দিন পদ্মের পাপড়ির মত স্নান হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু দুইটি আনন্দোজ্জ্বল গর্জিত ভাব প্রকাশ করিত।

জনের চরিত্রের সকল গুণগুলি একমাত্র আৰ্ঘ্যব্রতের আবরণে ঢাকিয়া যাইতেছিল। চিরকালই তাহার এমনই কাটিয়াছে ; কর্তব্যজ্ঞানটা তাহার চরিত্রে খুব কমই ছিল। আত্মমুগ্ধ লইয়াই সে ব্যস্ত ছিল। মলির সহিত তাহার সাক্ষাতের পূর্বে আত্মমুগ্ধের অন্য যতটুকু দয়াকার তাহার অধিক কখনও

সে গ্রীষ্মকালের সহিত মিশে নাই। বড় বড় চুল তাহার সমস্ত মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল; আর তাহার মাঝে সাদা সাদা দাঁতগুলি বড়ই বেমানান দেখাইতেছিল। মাসুকের শরীরে বতটুকু দরকার তাহার চেয়ে এতটুকুও বেশী মাল তাহার পেশীবহল দেখে ছিল না।

এ পর্যন্ত তাহাদের দুই জনের ভালবাসার মধ্যে কোন ছায়াপাত হয় তাই; দেবদেবীর মতই দুইজনে সে ঘোঁপে রাজ্যশাসন করিয়া আসিতেছিল। সেই ঘোঁপে লোকাভাবে তাহারা দুইজনে পরস্পরের সঙ্গে কথা কহিয়া সকল সাধ মিটাইত। এক কথায় তাহাদের মত সুখী জগতে সুখি আর কেহ ছিল না। কিন্তু তবু—

সেদিন তাহাদের হাতে বিশেষ কোন কায না থাকায় জন একটা ঘরের বেড়া বাঁধিতে লাগিয়া গিয়াছিল; মলি তাহার কায়ে জোগাড় দিতেছিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জন বলিল,—“জনঘীপটা দেখিবার আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে;—যদি জায়গাটা কোন কায়ে লাগে। কিন্তু ওটার ঘাইবার ত কোন পথই দেখি না।”

“সে কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু যাহা নাই তাহা আর ভাবিয়া কি করিবে বল।”

মলি আবার বলিল,—“দেখ, জন! এটা প্রেমের রাজ্য; এ স্থানে আমরা কেহ বেশী দিন কাহারো বিরহ সহ করিব না, এটা ঐশ্বর্য সত্য। আর পরস্পরের উপর একটা ভ্রান্ত বিশ্বাসও বেশী দিন থাকিবে না জানিও।—কেন জান, জন! এ স্থানে আমাদের প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই!”

“আমি তাহা ভাবিতেছি না—একমাত্র ভাবনা আমার কিরণে ওপারে ঘাইব!”

“সে জন্ত আর ভাবিয়া কি করিবে বল? সময়ে পথ আপনি বাহির হইবে। তখন আমরা অনায়াসে ঘাইতে পারিব।”

উপরোক্ত ঘটনার দুই দিন পরে তাহারা পূর্ণবস্ত্রের উপর বসিয়া সূর্যাস্ত দেখিতেছিল। আবির্মমাণা ডালির মত সূর্য্যদেব পশ্চিম দিকের অনন্ত লম্বুজের দিকে ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িতেছিলেন; যেন সারাদিনের কর্মক্লাস্ত দেহ সমুদ্রে অবগাহন করিয়া শীতল করিতে যাঁহঁতেছিলেন।

জন বলিল,—“উত্তর আর পূর্ব দিকে কত যে জিনিষ ভাসিয়া আসিয়া

লাগে ভাঁহা আর বলিতে পারি না,—রোজ আমি তাহাই দেখি । ভগবান
জানেন কত দিনে সেগুলি পাইব ।

“কোথাকার কথা ?”

“জননীপে ;—ওঃ তবায় কত জিনিষই যে আছে তাহা আর কি
বলিব !”

“বোধ হয় কিছু মন টানিবার মত জিনিষও আছে ?”

জন উচ্চ হাত করিয়া উঠিল ।

* * *

“দেখিতেছ, মলি, কত জিনিষ ছিল ও স্থানে ?”

তীরে ঠাড়াইয়া মলি জনের ভেলাখানির অপেক্ষা করিতেছিল । আর
জন এক ভেলা জিনিষ লইয়া বীরে বীরে মলির দিকে অগ্রসর হইতেছিল ।
হঠাৎ ভেলার মধ্য-ভাগ ছাড়িয়া গেল, কতক জিনিষ সমেত জন একটা
এবল স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল ! বিস্ময়বিমূঢ় মলি পলকহীন নয়নে
জনের দিকে চাহিয়া রহিল,—দেখিল জন প্রাণপণ শক্তিতে ভেলা-
খানা তীরের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য
হইতে পারিতেছে না । হা ভগবান ! এ কি করিলে ? তবে মলির প্রাণ
তকাইয়া গেল । যদি জনের কিছু..... । সে আর ভাবিতে পারিল না ;
ছুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল ।

এ দিকে জন প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর উপস্থিতি অনুভব করিতে লাগিল ।
চক্ষুর সম্মুখ হইতে সারা বরাটা কি এক বাতাসে বিধের অন্ধকারে রূপান্তরিত
হইতে লাগিল ; ক্রমে আর কিছুই দেখা যায় না স্রোতের উপর স্রোত আসিয়া
সুত্ৰ ভগ্ন ভেলাটিকে তীরের মত এক দিকে ছুটাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল ।
অল্পকণ পরেই একটা জলময় পর্কট-শিখরে আহত হইয়া সেটা বগবিশত
হইয়া গেল ।

সেই সঙ্গে দেখিল প্রতি মুহূর্তে জন জলের গভীরতম প্রদেশে নামিয়া
যাইতেছে তাহার শত চেষ্টাতেও সে তিলমাত্র সে গতির বোধ করিতে
পারিতেছে না । ঐ—ঐ—না জন একেবারে এবার ডুবিয়া গেল ।—জন ।

পাগলের মত মলি চীৎকার করিয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে গাশিল ।
কত ঠাকুরের নিকট যানত করিল “হে ঠাকুর আমার নির্দাসিত জীবনের
একমাত্র শব্দ জনকে ফিরাইয়া দাও !” মিষ্ট ঠাকুর সে কথা শুনিলেন

কি না জানি না। কতক্ষণ পরে মলি আসিয়া আবার সেই ঘনত্বের সৈকতে দাঁড়াইল;—তাহার দৃষ্টি সেই ময়ূরালের কাছে; যথায় তাহার অতিশয় জীবনের একমাত্র সঙ্গী ভূবিয়াছে। নীরবে মলি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আত্মবেহে শান্তি-পিপাসা হৃদ্য সারা দিনের পর বিশ্রাম লইবার সময় একবার সেই বামিধানময়্য সতীর কাণে কাণে বলিয়া গেলেন,—“কিনিয়া কি করিবে বৎ, ভগবতুই অনিত্য! আবার ভূমিও এক দিন যাইবে।” ধ্যান-নিরত মলির কাণে সে বর পৌছিল না। সে তখনই ভয় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নিশাচীর সঘর নৈশ সমীর আসিয়া মেহান্তিবিহীন জননীয়ে মত মলির অশ্রুত এলায়িত কুন্তল লইয়া তাহার প্রতি কত রেহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহাকে কত সান্ধবা দিতে লাগিল,—বামিবিহিত্য হতভাগিনী কিন্তু শান্তি পাইল না।

পর দিন যখন হৃদ্য উট্টল মলি তখনও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া! প্রায় আরও এক ঘণ্টা পরে মলি দেখিল, জননীয়ে কি একটা মহাব্যুত্তি। সে ভাল করিয়া মলি দেখিতে লাগিল তবে ত—তবে ত—জন.....!

তাহার কত দিন পরে মলি জনের কথা শুনিতে পাইল। জনের সহিত মিলনের ক্ষত তখন তাহার মনে কি প্রবল আগ্রহ! তাহার মনে হইতেনি, জনের বৃক ঋপাইয়া পড়িয়া তাহার এত দিনের বিরহ-বাধাটার নির্মাণ করে। কিন্তু হায় ভগবান বাদী!

জন বলিল,—“শ্রী যাহাতে তোমার কাছে যাইতে পারি আমি তাহাই করিতেছি, মলি! একখানা নৌক করিতে অগ্রস্ত করিয়াছি, এবার আর ভেলা নহে। বাস্তবিক, বলি, তোমার কথা না শুনিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছিলাম। একবার তোমার কাছে পৌছিতে পারিলে আর জননীয়ে আসিবার নামও করিব না।”

উত্তরে বিরহিনী মলি বলিল,—“তাই আইস, প্রিয়তম, বত শ্রী পর চলিয়া আইস।”

তাহার পর হইতে প্রত্যহ দুইবার করিয়া তাহাদের সাক্ষাৎ হইত। মলি নিত্য সাগ্রেহে জনের কথা শুনিত, তাহার নৌকাগঠন কতদূর হইল জিজ্ঞাসা করিত। এমনই ভাবে আরও এক বাস কাটিয়া গেল। অনাবারক্ষিত্য বিরহবাধিতা মলির শরীর দিন দিন তাদিয়া পড়িতে লাগিল।

এক দিন সকালে জন মলির অপেক্ষায় অনেক কণ ধাঁড়াইয়া রহিল— অনেক কণ পর্যন্ত তাহাদিগের সেই চির-প্রিয় মলিঘোপন হুটীরখানির দিকে চাহিয়া রহিল । কিন্তু আজ মলি কই ? কোন দিন ত এত দেয়ী হয় না ! আজই বা তবে এমন হইল কেন ? অহির হৃদয়ে জন অনেক কণ অপেক্ষা করিবায় পর দেবিল, মলি অতি কষ্টে বীয়ে বীয়ে আসিয়া নদী-তৈলকতে ধাঁড়াইল ।

জন কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল । মলি তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, “কাল সারা রাত আমার ঘুম হয় নাই । আমি আর ধাঁড়াইতে পারিতেছ না । একটা কথা—”

“বল ।”

“তুমি আমার ভালবাস, জন ?”

“সে বিষয়ে কি এখনও সন্দেহ আছে, মলি ?”

“তবে আমার লজ্জা একটা কাব করিবে ?”

“নিশ্চয়ই ।”

“আর যদি তোমার কাছে কখনও কিছু না চাই তবে আমার কাছে একটা দিবা করিবে ?”

“প্রিয়তমে ! এ কথা জিজ্ঞাসা কর কেন ?

কথা কহিবায় পূর্বে মলির ঠোঁট দুইটি একবার কাঁপিয়া উঠিল, “তবে প্রতিজ্ঞা কর তুমি আর এ স্থানে আসিবে না যত দিন—যত দিন না—।”

“—যত দিন না তুমি মর ?”

মলির চকুতে একটা দীপ্তি ভাসিয়া গেল । সে বলিল,—“হঁ।”

——“মলি ! মলি ! প্রিয়তমে ! তুমি এ কি বলিতেছ ?”

“আমি জানি তুমি তাহা পরিবে না । সেই জন্যই প্রতিজ্ঞা করাইয়া জইসাম । আমি তাহা বলে ধাঁড়াইয়া তোমার বৃত্তা বেধিতে পারিব না ।”

প্রায় এক মাস পরে জনের আর এক নৌকা সমাগ হইল । আনন্দ্রিক বলে সেখানাকে জলে ফেলিয়া প্রাণপণ শক্তিতে জন মলিঘোপ অতিব্রূণে ছুটিল । অজ্ঞ কণের মধ্যেই মলিঘোপে পৌছিয়া সে শাগলের মত সেই চিরপরিচিত হুটীরখানার দিকে ছুটিল । হুটীরের আর সে ঐ নাই—সে পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতা নাই।—আপাহা ও কাঁটা পাছে চারিদিক আম্রয় । অনেক মত জন সে সকল অগ্রাহ করিয়া একেবারে হুটীরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল ।

“মলি! মলি! প্রিয়তমে আনার—”

গৃহের এক কোণে মলির গলিত লব পড়িয়া ছিল। পাগলের মত জন তাহারই উপর আছড়াইয়া পড়িল।

ঐহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জ্যোৎস্না মাধুরী।

—১০:—

বাগত বিবেগ ধারে হেমন্তের তরঙ্গা ত্রয়োদশী
হাতোচ্ছল্য নিশিধিনী! চন্দ্রলোক গলিয়া গলিয়া
অকস্মৎ অন্ত-ধারে দিকে দিকে পড়িতেছে ঝরিয়া।
দেব-করণার সম! মধুময়ী জ্যোৎস্না রূপসী
পত্রে পত্রে-পুষ্পে পুষ্পে প্রান্তরে পুলিনে বেলাকুমে
কি অপূর্ণ মায়াভাল অতর্কিতে করিয়ে ওঁচনা
জাগাইয়ে স্বপ্ন-রাণ্যে শান্তিময় আনন্দ করনা
নিঃশব্দে গুমায় অধে! অতি বীরে স্তম্ভর্ণে চুমে
কনক কপোল তার স্নানবীন নৌহার ঈতন
মৃদুমন্দ গন্ধবহ, শেফালীর হার পরিমল
মাতাইয়ে বসুন্ধরা চলে যায় অরুণে কোণায়
কার অবশেষে যেন। অতীতের পুলকের স্মৃতি
হাসি খেলা গদ্য গান উচ্ছাসিত মেঘ-প্রেম ত্রীতি
আজি কোর তকে রূপা কণে কণে উৎসাহিত চায়!

ঐকীবেত্রকুমার দত্ত।

কবি বিহারীলাল

—:~:—

(৪)

পূৰ্ণ-ঐবন্ধে বিহারীলালের জীবন-কথার আভাস দিয়াছি। বাক্যমাণ ঐবন্ধে কবির রচনাবলীর বিশেষরূপে সঞ্চক্ষে কয়েকটি কথা বলিব। ভাবুক কবির পরিণত বয়সের কবিতাগুলি তাঁহার জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ বাণী-সাধনার ফল। সে কবিতার বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে যাইলে ঐবন্ধ বিস্তৃত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাহা না করিয়া এ স্থলে কেবল কবির কয়েকটি প্রধান বিশেষত্বের নির্দেশ করিব। সেই বিশেষত্ব কয়টি নিচলিখিত পর্ধ্যায়ে বিস্তৃত করিয়া লইলাম—

(১) শব্দসজ্জিত, (২) আত্মপ্রকাশ, (৩) নারীপূজা, (৪) দুঃখবাদ (৫) সুন্দরের গান, (৬) সারঙ্গার গান ।

শব্দসজ্জিত। বিহারীলালের কবিতা অতি মিষ্ট,—কোমলাদপি কোমল। ভাবা ও ছন্দ কবিতার দেহ মাত্র, ভাববাক্ত্যনাতেই তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু বিহারীলালের কবিতার দেহে ও প্রাণে, ভাষায় ও ভাবে এত মিশামিশি যে একের বিহনে অপরের অস্তিত্ব গেন অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বিহারীলাল শব্দকুশলী ও সুরজ্ঞ ছিলেন। তিনি যুহুস্বরে গান করিতে করিতে কবিতা রচনা করিতেন। সেই জন্ত তাঁহার কবিতা যে কেবল গীত হইবার উপযোগী তাহা নহে; সে কবিতার স্থলিত কথাগুলিই গানের মত সুধাবর্ণী। স্বরমালার সমস্ত পরতই কবির আয়ত্তাধীন এবং অভিধানের বিপুল শব্দসম্ভারে কবির অধিকার। ‘সারঙ্গা-মঙ্গল’ যে মৃতলীমধুর কান্ত-কোমল শব্দাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা কবির উক্ত ক্ষমতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দান করে। ‘সারঙ্গা-মঙ্গলের’ কোন স্থলে শব্দপরিবর্তনে উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। ঐ কাব্যের কোনও স্থলে কবির ধৈর্যবীণা কুহুম কোমলাঙ্গুলির পেলব স্পর্শে বেহাগের আবেশময়ী স্বরগহ্বরী জীলায় তনু অলসিত করে; যেন সত্যই চন্দ্রমা শালিনী মধুমামিনীতে

ভাগিরথী হুকে

ভাসি ভাসি শূণে

চলে ফুলময়ী তরী ধীর ধীর !

আলু থালু কেশ

আলু থালু বেশ

দুয়ার কামিনী রূপসী কচির।

—আবার কখনও বা সেই বতাবকোমল অঙ্গুলি তমসাম্ভ্র প্রকৃতির বিস্তীর্ণ-
কামর ভ্রুকণনে সন্তপ্ত হইয়া অশনি-কঠোর আঘাতে বীণার হৃদয় তন্ত্রীগুলিকে
যেন উচ্ছ্বল করিয়া তুলিয়াছে—

ভাবিতে পারিনে আর !

অন্তকার অন্তকার,

কটিকার ঘূর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর,

তরলিয়ার রক্তরাশি

নাকে মুখে চোকে আসি,

বেগে যেন ভেঙে ফেলে, ধর ধর ধর।

এ কথা বলা বোধ হয় নিশ্চয়োজন নো, বিহারীলালের কবিতার যত্নবদন,
হেমচন্দ্র বা বিজ্ঞেন্দ্রলালের কবিতার তুফাননি নাই। তাঁহার গীত দামা-
ধ্বনির সহিত 'সঙ্গত' হইবার উপযোগী নহে—বংশী ও মৃদঙ্গই তাঁহার উপযুক্ত
সহচর।

আত্মপ্রকাশ। বিহারীলাল উদ্ভুক্ত-জন্ম ও সম্প্রদায়ী ছিলেন। কবি
বতাবের এই বিশেষত্বটি তাঁহার কবিতার সঙ্গপ্রকাশ। বিহারীলালের কবিতা
যেন তাঁহার জন্মের বন্ধ যুগের। আমরা তাঁহার অন্তরের অন্তরতম কথা
সেই কবিতার বিমল বর্ণনে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। কবি তাঁহার
'প্রেম-প্রবাহিনী' কাব্যে আপনার যে চিত্র দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্বভা-
বের দোষ গুণ সমস্তই যথাযথ ভাবে পরিষ্কৃত। কবির যৌবন কালের রচনা-
গুলি তাঁহার সাদা প্রাণের খোলা কথা; তাহাতে কবি তাঁহার মনের শোভন
অশোভন সকল কথাই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার "জননী জনম ভূমি
সম মাতৃভাষা"র প্রতি প্রজ্ঞা, পান্ডিত্য প্রভাবময়ী কবিতাকে "কে তোরা
ফেরৎ বেশে উভায়ুধী আয়া" সম্ভাষণ, বিদেশী "প্রসাদী কুসুম" বাস্বেদী-
সেবার প্রতি বৃণা, "খুলির পুতলীগণে ফেটে পড়ে সেই বনে" সেই বনের উপর
বিতৃষ্ণা, "তেজের মান" রাধিবার জন্ত অকাতরে প্রাণ ত্যাগিবার কামনা,
"নিজের লেখার" জন্ত "বিষম বড়াই", বিরুদ্ধ সমালোচকগণের প্রতি অপরি-
ণত বয়সস্থলভ "পরের পাতড়া চাটো আপনার নাই" ইত্যাকার অনিষ্ট
ভাষায় গালিবর্ষণ, সাহিত্য সম্বন্ধে এমন কিছু রাধিয়া বাইবার সাধ বাহ্য
"নারিবে করিতে লোক ঈদ্র অবতন", "দুঃখা পুত্র"কে গৃহে স্থান দিয়া
পদাশ্রিত্য কস্তার প্রতি "ঘোর অত্যাচার" স্বরূপে সমাজের প্রতি অসহিষ্ণুতা
প্রদর্শন, ভগবানের প্রতিবে শরণ ও সেবদেবীপূজার ভক্তির ও আনন্দের
অভাব এবং সেই জন্ত স্বাভাবিক আত্ম-অহুযোগ, ব্যক্তি-বিশেষের বলকপটতা

মিথ্যাপ্রবন্ধনার জগৎ সমস্ত “মানব জন্তকে” “ব্যস্ত সূৰ্ণ” অপেক্ষা ভয় এবং এই অথবা মানব-বিষয়ের জগৎ উত্তর কালে দারুণ অসুস্থতা ও আত্মভাঙনা এইরূপ কত কবাই কবি অসুস্থিত ভাবে, কোনও কোনও হুলে শীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া, তাঁহার কবিতার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন !

কবির তরুণ বয়সের রচনাগুলিতে যে আত্মপ্রকাশ আছে সাহিত্য হিসাবে তাহার বিশেষ মূল্য নাই ; কিন্তু তাঁহার পরিণত বয়সে রচিত কবিতায় যে মাতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ, বন্ধুপ্রীতি প্রকৃতির উচ্ছ্বাস আছে তাহা বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যে অবহেলার বস্তু নহে । সে আত্মপ্রকাশ ব্যক্তিগত হইলেও সার্বজনীন সাহিত্যে স্থান পাইবার দাবী করিতে পারে । কবির ‘বঙ্গবন্ধু’ কাব্যে যে আত্মপ্রকাশ আছে সে সৰ্ব্বদেই স্ববীজনাথ নির্ধিয়া ছিলেন, “আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা ।”

শৈশবে মাতৃহারা কবি প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার জীবন-প্রত্যাহার সেই জুহেলিকাঙ্কর মাতৃমূর্ত্তিকে স্মরণ করিয়া উবেলিত হৃদয়ে পাইলেন—

হৃদয় আনিবে কেন

আত্মল হইলে কেন

কত কাল সেবি নাই মায়ের স্নেহের হৃৎ,

অতি কষ্টে আঁধ আঁধ,

ভাত বেস বাঁধ বাঁধ,

পড়েত পড়ে না মনে জীবনের কি-অনুৰ ।

সে কাল কালিয়া টুটে

আহা কি উঠেছে সুটে

কিহিয়া আনিছে বেন হার্যাণো পুরাতন হৃৎ ।

চিনেছি না আর আর ।

বিকাইব রাজ্য পার ;

তুমিই দেবতা নয় আগ্রস্ত রয়েছ এগে,

বিপদে সম্পদে রাধ,

অলক্ষ্যে আগলে থাক ,

বনন বেগানে আহি, চেয়ে আঁধ হৃৎ পামে ।

নিদ্রার আত্মল হোলে

দুখাই তোমারি কোলে

জ্বাৰ ত্বকায় করি তোমারি সে ভয় পাম,

তুমি আছ কাছে কাছে,

তাই এগে বেঁচে আছে ,

সর্ব্বদা সঙ্কট আছে, সদা কর পরিজ্ঞাপ ।

চারি বয়সের হোলে

কেন কলে অর্পে গেলে ?

আমি অতি শিশুভক্তি চিনিতে পারিনি গো ।

এতাক দেবতা তুমি তোমারে পুজিদি গো ।

কবির পত্নী-প্রেম তাঁহার যৌবনকালের রচনা 'সঙ্গীত শতক' হইতে আরম্ভ করিয়া পরিণত বয়সের রচনা 'নিশান্ত সঙ্গীত' পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত কবিতাতেই প্রতিবিম্বিত। এ স্থলে তাঁহার পত্নীপ্রেমান্বক চরম গীতটি 'সারস মঙ্গল' হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর স্মৃতি তোমার।
 সন্ধ্যা বেন হাদিতেছে আলর আশায়।
 সন্ধ্যা বেন ঘরে ঘরে কলস বিরাজ করে,
 ঘরে ঘরে দেবদীপা বাজে সারিসার।
 ধাইয়ে হরষভরে কল কোলাহল করে,
 হাসে গেলে চারিদিকে সুমারী সুমার।
 ঘরে কত আলাতন করি অন্ন আহরণ,
 ঘরে এলে উলে দার ভস্মের তার।
 মন্ত্রময় ধরাতল তুমি শুভ শতমল,
 করিতেছ চল চল সন্ধ্যা আশায়।
 সুখা তুচ্ছা দুয়ে হাবি, তোমার ঘরে ব'সে থাকি
 মনন পরাণ তোয়ে দেবি অবিহার।
 তোমার দেবি অবিহার।
 তুমি সঙ্গী সর্বস্বতী আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
 হোগ, গে এ বস্ত্রবস্ত্রী দার পুসি তার।

বিহারীলাল 'নির্গঙ্গদর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে বেঙ্গল সুমধুর কবিতার পত্নীপ্রেমের সহিত অপত্যস্নেহ বিজড়িত করিয়াছেন তাঁহার তুলনা নাই। কবি যৌবনে তাঁহার শিশুপুত্র "বাছু অধিনাশবনিকে" "প্রেমসীর কোল আলো করি" থাকিতে দেখিয়া যে অতুল সুবাসন্তোষের উদ্ভাস কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, জীবন-সাম্রাজ্যে 'প্রভাত-সঙ্গীতে' তাঁহার "ছুঁধের মেয়ে বন্ধ"কে বন্ধে ধারণ করিয়া সেই সুরেরই প্রতিধ্বনি তুলিয়া গাহিয়াছেন—

বন্ধাবে অন্ডার আছে পূর্য্য কেমন কোয়ে,
 এছাৎ বত ভালবাসা, ওত ভালবাসি তোয়ে।
 বিচিত্র বিধাতা জব প্রেমেই মোহন ভোর
 ছুরানে না বগ্ন কল্লু জাতিবে না দুঃখোর।
 অতি অপমান দিয়া, অপকরণ সন্তোর,
 বিদেহ সৌন্দর্য্য দাপি কি এক কিরীতিবর।

বহুবল্লভ কবি— তাঁহার অজবয়সের রচনা ‘বহুবল্লভ’ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ জীবনের রচনা ‘সাধের আসন’ কাব্য পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত কবিতাতেই বহুপ্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার শৈশব-সখা অভয়চন্দ্র চন্দ্রের মরণে কবি যথাবয়সে গাহিয়াছিলেন “কাঁদে কাঁদে প্রাণ অভয়-বিহনে” এবং শেষ জীবনে তাঁহার কাব্যাহুগাগিনী মহিলা বহু ‘সাধের আসন’দাত্তীর শোকে কাদিয়াছিলেন “হা দেবি ! তোমার আর দেখিব না এ ধরায় ।” এ স্থলে ‘অর্থ্যাবর্তে’ প্রকাশিত ‘পুরাতন প্রসঙ্গের’ পাঠকগণের ঐতিকর হইবে বলিয়া কবি তাঁহার অকৃত্রিম স্মৃতি পণ্ডিতপ্রবর ঐযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়কে ‘বঙ্গসুন্দরী’-কাব্যে যে ব্রহ্ম-সম্ভাষণ করিয়া গিয়াছেন সেই কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রিয়তম সখা সন্তান ! প্রভাতের অক্ষয় উদয়,
হেরিলে তোমার পানে, ভূতি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয় ।

যখন তোমার কাছে যাই, যেন ভাই স্বর্গ হাতে পাই ;
অতুল আনন্দ তরে যুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই ।

কিরে আসে সেই হেলে বেলা হেসে হুঁধে করি বেলাদুন্দুবেলা,
আজ্ঞাসের শীমা নাই, কাড়া কাড়ি করে খাই,
জলে যেন বাথালের বেলা ।

তুমি বাও আপনার ঝোঁকে হৃদয় নর্পনস্থ্যালোকে ।
যার দীপ্ত প্রতিভায় তিমির মিলায়ে যায়,
কোটে চিত্ত বিচিত্র আলোকে ।

আমি আমি কহল-কাননে, যথা বলি কহল-আসনে
সরস্বতী বীণা করে, স্বর্গীর অমির করে
গান গান সহস্র আননে ।

পরশুর উন্মত্তর কালে পরশুরে বাধা নাহি থাকে
চোকে বত দুইে আছি যেন ভত কাছাকাছি
ঈর্ষ্যার আড়াল নাই থাকে ।

নারীপূজা। বিহারীলাল তাঁহার কবিতায় যেভাবে নারীবন্দনা করিয়া গিয়াছেন, সেরূপ পবিত্র উদার ও উন্নত আদর্শের নারীজাতির প্রতিগান তাঁহার পূর্বে অপর কোনও কবি করেন নাই। বিহারীলাল বৈষ্ণব কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া—অবতাররূপিনী দেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করেন নাই, অথবা কবিকুলের আবহমান কালের প্রথমত রমণীর রূপের বা প্রেমের বর্ণনা করেন নাই। তিনি নারীজাতির সমষ্টিতে জগদ্ধাত্রী ও জগৎপালয়িত্রী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া এবং সেই অতুল্যতার আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করিয়া কবিত্বরসে উদ্ভাসিত হইলেন। এই কঠোর পৃথিবীতে বাহ্য কিছু কোমল, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু সুন্দর, সে সমস্তই বিহারীলাল নারীতে একাধারে বিস্তারিত দেখিতেন। তিনি জানিতেন নারীই জগতের প্রাণস্বরূপ। নারী—

প্রেমের প্রতিম, মেহের সাগর, করুণা-নিবর, দয়ার নদী ;

হ'ত মরুময় সব চরাচর না থাকিতে ভূমি জগতে যদি।

বজীর গৃহলক্ষীগণের জন্তই তিনি আমাদের এই সুজলা সুফলা মাতৃভূমিকে স্বর্গাদপি পরায়সী জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন—

হেম ধরাধাম থাকিতে সমুখে সুরলোকে লোকে কেনরে ধায়
নরে কি অমরে আছে মন সুখে, যদি কেহ মোরে সুধাতে চায়।

অবস্তা বলিব নারীর মতন, সুখ শান্তিময়ী অমৃতলতা,

নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন, শচী পারিজাত কপোলকণা।

এ মর্ত্ত্য ভুবন কমল কাননে নারী পরম্বতী বিরাজ করে,

কবে সমাদরে, সদানন্দ মনে, পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে।

অস্তিত্ব মতামতের জায়, রমণীভক্তি বিহারীলালের ইহ জীবনের সাথী ছিল। জীবনের প্রদোষকালও তিনি অচলা প্রজ্ঞা ও প্রেমের সুরে গাহিয়া গিয়াছেন,—

(আছে) বিশ্বজয়ী শান্তিময়ী নারী এ ধরায়,

তাই নরে নিধি পায় ;

আমর সেই স্বর্গ চতুর্দর্শি দারি কেবল প্রেমের ধার।

দুঃখবাদ।—৬ রাজনারায়ণ বসু তাঁহার ‘বাল্মীকি ভাষ্য ও সাহিত্য বিশ্লেক বক্তৃতা’য় লিখিয়াছেন, বিহারীলাল “যেমন দুঃখ ও মানসিক কষ্ট বর্ণনা করিতে পারেন তেমন অল্প কোন বর্ত্তমান কবি পারেন না।” বিহারীলাল গাহিয়াছিলেন—

সর্বদাই হহ করে মন, বিশ্ব ঘন রক্তর মতন
চারি দিকে কালা ফালা, উঃ কি অগত জালা ।
অগ্রিকূণ্ডে পতঙ্গ পতন ।

কছু ভারি ভোজে এই বেশ, যাই কোন একদা প্রবেশ,
যথার নগর গ্রাম, নহে যাহুকের দাম,
পড়ে আছে ভয় অবশেষ ।

ইত্যাদি ইত্যাদি

বিহারীলাল “হুঃখের কবি” বলিয়া কাব্যরসজগতের নিকট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিশ্রমের অনেকেই হুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের ও বিহারীলালের হুঃখ অভিব্যক্তিতে প্রভেদ আছে। বৈষ্ণব কবিগণ কৃষ্ণ-বিরহ-হুঃখ ও কবিকল্প সাংসারিক ক্রেশের বর্ণনা করিয়াছেন, সে হুঃখের গানে কবির আত্মপ্রকাশ নাই। বিহারীলালের হুঃখের কারণ অস্বপ্ন,—তাহা সংসারে অতৃপ্তি, জীবনে বিতৃষ্ণা, ভবিষ্যতে নিরাশা, আর সেই হুঃখ কোনও কল্পিত ব্যক্তির মুখে ব্যক্ত হয় নাই ; কবি আত্মপ্রকাশ করিয়া নিজের মনোদুঃখই বিকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পান্ডিত্য কাব্য সাহিত্য হইতে বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্যে এই হুঃখ-বাদের উৎপত্তি। যুরোপে হুঃখবাদের উৎপত্তি হইবার প্রবল কারণ ঘটিয়াছিল। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর বর্ষে অভ্যুত্থান, দেশে অস্বাভাবিকতা, সমাজে উচ্ছ্বাসতা আবির্ভূত হইয়া যুরোপীয় জনসাধারণকে অতৃপ্তির ঘোলায় প্রবল ভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। জর্জ কবি গেটে (Goethe) প্রথমে সেই অতৃপ্তি কবিতায় লিপিবদ্ধ করেন ; তাঁহার “ওয়ার্ডারের হুঃখ” বেশ ব্যাপিনী অতৃপ্তির অভিব্যক্তি। গেটের করুণ ক্রন্দনের কণ্ঠে ইংলেণ্ডে একদল হুঃখবাহী কবির উদয় হয়। বার্লিন ওঁহাদের সুবন্দিত ; শেলী আর একজন নেতা ! উভয় কবিরই অতৃপ্তিবাদের ব্যক্তিসত্ত কারণও বিস্তারিত ছিল। ভুল্যন্তর ব্যক্তিগত বা সমাজগত কারণ না থাকিলেও বহুদেশে নিরাশাবাহী কবির,—অবশ্যাদ লক্ষ্যের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহার মূখ্য কারণ, পান্ডিত্য কবিগণের অস্বপ্ন। কেহ বা বলেন, তাবতিসার। কেহ বা বলেন, বিদ্যার সঙ্কীর্ণতার মধ্যমী স্বরলহরীর অন্ধ আকর্ষণ। পরবশতাও ইহার কারণ। আরম্ভেও বোধ হয় সেই অন্ধই বিদ্যার-গীতের এত আদর ও প্রাচুর্য।

বিহারীলালের কাব্যে বিবাদের স্র, নৈরাত্তের উজ্জ্বল আদিবার অপর কোনও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি কোনরূপ অশান্তি বা রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করেন নাই। শোকতাপ প্রণয়নৈরাত্ত দারিদ্র্য-ছায়া ব্যাধিক্রম প্রভৃতি ব্যক্তিগত বা সাময়িক ছায়াবস্তুর কারণের অন্তিম বিহারীলালের জীবনে দেখা যায় না। আর বিহারীলালের অবসাদ সঙ্গীতে শোকের স্র নাই; তাহা অস্থিতির রাগিনী। বিহারীলাল একজন প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। বঙ্গাতির হীনতায় ও হৃদয়শূন্যতায় তিনি তাঁহার ছঃসবাদ বা নিরাশাবাদের গগন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিহারীলাল স্র-বস্তুর উপাসক। নিরাশা অনুস্রব; স্রতঃস্র নিরাশার অন্ধ-কারে থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই জীবন-সাম্রাজ্যে তিনি বৌদ্ধের ত্রমাস্তক সংস্কারের মত অহুতাপ করিয়াছিলেন।

ঐনবক্তক বোধ।

উর্বশীর প্রতি পুরস্রবা।

জুড়াও জীবন-আলা হে বরস্রন্দরি !
আছে ও কোমল বুকে শিঙ স্রোবর।
মুহুর্তাশিখির ভরা তুমি বিভাবরী !
জুড়াও ; এ রৌত্রতত্ত্ব বরুত্ব অন্তর !
তুমি ত্রিবিবের স্রবা অঙ্গরা-রূপিনী !
জুড়াও এ বুকে জলে ভীত হলাহল ;
নন্দমে বুদ্ধারছায়ে তুমি মন্দাকিনী,
জুড়াও তুমিতে দিয়ে বারি স্রষ্টাভল !
এ মস্তা-উত্তান ওই পারিজাত ফুলে,
বিমোহিবে দল শিফ সৌরভে স্রন্দর ;
রঙ্গে ভব ছেম-অঙ্গ রাধি বন্ধে তুলে,
মরতে রচিব নব'মর্গ মনোহর।
র'ব এ বিবেক বুকে তুমি আর আমি।
ছায় কায়্য স্র বোর হও শুভগামী।

ঐনপেঙ্গনাথ সোম।

নবীনচন্দ্রের কাব্য কৃষ্ণচরিত্র।

—::—

(২)

‘কুরুক্ষেত্রের’ কবি লিখিয়াছেন, “কুরুক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) অনন্তকালস্পর্শী মধ্য লীলা।” কবি-শিল্পীর অপূর্ণ তুলিকা-পাতে ‘কুরুক্ষেত্রে’ কৃষ্ণ-চরিত্র; কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, এবার আমরা তাহাই দেখিব।

মগধরাজ জরাসন্ধ পত্তবলে বলীয়ান হইয়া অশীতি জন নিরপরাধ যুগ-তিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে;—উদ্বেগ নত সংখ্যা পূর্ণ হইলে ক্রোধের সম্মুখে বলি প্রদান করিবে।

এই সংবাদ কৃষ্ণের করুণাপূর্ণ হৃদয়ে বেদনা প্রদান করিল। তিনি পত্তবল বিদ্যালিত করিতে—দ্বৈষ্টের দমন করিতে—অগ্রসর হইলেন। তাঁহার কৌশলে একমাত্র জরাসন্ধেরই নিধন হইল, আর কাহারও এক বিশু-রক্তপাতও হইল না। কারারুদ্ধ রাজস্বয়ং মুক্তিদাতা কৃষ্ণের চরণতলে কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে লুপ্ত হইয়া পড়িলেন। মনে করিলে কৃষ্ণ তখনই ভার-তের একচ্ছত্র সম্রাট হইতে পারিতেন। কিন্তু, সে রূপ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না। তিনি নিষ্কাম কর্ম প্রচার করিতে—ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জরাসন্ধ-বধের পর ভারতে কিছুকালের ক্ষত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ধর্ম্মরাজের রাজস্বয় যজ্ঞ-শেষে কৃষ্ণ দুই শিষ্যপালকে বিনাশ করেন। রাজস্বয় এক প্রকার নির্ঝিয়ে সম্পন্ন হইয়া গেলেও, সেই সময় যে অশান্তির অনল প্রধূমিত হইয়া উঠিল, তাহা আর নির্দাপিত হইল না। কিছু কালপরে তাহা ভীষণ ভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই হত্যাশনে ভারতের যুগতি ও বীরবর্গ পত্তনের ভ্রায় আত্মহুতি প্রদান করিলেন।

সতীর অবমাননাকারী—নির্দোষের নির্ঘাতনকারী বৃদ্ধিমান দম্ভ দুর্ঘোষন যখন বিনা বুদ্ধে স্বেচ্ছা বেতিনীও পাণ্ডবদিগকে দিতে বীরুত হইল না, তখন তাহার বিরুদ্ধে “ধর্মবুদ্ধ” অনিবার্য হইয়া উঠিল। সেই বুদ্ধক্ষেত্রেও কৃষ্ণ নিকায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ধ্বংসলীলা দেখিয়া মহর্ষি ব্যাসের অনৈক শিষ্য ব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,

“তদিত্যহি বাপরেণে কৃষ্ণ অবতার,
এই ধ্বংস যজ্ঞ প্রভু। ধর্ম পিকা তাঁর ?
জীবৈ দয়া, জীব হিংসা ? সর্গ জীবহিত,
সর্গ জীবের বিশাল ? এই মহাভাণ,—
কুরুক্ষেত্রে—ধর্মক্ষেত্রে ?—”

তদুত্তরে ব্যাস বলেন,

এই ধ্বংস-যজ্ঞ ধর্ম! কর দয়ন
সর্গের ধর্মের মানি, অধর্ম প্রবল,
সাপুত্রের ছায়াকার, দ্রুত দ্রুত
বহিতেছে নিরন্তর পাণহলাহল।
অধর্মের অভ্যুত্থান, এই পাণ্ডব
করিতে বোচন বৎস। করিতে প্রচার
ভারতে মহাভারত, কৃষ্ণ অবতার।
অপূর্ণ জীবন লীলা! কংসের নিধন,
উগ্রসেনে দানবদান, আত্মনির্ভর
নিবাহিতে বক্তব্রোত সমুদ্রের পার।
রাজব্রহ্মের পাণ্ডবের সাক্ষাৎ প্রবল,
বিনা বুদ্ধে কি কোপলে হইল দ্বাপন।
সর্গের নিগিষ্ট কৃষ্ণ, সর্গের নিকায়,
সর্গেরই দয়া ধর্ম আদর্শ মহান।

সাপুত্রের পরিত্রাণ, দ্রুত দয়ন
সাহিব্যের অনিবার্য হ'ল ধর্ম-রথ।

তাহার পরে কৃষ্ণের নিগিষ্টতা বা কামনাশূন্যতা সম্বন্ধে—

“কর্ম তাপ নিগিষ্টতা ভাবিও না বধে।
ভগবান কর্মরত। বিপুল সংসার
কর্মক্ষেত্র; বাহি কাহো তিলাঙ্ক বিপ্রাধ।

অগস্ত্যের হৃৎ হাত হৃৎ আপনার,
 জামি অগস্ত্যের অংশ, এ নিঃস্বার্থ জ্ঞান
 ব্যর্থ কর্ণমূলে : কর্ণমূলে কদাচন
 নাহি ছুই স্বার্থ ভাষে ; নিগিত গে জন ।
 নিকাম বা মিলিতের আদর্শ উজ্জ্বল
 মহিমা দ্রুতিত ভই সমুদ্রে তোমার
 কুণ্ডল জীবন-চিত্র গবিত্ত নির্মল ।
 আছে কি স্বার্থের রেখা কোথাও তাহার ?
 দ্বারদ্বার, দ্বারদ্বারী সেনা আপনার
 দেব অতিকুলগকে ! সমগ্র কবিত্ত
 সমবেত বেই ক্ষেত্রে, ছুই কীট দ্বার
 মনোমোহনে মত্ত বধা, বীর অধিতীয়
 ভারতের, সেই ক্ষেত্রে নিরস্ত আপনি !
 দায়বিত্ত ত্রুতে ত্রুতী ! শূণ্যলোক ত্রুতে
 ত্রুতী সিংহ ! পাদোত্ত-ত্রুতে ত্রুতী মিমহনি ।"

ভারতের অধিতীয় বীর কৃষ্ণ সমস্ত দিন সারথির ত্রুতে ত্রুতী থাকিয়া নিশিতে
 স্নানকালে সন্ধ্যা লইয়া উভয় পক্ষীয় আহত সৈন্যের শুশ্রূষা করিতেন । তদন্ত
 শিকার সাফল্যেই আশ্রয় স্নানকালে নিঃস্বার্থ করণার মল্যাকিনী মাতৃহৃৎ দেবিত্তে
 পাই ।

'রৈবতকে' আমরা কৃষ্ণ-চরিত্রের বে অংশ উদ্দেশিত দেখিয়াছি, 'কুরুক্ষেত্রে'
 তাহাই পূর্ণরূপে বিকশিত দেখি । পতিত তমসাত্মক ভারতকে ধ্বংসে উন্নত
 এবং বিমল জ্ঞানালোকে উজ্জ্বলিত করিবার জন্য কৃষ্ণ শোকে দুঃখে স্থিরতা,
 অপরাজয় এবং নিশ্চিন্তিতে সমভাবে, পত্র মিত্রে সমান দয়া এবং প্রত্যেক
 কর্ণমূলে নিকামতা প্রদর্শিত করিয়াছেন ।

নিবিড় নির্জন বনমধ্যে মুক্তিত মেয়ে বসিয়া থাকিলেই বাহুবীর যত্নবাহ
 সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না । ভারতের ভৎকালীন দুর্দশা দেখিয়া কৃষ্ণের মনে
 সময় সময় বৈরাগ্যের সঞ্চার হইত । তিনি মনে করিতেন, শত্ৰুপাশ গ্রহণ
 করিয়া নব বর্ষ প্রচারদ্বারা ভারতের দুঃখানল নির্জ্বলিত করিবেন । কিন্তু
 তৎপরকণ্ঠেই তাঁহার মনে হইত—

"কি অগস্ত্য অগস্ত্য বিভাষ ।

হৃৎ সৌন্দর্য্যোত্তে কদা, কর্ণের সঙ্গীত পূর্ণ,

কি উজ্জ্বল অগস্ত্য দায় ভার ।

গগনেতে গ্রহভায়া, ধরাতে নিরিপুত্র,
 ভক্ত ভূপ, নবী, পাশ্চাত্য,
 যেখানে বাসায় নহি সেইখানে কর্তৃ তার,
 সেই কর্তৃ নিয়তি তাহার।
 কেবল নারিক-নহি গ্রহ কি যে বিঘাতার ?
 অক্ষক্রেতে নাহি কর্তৃ তার ?
 এ নন্দার, এই গৃহ, পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র,
 সকলি কি গ্রহ বিঘাতার ?
 জন্মের উত্তম পবিত্র প্রভুভিঃ
 পুত্র করে করিয়া ছেদন,
 জন্মভূমি, জন্মগৃহ ত্যাগিয়া বাইব বনে,
 এই ভব ইচ্ছা, নারায়ণ ?
 পিতা মাতা পত্নী পুত্র একটী মানব হায়।
 যদি ভাল নাহি বাসিলাম,
 অনন্ত মানবজাতি, কেমনে বাসিব ভাল
 অনন্ত অচিন্তা ভগবান ?
 আগনার জন্মভূমি জনদীর শ্রেহকোড়
 রক্তভূমি কৈ নার জীড়ার
 নাহি ভালবাসি বিশ্ব কেমনে বাসিব ভাল
 অচিন্তা অতীত কল্পনার ?”

কৃষ্ণ শিখাইয়াছেন, মানুষের দৈহিক ও মানসিক প্রত্যেক বৃত্তির যথোচিত
 কুরণই পূর্ণ যত্নব্যব। আত্মীয়বন্ধনের প্রতি স্নেহ প্রীতি ও তত্ত্বি ক্রমে পূর্ণতা
 লাভ করিয়া বিশ্বজনীন প্রেমে পরিণত হয়। সেই বিশ্বজনীন প্রেমই বিশ্বপতির
 পাদপদ্মে অর্ঘ্যরূপে স্থাপিত হয়। সংসারই সন্ন্যাসসাধনের উপযুক্ত ক্ষেত্র,
 তাহার মহান আদর্শ কৃষ্ণ।

“এতি ব্রহ্মই কঠ, কন্যারঃসাহায্য
 পাশ্চাত্য পোকোজ্জ্বল পোক-ধবি উত্তর
 অর্থের উত্তমতা সে বৈরাগ্য হৃদয়
 করিয়াছে কৃষ্ণ-প্রাণে পলায়িত অনিবার।”

তথাপি কৃষ্ণ হির অবিচলিত ভাবে কহিতেছেন,

“নাহি হৃদে, ভব প্রাণ মানবের মহা প্রাণ
 তুমি সহিতেছ যদি কৃষ্ণের জন্মের স্থান

গাইবে না শোক ; কর পূর্ণ তব মনজান :

কর এবে ধরাতলে বর্ষরাজ্য নিরমান ।”

লোকশিকারী তিনি সর্গজ্ঞ এইরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, এইরূপ অ্যাগ
বীকার করিয়াছেন ।

মহোচ্চ ভাব এবং ভাবানন্দে ‘কুরুক্ষেত্র’ কাব্য বঙ্গ সাহিত্যে সমাদরীয় ।

‘বৈবতকে’ ও ‘কুরুক্ষেত্রে’ কবি মানবরূপে কৃষ্ণ-চরিত্রের চরমোৎকর্ষ
প্রদর্শিত করিয়াছেন । কিন্তু ‘প্রভাসে’ কৃষ্ণ ভারতবর্ষীয় মরনারীকর্ষক
ভগবানের পূর্বাভাররূপে স্বীকৃত এবং পূজিত । ‘প্রভাসে’ কৃষ্ণ স্বয়ং অনেক স্থানে
বলিয়াছেন, তিনিই ভগবান বিষ্ণু । ‘প্রভাসে’ কবি শান্তরসের উৎস উন্মুক্ত
করিয়া দিয়াছেন । ‘প্রভাসের’ রচনা এমনই স্বয়ম্ভূত যে, পাঠ করিতে
করিতে মনে হইয়াছে, যেন পতিতপাবন প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস-লীলা
প্রত্যক্ষ করিতেছি, যেন সেই নিবিড় উৎসবানন্দ ভোগ করিতেছি ।

কুরুক্ষেত্রের হৃদ্য শেষ হইয়া গিয়াছে । সেই হৃদয়ের ফল এইরূপ,—

“ভারত হৃদয়ের কল, কি আনন্দ নিরবল ।

ভারত ব্যাপিরা শান্তি, বর্ষের উজ্জ্বল

ভারত ব্যাপিরা উদ্ভিতহে হরিনার ।

অরাসন্ধ, নিশুপাল, অসংখ্য অবদীপাল,

অবর্ষের বহীতহ নাহি দুর্বোধ্যন,

আগনার পানাবলে ভস্ম পানিগণ :

হৃৎগ কুবকগণ কাটি যথা অগণন,

হৃৎগে পূর্তি ক্ষেত্র করে আগনার,

হ’তেছে হৃৎগে পূর্ণ ভারত আবার ।”

ওখন আর রাজ্যে রাজ্যে, যাহুবে যাহুবে হিংসাবেশ নাই । অশান্তির
করাল ঝটিকা-গর্জন বামিয়া গিয়াছে । কৃষ্ণের প্রাগণণ চেষ্টায় ভারতে
বর্ষ-সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে । ভারতবাসিগণ পরিত্রাতা কৃষ্ণকে বিষ্ণু
জ্ঞানে পূজা করিতেছে । ভারতের তৎকালীন অবস্থা এইরূপ,—

“কুরুক্ষেত্র কটিকার গর্জিয়া বরিয়া,

অসংখ্য অননিপাতে করিয়া নিপাত

আগনার লক্ষ্যগতা বহীণতিগণ,

অবর্ষের সে করাল বহা যেমনালা

হইয়াছে নিঃশেষিতা আশ্র-বিদ্যাপিনী ।

জীবন কষ্টকা অস্ত্রে প্রকৃতির মত
হাসিহেন বেধনুতা ভারত-জননী
কি সুন্দর পাতি হাসি! ভারত-জননী
অপাতির দাবদা, হইরা ভাবল।
আলি বিমতিতা কিবা পাতি অ্যাংগার
নিরমল হুশীতল। নীলাম্বু-সাগরে
ভাসমানা নিত্য মাতা নীলাম্বুতপিনী,
আলি ভাসিহেন কিবা পাতির সাগরে
নিরমল হুশীতল নীলাম্বুতবর।
প্রতিষ্ঠিত বর্ধরাজ। ব্যাশিরা ভারত
এক মহারাজ্য হই। জায়গে তাহার
মত উপরাজ্যপ্রাণ করিছে বিজ্ঞান
পাতির কোবল অস্ত্রে, হ'তেছে চাপিত
পাতির সুখ পথে উপগ্রহমত।
নাহি হিংসা, নাহি বেধ। পৌরশক্তি মত
করিয়াছে নব বর্ধ এথে মৃৎস্থলিত ;
করিয়াছে কি উন্নতি-পথে সকলিত।

* * * *

-----এক বর্ধ—সরসিমে

বিদ্যাজিত নব এথে দলাগলি করি
দন-মাতা জ্ঞান-মাতা চির বিরোধিনী;
আলিদিয়া মাতারণে। পাতি-পাহাবার
সেই দিগ্ধ, নব রাজ্য সেই শতমল ;
সেই দারায়ণ কৃষ্ণ, পাতি-পাহাবার
গাইতেছে কৃষ্ণ নাম অবন্ত উজ্জ্বলে।
নব রাজ্য-বীরদের অক্ষর মৃগাল
কৃষ্ণনাম। নব বর্ধ-মত কৃষ্ণ-নাম।
আসমুদ্র হিমালয় ভারত কেবল
গাইতেছে কৃষ্ণ-নাম আনন্দে বিহ্বল।"

সমস্ত ভারতবর্ষের এইরূপ অবস্থা হইলেও বাদবর্ণের মধ্যে সুরাসক্তি ও
পাপাসক্তির উদ্ভব হইয়াছিল। পাপাসক্ত বাদবর্ণিণের তাবী অমঙ্গলের লক্ষণ-
সূত্র দেখিয়া সত্যভামা শিহরিয়া উঠিলেন। "তিনি রুক্ষিণীর নিকট গাঁহার
আশঙ্কা ব্যক্ত করিলেন। রুক্ষিণী যত্নপতি কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি যে বাঘ-
৫

পণের প্রভু, সেই যাদবগণের কি কোন অমঙ্গল হইতে পারে ? যদিই বা হয়, তবে তুমি তাহা নিবারণ করিয়া সত্যভাষার ভীতি দূর কর ।”

ভগবান বলিলেন, “যদল ও অমঙ্গল সকলই মানুষের কর্মফল । মানব যদি সুকর্মদ্বারা নিজের অমঙ্গল দূরীভূত করিতে না পারে, তবে অপর কেহই তাহা করিতে পারে না । যে অশর্মের উত্থান কুরুক্ষেত্রে শশান-বহি জ্বালাইয়া-ছিল, সেই অশর্ম যাদবের অগ্নিমজ্জাগত হইয়াছে । এই অশান্তি ও অমঙ্গল সেই অশর্মের ফল ! আমি সে অমঙ্গল কেমন করিয়া দূর করিব ? আমি শুধু যাদবের নহি,—নিখিল মানবের স্বামী । সকল মানব যেরূপ স্ব স্ব কর্মফল ভোগ করে যাদবরাও সেইরূপ করিবে ।”

‘রৈবতকের’ ও ‘কুরুক্ষেত্রের’ আদর্শ মানব কৃষ্ণ ‘প্রতাসে’, দ্বায়পের ভক্ত-বৎসল ভগবান ।

‘প্রতাসে’ পঞ্চম সর্গ পাঠে হৃদয়বান ব্যক্তি প্রেমাক্ষ বর্ণন না করিয়া থাকিতে পারেন না । উৎসবমগ্ন ভক্তদিগের প্রেমভক্তির উবেলতায় আশ্চ-বিস্মিত, মুগ্ধিমতী শান্তি ও ভক্তি সুতরাং-শৈলজার মরীচিকা মাতৃমূর্তি এবং সেই সকলের কেন্দ্রস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্ন প্রশান্ত আনন্দোজ্জ্বল মূর্তি যিনি দেখিবেন তিনিই মুগ্ধ হইবেন ।

ভক্তের প্রতি ভগবানের কি অসীম অমুগ্ধহ ! জরৎকারুর শরে আহত হইয়াও কৃষ্ণ সুপ্রসন্ন মুখে করুণা-নীতল কণ্ঠে প্রেমোচ্ছ্বাসিনী জরৎকারকে বলিলেন,—

“গাইরাহ বহু হুঃখ, এস বন্ধে প্রেমময়ি ।

উভয়ের লীলা দেখ, চল শান্তিধাম ।”

ভগিনী কৃষ্ণকে আহত করিয়াছে দেখিয়া নাগরাজ বাহুকি অত্যন্ত শোকাবুল হইলেন । প্রেমাক্ষবিগলিত নয়নে প্রশান্ত মুখে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন—

“নাগরাজ, তুখা শোক কম পরিহার ।

যে জন যে ভাবে চায়, সে ভাবে আমাকে পায়

সত্যাবে মানব করে সব অনুসারি ।

ভ্রাতা ভগ্নী ছই জন গাইরাহ শক্রভাবে

পাইরাহ শক্রভাবে আজি ছই জন ।”

বাহুকির মোহককার এখন আর নাই । তিনি কাঁদিয়া বলিলেন, “জামরা কেন তোমার শত্রু হইলাম ? কেন সকলের মত তোমাকে শত্রু

জ্যেষ্ঠার বাণ, আর সুখের বাণেরে ঘূর্ণ্যে ঘূর্ণ্যে,

হুসীনা, বাহুতি,—অহ একই লীলার ।

জ্যেষ্ঠার সে সুখিবা, বাণেরে ঘূর্ণ্যে ঘূর্ণ্যে,

রণে হুতা তততিয় প্রতিমা আহার ।

এস সেবে ! এস হুকে ! বড়ই কাতর বাণ

তব প্রেম-গিপানার, গাজ হরিমার ।

এস হুকে ! আমাদের লীলা অবদান !

এই স্থানেই বাণেরে লীলা শেষ । এই স্থানেই নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রা-
দন শেষ ।

ভগবান ঈশ্বরের তিরোধানের পর লহরী বংশের অতীত হইয়া গিয়াছে ।
এই সুদীর্ঘকালের করম্পর্শে কৃষ্ণের জীবনচিত্রের কোন কোন অংশ বলিন
ও অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছিল ; বাণীর প্রিয়পুত্র কবি নবীনচন্দ্রে অনন্তসাধারণ
প্রতিভা এবং গবেষণায় কৃষ্ণচরিত্রের সেই সেই অংশ উদ্ধৃত ও স্পষ্ট করিয়া
আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন ।

নবীনচন্দ্র যে কৃষ্ণচরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের অঙ্গুগত
কি বিরোধী ? আমরা বলি, অঙ্গুগত, বিরোধী নহে । এই কাব্যদ্বয়ে কৃষ্ণ-
জীবনের বিশেষ প্রতিপাদ্য ঘটনা, যন্ত ভারতকে বহাভারতে পরিণত করিয়া,
নিকাম কর্ণমূলক যশের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা । এই ঘটনা ইতিহাস (বহাভারত
ও ভাগবত) হইতে গৃহীত । অবশ্য তিনি ‘রৈবতক’ ‘হুত্বক্বেত্র’ ও ‘প্রভাস’
রচনায় সর্বত্র ইতিহাসের অনুসরণ করেন নাই । কাব্য-রচনায় তাহা করা
উচিতও নহে ; করিলে কাব্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যায় । ঐতিহাসিক
কাব্য-রচনায় কবি যদি কেবলই ইতিহাসের অনুশাসন মেনিয়া চলেন, তাহা
হইলে নতুন সৃষ্টির নৈপুণ্য বা প্রতিভা প্রকাশের অবকাশ থাকে না ।
ইতিহাসে যে ঘটনার আভাস থাকে, কবিকে প্রতিভার কিরণে তাহা সুন্দর-
রূপে স্ফুটাইয়া তুলিতে হয় । নহিলে কাব্যোক্ত চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও সম্পূর্ণতা
পাঠক সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন না ।

ঐশ্বরোজবাসিনী ওড়া ।

সঙ্গীত-মাহাত্ম্য ও সঙ্গীত আলোচনার উপকারিতা।

সঙ্গীত শব্দের অর্থ—গীত, বাস্তব ও নৃত্য। শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, “গীতঃ বাস্তবঃ—তথা নৃত্যঃ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে।” সঙ্গীত ত্রিবিধ; মার্ম ও দেশী। ত্রয়োবি চতুর্ভেদে অব্যবহৃত করিয়া যে সঙ্গীত প্রবর্তিত করিয়াছেন তাহা মার্ম সঙ্গীত, আর দেশে বিশেষে জনসমাজে ছন্দরতনের অঙ্ক যেতন গীত, বাস্তব ও নৃত্য চলিত হইয়াছে তাহা দেশী সঙ্গীত। গীত, বাস্তব ও নৃত্য তিনটিই সঙ্গীত পদবাচ্য। গীতেই বিধি বর্তমান প্রবর্তের আলোচ্য।

কথিত আছে যে, দৈত্যরাজ ত্রিপুরাসুরের নিধনের পর দেবগণ আনন্দে নৃত্য-গীত করিয়াছিলেন। সেই সময় মহাগোপী দেবাদিদেব মহাদেবের পক্ষ হইতে পক্ষ রাগের সৃষ্টি হয় এবং জগজ্জননী ভবরাসী ভগবতীর পক্ষ-কবল হইতে একটি রাগের সৃষ্টি হয়। এই দুইটি রাগ ও তাহাদের এক একটির ছয় ছয়টি করিয়া ভাষ্য পরিকল্পিত হয়। তাহার পর, দেব, বক্ষ, বক্ষ ও ময়গণের মধ্যে বাঁহারা নান-বিভার আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহারাও কতকগুলি কতকগুলি রাগের ও রাগিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এ হলে এ বিবরণ ইহার অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

শাস্ত্রকাররা নাহকে ত্র্যম্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। কারণ, প্রণবপূর্ণ নাহই পূর্ণত্বেষের স্বরূপ নির্দেশক, প্রায় সকল উপনিষদেই প্রণবের ত্র্যম্বরূপতা প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব নাহ-সাধনা করিলে ত্র্যম্বরূপতা করা হয় ইহা নিম্ন, এবং এই সাধনার ফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব নির্ণয় করা হইতে পারে। আনন্দের তত্ত্বপ্রাপ্তি ইহারি নামকরণ। শাস্ত্রকাররা বলিয়া গিয়াছেন :—

“ননাদেন বিনা জ্ঞানং ননাদেন বিনা শিবম্
নামরূপং পরং জ্যোতির্নামরূপীং স্বয়ং হরি।”

শ্রীমদ্ভক্ত হইতেও বুঝা যায় যে, পরসামান্যতা বাহ্যবাহী পরিচ্ছন্ন ও পরিপুষ্ট হয়, ইহার দ্বারা আমাদের জ্ঞানোন্নতি ও বর্ধিত উপকার হইয়া থাকে।

মার্কিন এসোসেশনের কোনও চিকিৎসক ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, মানসিক সৰ্ব্বপ্রকার ব্যাধিই সঙ্গীত-প্রভাবে আরোগ্য হইতে পারে। অধুনা কতিপয় বহুদর্শী চিকিৎসক রোগ-প্রতীকারের জন্য সঙ্গীতের শক্তি-নির্ণয়ের বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। জনসাধারণ সঙ্গীতের উপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেই বিশেষ উপকার হয়।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সঙ্গীত-চর্চায় পরমার্থ পর্য্যন্ত লাভ হয়; পার্শ্বিক শান্তি ও স্বস্তি সিদ্ধ। পক্ষান্তরে একপাশে দেখা গিয়া থাকে, যখন কোনও সঙ্গীত-সাধক ভয় হইয়া স্বর-সাধনা বা সঙ্গীত-সাধনা করিতে থাকেন তখন তাঁহার ব্যক্তি-জ্ঞান ও পার্শ্বিক আসক্তি বহু দূরে অবস্থান করে; এমন কি সাধকরা প্রায়ই জুঘাতিকা-জ্ঞানগ্রস্ত হইয়া যান। এখন দেখিতে হইবে যে, সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সম্পূর্ণ একাগ্রতা আসিতে পারে কি না? যদি অন্য সময়ের জন্য সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিলে পার্শ্বিক আসক্তি ও যোহজাল কতক অতিক্রম করিতে পারা যায় এবং চিন্তের একাগ্রতা আংশিক লাভ করিতে পারা যায় তাহা হইলে ইহার প্রকৃত সাধক হইতে পারিলে ও সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিলে পূর্ণরূপে চিন্তবৃত্তির দমন করা যাইতে পারে; অর্থাৎ যোগসাধনার সমস্ত ফললাভ করা যাইতে পারে। যোগ-স্বত্রকার বলিয়া গিয়াছেন, “যোগশ্চিন্তবৃত্তেন্নিরোধঃ”। অতএব স্বর-সাধনার দ্বারা যদ্ব্য নরজন্মের একান্ত অভীষ্ট বস্তুও যে লাভ করিতে পারেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিচার করিলে বুঝা যায়, সঙ্গীত কতদূর উচ্চ ও আদরীয়। সঙ্গীতের সহকারিতায় আমরা দেবদেবীর নামগুণ কীর্তন করিয়া থাকি, কোনও রাজ্যেশ্বরের বা কোনও মহাজনের আগমনে উৎসব করিতে হইলে আবাহন-গীতি-বান্ধা আমরা তাঁহাদের বন্দনা করিয়া থাকি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সঙ্গীতের মধ্যে এক মহাশক্তি নিহিত আছে বাহার প্রভাবে দেব-দেবী, নর-নারী, জীব-জন্তু পর্য্যন্ত মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। জগতে একত্র আর একটি বস্তু দেখিতে পাই না বাছা একাধারে এতগুলি গুণের সমষ্টি।

সঙ্গীতের দ্বায় মনোমুগ্ধকারী ও শান্তিপ্রদ বিজ্ঞা জগতে আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার এমনই যোহিনী শক্তি যে, ইহা সকল জীব জন্ত এমন কি ক্রুর বিষধরকে পর্য্যন্ত বশে আনিতে পারে। শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে

শান্তিবারি সেচন করিতে, ছন্দকে রসপূর্ণ ও ত্রবীভূত করিতে ইহারা ভুল্য আর কিছুই দেখিতে পাই না। পুরাণকাররা বলিয়া গিয়াছেন যে, কোনও সময় দেবাদিদেব মহাদেব সঙ্গীত আরম্ভ করিলে ভগবান নারায়ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে যাবেন এবং রসরূপে পরিণত হইয়া আসন হইতে পতিত হবেন। তখন ভগবান ঐহরির ভেদোন্ময় শরীর ত্রবীভূত হইয়া সমুদায় বৈকুণ্ঠগায় জলপ্লাবিত হয়। তৎকালে ব্রহ্মাদি নিম্নলি দেবগণ ভাবিলেন, ইহা শিব-সঙ্গীতের পরিণাম। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা তথায় গন্ধাদিভিত কমণ্ডলুকে আবরণহীন করিয়া করিলেন, সঙ্গীতও ব্রহ্ম-সম্ভূত এবং দেব হরিও স্বয়ং ব্রহ্ম আত্ম ত্রবীভূত হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্মময়ী গঙ্গা এই সলিল-রাশি সংবরণ করুন। তাঁহারা ইহা বলিয়া সেই সলিলে কমণ্ডলু স্পর্শ করাইবা-মাত্র সমুদায় সলিল গঙ্গার সহিত মিশ্রিত হইল। তখন পরমারাধ্যা দেবী গঙ্গা পতিতপাবনী, পাপনাশিনী সলিলময়ী হইলেন। ভগবান নারায়ণ যে সঙ্গীত-প্রভাবে ব্রহ্মরূপ হইতে পারেন, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু আছে বাহা সেই সঙ্গীতপ্রভাবে ও তাহার মোহিনী শক্তিতে ব্রহ্ম ও মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীতে শুনা যায় যে, অর্গিমস নামক কোনও স্ত্রীস্বামকের পত্নী ইউরিডাইস, স্ক্টিয়ারাজ স্কটো কর্তৃক অপহৃত হইলে অর্গিমস পত্নীর উদ্ধার-কাষমায় গাহিতে গাহিতে স্ক্টিয়ারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। স্ক্টিয়ারাজ তাঁহার সঙ্গীত-প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পত্নীকে প্রত্যর্পণ করেন। সঙ্গীতের এইরূপ মোহিনী-শক্তির কল্পনার বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

সঙ্গীতের মধ্যে নব রস পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। সঙ্গীতের ভাবো-দীপক ক্ষমতা অতুলনীয়, অমুরাগ-বৈরাগ্য, হর্ষ-বিষাদ, উদ্ভাস-নৈরাশ্য প্রভৃতি সকল ভাবই ইহাতে বর্তমান রহিয়াছে। হাস্যহেতু, ক্রোধহেতু, উত্তেজিত করিতে, শান্তি প্রদান করিতে ও নব নব ভাবে জাগাইতে ইহা অধিতীয়। সঙ্গীতের স্বরলহরী ক্ষয়-নিহিত স্তম্ভ ভাবগুলিকে জাগ্রত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

বেদমাতা গায়ত্রী যখন সঙ্গীতময়ী, বেদভ্রষ্ট সামবেদও যখন আত্মোপাস্তই সঙ্গীত তখন সনাতন হিন্দুধর্মাবলম্বীর পক্ষে সঙ্গীত অপেক্ষা পূজা ও আদরনীয় আর কি হইতে পারে? বর্ণগুরু ব্রাহ্মণমুখনিঃসৃত এই সামগান যখন

জগৎকে এক অনির্জনমীয় ভাবাবেশে অভিভূত করিতে পারে তখন ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সাধন-সামগ্রী আর কি হইতে পারে? পুরাতত্ত্বসন্ধানের অবগত হওয়া যায়, জগতে প্রবীন ও পূজ্য সাধকরা কেহ বা যোগসাধনার দ্বারা কেহ বা ব্রহ্মসাধনার দ্বারা সিদ্ধ লাভ করিয়া গিয়াছেন।

জগৎ সঙ্গীতময়, প্রকৃতিও সঙ্গীতময়ী। পবন-নিবন, পুষ্পপত্র-সকলম কল্লোলিনী হুহু হুহু স্বনি, কোকিলের হুহুহব, বেহুর হাধারব, বিধ-সঙ্গীতের তান মাত্র। অতএব বিশ্বনিরস্তা যে সঙ্গীত-মূর্ত্তে জগৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা হইতে প্রের্ত আর কোমও বিচ্ছিন্ন নাই। ইহা আমাদেরই স্বকপোলকল্পিত ব্যাক্যের দ্বারা সঙ্গীত-শাস্ত্রের অস্তার সন্ধান নহে। শাস্ত্রকাররাই বলিয়া গিয়াছেন ;—

“অপাং কোটিভগং ধ্যামং ধ্যামাং কোটি গুণোলয়ঃ

লয়াং কোটিভগং গানং গানং পরতরং মহি।”

কথিত আছে, কোনও সময় দেবাদিদেব মহাদেবাধিষ্ঠিত কৈলাসে নারদ হুনি ও সঙ্গীত-সাধক গন্ধর্ব্ব তত্ব একই সময় উপস্থিত হইলেন। তগবান পঞ্চানন নারদকে একটি আসনে বসিতে আজ্ঞা করিয়া তত্বরূপে তদপেক্ষা একটি উচ্চ আসনে বসিতে আদেশ করিলেন। ইহাতে নারদ হুঃখিত হইয়া অভিমানভরে পরমারাধ্য মহাদেবকে বলিলেন, “প্রভু! গন্ধর্ব্ব তত্বরূপে উচ্চ আসনে দিয়া আপনার পরম তত্বকে অন্যায় কর্ত্ত্বার ইচ্ছা কেন হইল? এ অধর্ম্মের কি অপরাধ হইয়াছে?” তখন মহাদেগী মহেশ্বর সহাস্ত বদনে বলিলেন, “নারদ! তুমি কি জান না যে, তত্বরূপ মহাবিভাঙ্গপ সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞ? তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান না করিলে সঙ্গীতের অবমাননা করা হয়। অতএব তুমি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইও না।” তখন নারদ বলিলেন, “প্রভু! আমিও বহুকাল সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছি, আমার কি মর্যাদা নাই?” তগবান বলিলেন, “তুমি এখনও প্রভুত্বরূপে সঙ্গীত বিজ্ঞার পারদর্শিতা লাভ করিতে পার নাই।” তখন নারদ বলিলেন, “হে প্রভু! আমি কি একায়ে এই মহাশাস্ত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি?” নারদ তখন ভূতভাবন ভবানীপতির আদেশানুসারে সঙ্গীতশাস্ত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভে ইচ্ছুক হইয়া নানাধানে সাধনার পর তগবান নারায়ণের অমুকম্পায় ও আদেশক্রমে কুন্তী ও সত্যভামা দেবীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া ইহার চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ বহু উদাহরণদ্বারা প্রমাণ করা বাইতে পারে যে, দেবতা ও

মুনি ঐষি মহাজনরাও সঙ্গীতকে প্রেষ্ঠ বিভা বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। কেহই ইহাকে বিলাসিতার অঙ্গ বলিয়া অগত্যা করেন নাই। তদুক্ত প্রভৃতি গুরুগণ ইহাতে চরম উৎকর্ষলাভ করিয়া গৌরবের মহোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পুরাণ ভাষার সাক্ষী। এই নরলোকেও গোপাললাল, বয়স্কাওরা, তানসেন, সুলতান হুসেন প্রভৃতি সঙ্গীত আলোচনা করিয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়া গিয়াছেন ও রাজস্ববর্গ হইতেও উচ্চ পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাসাগোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, গোপাললাল সঙ্গীতশাস্ত্রে পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ও সঙ্গীত-প্রভাব পাষণ পর্য্যন্ত অবীক্ষিত করিয়াছিলেন। বয়স্কাওরা বক্তব্যদিগকে পর্য্যন্ত মুক্ত করিতে পারিতেন, মন্ত্রোষধি ষাণ্ডা বশীভূত হইয়া যেন হিংস্র জন্তুসমূহ ২১ঙ্কর শীত একান্তমনে শুনিত ও হিংসাযোবর্জিত হইয়া নিশ্চলভাবে ঝাঁড়াইয়া থাকিত।

(ক্রমঃ)

ত্রিনেপালচন্দ্র রায়।

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস।

কিরদবিল পূর্বেই ফরাসিরাাজ বিপদাশঙ্কা করিয়া রাজত্বময় সংরক্ষণের নিমিত্ত যথাসম্ভব আয়োজনের অকুঠানে প্রযুক্ত হইয়াছিলেন। তদনুসারে প্রাদেশাভ্যন্তরে এবং নিকটবর্তী স্থানসমূহে প্রহরীদিগের সংখ্যা ত্রিগুণ পদ্ধি-মাণে বদ্ধিত হইয়াছে। বহির্বার সংরক্ষণকরে যথোপযোগী উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। বৃহদ্বারে শত্রুগণের আক্রমণনিবারণকরে অন্তরায় প্রস্তুত এবং তথায় অশীতি সংখ্যক অঝারোহী সংস্থাপিত হইয়াছে। বিষমুত স্বেদ সৈন্যগণ ইতঃপূর্বে সমিতি কর্তৃক পদচ্যুত হইয়াছিল; কিন্তু রাজমন্ত্রিগণ নানাপ্রকার ছপনা করিয়া এ যাবৎ তাহাদিগকে কর্তৃ হইতে অবসর প্রদান করেন নাই। বর্তমান স্বেদসৈন্যের সংখ্যা ৮০০ জন মাত্র। তাহার টুইলারি প্রাসাদের

সংসার ক্যারুসিন ভবন সংরক্ষণের কার্যে নিয়োজিত হইয়াছে। জাতীয় সৈন্য গণের মধ্যে রাজভক্ত দলসমূহ প্রাসাদ-প্রাক্ষেপে সমবেত হইয়াছে। উচ্চ কুলোদ্ভব ব্যক্তিগণ রাজভক্তিপ্রবোধিত হইয়া রাজপরিবারবর্গের বিপক্ষদৃষ্টি রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রাসাদ-উভানে ১০০ অশ্বারোহী এবং ঘাসপটি কামান বিস্তারিত।

পরদিন প্রাত্যহে রাজা, রাজ্ঞী, রাজপুত্র ও রাজভগিনী সংরক্ষণের আয়োজন পরিদর্শনের নিমিত্ত আগমন করিয়া প্রাসাদান্তঃস্থিত সৈন্যগণের রাজভক্তি দৃষ্টি সান্ত্বনয় প্রীতিলাভ করিলেন। কিন্তু তাহারা প্রাসাদের নির-
বেশে গমন করিলেই তাহাদের আনন্দে নিরানন্দ হইল। কয়েকটি দল মাত্র “রাজা দীর্ঘজীবী হউন” বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু কামানাত্মিকগণ, ক্রুররোজ এবং অস্ত্রাচ্ছ দলসমূহ “ফরাসী জাতির জয় হউক” এই মহাবাক্য উচ্চারণ পূর্বক রাজপরিবারবর্গের ক্ষমদে আশঙ্কা উৎপাদিত করিল। তখন রাজা ত্রিযমাণ হইয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাজ্ঞী বিক্রোহিত্বাপন্ন সৈনিক মণ্ডলীর নিকটে গাঁড়াইয়া বলিলেন, “তোমাদের স্ত্রী পুত্র কন্যা বাসগৃহ প্রভৃতি যে সমুদায় বস্তু সংসারে মানবের অতি প্রিয়, সে সমুদায়ই রাজপরিবারবর্গের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। অস্ত্র আয়াদের ও ফরাসী জাতির স্বার্থ-বিস্তার নহে।” রাজ্ঞীর বাক্য শুনিয়া সৈন্যগণ রাজপরিবার-
বর্গের নিমিত্ত জীবনদান করিতে প্রীতিপূর্ণ হইল বটে; কিন্তু তাহাদের উগ্রম-
হীনতা দৃষ্টি রাজ্ঞী ত্রিযমাণা হইলেন।

এ দিকে বিপ্লবকারীরা অপরিমিত উত্তম ও উৎসাহ সহকারে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। প্রাত্যহে তাহারা রাজকীয় আত্মাগার লুণ্ঠন করিয়া রাশি রাশি অস্ত্র সূত্রভঞ্জে জনসাধারণকে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর সেন্ট এক্টনি ও সেন্ট বাসেলি এই দুইটি সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহারা ক্যারুসিন ভবনের সম্মিহিত স্থানসমূহ অনায়াসে অধিকার করতঃ টুইলারি প্রাসাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি কামান সংস্থাপিত করিল।

রাজভবন সংরক্ষণের ভার সেনাপতিপ্রবর রিচার্ডারের হস্তে তত হইয়া-
ছিল। রিচার্ডার রাজপরিবারবর্গের আসন্ন বিপদ দৃষ্টি ব্যবস্থাপক সমিতির সভ্যমণ্ডলিসমীপে বিপ্লবকারিগণের কার্যকলাপ নিবেদন করিলেন। কিন্তু সভ্যগণ তাহার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তখন অনন্তোপায় হইয়া

সেনাপতি জাতীয় সৈন্তগণের হৃদয়ে রাজতন্ত্র উদ্দীপনের প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সৈন্তগণ তৎপ্রতি ক্ষেপণ না করিয়া “ফরাসীজাতি দীর্ঘ-জীবী হউক” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া রিদাতার হতাশাস হইয়া রাজসভাশে সমগ্র ব্যাপার বিবেচনের নিমিত্ত প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন:

রাজা, রাজ্ঞী ও মন্ত্রিগণ কর্তব্যনিষ্ঠাঃগণের নিমিত্ত রাজসভায় সম্মিলিত হইয়াছেন। সেনাপতি শশবাত হইয়া তথায় আসিয়া বলিলেন, “রাজ-পরিবারবর্গের বিপদের পরিশীমা নাই। বিপ্লবকারিগণ সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না। জাতীয় সৈন্তগণের প্রতি কোনক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। যদি অনতিবিলম্বে রাজপরিবারবর্গ সমিতি-গৃহে আশ্রয় গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে কাহারও নিস্তার নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিলে প্রাসাদ হইতে বহির্গমন দুঃসাধ্য হইবে।” রিদাতারের বাক্য শুনিয়া রাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বনে রহিলেন। তদুত্তে রাজ্ঞী বলিলেন, “আমার হতে প্রাসাদ ভ্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন অপেক্ষা প্রাসাদে শত্রু-বর্গের অস্ত্রপুঞ্জ বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করা শ্রেয়ঃ”। এই বলিয়া তিনি রাজার হস্তে একটি পিডল দিয়া তাঁহাকে বলিলেন “রাজন্, আপনার শৌর্য্যপ্রদর্শনের সময় উপস্থিত”। কিন্তু রাজা তথাপি কোন উত্তর দিলেন না। তখন সেনাপতিশ্রেয়র রাষ্ট্রকে বলিলেন, “আপনি কি সমগ্র রাজপরিবারবর্গের এবং সংরক্ষণে নিযুক্ত সৈনিকগণের ক্ষুণ্ণ-সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন?” ইহা শুনিয়া সকলেই নিরুত্তর রহিলেন। তখন কণা উঠিল, “বহারাজ! আর চিন্তার সময় নাই; চলুন আমরা সমিতি-গৃহে গমন করি।” রাজা সপরিবারে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ফরাসীরাজ সমিতি-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সভ্যমণ্ডলীকে সন্বেদন করিয়া—
বলিলেন

“সভ্যমহোদয়গণ, আমি ফরাসী জাতিকে একটি গুরুতর পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়াছি। আশা করি, আপনাদের হস্তে সপরিবারে আত্মসমর্পণ করিয়া নিরুদ্বেগ হইতে পারিব।”

ব্যবস্থাপক সমিতির অধিকাংশ সভ্যই গিরন্থিষ্ট সন্দেহাশঙ্কিত। তাঁহারা দেখিলেন যে, বিপ্লবের উদ্বেগ সংশোধিত হইয়াছে। রাজকুলের অত্যাচার নিবারণিত হইয়াছে। রাজা সপরিবারে সমিতির কক্ষস্থ গ্রহণ করিয়াছেন

সুতরাং, রাজপরিবারবর্গের প্রতি এইক্ষণ নির্ধাতন অকর্তব্য । সভাপতি জার্মিও উত্তর করিলেন ;—

“রাজস্ব, আপনি সমিতির দৃঢ়তার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন । সভ্যমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত শাসনপ্রণালী এবং করাদ্বী জাতির অধিকার সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রতিক্রমত হইয়াছেন ।”

গিরমিষ্টপ্রধান ব্যবস্থাপক সমিতি রাজপরিবারবর্গকে আশ্রয় প্রদানের নিমিত্ত প্রতিক্রমত হইলেন বটে ; কিন্তু জেকবিনপ্রধান মিউনিসিপালিটির অবৈধ উত্তেজনামিবন্ধন প্যারিস নগরের বিদ্রোহানল কোনক্রমে নির্দাপিত হইল না । সুতরাং টুইলারি প্রাসাদে উভয় পক্ষে বোম্বতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল । কিন্তু প্রাসাদসংরক্ষণ ছদ্মহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে । কামন, তৎসংলগ্ন কার্য্যসিন ভবনের নিকটস্থ স্থানসকল আক্রমণকারিগণের হস্তগত । তাহার প্রাসাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তথায় বহুসংখ্যক কামান সংস্থাপিত করিয়াছে । আবার সংরক্ষণে নিযুক্ত কামানান্ত্রিগণ এবং জেভারিয়ারদলগণ বহু কর্তব্য বিষয় হইয়া “করাদ্বীজাতির জয় হউক” বলিতে বলিতে শত্রুগণের সংখ্যাযুক্তি করিয়াছে । রাজনীতিক যতবৈধনিবন্ধন জাতির সৈন্তগণের নব-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে ; কেবল সুইস বন্দুকধারিগণ প্রাসাদসংরক্ষণের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে । সুইসগণ বিদেশীয় লোক । ব্যবস্থাপক সমিতি বা মিউনিসিপালিটির প্রতি তাহাদের ক্রক্ষেপ নাই । তাহার গিরমিষ্ট বা জেকবিন কোন সম্প্রদায়ের বাক্যে কর্ণপাত করে না, অথবা জাতির দেহগণের রাজনীতিক বক্তৃতায় মুগ্ধ হয় না । তাহার শুদ্ধ রাজা ও রাজ্যের প্রতি অহরহ । তাহাদের নিমিত্ত প্রাণদান করিতে কৃতসংকল্প । কিন্তু রাজপরিবার-বর্গ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া গমন করিলে, আশেপাশে প্রদানের ত্রুটি প্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে বিভ্রাট উপস্থিত হইল ।

অনন্তর সংখ্যাভীত অস্ত্রধারী বহুসংখ্যক কামানের সাহায্যে ক্যাক্সনিন ভবন আক্রমণ করিল । দ্বাররক্ষকগণ আক্রমণকারিগণের সংখ্যাযুক্তি ভীত হইয়া তৎক্ষণাত্ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিল । আক্রমণকারিগণ তদধারিহস্তে নক্ষত্রবেগে সোপানপথে অগ্রসর হইয়া পাঁচ জন সুইস প্রহরীর প্রাণসংহার পূর্ব্বক প্রাসাদের উপগ্রিভাগে ধাবমান হইল । তদ্ব্যতীত সুইস সৈন্তগণ পর্ব্বাক-রহু হইতে কিপ্রহস্তে শত্রুগণের প্রতি বুদ্ধবুদ্ধ অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল । আক্রমণকারিগণ সুইসগণের অগ্নিবর্ষণ সহ করিতে অসমর্থ হইয়া অচিরে

প্রাসাদের নিয়মের পলায়ন করিল। সুইস সৈন্যগণ পলায়নকারী শত্রুগণের পক্ষাৎ পক্ষাৎ ধাবমান হইয়া ক্ষিপ্ৰহস্তে তাহাদের প্রতি অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন আক্রমণকারিগণ ছত্রতল হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। এইরূপে সুইসগণ জয়লাভ করিল বটে; কিন্তু অস্বাভাবে তাহারা পলায়ন-কারিগণের অতুলসরণে সমর্থ হইল না।

আক্রমণকারিগণ আশঙ্কা করিয়াছিল যে, বিজয়ী সুইস সৈন্যগণ অচিরে তাহাদের অতুলসরণে প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু কিয়ৎকাল যাবৎ সুইসগণকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তাহাদের সে আশঙ্কা দূর হইল। তখন তাহারা পুনর্বার কামানের সাহায্যে প্রাসাদ আক্রমণ করিল। সুইসগণ মিশ্রশক্তি বন্দুক হইয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইল। কিন্তু কামানের অবিস্রান্ত সোলাবর্ষণে তাহারা দলে দলে বরাশারী হইতে লাগিল। সমিতি-গৃহের পবাক্রুদ্ধ হইতে ফরাসিরাও বিশ্বস্ত সৈন্যগণের দুর্গতি দর্শনে মর্ষাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ নিবারণকরে হার্ভেলি নামক তনীয় বিশ্বস্ত অহুচরকে ব্রণ-স্থলে প্রেরণ করিলেন। হার্ভেলি উত্তম পক্ষের অগ্নিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে ধাবমান হইলেন। বন্দুকের গুলীর আঘাতে তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত এবং চক্ষু অন্ধ হইল। তথাপি তিনি কর্তব্য-সম্পাদনে ক্লান্তমগ্ন হইয়া সোপানসারিণ্যে আগমন করতঃ সুইসগণকে বলিলেন, “বীরগণ, তোমরা রাজার শরীর-রক্ষার্থ গমন কর।” রাজা অচ্যুত বিপদগ্রস্ত চইয়া আমাদিগকে আল্লান করিয়াছেন মনে করিয়া সুইসগণ সমিতি-গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া শত্রুগণ তাহাদিগকে পক্ষাঙ্গিক হইতে আক্রমণ করিল। সুইসগণ আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া দলে দলে পক্ষাৎ প্রাপ্ত হইল।

অস্তায় সন্ধ্যাে রাজতল সুইসগণের পতন হইলে উদ্যত ইতর সাধারণ প্রাসাদভাঙারে প্রবেশ পূর্বক বহুজ্বাচার ও উচ্ছ্বাসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। তাহারা উচ্চবংশীয় ব্যক্তিসমূহকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে অতুলসরণ পূর্বক তাহাদিগের প্রাণসংহার করিল। আহত সৈনিকগণ শাবিত ক্রপাণের এতদ্ভ আঘাতে নিহত হইল। দ্বার ও পবাক্রাঙ্গি ভগ্ন হইয়া সেই অপূর্ণ প্রাসাদ শিথিল হইল। রাজপরিবারবর্গের ব্যবহারোপযোগী বস্ত্রবাস্ত্রবিমণ্ডিত পালকাসনাদি চূর্ণীকৃত, পদদলিত ও চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। ফরাসিরাজের ও তনীয় পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের প্রচ্ছন্নময় মূর্তিসমূহ গদাঘাতে চূর্ণ হইয়া ইতরসাধারণের বর্ষরত্নের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিল।

যুদ্ধান্তে ব্যবস্থাপক সমিতি সর্বসাধারণকে প্রকাশভাৱে ধারণ করিতে অসু-
 রোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু অচিরে মিউনিসিপালিটির সভ্যগণ সমিতিগৃহে
 উপস্থিত হইয়া রাজাকে পদচূত করিয়া অভিনব প্রকারে শাসন-প্রণালী
 প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত আবেদন করিলেন । তদনুসারে সমিতি রাজার
 রাজশক্তি হরণিত করিলেন । অতঃ হইতে রাজপরিবারবর্গের বিবাহময়
 আধ্যায়িকার অন্তিম অধ্যায় আরম্ভ হইল ।

যুদ্ধাবসানে রাত্রি এক ঘটিকাকাল যাবৎ সমিতির অধিবেশন হইল ।
 রাজপরিবারবর্গ তাবৎকাল সমিতিগৃহে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে কিউল্যাণ্ট
 ভবনে বাসিনীযাপন করিলেন । তাঁহাদের পরিষেয় বজ্রাদি পর্য্যন্ত অপহৃত
 হইয়াছিল । জটনৈক ইংরাজ মহিলার আত্মকল্যাণে রাজপুত্র পরিচ্ছদ পরিবর্তন
 করিলেন । রাণী সন্দেহাত্মক ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত স্বীয় সহচরীর নিকট
 কিঞ্চিৎ ঋণগ্রহণ করিলেন । অনন্তর ১০ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা সমিতির
 আদেশক্রমে টেম্পল ভবনে প্রেরিত হইল ।

ঐন্দ্রেন্দ্রনাথ বোষ ।

শ্যাম-বিরহে ।

—:~:—

বিবস গোকুল ;—যমুনার তীরে
 ভালে ব্রজবাসী নয়নের নীরে ।
 ব্রজনাথে লয়ে গেছে চলি' কিরে
 মধুরার রথ আনি' ।

সে ছিল ব্রজের নয়নের তারা ;
 ব্রজবাসী আজ তাই তারাহারা,
 ব্রজের গোপাল ব্রজের দুলাল
 আজি সে মধুরাবাসী !

২

বহুনা কিলপি' বহে ছল ছল ;
 বিছায় মাধবী ভয়ালের তল ;
 কাঁপে না কোকিল-কাকলী তরল ;
 আবার বৃন্দাবন !

না স্তনি' বিপিনে কাহ্ন-বেগ্ন-রব
 পথপানে শুধু চাহে বেগ্ন সব ;
 বেদনা-বিকলা কাঁদে ত্রলবালা
 নীরব কুজবন !

৩

শিখী শাবিপরে কেকারব তুলি',
 নাচে না পুঙ্খ-চক্ৰক তুলি',
 ডাকে না কপোত চাক্র ঐবাতুলি' ;
 কানকে কুজন নাই ।

বৃহি' পড়িছে ললিতা বিশাখা ।
 চাক্র চক্রাবলী আঁধি জলমাখা ;
 কানে বশোমতী ; দুলায় শ্রীমতী
 রাস রসবতী রাই ।

৪

সিক্ত গোপীর নয়নের জলে
 বনমালা আজি পড়ি' ভূমিতলে ;
 রবি-রাগ-রাক্ষা আশোকের দলে
 যত্নে বসে না আর ।

রবির বিহনে ধরণীর যত
 কাহ্ন বিনা ত্রল শ্রীহীন নিয়ত ;
 নাহি জলবেলা প্রমোদের হেলা
 সকলি অন্ধকার ।

৫

কলসের জল কেলি' ছল করি ।
 যমুনার নীরে ভরিতে পাগরি
 নাহি আসে আর ত্রৈলোক্যের নাগরী
 নদীকূলে নীপতলে ;
 ক্রাম-দলন পিয়ারী নয়ন
 ক্রাম-ক্রোম-রসে ছদয় মগন
 বিকলিত দল কামিনী-কমল
 ছুটে না যমুনা-জলে ।

(৬)

যে নয়ন-ভূগে ছিল ধর শর,
 সে আঁখি সজল বেদনা-কাতর ;
 নীরস সরস ঝুলী-অধর ;
 ত্রৈলোক্য আঁখি ধার ;—
 যাহার পরবে গরবিনী রাই,
 তাহারি বিরহে ত্রৈলোক্য নাই ;
 যা'র স্নেহে স্নেহ সে বিনা অন্তর ;
 প্রাণে প্রাণ নাহি আর ।

(৭)

মাধব বিহনে মধু মধুহীন,
 মাধবী-কুঞ্জ বিজন মলিন,
 সব স্নেহ-আশা নিরাশা-বিলীন
 জীবন যাতনা-ভার ।
 মৃত্ত ক্ষয়—মৃত্ত নয়ন,
 আকুলি উঠিছে ব্যাকুল রোদন ।
 এ নয়ন-বাগি কেমনে নিবারি ?
 জীবন অন্ধকার !

—

সনেট পকাশৎ ।

—:—

(সনেট পকাশৎ—প্রথম জৌহরী জীবিত । হুগো ১০ খাট আলা ।)

আজকালকার কবিতা পড়িয়া সাধারণতঃ নিরাশ হইতে হয় । মাদিক-পত্রে যে কবিতাগুলি প্রতি মাসে জন্মগ্রহণ করিতেছে, সে জন্ম ঐ সমস্ত কবিতার ‘প্রস্থতি’—কবিত্ব-প্রাধিকার অপেক্ষা ‘ধাত্ত’—সম্পাদকগণই সম্ভবতঃ অধিকতর দায়ী । ঐ সমস্ত কবিতার অধিকাংশই মুখে লবণপ্রক্ষেপ-পূর্ণক হস্তিকাগারে বিনষ্ট করিলে, বঙ্গসাহিত্যে হত্যাপর্য্যাপ্ত হইলে না— ইহা নিশ্চিত ।

চিত্রপরিচিতমার্গে আর কোন অভিনব সৌন্দর্য্যই মননপথে পতিত হয় না ; এক ছাঁচের চিত্র এক স্থানে অনেকগুলি থাকিলে তাহাদের বিশেষত্ব লুপ্তিগোচর হয় না ; পুষ্পোচ্চানে এক জাতীয় গাছ অপেক্ষা নানা জাতীয় গাছ থাকিলেই বাগানের শোভা হয় । মৌলিকতা কবিতার প্রাণ ; মৌলিকতার পরিবর্তে নরক আরম্ভ হইলেই, কবিতার হৃদয় আসিয়াছে বৃষ্টিতে হইবে । প্রকৃতিই বাবলীয় সৌন্দর্য্যসম্পদের অক্ষয় ভাণ্ডার ; যখন দেখিয়াছি, আমাদের কবিতার মধ্যে প্রকৃতির অনন্ত মূর্ত্তির পরিবর্তে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবির কবিতার শত সহস্র বার্ষ অমুকরণ—কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও সুবাক্ত—তখনই বৃষ্টি-মাছি, আমাদের সাহিত্যে হৃদয় আসিয়াছে । কারণ, কবিতাই সাহিত্যের প্রাণ, গন্ধ অক্ষ-প্রভাক্রম্য । অধিকাংশ আধুনিক ‘কবিত্ব’গণের রচনা আবার ‘মৌলীন হেরাল্ড’ মাত্র, Fashionable mysticism এ পরিপূর্ণ ! বাস্তবিক এই সকল কবিতা কি ‘কালের সাক্ষীস্বরূপ’ জগতে বর্তমান থাকিবে ? Jeffryর ভাষায় বলিতে হয় “This wont do.”

হৃদয়ের মনর একমুষ্টি অস্ত্র ও অস্ত্র মনয়ের স্মৃতিভোজনাপেক্ষা হৃদয়জনক ! তাই আক ‘সনেট পকাশৎ’ আমরা মাদরে গ্রহণ করিলাম । ইহাতে মৌলিকতা, নির্ভীকতা ও ভাবুকতার সমাবেশ আছে । স্পষ্ট কথা বলিবার তেজ ও সাহস সকলের নাই । এ কবির তাহা আছে । এই জন্ম ক্ষুদ্র পুস্তিক-খানি বঙ্গীয় সমালোচক-সমাজে যথোচিত, হয় ত একটুকু অতিরিক্ত মাত্রায়, প্রশংসা লাভ করিয়াছে । এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া মনে হয় যেন সুনিপুণ শিল্পী সামান্য প্রয়াসে খেতবর্ষের মধ্যে এক একটি মূর্ত্তির আভাস দিয়াই কাল

হইয়াছেন—ইচ্ছা করিলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও পরিমুট ও ‘পালিশ’ করিতে পারিতেন ; কি সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। ইহা যে ভণ, তাহা বলিতে পারি না ; বরঞ্চ ইহা দৃশ্যীয়। তবে ভাষার কভারের খাতিরে ভাবকে স্ক্রুণ করা অপেক্ষা এ দোষ সূর্য্যধা মার্জ্জনীয়।

ভাষকবিকে সন্মোদন করিয়া, কবি লিখিয়াছেন—

“সে শুধু কাতর, যার নয়নে বরুণ।

তোমার নাটকে তাই জলে পরিহাস।”

তাঁহার নিজের কবিতাগুলির অন্তরালেও ফন্ডর ধারার ভ্রাস বিক্রপের যে একটি ক্ষীণ প্রবাহ বহিতেছে তাহাই বহিধানিকে বেশ সূর্য্য করিয়াছে। কবি বাহা দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব ; তাঁহার নিজের কথায়ই বলি, এ পুস্তকে “জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা” নাই। বস্তুতঃ কবির অনন্ততত্ত্ব হানে হানে বক্তব্যের প্রচলিত রচনাপদ্ধতি ও প্রয়োগগীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। পুস্তকের মলাটেই তাহার নিদর্শন আছে। অবতরণিকার শেষে কবি স্বয়ং লিখিয়াছেন, তাঁহার সনেট—“সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেটু”।—কবি তাঁহার সরস্বতীকে সত্য সত্যই বিলাতী বনেট ও ইরানী পেশোয়াজ পরাইয়া উপস্থিত করিয়াছেন। লেখক, শক্তিশালী ; স্তত্রাং মাতৃভাষার উপর এই ইচ্ছাকৃত প্রমথ-নর্জন আবাদগিকে ব্যথিত করিয়াছে। বড় দুঃখেই স্বর্ণীয় কবির বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী এক দিন লিখিয়াছিলেন—

“হা বিক্, ফেরজবেশ

এই বাস্ত্যিকির দেশে

কে তোরা ভ্রমিস আজি, উদ্ভিন্নুখী আয়া।”

হানে হানে আধুনিক রুচির প্রতি কবি যে নিঃশব্দ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাও আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। শক্তির সহিত সংঘের সম্বন্ধই সাহিত্যে আদরণীয়।

আরন্তের কবিতাটিতে কবি লিখিয়াছেন—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন

শিল্পী বাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।”

আগাগোড়। স্বকল্পিত কঠিন বন্ধন রক্ষা করিয়া এই পঞ্চাশটি কবিতা রচনার লেখক তাঁহার শব্দ-সম্পদের পরিচয় দিয়াছেন। তবে

“দেখেছ কখনো বিশ্ব শুধু নারীময়,

আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়।”

এইরূপ দুই এক স্থলে যে মিলের দৈবত দৃষ্ট হইল তাহা সম্ভবতঃ অনবধান-
তার ফল। ‘সুনেট পঞ্চাশতে’ যে নব প্রতিভার পরিচয় আছে, তাহাতে
আবার ভবিষ্যতে কবির নিকট উৎকৃষ্টতর কাব্যের প্রত্যাশা করিতে পারি।

কোজাগর পূর্ণিমা।

পাত্ত রিচ পরেতর সুবীল অখরে
পঞ্চ-ভুজ বজ্রকার
বও বেগ ভেসে যায়,
ভুজ ছাড়াই-রাঙ্গি বেগ সরোবরে।
চন্দ্রলোক হ’তে আসি’
উজ্জ্বল জোছনারাশি
দুলকে পড়িয়ে আলি বরপীর’ পরে।

২

বিকশিত কাশবনে জোছনা বিহীন
রচিষ্যকে সুশোভন
রুচকেন-আশ্রয়ণ
মগ্নিত থাকেজে রক্ত তরল।
যানি’ পেকালির পঞ্চ
বহে’ যার সুদুর্লভ
নিশিরগগনরিক সমীর ঈতল।

৩

অর্গ হ’তে কুতুহলে
নাখিলেন বরাভলে
জননী কল্যা—বজ্র করিতে জ্বল।
ভুজ এই অবসরে
অর্গরাশি লগে করে
কহিলেন যারে বারে—অস্তর ঘটন;—

৪

“সদু খে উজ্জ্বল বন বাজের তাতার,—
লক্ষীর করণা রাশি’
কে মিঠা সরেছ জানি’ ?
উঠ, লহ নিজ-অংগ এসাবে আবার।
মিস্ত্রালসে অচেতন
নিজবন্দাহ বেই জম,
সে শুধু বাকিত র’বে—সদে বৈজ্ঞ-তার।”

ঈদবপীমোহন ঘোষ।

সমালোচনা ।

—:—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমীদার । ❀

—:—

কয় বৎসর পূর্বে 'আর্য্যাবর্তে' ঐহুত্ব আনন্দনাথ রায় প্রণীত 'ফরিদপুরের ইতিহাসের' সমালোচনা করিতে যাইয়া আমরা বলিয়াছিলাম,—“বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধারকার্যে বাঙ্গালার জিলাগুলির ইতিহাস যে বিশেষ সাহায্য করিবে—সেই ইতিহাস যে একান্ত আবশ্যক—তাহা বলাই বাহুল্য ।” বাঙ্গালার ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই । বিদেশীয় লেখকগণ মান্য কার্যের মধ্যে বিরলপ্রাপ্ত অবসরকালে বাঙ্গালার যে সব বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন সে সকলের অল্প আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ । কিন্তু সে সব বিবরণ বাঙ্গালার ইতিহাস নহে । সুখের বিষয় ক্রমে বাঙ্গালার জিলাগুলির ইতিহাস লিখিত হইতেছে । কেবল তাহাই নহে ; পরন্তু মান্য জমীদারের বংশের ইতিহাসও লিখিত হইতেছে । এই সকল ইতিহাসে দেশের সমাজিক ও ঐক্যনৈতিক অবস্থার পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে । নশিপুরের মহারাজ রণজিৎ সিংহ বংশপতি দেবী সিংহের ইতিহাস লিখাইয়াছেন । রাজ্য বিনয়কৃষ্ণ দেব বংশপতি নবকৃষ্ণের চরিত লিখাইয়াছেন । উভয় পুস্তকেই প্রংশসার সুবাদেপে বংশপতির কলঙ্ককালিয়া গোপন করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু ইতিহাসের উপাদান হিসাবে উভয় পুস্তকই মূল্যবান । আবার হেডমপুর রাজবংশের ও নলডাঙ্গা রাজবংশের ইতিহাস লিখিত ও প্রকাশিত হইয়াছে । এ সব অলঙ্ঘন সম্ভব নাই ! সংপ্রতি যয়মনসিংহ জিলার দামগোপালপুরের কুমার ঐহুত্ব সৌরীজ্জকিশোর রায় চৌধুরী 'যয়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার' নামক গ্রন্থে যয়মনসিংহের প্রসিদ্ধ জমিদারদিগের বিবরণ বিস্তৃত করিতেছেন ।

কাত্তকুজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম কাত্তপ গোত্রীয় সুবেণের অধস্তন নবম পুরুষে জিগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি “জিগ্নি মহামুনি”

• যয়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার—ঐসৌরীজ্জকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত । কলিকাতা ২১:১ পটুয়াটোলা লেনে সাক্ষী প্রেসে ঐহেমচন্দ্র রায় দ্বারা মুদ্রিত ।

আখ্যাবট ।



কালচাঁদের মন্দির ।

নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার পুত্র স্বর্ণরেখ বরেন্দ্র ভূমিতে গমন করেন। তাঁহার বংশধরগণই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহার পুত্র কৈতাই ভাটুড়ী ও মৈতাই মৈত্র গাঞি সংজ্ঞা পাইয়াছিলেন। নাটোরের রাজবংশ ও ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ এই মৈতাই মৈত্রের বংশধর। ইহার পৌত্র দোয়া-চাখ্যের জীবিতকালে বাক্সালা মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হয়। তাঁহারই বংশে জীবর ওকা (অর্থাৎ উপাধ্যায়) কুলচাত হইয়া কাপ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন ও বার ভূঁইয়ার অজ্ঞতম তাহিরপুরের কংশনারায়ণের প্রচলিত নিয়মানুসারে “কাপ হইয়াও পরে শ্রোত্রীয় বরে কস্তাদানে” শ্রোত্রীয় হইলেন। জীবরের প্রপৌত্র দিবাকর হইতে নাটোর রাজবংশের উৎপত্তি। হরি পণ্ডিত দিবাকরের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাত। তাঁহার পৌত্র গঙ্গানন্দ দিল্লীর বাদশাহ সরকারে কায করিয়া হালদার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গানন্দের পুত্র যজ্ঞেশ্বর ও জয়নারায়ণ বগুড়ার কড়ই গ্রাম নবাব সরকার হইতে পত্তনি লইয়া তথায় যাইয়া বাস করেন। জয়নারায়ণের পুত্র ঐকান্তক ঐ গ্রামে “পরিধাবেষ্টিত, দৃঢ় প্রাচীরদ্বারা সুরক্ষিত, অগণ্য অট্টালিকাভেদীতে পরিপূর্ণ, দেবালয় উৎসবালয় কাঠাগার এ অস্ত্রাগার দ্বারা সুরক্ষিত, সুবিশাল” বাস-ভবন গঠিত করেন। এই বাসভবন বর্তমানে ভগ্নরূপে পরিণত হইতেছে। ইহার মধ্যে কালাচাঁদের মন্দির, হুর্গামস্তণ ও জোণ দালান, অস্ত্র-পুরের বিতল দালান প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। কালাচাঁদের “মন্দিরের বহির্দেশে এক স্থানে ১১২২ সনে মন্দির নির্মিত হইয়াছে” লিখিত আছে। “হুর্গামস্তণের প্রাচীন প্রধাহুয়ারী কোদাই কার্য্যের অপূর্ণ শিল্প-চাতুর্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।” এই বাসভবনের কথায় এককায় লিখিয়াছেন—“তুই নত বা ‘মোড়ী’ নত বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে হুপতি-কার্য্য কিরূপ নিপুণতার সহিত সম্পন্ন হইত উক্ত বাসভবন দৃষ্টে তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয়।”

ঐকান্তকই ময়মনসিংহের প্রথম প্রধান বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমীদার। মুর্শিদ কুসী-বাঁ'র শাসনকালে তিনি ভাগ্যপরীক্ষা করিতে মুর্শিদাবাদে গমন করেন ও নবাব সরকারে রাজস্ব-বিভাগে সামান্য কাযে নিযুক্ত হইলেন। নাটোর রাজবংশের সুপ্রসিদ্ধ রঘুনন্দন ভদ্রন ‘রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারী। তাঁহার চেষ্টায় ঐকান্তকের পদোন্নতি হইল এবং তিনি কাননগোর পদে উন্নীত হইলেন। যে উপায়ে তিনি প্রথম জমীদারী লাভ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহা কালো-

চিত্ত হইলেও প্রবাসনীর নহে। ঐ সময় কোন পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন ও নবাবকে উপেক্ষা করিয়া বীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। নবাব উপহুঁপরি ছুইবার তাঁহার দমনকল্পে সৈন্য পাঠান। কিন্তু নবাবের সৈন্যদল পরাজিত ও লাহিত হয়। তখন নবাব ঐক্যের উপর তাঁহার দমনতার অর্পিত করেন। সৈন্যদলপরিবৃত্ত ঐক্যক জমিদারের অধিকার-সম্মিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সংবার পাঠান—“বাদশাহের আদেশ বশত আমি পূর্ণিয়ার নবাবকে দ্রুত করিবার জন্য ঘাইতেছি, আপনি শক্তিশালী এবং বাদশাহের হিতৈষী, আপনার সাহায্য লইবার জন্য বাদশাহের আদেশ আছে। অতএব আপনি আমাকে সংপত্তমল ও সাহস দানে বাদশাহের কার্য সাধন ও নিষ্ফল স্বার্থসাধন করিবেন। ভরসা করি এই সুযোগ ভাণ করিবেন না।” জমিদার ঐক্যের কথার বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ঐক্যক তাঁহাকে বন্দী করেন। বাদশাহ ঐক্যকে পুরস্কৃত করিতে আদেশ দেন। তিনি বাজুহার অন্তর্গত ময়মনসিংহ পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। এই পরগণাই পূর্বে যোনিমসাহী নামে অভিহিত হইত। ঈশা রা'ই ইহার অধিকারী ছিলেন। অহম্মান ১১২৫ বঙ্গাব্দে ঐক্যক “চৌহুরী” উপাধিসহ ঐ পরগণার জমিদারী ফরমান প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরগণার অবস্থা শোচনীয়। অধিকাংশ স্থানই জলময়—অধিকাংশ ভূমিই পতিত—খাজনার দায় অল্প। তখন “শস্তাদির বিনিময়েই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় চলিত।” ঐক্যক বিশেষ চেষ্টায় জমিদারীর উন্নতি সংসাধিত করেন। ঐক্যের পুত্র চাঁদ রায় খালসা বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি “সুপুরুষ নির্ভীক ও অসাধারণ বলবান ছিলেন।” কিম্বদন্তী তাঁহার চরিত্রেও চাতুরীর কলককালিমা লিপ্ত করিয়াছে। “ঘোড়াঘাট চাক্কার কোনও দুর্ব্বাস্ত মুসলমান জমিদারের শাসনের জন্য নবাব আলিবর্দীখাঁ চাঁদরায়কে প্রেরণ করেন। চাঁদ রায় . . . নবাবের কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া অশ্বব্যবসারীভূত্রে উক্ত জমিদারের নিকট উপস্থিত হন। কিছু দিন তাঁহার বাস করিতে করিতে দীন দরিদ্রকে বহু অর্থ দান করেন, বহু লোকের অভাব যোচন করেন, এবং জমিদারের কর্মচারীগণকে অর্ধে ও সৌজন্যে বন্দিভূত করেন। তাঁহার অপগ্রন্থ রূপ, অপরূপ দানশক্তি দেখিয়া লোকে তাঁহাকে কোনও ছদ্মবেশী রাজপুত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক লোকের আভাব রহিল না। ক্রমশঃ এই সমাচার জমিদারের অন্তঃপুরে পৌছিল। জমিদারের পত্নী তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা

প্রকাশ করিলেন এবং কোন উপায়ে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার রূপসাবণ্যে বোহিত হইয়া পড়িলেন। চাঁদ রায় সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, বেগমের হাবভাব বুঝিয়া তাঁহার প্রতি অহুসাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রূপোন্মাদিনী বেগম চাঁদ রায়ের এতই বশীভূতা হইলেন যে, খ্যৈ পতির জীবন নাশের প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। চাঁদ রায় বেগমের কোশলে গোপনে অস্ত্রপূরে প্রবেশ করিয়া নিহিত অমীদারকে নিহত করিলেন।

তখন “যা’র লাঠি তা’র মাটি!” চাঁদ রায় সেই সময় বিশেষ প্রতাপশালী হইয়া উঠেন।

ঐক্যের পুত্রগণ কড়ই ত্যাগ করিয়া কলকরসাহীতে বাস করেন। চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় সহোদর কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল পিতার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ প্রাপ্ত হইলেন। অপুত্রক কৃষ্ণকিশোর প্রভুর প্রাপ্যকর্ত্ত্ব প্রাপ্যবিসৰ্জনোত্তর স্বভাবের প্রাপ্য রক্ষা করিতে বাইরা প্রাপ্য হারাষ্টয়াছিলেন। প্রভু ও দৃত্য উভয়ের কার্যই সমভাবে প্রবাহমান। “কৃষ্ণগোপালের মৃত্যুর পর ১১৭১ সালেও বিপুল উৎসবের সহিত রথযাত্রা পূজার অহুষ্ঠান হইল। প্রতি বৎসর রথ টানিবার পূর্বে উভয় ভ্রাতা রথের সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিতেন, ঐ ভাবে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া উঠিয়া রথ টানিবার আদেশ দিতেন। যে বৎসর কৃষ্ণকিশোরের মৃত্যু ঘটে, ঐ বৎসরও পূর্বনিয়মমত তিনি রথের সম্মুখভাগে পতিত হইয়া প্রণাম করেন। প্রণাম করিয়া উঠিবার পূর্বেই কোনও অজ্ঞাত কারণে রথ টানা আরম্ভ হয়। প্রণামান্তে উঠিয়া আদেশ দিলে তবে রথ টানা হইবে ইহাই চিরন্তন প্রথা, কিন্তু নিরতিথি বিধান অহুসাসে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। প্রবল টানে সেই বিশাল রথ বর্ষের মধ্যে অগ্রসর হইল। কৃষ্ণকিশোর বাহুজানুত, ইষ্টচিত্তায় তন্ময়; এই বিপদের সম্ভাবনা তাঁহার ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহার প্রিয় ভ্রাতা কানীশরণ প্রভুর নিকটে গণ্ডায়মান ছিল, চালিত রথ প্রভুর উপরে আসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া তাহার প্রাপ্য আহুত হইল। কানীশরণ রথ টানা বন্ধ করিবার অস্ত্র চীৎকার করিল, কিন্তু বিপুল জনকোলাহলের মধ্যে নিবেদন-স্বচক চীৎকার ভুবিয়া গেল। কেহ তাহা শুনিয়া না, রথের গতি বন্ধ হইল না। আর সময় নাই, রথ কৃষ্ণকিশোরের নিকটেই হইয়াছে, আর এক পল বিলম্ব করিলে রথচক্রে পিষ্ট হইয়া প্রভুর জীবনান্ত হইবে; চিন্তায়, আতঙ্কে, উদ্বেগে কানীশরণ উন্নত হইয়া উঠিল। অস্ত্র কোন উপায়

নাই দেখিয়া স্মৃতিকাপতিত প্রভূকে সবলে উঠাইল এবং অমানুষিক শক্তি-
 প্রয়োগে সেই স্মৃণোরতনেহ প্রভূকে সমুখস্থ রথের উপর উঠাইয়া দিল ।
 এই অতর্কিত ঘটনার জন্য তিনি প্রত্যন্ত ছিলেন না, হঠাৎ এই ঘটনা ঘটায়
 তিনি বিম্মিত ও আশ্চর্য্যবোধ হইয়াছিলেন । রথের উপর উঠিয়া আত্ম-বিপদের
 অবস্থা তাহার উপলব্ধি হইল । স্মৃহার ব্যাদিত বদনের ভিতর হইতে রক্ষা
 পাইয়া তিনি কল্পিত জনের ইষ্টদেবতার স্বরণ করিলেন । কিন্তু বিধাতার
 বিধান অচ্যুত । তখনই অস্ত্র এক ঘটনা ঘটিল । কুরুকিশোরকে রথের
 উপর উঠাইয়া দিতে দিতেই রথ প্রায় কাশীশরণের উপরেই পড়িতেছিল !
 কাশীশরণ পুত্র আতীত, রথে দেববিগ্রহ বিরাজিত, সে রথে উঠিবার তাহার
 অধিকার নাই । স্মৃত্যং প্রভূকে রথে উঠাইয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে অন্নদাতার
 জীবন রক্ষা করিয়া, কাশীশরণ কষ্টভিত্তে রথের সমুখ হইতে দৌড়িল । কিছুকণ
 পূর্বে দৃষ্টি হইয়াছিল, সিন্ধু পিঙ্গিল পংখ তাহার পদাঙ্গন হইল । কাশীশরণ
 রথের সমুখ পড়িয়া গেল । স্মৃত্যং এই বিঘ্ন বিপদ দেখিয়া কুরুকিশোরের
 জনম গলিল । যে কৃত্য স্বাস্থ্যসৌভাগ্যের মমতামাত্র না রাখিয়া তাহার জীবন
 রক্ষা করিয়াছে, সেই জীবন-রক্ষক স্মৃত্যং জীবন রক্ষার জন্য তিনি নিযিমিক
 জ্ঞানশূন্য হইলেন । আত্মজীবন তুচ্ছ ভাবিয়া রথ হইতে লক্ষ দিয়া স্মৃত্যং
 অবতরণ করিলেন । যে স্থানে তিনি অবতীর্ণ হইলেন সে স্থান বড়ই গিঞ্জিল ছিল,
 ব্যস্ততার সহিত অতর্কিত ভাবে অবতরণ করিবারাত্র তিনি স্থিতি-পদ হইয়া
 রথের সমুখ পতিত হইলেন । নিকটস্থ লোকে এই আকস্মিক বিপৎপাতে
 হাহাকার করিয়া উঠিল । যাহারা রথ টানিতেছিল তাহাদিগকে নিদ্রত করি-
 বার জন্য যথাসম্ভব যত্ন চেষ্টা করা হইল, কিন্তু উন্নত জনমণ্ডলী সে বাগা শুনিম
 না, কঠোর ভবিতব্যতার ফল ফলিল, কুরুকিশোর ও তাহার কৃত্য কাশীশরণের
 উপর দিয়া বর্ষের নল রথ চলিয়া গেল ; প্রহবৎসল কৃত্য ও কৃত্যবৎসল প্রভু
 এক সঙ্গে রথচক্রের নীচে পড়িয়া বাজালা ১১৭১ সালে জীবন বিসর্জন
 করিলেন ।”

কুরুকিশোরের মৃত্যুর পর কুরুগোপালের দত্তক পুত্র যুগলকিশোর পিতার
 ও পিতৃব্যের সম্পত্তি অধিকৃত করিলেন । মহামারীষেহু তিনিই পূর্ববাসস্থান
 ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ—গৌরীপুরে আসিয়া বাস করেন । কুরুকিশোরের
 পত্নী রত্নমালা ও মাতারঙ্গী দত্তক গ্রহণে অভিলাষ ব্যক্ত করিলে বার্ষহানিত্য-
 ভাত যুগলকিশোর তাহাদিগকে সতর্ক-প্রহরী-বেষ্টিত গৃহে আবদ্ধ রাখিলেন ।

ଆସିଆର ଗୁପ୍ତ



কিন্তু তাঁহার কৌশলে পলায়ন করিয়া “পতির প্রাণা মরমনসিংহ ও জকর-
শাহী পরগণার অংশ প্রাপ্তির জন্য কলিকাতার রাজস্ব-সমিতিতে যুগলকিশোর
রায়ের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।” গঙ্গাগোবিন্দ তখন কাউন্সিলের
ডেপুটী মঃওয়ান। এই অভিযোগব্যাপারে এক দিকে তৎকালীন সমাজের
নীতিজ্ঞানহীনতার ও অপর দিকে লোকের দেহবিদ্বেষ ভ্রমের ও মাতৃভক্তির
পরিচয় পাওয়া যায়। “কবিত আছে যে, কোনও স্বর বা অধিকার লইয়া
রাজস্ব-সমিতিতে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তাহার অগ্রপরাধর লইয়া
উভয় পক্ষে নীলামের মত ডাকাডাকি করিত, যে পক্ষ অধিক উৎকোচ দিতে
সক্ষম হইত, তাহার অগ্রকূলেই যোকদ্দমার নিশ্চিতি হইত। রক্তমালা ও
নারায়ণীদেবীর অভিযোগে প্রচুর অর্থপাতের সম্ভাবনা দেখিয়া গঙ্গাগোবিন্দ
মিংহ নিরাপত্তিতে তাহা গ্রহণ করিলেন; এবং যুগলকিশোরকে আশ্বপক্ষ সমর্থ-
নের জন্য উপস্থিত হইতে আদেশ দিলেন।” “বিধবাবয়সকে বঞ্চিত করিবার
জন্য যুগলকিশোর রায় উৎকোচ দানে মুক্তহস্ত হইলেন।” শেষে বিধবাবয়স
ভুলিলেন, “যুগলকিশোর অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর; দেওয়ান উৎকোচের
মোহে তাঁহার পক্ষভুক্ত হইয়াছেন; সুরতায় তাঁহার অগ্রগতি নিশ্চিত।”—তাঁহা-
দের আশাশীল নির্ধাপিত হইল। “সে দিন আশাঢ় মাসের শুক্লা ষাদশী,
পূর্ণিমা একাদশীর উলবাস করিয়া পারণার উযোগ করিতেছিলেন। ঐ সময়
ভীষণ বজ্রাঘাতের ন্যায় এই হুঃসংবাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। আর
তাঁহাদের পারণা হইল না। জীবনের সমস্ত আশাভরসা লোপ পাইল ভাবিয়া
তাঁহারা চক্রে অন্ধকার দেখিলেন। দারুণ মনোবেদনায় আত্মহারা হইয়া
উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আর আশা নাই দেখিয়া জীবনের
প্রতি মমতাসূন্য হইলেন। গঙ্গার জলে জীবন বিসর্জন করিয়া অধর্মের
সংসারের সমস্ত দুঃখ, শোক, আলা, যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভই তাঁহাদের
প্রার্থনীয় হইল। নরসিংহ রায় (মোক্তার) তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিবার জন্য
অনেক আশার কথা—সম্ভাবনার কথা জানাইলেন এবং পারণা করিবার
অন্ত বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিধবাবয়স জনগ্রহণ করিতে অসী-
কার করিলেন এবং গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জন দিবার সঙ্কল্প জানাইলেন।
নরসিংহ রায়ের বয়, চেষ্টা, প্রবেশ, আশ্বাস সমস্তই নিষ্ফল হইল, বিছুতেই
বিধবাবয়স সঙ্কল্প টলিল না। যে সময় নরসিংহ রায় ও বিধবাবয়স
মধ্যে এইরূপ কলোপকথন হইতেছিল, সেই সময় এক বখাঁরসী মহিলা তাঁহা-

ঘের নিকটে গঙ্গার তীর করিতেছিলেন। এই সমস্ত কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। বিধবাসের ক্রন্দন অপেক্ষা আত্মহত্যার কথা শুনিয়া তাঁহার বড়ই দয়ালু উদ্বেগ হইল। তিনি বিধবাসের অবস্থা জানিবার জন্ত একজন দাসীকে নৌকায় পাঠাইয়া দিলেন। বিধবাস এই বর্ষারসী মহিলার স্নানোৎসাহিত দেখিয়া ক্রমশঃ দ্বার অন্তর্গত করিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলেন। গঙ্গাপোবন্দ সিংহ উৎকোচের বন্দীকৃত হইয়া তাঁহাদের সর্জনশ সাধন করিতেছেন, ঐতিকার করিবার তাঁহাদের সাধ্য নাই, তাই আত্মহত্যা করিয়া পাপের পৃথিবী ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে কথাও বলিলেন। দয়ালুহৃদয়ে বৃদ্ধা মহিলার ক্রম পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অক্লমোচন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন “মা, যে গঙ্গাপোবন্দ সিংহের নিকট আপনাদের যোকদ্দমা, আমি তাহারই গর্ভধারিনী। আপনারা আমার পুত্রের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আপনারা যোকদ্দমার জয়লাভ করিবেন। এক্ষণে নিশ্চিন্ত মনে পারণ্য করুন। আমি গঙ্গাতীরে মিথ্যা প্রবোধ দিতেছি না।” • • • • যথাকালে যোকদ্দমা নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। রাতার অহুরোধে গঙ্গাপোবন্দ সিংহ রক্ত-মালা ও নারায়ণী দেবীকে বৃগলকিশোরের অবিদ্রুত দ্বাবর অন্ধার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদের নামে জমিদারীর পনন্দ বাহির হইল।”

বারেন্দ্র ভ্রাতৃগণ জমিদারদিগের ইতিহাসের সহিত ময়মনসিংহের ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। পূর্বে “ময়মনসিংহ পরগণার অনেক স্থান জল-পূর্ণ ছিল। নিম্নভূমিতে কর্ণযোগ্য ভূমি বাহা ছিল তাহাও ক্রমশঃকর অভাবে পতিতাবস্থায় থাকিত। জলপ্রাবনে অনেক সময়ই বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইত। হাটবাঙ্গার যাতায়াতের পথ এ সমস্ত ছিল না।” এই জমিদারগণ “অনেক বন জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া নূতন প্রকার বসতি করাইয়াছিলেন।” তখন জমিদারগণ রাজার অপ্রীতিভাজন করসংগ্রহকারীবাঞ ছিলেন না। “তাঁহারা বেওয়ানী ও ফৌজদারী যোকদ্দমার বিচার করিতেম, প্রজাগণের সর্জনপ্রকার দায়িত্বকারের উপর কর্তৃত্ব করিতেম।” তাঁহাদের সৈন্ত, কারা-গার, দুর্গ সবই ছিল। তাঁহারা বাঙ্গালার শাসকের ত্যাগ নির্ধারণ করিতেম। বাঙ্গালার ইতিহাস তাঁহারাই অনেক সময় গঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহা-দিগের কেহ কেহ আধীন রাজা হইয়া দিল্লীর সম্রাটের অমর্ত্যও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালার বারেন্স কমিটাদিগের ইতিহাস লিখিত হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু মূল্যবান উপাদান সংগৃহীত হইবে । এ কার্যে অগ্রণী হইয়া হুমার সৌধীনকিশোর আশাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইরাছেন । তাঁহার আরও কার্য সুসম্পন্ন হউক ।

স্বাগত ।

—:—

এস	রজনীর পেনে	সম্মেলন বেগে	দিবালোকরাশি নয় ।
এস	ত্রিভুজিতল	বরষায় জল	তত্ত্ব ভগ্নয়ে মন ;
এস	বকর উষায়	বাসুহ উপর	কটিক বাক্স-পুত্র ।
এস	শিশির-অন্তে	নব বসন্তে	সুবনয় সুস্বায় ;
এস	বীল বিবল	গগনে বিবল	রজত জ্যোৎস্নাহাসি ;
এস	অলিসম্মল	সুহৃতি-দাহুল	পুলকিত সুলরাশি ;
এস	নরৎ-তপসে	এভাত-পবনে	বিকশিত পতমল ;
এস	বর হবিকরে	শিখাসা-কাতরে	ত্রিভুজিতল জল ;
এস	অবাদিপাশরে	বীল অঘরে	হবিকর মধুঘর ।
এস	হত্যশের তরে	জীবন-সমরে	চিরদীপ্তিত নয় ।
এস	হত্যশা-কাভর	বর অস্তর	পুলকিত তোষা লানি' ;
এস	ইষ্টি' হুম্বোক	আপায় আলোক	উগ্রিয়ে সেবার আনি' ;
এস	অমায় অঁবায়	সুতরে আবার	আলোক পুলকর্তরা ;
এস	স্বপ্ন এ জীবনে	পাণ্ডি বহণে	সংসার আলো করা ।

হরিদ্বার হইতে লক্ষ্মণ-ঝোলা ।

—:—

আমাদিগের জায় পরাঙ্গলীকী সেবকধর্ম্মাদিগকে সমস্ত কাৰ্য্যই পরমুখাপেক্ষী হইয়া করিতে হয় । বৈদেশিক কাৰ্য্য, স্বাধ্বালাভের জন্য বাহু-পরিবর্ত্তন, এমন কি অনেক সময় অবশ্যকর্তব্য পিতৃমাতৃশ্রদ্ধ পর্য্যন্তও কোন একটা বন্ধের অবসর-প্রতীক্ষায় স্থগিত রাখিতে হয় । সুতরাং চির-বাহিত হরিদ্বার-দর্শনও যে একটা বন্ধের প্রতীক্ষায় স্থগতবী রাখিয়া দিতে হইয়াছে তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি ? এই জন্তই তর্জুহরি গাহিয়াছেন “সেনাপর্ষ প্ৰথমগমনঃ যোগিনা-মপাগমাঃ,” এবং এই জন্ত আর্য্যশাস্ত্রকারগণ আধুনিক যুগের পরম গৌরবা-ল্পদ ‘চাকরী’-বৃত্তিকে বৃত্তি বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । কবে জাতীয় স্বাধ্বাধ্ব্যনের প্রধান সহায় আমাদিগের যুবকগণ স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কলক—বাক্যলীর এই হেয় অযোগ্যতা ঘুড়াইয়া বঙ্গ-সমাজকে একটু স্বতন্ত্র ও সবল করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন ? না করিলেও বাক্যলীর আর উদ্ধার নাই ।

আমরা বারানসী হইতে ১০২-০ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বেলা ১১ টার সময় পঞ্জাব মেলে আরোহণ করিয়া বাম্পীর ধানের উদ্যম গতিতে ক্রমশঃ প্রতাপ-গড়, জায়সূ, রায়বেরেলী, লক্ষৌ, বেরেলী, হরদোই, সাজাহানপুর, মোহান্দা-বাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরসমূহ পঞ্চাতে রাখিয়া রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় লুৎসর্ জংশনে যানপরিবর্ত্তন করিয়া সুন্দরতর শকটপ্রেবীতে আরোহণ করিয়া শেষ রাত্রিতে হরিদ্বার ঠেশনে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গাতীর-সমীপবর্তী এক পাত্তার আশ্রয়ে বাসস্থানাদি লাভ করিয়া প্রাতঃকালে ব্রহ্মহুঙ্কাটে অবগাহন করিবার অভিপ্রায়ে জননী জাহুবীর ফোড়ে নামিয়া দেখি, তিনি যেন আমা-দিগের জায় সুসজ্জানকে সরাইয়া ফেলিয়া দিতেই চূড়চঞ্চল । ঘোড়ের সে বেগ সহ করা আমাদিগের জায় দুর্ব্বল সজ্জানের সাধ্যায়ত্ত নহে । জননীর চণ্ড নৃষ্টি শাস্ত করিবার জন্য পুল বাঁধের সৃষ্টি হইলেও কাহার সাধ্য তাঁহার সে বেগ নিবারিত করে ? আমরা সেই পুলের একটা লৌহজড় ধরিয়া কোনরূপে শাক্তকোড়ে নিমজ্জনস্বপ্ন অন্ততব করিয়া বিমলানন্দ অন্ততব করিতে লাগিলাম ।

এই স্থানেই তীর্থের মাহাত্ম্য এবং এই লক্ষ্মী শাস্ত্রাদিতে তীর্থযাত্রার উপ-
যোগিতা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

ব্রহ্মহুত ষাট হইতে গঙ্গাতীরের কিয়দূর পর্যন্ত স্থলর ভাবে বাধাইয়া
দেওয়া—বেড়াইবার পক্ষে বড়ই মনোহর স্থান। এক দিকে ধরপ্রবাহিনী
গঙ্গাদেবী, পরপারে পর্বতমালা, তাহার পশ্চাৎ হইতে সুর্যোদয়ের দৃষ্ট চিত্রপ
চিত্তবিনোদন তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। একটি ক্ষুদ্র পুল পার হইয়া
চড়ার উপর যাওয়া যায়। তথায় বেড়াইবার বেশ স্থান। সেটি নদীগর্ভে
একটি ক্ষুদ্র দ্বীপবিশেষ; গঙ্গাদেবী তাহার চারিদিকে বেঠেন করিয়া ভীত বেগে
চলিয়াছেন; অকূরে পাহাড়; অপর পার্শ্বে হরিদ্বারের স্থলপ্রবাহ নয়নাভিরাম
সৌধমালা। এ দৃষ্ট কৌশলে কখনও ভুলিবার নহে। হরিদ্বারের কোন যাত্রীই
যেন এই উপভোগ্য বস্তুটির কথা বিস্মৃত না করেন।

কনখল হরিদ্বার হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। সপ্ত মোক্ষদায়ী নামের
উল্লেখ করিয়া যে প্রবচন প্রচলিত আছে, তাহাতে হরিদ্বার বা কনখলের
নাম নাই—যাত্রা শব্দেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। গঙ্গা হইতে নবকর্ষিত
ধাত-প্রবাহের সেতুসমূহে মায়াপুরী অতিক্রম করিয়াই পথে রামকৃষ্ণ-সম্প্র-
দায়ের দেবাপ্রস-দর্শন করিয়া আমরা ক্রমশঃ কনখলের দক্ষের মন্দিরে
উপনীত হই। বারাণসী নগরে রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত যে সেবাপ্রতি
কেবল বাঙ্গালীর নহে, কান্দিবাসী মাত্রেই, গৌরবহুল এবং যাহার ব্যবস্থা ও
রোগী-পরিচর্যা-পদ্ধতি রাজকীয় সুবিশাল হাসপাতাল হইতেও অধিকতর
সুব্যবস্থিত ও স্বাস্থ্যনিয়মানুসার বলিয়া অভিজ্ঞব্যক্তিগণ অভিযত প্রশংসা করিয়া
বাকেন। এই সেবা-সৌধটিও তাহার অননুসৃত নহে দেখিয়া মাতৃকোড় হইতে
বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সুদূর প্রবাসেও বাঙ্গালী জাতির আশ্রয়ভাগের উচ্ছল কীর্তি
দর্শনে বিশেষ আনন্দ অহুতব করিতে লাগিলাম। এই সেবাবর্ধ মহাত্ম্য
রামকৃষ্ণ পংমহংস দেবের নামের সহিত জড়িত থাকিয়া পবিত্রতর ও মহত্তর
হইয়া রহিয়াছে। পরমেশ্বর উত্তোজগণের এই মহাহুতানকে অরমুত করিয়া
তীর্থে তীর্থে নগরে নগরে ইহার বিজয়বৈজয় প্রোথিত করুন; সঙ্গে সঙ্গে
বাঙ্গালী জাতিকে অপরাপর প্রদেশের জাতবর্গের সেবাবর্ধের মাহাত্ম্য শিক্ষা-
দানের সুযোগ দান করিয়া বাঙ্গালীর নামকেও বহু করিয়া তুলুন।

তীর্থযাত্রার পক্ষে কনখলে দক্ষের মহাদেবই প্রধান দর্শনীয়। দক্ষ-
প্রজাপতি শিবহীন বজ্রাহুতানে ব্রতী হইলে সতী কনখলের অপর অংশে

সতীহুত নামক স্থানে আসিয়া শিবনিষ্ঠা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করেন। তাহার ফলে যক্ষ পশু হইয়া দক্ষের ক্রুর হুগতি হয়, তাহা পুরাণ পাঠকমাজেই অবগত আছেন। অতঃপর দক্ষ প্রজাপতি জামাতার বধার্থ মহৎ উপলক্ষি করিয়া তাঁহার প্রতি অপব্যবহারজনিত ক্রটি খীকারবারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করেন। তাহারই ফলে এই শিবমন্দিরের উৎপত্তি। এই ত গেল ইহার শৈবত্বের কথা। আবার হরিবার নাম হইতে ইহা বিষ্ণুক্ষেত্র বলিয়াও উপলক্ষি হয়। অতএব এই প্রাচীন মায়াপুরীকে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর্ম্মেরই সম্মিলন-স্থল বলা যাইতে পারে। সুদূর মাজাজ প্রদেশস্থ অল্পতম ধাম কাকীমগরীতেও শৈব-বৈষ্ণবের এই শুভসম্মিলন দেখা যায়। সেই প্রাচীন নগরীর এক ভাগে জটাজুটবারী বিভূতিভূষিত শৈবগণ অধুষিত বিশাল একাত্মকাননেশ্বর মহাদেবের মন্দির, অল্প ভাগে শম্ভুক্ষেত্রপরিচিতিত তিলকবারী বৈষ্ণবগণপরিষেবিত সুউচ্চ বিষ্ণুমন্দির বিরাজিত। আর্য্য-সম্রাটবৃত্ত নাম্য সেনীর উপাসকগণের মধ্যে ক্যাথলিক প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ও শিখা সূরীর ভায়ই একটা ছায়া বিরোধ চলিয়া আসিতেছে কল্পনা করিয়া বাহারা আত্মতুষ্টি অহুতব করিয়া আসিতেছেন, একবার এ দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, তাঁহাদিগকে বীর বারবার লজ্জিত হইবে, সন্দেহ নাই। তবে অশিক্ষিত স্বার্থচেষ্টা সাম্প্রদায়িকগণের মধ্যে যে সে ভাব একেবারেই পরি-লক্ষিত হয় না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রের মর্ম্ম এই জাতীয় সাম্প্রদায়িকতা হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত। বাহাদিগের সামান্য মাত্র অন্ত-দৃষ্টি আছে তাঁহারা এ কথা বর্ণে বর্ণে উপলক্ষি করিতে সমর্থ হইবেন। এই স্থানে দৃষ্টান্ত-স্থলে ভারতের বহু-অংশব্যাপিনী পতিতপাবনী গঙ্গার কথাই আলোচনা করিয়া দেখুন। ভগবান্ বিষ্ণু হইতেই গঙ্গাদেবীর উৎপত্তি এবং কৃত্তবান শিবের জটাকলাপেই অবস্থিতি। ইহাতে গঙ্গা কেবল শৈব ও বৈষ্ণবগণের তীর্থ হইয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি গাণপত্য, সৌর, শাক্ত, সকলেরই সমান ভক্তিভাজন। হিন্দুধর্ম্মের এই সুন্দর সবধরের ভাবটুকুও বিচ্ছিন্ন সমালোচকগণের প্রণিবানযোগ্য।

আমরা দক্ষেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী ঘাটের সেতু পরিভ্রমণ করিয়া আর্য্য-সমাজ-প্রতিষ্ঠিত 'গুরুতুল' দেখিতে যাই। পথে আরও তিনটি সেতু পার হইয়া আমরা গুরুতুলের সন্ধান পাই। ইহাকে একটি ত্যাগীর গ্রাম বলিলেও অত্যাধিক হইবে না। আশ্রমে শিক্ষক ছাত্র সকলেই ত্যাগধর্ম্ম

সাদোপাত্র বেদাদি অধ্যাপনাধারমনিরত । প্রাচীন আদর্শের ব্রহ্মচর্যা-
পালনসম্বিত শিক্ষাপ্রণালীর গুরুকুল আর্থা-সমাজ-মতালম্বিগণের একটি
উজ্জল কীর্তি । তাহোরে দয়ানন্দ ঘাংলো-বৈদিক কলেজ ও অধ্যাত্ম স্থানের
ভগ্নায়ক স্কুলগুলি আর্থা-সমাজ কর্তৃক পরিচালিত হইলেও তাহারা পান্ডাতা
প্রণালীতে শিক্ষাপ্রবর্তনপ্রণালী । এইটুকুমাত্র গুরুকুলের সহিত তাহাদিগের
মতপার্থক্য । শুদিল্যম, গুরুকুলের পান্ডাতা শিক্ষাপদ্ধতির অসুখবর্তী বিস্তা-
লনও স্থানান্তরে আছে । উভয়ের মধ্যে সম্প্রদায়িক কোন ভেদ নাই ।
অথচ আমরা এতদিন আদি ও সাধারণ ব্রহ্মসমাজের মত উভয়ের মধ্যে
সম্প্রদায়গত খুনিটি লইয়া দলদলির ভাব আছে বলিয়াই একটা বগবড়া
বারণা লইয়া বসিয়া ছিলাম । অহুসঙ্কান করিয়া না দেখিলে লগতে এইরূপ
অনেক ভ্রান্ত ভাবই জন্মে পোষণ করিয়া যাইতে হয় । হরিষ্যারের অনতিদূরে
ওবিহুল নামক সনাতন মতালম্বিগণ-প্রতিষ্ঠিত আর একটি এই জাতীয় ব্রহ্মচারী
আশ্রম আছে । কিন্তু আমাদিগের সমস্যাভাবে শেটিরও কার্য প্রণালী দেখিয়া
উভয়ের তুলনামূলক জ্ঞান সঞ্চলনে সমর্থ হইতে পারি নাই বলিয়া আমরা
হুম্বিতাস্তঃকরণে হরিষ্যারে প্রত্যাবর্তন করি । একটি দোষ আমাদেব জাতি-
গত কেন মক্ষাপত । আমরা বাহিরের চাকটিকো নামডাকে একেবারে
ব্যাঘোহিত হইয়া পড়ি । ঘরে কি আছে না আছে একবার কিরিয়াও দেখি
না । এইজগৎই বোধ হয়, বাদ্ধালি জাতির উপর পান্ডাতা সত্যতা ও শিক্ষা
এত প্রত্যাব বিভায়ে সমর্থ হইয়াছে । আমরা আমাদিগের প্রাচীন উচ্চ
আদর্শগুলি হইতে ক্রমশঃ সরিয়া পড়িতেছি । এ দোষটি যে আমাদিগের জাতীয়
অযোগ্যতার লক্ষণ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । এই অধঃপতনের
প্রতীকারের উদ্দেশ্যেই বাদ্ধালী দাত্তী মাত্রেয়ই এই দুইটি আশ্রমেই শিক্ষা-
পদ্ধতি ভাল করিয়া দেখিয়া প্রাচীন আদর্শের সাহায্যে বর্তমান শিক্ষা-
প্রণালীটি একটু কালাইয়া লইবার লজ্জ সংকল্প পোষণ করিয়া বাহির হওয়া
উচিত ।

কিরিবার পথে গঙ্গাতীরবর্তী দান্ভোরার রাণীপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নিম্ন-
নৈশুলা ও অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহ বিক্ষুব্ধতির আরতি দর্শন করিয়া রাত্রিকালে আমরা
এক । নাবিক একরথবাহিত বানে আগ্রোহণ করিয়া হরিষ্যারে কিরিয়া আসি ।

পরদিন প্রাতঃকালে হরিষ্যারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া যে স্তম্ভের পথে
বান্দীয় ঘান ডেরাছন অভিযুখে প্রধাবিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া গঙ্গাতীরবর্তী

অদীর্ঘ চাতালে পরিক্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া দেখি, সন্নিগণ ঋষিকেশ ঘাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আমার অপেক্ষায়ই বসিয়া আছেন। হরিবারের পরই “ঋষিকেশ রোড্” নামক একটি ষ্টেশন আছে। তথা হইতে ঋষিকেশ প্রায় চারি ক্রোশ, সে স্থানে যানাদি সকল সময় পাওয়া যায় না—ঘাইলেও অন্ততঃ ব্যয়সাধ্য এবং টেনের সময়ও আমাদের ভাবন অস্বস্তিকর নহে। এই সমস্ত কারণে আমরা হরিবার হইতেই একা করিয়া ঋষিকেশ যাই। এই একা বিচক্রবিশিষ্ট অস্বাভাবিকতাই। পথ ক্রমশঃই উপরে উঠিয়াছে। “ঋষিকেশ রোড্” ষ্টেশন পর্যন্ত পথটি রাজকীয় বন-বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত, গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়াই গিয়াছে ও যানাদি গমনাগমনের সম্পূর্ণ উপযোগী; সুতরাং আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই। তাহার পর হইতেই “পাহাড় পথ” অভ্যন্তর করণ্য; কায়েই একার ঋকনিতে আমাদের শরীরগ্রহি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। পথে সত্যনারায়ণের মন্দির ও কালী-কখনীওয়ারার ছাত্রের তত্ত্বাবধানে স্থিত ধর্মশালাটি দেখিয়া তাহার মধ্যে পার্শ্বতা স্রোত রুদ্ধ করিয়া যে পুত্রগীতি প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নিত মন্দিরটি দেখিয়া অসুতসরের শিখ-তীর্থ ওরু দরবারের দৃষ্টি মনে পড়িল। তথা হইতে কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া পলিপাশেই যাতাজীর আশ্রম দেখলাম। ইনি একজন তপস্বিনী; নিজে একখানি পর্ণশালায় থাকেন। গৃহটির চারি দিকই খোলা; মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ ও কয়েকটি পিত্তল-মূর্তি রহিয়াছে। পাশেই দুই ও চিমটা। অনতিদূরে তিনটি প্রকাণ্ড ভগ্নকর স্তম্ভ (বোধ হয় ভোটানী কুন্ডর হইবে) শৃঙ্খলাবদ্ধ রহিয়াছে। রাজিকালে এই জঙ্গলে ইহারাই বোধ হয় আশ্রমটির রক্ষণাবেক্ষণ করে। পাশেই ইষ্টক-নির্মিত গৃহশ্রেণী। তাহাতে প্রচুর গোশন। বয়ঃপর্বকূটরে বাস ও লেবার এই আদর্শ ব্যবস্থা দর্শনে বিশেষ প্রীতি অনুভব করিয়া আমরা যাতাজীর অল্পবতি গ্রহণ পূর্বক প্রহ্মমোক্ষ হইলে আশ্রমবাসিনী অপর একটি মাছুর্ভি আমাদের কথাকে কথিত্ব জলপানের জন্য আহ্বান করেন। আমরা ঋষিকেশে প্রানাদি করিব বলিয়া বিনয়-বচনে তাহার আতিথ্য গ্রহণে অসামর্থ্য জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করি। আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনীগণের আতিথ্যের ধর্মের সহায়তা-দানজন্য বোধ হয় কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আশ্রমপাশে একটি বৃহৎ কুণ্ড খনন করাইয়া দিতেছেন। এইরূপ দানশৌভাগ্যের উদ্দেশ্যেই আমাদের ঋষিগণ “দাতা দাত্যং দিবজ্জু” এই আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ

বনমধ্যে এতাদৃশ তপোনিরত। যাতৃভূতির দর্শনলাভ বর্ষাৰ্ধই নৌভাগ্যের
বিষয় মনে করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, তবে যুক্তি প্রাচীন তপঃপ্রভাব এখনও
প্রভাবশালী নহে; আৰ্য্য আদৰ্শ আজও একেবারে বিলম্বপ্রাপ্ত হইয়া যায়
নাই ।

কিয়দূর অগ্রসর হইবার পর পথের উভয় পার্শ্বে এই “পাহাড়ো” দেখে
ধান-ক্ষেত্রের ছোট ছোট কেয়ারী দেখিয়া লজ্জামলা যাতৃভূতির সেই
হরিশ্চন্দ্রের সাদৃশ্যে এক অনির্জন্য আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম ।
নিঃসর্গপ্রেরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতোধারা সিক্ত ক্ষেত্র । এরূপ দৃশ্য যে কি সুন্দর
তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা কঠিন । আমরা এই জাতীয় নয়নাভিরাম দৃশ্যে
পুলকিত হইতে হইতে ক্রমশঃ ঔষিকেশের সমীপবর্তী হইলাম; দেখিলাম,
হঠাৎ একটা ভয়ানক “উতরাই” অর্থাৎ পথ একেবারে এরূপ ঢালু যে যান
উঠিয়া নামা দুরে থাকুক আরোহিণী বানধানিকে পক্ষাৎ হইতে বিপরীত
দিকে টানিয়া বরিয়া নামিলেই ঠিক হয় । এই ঢালু পথটি অতিক্রম
করিলেই ঔষিকেশের নৌপ্রশস্তি নয়নপথে পতিত হয় । এই স্থানে অনেকগুলি
“সত্র” বা বর্ষাশালা বিস্তারিত থাকিয়া বাজীনিগের সুখশোকার্থেই সহিত
প্রতিষ্ঠাতৃগণের অবিনশ্বর কীর্তি ঘোষিত করিতেছে । তদ্ব্যতীত পক্ষাণী সত্র ও
কালী কলীওয়ালা সত্রই বহুৎ । আমরা শ্বেতোকটিতেই প্রায় লই । কবিত
আছে, বাবা কালীকলীওয়ালা নামক জনৈক সাধু (যেহেতু বৃদ্ধ বর্ষের
কলম মাত্রই তাঁহার সখল ছিল বলিয়া তিনি এই আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন)
কলিকাতা প্রস্থতি নগরে উপস্থিত হইয়া “দুই কুটি”র লজ্জা ভিক্ষা করিয়া বেড়ান
এবং উহার সংস্থান না হওয়ায় কয়েক দিন হইতে অসুস্থ আছেন ক্রমশঃ
ইহাও প্রকাশ হয় । ইহাতে আচা্য দরিদ্র ব্যবসায়ী ব্যক্তি কঁঠার স্তম্ভ-
শাস্তির লজ্জা বহু ব্যয়সম্ভার লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, “দুই কুটি কেবল
আমার ঋণই আঁচি চাহি না, আশ্রমে যে কেহ আসিবে সকলেই অস্ত্রতঃ
দুইখানি কুটি পাইবে, আপনারা তাহারই সংস্থান করিয়া দিউন ।” ইহাতে
ক্রমশঃ চাঁদার দ্বারা অনেক টাকা উঠে এবং তাহারই ফলে এই বহুৎ ব্যাপারের
প্রতিষ্ঠা হয় । দেখিলাম, এখনও আগন্তুকগণ, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ যিনিই হউন
উপস্থিত হইলেই ভোজনোপযোগী কুটি ভাঙিল পাইয়া থাকেন । সন্ন্যাসীদিগের
লজ্জা নিত্য সদাক্রমেই ব্যবহৃত আছে । তাঁহারা উপস্থিত হইলেই ভোজন
পাইবেন । যে সকল বাজী সদাক্রমেই ভোজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক তাঁহাঙ্গিগের লজ্জা

বাঁশের ও বন্ধনের স্থান দেওয়া হয় ; ভোজননের ব্যবস্থা তাহার। নিজে করিয়া লইতে পারেন। এরূপ সুব্যবস্থিত জনবহুল প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা ও সার্বজনীন সদাশ্রিত আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যাত্রীগণের যানাদি থাকিবার স্থান, চালকবাহকের আবাহ্যের ব্যবস্থা, অধিক কি মেধবশুস্ত্র স্থানে তাহার কায চলাইয়া লইবার ক্ষমতা শূকরপাল প্রতিপালনরূপ নানা সুনিয়ম দেখিয়া আমরা বাবা কালীকথলীওয়ালো ও তাহার পৃষ্ঠপোষকগণকে আশ্বাসিত করার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। এইরূপ সাবিক দান ক্রমশঃ বিরল হইয়া পড়াতেই ভারতের দুর্গতির হুগ বনাইয়া আসিয়াছে। সচেষ্ট আতিথের বর্ধে ভারত তিরকালই লগতের মুহূর্ত্ত-মনি বলিয়া সর্জন্যতি কর্তৃক পুন্নিত ।

(ক্রমশঃ)

প্রজাপতির নির্বন্ধ ।

—:—:

(১)

বড় লোকের ঘরে হইলেও উমা দরিদ্র প্রতিবেশীর পুত্র স্ত্রীরের সহিত খেলিত। স্ত্রীরের মুখে হাসি না দেখিলে সে চকল হইয়া পড়িত, স্ত্রীরও বৈশিষ্ট্য তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। এই ভাবে উভয়ের মনে ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত হইতে চলিল। ঠিক সেই সময়ে এক দিন বৈষ্ণবনাথ গৃহিণী মোক্ষদাকে বলিলেন, “দেখ উমার এখন বিয়ে দেওয়ার বয়স হয়ে এল, আর এখন স্ত্রীরের সঙ্গে সদা সর্জন্য খেলা খুলা ভাল দেখায় না।”

মোক্ষদা একমাত্র কস্তার পক্ষ হইতে বলিলেন “ছেলেমানুষ, বিয়ে হ’লেও আর খেলতে পাবে না, পরের বাড়ী চল্লে যা’বে, তা এখন ছ’দিন খেলাখুলা করলেই বা !”

বৈষ্ণবনাথ বলিলেন “ঐত বড় গোল ! কথায় বলে, জীবুড়ি প্রলয়করী। আরে, এখন ছেলে ; কাল যে ছেলের মা হ’বে। এখন হ’তে যদি তা’কে সং

শিকা না দেওয়া যায়, তবে কালে যে সে আশ্বাদের মুখ হাসা'বে। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না, তুমি স্মৃতিরকে বলে দিও, সে যেন আর উমার সঙ্গে খেলতে না আসে। আরে গেল, বেটাছেলে বেটাছেলের সঙ্গে খেলবে; বেটারছেলের আবার বেয়ের সঙ্গে খেলা কি রকম!”

সেই হইতে স্মৃতিরের সহিত উমার অবাধ আলাপ বন্ধ; তবু উমা মাতাপিতার অজ্ঞাতসারে সোজা রাস্তা ছাড়িয়া বাঁকা রাস্তায় স্মৃতিরদের বাড়ীর পাশ দিয়া বেড়াইতে যাইত, আর বেড়াইবার ইচ্ছা না থাকিলেও স্মৃতির উমাদের বাড়ীর বাহিরের রাস্তায় সন্ধ্যাবেলা ও বৈকালে আহারের পূর্বে ও পরে, প্রতিদিন অনেকগুলি পর্য্যন্ত পায়চারি করিত।

বিরহবিধুর হৃদয় কণিক মিলনে অপ্রশস্তস্মৃতি স্রোতস্বিনীর স্রাব ভালবাসা-যন্ত্রার চাকলা তরকের উপর তরল তুলিয়া প্রবাহের উপর প্রবাহ চালিয়া দেয়, এক দণ্ডের কাষ এক পলকে সমাধা করিতে চাহে; বিরহ-মিশ্রিত মিলনের এইটুকুই শক্তি, বিচ্ছেদ-কালের এইটুকুই মাধুর্য।

বিরহবিধুর প্রকাণ্ড সারাদিনের কাষের মধ্যে মুহূর্তের মিলনের মধুময় ক্ষণের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, কত দুর্ভোগের মধ্যে একবার ক্ষণেকের দেখা দেখিয়া, উভয়ের ভালবাসা গাঢ়তর হইল; ক্রমে প্রণয়ের বীজ অঙ্কুরিত হইল। কিন্তু এ দিকে বৈজ্ঞান্য উভয়ের মধ্যেও পর্দা আরও এমনভাবে প্রস্তুত করিতে, লাগিলেন যেন তাহার মধ্য দিয়া কিছুতেই দৃষ্টি না চলে। উমা যাহাতে কোন উপায়ে বাহিরে যাইতে না পায় সে সম্বন্ধে তিনি যোদ্ধাকে যথোচিত উপদেশ দিলেন, নিজেরও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। আর বেচারী স্মৃতিরের দরিদ্র মাতা করুণাময়ী বৈজ্ঞান্যের কাছে মাঝে মাঝে এমন দুই একটি কথা শুনিতে লাগিলেন, যাহাতে স্মৃতিরের বাড়ীর বাহিরে যাওয়া একরূপ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

(২)

যে দিন বৈজ্ঞান্য যোদ্ধাকে বলিলেন “কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির এম, এ, পাশ করা ছেলের সহিত উমার বিবাহের সম্বন্ধ এক প্রকার স্থির,” সেই দিন উমা বুকিল, স্মৃতিরের সহিত এ সংসারে মিলন অসম্ভব। তাহার মনে হইল, “স্মৃতির কেন এম, এ, পাশ করে নাই?” পরীত্রাঘের বৈজ্ঞান্যের কলিকাতায় ভাবী কুটুম্বের কথা জাইয়া যখন গ্রামে একটা বৈঠক পড়িয়া গেল, তখন স্মৃতির বুকিল, ঋত্নোত্তের স্থান গাছের উপর,—তাহার উর্দ্ধে বসে; আর তাহার

আকাশেই ভুটিয়া থাকে । সে আরও সুকিল, সুকৃতি ব্যক্তি বহুবিধ উপায়ের আশা-
ধ্বংসের যত্নের ব্যবস্থানে থাকিবে, ততই তাহার স্বপ্নের অশান্তি বন্ধীভূত
হইবে ; তবে বেদনা থাকিলেও তীব্র আশা থাকে না ।

ক্রমে যখন নিজের বাড়ীখানি সুধীরের নিকট একটা কারাগারের মত
বোধ হইতে লাগিল, যখন ঘনের কথা আর সে চাপিয়া রাখিতে পারে না,
সেই সময়ে বৃদ্ধা মাতাকে পর্যন্ত না বলিয়া একদিন গোপনে সে কোথায়
চলিয়া গেল ।

বোকপন্নস্বরায় সুধীরের আত্মগোপনের কথা উমার কাণে যখন উঠিল
তখন সে যেহুই আশা এখনও স্বপ্নে রাখিয়াছিল, একটি শীর্ণ-নিম্নালের সহিত
তাহাতেও জলাঞ্জলি দিতে বলিল । তবু তাহার মন বুকিতে চাহে না ; সকালে,
সন্ধ্যায়, রাজিতে কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল, “যে বাহা চাহে সে কেন
তাহা পাইবে না ?”

(৩)

অনেক দূর সুধীরা সুধীরা সুধীর যখন কলিকাতায় পৌছিল, তখন সন্ধ্যায়
ছায়া বনাইয়া আনিয়াছিল । লোকজনের কোলাহল, ঘোড়ার গাড়ীর ঘর্ঘর
শব্দ, ঘুরে কোন পোতভরী অট্টালিকার পবাকপথ হইতে সঙ্গীত লহরী বাতাসে
বিসিদ্ধা বাইতেছিল । একে একে পথ, বোকান, বাড়ী সকল ছান বীণ
আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; কিন্তু সুধীরের মনে অন্ধকার ধ্রুবে
জন্মট রাখিতে লাগিল । আগ্রহের পক্ষে পল্লীগ্রামগুলি অভিব্যক্তির ক্ষমতা
যেমন দূর উন্নত রাখে, কোন সহরে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না । সহরে
লুপ্তিকার বিস্তারে সৌজন্য স্থানে স্থানে ছড়ান থাকে সত্য ; কিন্তু সেই
সৌজন্য কোথায় তাহা খুঁজিয়া লওয়া সুধীরের মত একজন আবাল্য পল্লী-
পালিত অপরিচিতের পক্ষে বড়ই কঠিন । সুপ্রশস্ত রাজপথে—মস্তুর দৃষ্টি
চলে—জনশ্রোত, তাহার মাকে সুধীর এক জন । কত লোক পরস্পর হাত
গলাবরি করিয়া হাসিরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে পথ বাড়িয়া চলিয়াছে, আর
সুধীর একদৃষ্টে তাহাই দেখিয়া দেখিয়া চলিতে লাগিল । এত লোকের কেহই
তাহার সহিত আলাপ করে না, সকলেই তাহার অপরিচিত !

একটি বড় বাড়ীর বাহিরের বারান্দায় কয়েক ব্যক্তি বসিয়া কথাবার্তা
কহিতেছিলেন । সুধীর তাহাদের নিকটে ধীরপদে উপস্থিত হইয়াবামু একজন
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দরকার ?”

স্বর্গীর নরভাবে বলিল, “আমার বাড়ী এখান হইতে বহু দূরে। আপনারা যদি দয়া করে আমাকে কোন কাৰ্য কর্ত্ত্ব দিবে প্রতিপালন করেন সেই আশায় এসেছি।”

উত্তর হইল,—“বাণু হে, আজকাল চাকুরীর বাজার বড় চড়া, আর—বিশেষতঃ—সম্প্রতি আমার কোন লোকের দরকার নাই।”

স্বর্গীর বলিল,—“তবে দয়া করে আমাকে রাতিটুকু এখানে থাকিতে দিন।”

“সে কি হয়, বাণু, কে জানে ভূমি জুয়াচোর কি না?”

“জুয়াচোর! না, আমি জুয়াচোর নই।” বলিতে বলিতে স্বর্গীর কাঁদিয়া ফেলিল। বিনয়ের কাহ্না ‘নর’কে ‘হর’ করিতে পারে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। আবেশ হইল, “আচ্ছা, রাতটা এখানে থাকতে পার।”

সুসজ্জিত কক্ষের ভিতরে সকলে প্রবেশ করিয়া স্বর্গীরকে ডাকিলেন। সে গৃহসজ্জা দেখিয়া অবাক হইল। যেহেতু কার্পেটে ঘোড়া; ঘরে নানা রকমের চেয়ার টেবল; প্রাচীরে নানা রকম চিত্র স্থান; ঘরে ঘরে আলুবাড়ী; তাহার ভিতরে নানারকমের জিনিষ। সে সকল জিনিষ সে কখন দেখে নাই, সে সকলের নাম সে জানে না, তাহাদের উদ্দেশ্যই বা কেমন করিয়া বুঝিবে? তাহার মনে হইল—লেটা বোম্ব হয় মণিহাত্রীর দোকান। আবার ঘরন বাবুর দল এক একখানি চেয়ার লুণ্ঠন করিয়া বসিলেন, তখন তাহাদের ঘণ্টা কে গৃহস্বামী তাহাও স্থির করা কতদূর কঠিন তাহা স্বর্গীর ভালরূপ বুঝিল। তবু সে মনে মনে ঠিক করিল, যিনি প্রথমে তাহার সহিত কথা কহিয়াছিলেন ও যিনি পরের ঘণ্টা চুকিবার লক্ষ তাহাকে ডাকিয়াছিলেন তিনিই কর্ত্ত্বা; তিনি কর্ত্ত্বা হউন বা না হউন, তাহার মনোরঞ্জনই এ ক্ষেত্রে প্রথম। বাস্তবিক তিনিই গৃহস্বামী; নাম—বিদ্যাপতি; অস্তিত্ব সকলে তাহার বন্ধু—সাহা-নিবাসে উপস্থিত।

একজন স্বর্গীরকে একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলিলেন। “আজ্ঞে না, আমি এইখানে বসি” বলিয়া স্বর্গীর বেজের উপর বসিয়া পড়িল। যে স্থানে সে ভিক্ষুক সে স্থানে ভিক্ষুকের উপযুক্ত আসনই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

কিছুকাল পরে অস্তিত্ব সকলে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন, ঘরের ভিতরে রাখিলেন বিদ্যাপতি; আর রহিল স্বর্গীর।

(৪)

টানিয়া টানিয়া যখন আলবোলায় নল দিয়া আর ধূম নির্গত হয় না, তখন তৃত্যকে দ্বিতীয় কণিকা প্রসৃত করিবার আদেশ দিয়া বিভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি ?”

সুবীর নিজের নাম গোপন করিয়া উত্তর দিল, “সুরেশ ।”

বিভাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাড়ী কোথায় ?”

“বর্ত্তমান জিলায় ।”

“তোমার আর কে আছে ?”

“মা ছাড়া আর আমার কেহ নাই ।

“তুমি কত ধূম পড়ে ছিলে ? কি কায কর্ত্তে পার ?”

“জ্ঞান্ধে, আমি এষ্ট্রাল ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছি, টেটে পাস্ করছিলাম ; কিন্তু মাঝিল কর্ত্তে পারি নাই বলে পরীক্ষা দিতে পাই নাই ।”

কলিকাবিহীন আলবোলায় নল এক একবার টানিতে টানিতে বিভাপতি বলিলেন, “তবেই ত বাপু, এই কল্‌কাত্তার বাজারে তোমার কাযকৰ্ম্ম পাওয়া খুব কঠিন দেখছি । এখানে কত এল, এ, বি, এ, ছোকরা গড়াগড়ি যাচ্ছে । ৭১ দিন আমার কাছে পনের টাকা মাইনের বাজার-সরকারী কাযের অন্ত একটি বি, এ, কেল' ছেলে এসেছিল ; তাঁর সঙ্গে আমার ষান দশ বার প্রশংসাপত্র ।”

সুবীর বলিল, “জ্ঞান্ধে দু'মুঠো খেতে দিয়ে কেউ এই গরীবকে প্রতিপালন করবেন না ?”

বিভাপতি মাথা দোলাইয়া বলিতে লাগিলেন, ‘বি—না—বেতনে । তা' অবজ্ঞাই একটা বিবেচনার কথা বটে । তবে, বাপু, কথা কি জান, এই কল্‌কাত্তার মত স্থানে একটা লোকের পেটেও ঢের লাগে । তা' যদি তুমি অন্ত কোথাও যা'বে না এই সৰ্ত্তে অন্ততঃ এক বৎসরের অন্ত এগ্রিমেণ্ট লিখে দিতে পার, তবে না হয় আমি তোমার একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে পারি । আর দেখ, এই সহরে প্রলোভনের অভাব নেই, কাল তোমাকে একজন বল্বে দশ টাকা বেতন পা'বে, অমনই তুমি এখান হ'তে চলে যা'বে, সেটা কিন্তু হ'বে না । বুঝে দেখ, যদি তোমার মনে কিছু গোল থাকে তবে এই রাজিতেই অন্ত্র ঘেতে পার । আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই ।”

সুবীর বলিল, “আমি আপনাত্ত আশ্রিত, আপনি যা' কর্ত্তে বলবেন তাই করব, কোথাও যা'ব না, কারও কথা শুন্ব না ।”

বিজ্ঞাপতি বলিলেন, “তবে তোমার নিশ্চই উন্নতি হবে। আমি বৃহৎ পেরেছি, তুমি অতি সজ্ঞিত। কিন্তু দেখো, বাপু, কথা যেন নড়চড় না হয়।”

স্বধীর বলিল, “যে আজ্ঞে।”

“আজ্ঞা সকালে তোমার কাগজ ব্যবস্থা করে দেব। এখন রাত্রি হয়েছে; তুমি বাৎসরিক পত্রের উপর শোও যে, গরমের সময় বোধ হয় কোন কষ্ট হবে না; আর কষ্ট বয়েই বা বিশেষে চলে কেমন করে? কাল সকালে তোমার খাবার থাকবার ব্যবস্থা ঠিক করে দেব।” বলিতে বলিতে বিজ্ঞাপতি অন্দরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য আনিয়া ভিতর হইতে ঘরের দ্বার জানামাতনি বন্ধ করিয়া দিল। আর স্বধীর বাহিরের বেকের উপর হইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। সে রাত্রিতে তাহার নিদ্রা হইয়াছিল কি না সে-ই জানে।

(৫)

কেমন করিয়া পরের ঘরের লম্বীকে নিজের ঘরে টানিয়া আনিতে হয় এ বিজ্ঞা বালাকাল হইতে শিখিয়া বিজ্ঞাপতি নিজের অবস্থা বেশ উন্নত করিয়াছিলেন। মাতৃপিতৃহীন বিজ্ঞাপতি যৌবনে এক ধনবতী চরিত্রহীনার স্নানঘরে পড়েন, সেই হইতে তাহার সৌভাগ্যের সূচনা। সেই চন্দ্রাবতীর উপদেশমুখাপানের ফলে বিজ্ঞাপতির বিজ্ঞা মার্জিত ও বুদ্ধি সূত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর সেই বিজ্ঞাবুদ্ধির কার্যফলে এখন বিজ্ঞাপতির মণিকন্তায় ত্রিভুজ বাড়ী আর লক্ষ টাকার তেজস্বী কারবার।

স্বধীর পক্ষীর বৈজ্ঞানিক মাছি হইয়া উড়িতে উড়িতে এই বিজ্ঞাপতি মাকড়শার জালে পড়িয়াছিলেন। তাহার কোন গুণবান পায়ে উমাকে দান করিয়া কলিকাতার কোন বনচা বাগের সহিত কুটুন্ডিত করিবার সাধ যেমন চরমুখে বিজ্ঞাপতির কাণে পৌছিল, অমনই তিনি এক এম, এ. পাস্ হেলে কল্পনা করিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক সংবাদ দিলেন, “হাজার টাকার এম, এ পাস্ হেলে। আমার ভবিষ্যৎ উন্নয়নবিকারী।” বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যৎ ছিলেন, পূর্ণ-জন্মের বহু স্মৃতিফলে উচ্চশিক্ষিত পাণ্ডা ছুটিয়া থাকে। আর এ বিষয় চিন্তা করিবার সময়ে তাহার দক্ষিণ চক্ষু নাকি স্পন্দিত হইয়াছিল, সুতরাং অপরূপ বৈজ্ঞানিক একমাত্র কস্তার স্মৃতির জন্য যশোলাভের আশায় তৎক্ষণাৎ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

তাহার পর হঠাৎ এক দিন বিজ্ঞাপতির হুই জন বন্ধু বিবাহের সন্ধ্যা লইয়া

বৈশ্বনাথের আতিথ্য স্বীকার করেন। বৈশ্বনাথ পাত্রী দেখাইতে চাহিলে উক্ত বন্ধুদ্বয় বলেন “আমরা চাহি ভাল বেশ। আর কিছু চাহি না। তাই আমরা পাত্রী দেখতে চাহি না, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আমাদের সঙ্গে গিয়ে পাত্র দেখে আসতে পারেন।” আরও বলেন, “যশা, আপনি নাকি সে রকম সঙ্গতিপন্ন ন’ন তাই দয়া ক’রে পাত্রবর্তী এ বিবাহে এত অল্পে স্বীকার করেছেন। যদি পাত্র দেখানেনি ক’ন্তে বা’ন তা’ হ’লে বোধ হয় সৰ্ব্বটাই টিক্বে না।”

এ অবস্থায় বৈশ্বনাথ বাধ্য হইয়া পাত্র দেখিতে নিরন্ত হইলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ ছিলেন না, তাই সৰ্ব্ব পাকাপাকি করিবার জন্য উক্ত ভ্রাতৃলোকদ্বয়ের সঙ্গে পাত্রবর্তী বিভাগপতির বাড়ীঘর আর সুবিধা হইলে একবার পাত্রকেও দেখিয়া হাজার টাকার তোড়া বিভাগপতির ঐচরণে অর্পিত করিতে কলিকাতায় গায়েন।

বিভাগপতি যখন বাগেশ্বার দাঁড়াইয়া দুই ধারের বস্তুর দৃষ্টি যায় বাড়ীগুলি নিকট বলিয়া পরিচয় দেন, আর কলেজ প্রত্যাপ্ত রাস্তার কোন স্থানর সুন্দর ছাত্রকে দেখাইয়া বলেন, “দেখুন, এটি আপনার জামাই হ’বে।” তখন বৈশ্বনাথ সেই ছাত্রের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি সংযত করিতে পারেন নাই। তাহাকে দেখিয়া একখানা সাদা কাগজে বসি দইয়া তিনি হাজার টাকা এই বিভাগের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।

তাহার পর ছয়মাস গিয়াছে, কিন্তু এখনও বিবাহের দিন স্থির হয় নাই। বৈশ্বনাথ দিন স্থির করিবার জন্য পাত্র জিদ করিলে বিভাগপতি লিখিতেন, “যশাশ্রম, উতলা হইবেন না। আমি জুয়াচোর নহি। সুবিধামত দিন ঠিক করিতে হইবে। যদি আপনি বেশী রকম ব্যস্ত হইয়া পড়েন তবে আপনার টাকা ফেরত লইয়া অন্তত পাত্রের চেঁচা দেখুন।” এখন পাত্র পাঁচ সাতখানি লিখালিখি হইয়াছিল।

(৬)

সুখীর প্রায় তিন মাস বিভাগপতির বাড়ীতে আছে। তাহার আহার বা বাসস্থানের কোন কষ্ট নাই। কায়েত মধ্যে প্রতিদিন প্রাতে একজন চাকর সঙ্গে লইয়া বাজার করা আর অপরদিকে বিভাগপতির তৈয়ারতি খাতার টাকা আনা পাইয়ের যোগ দেওয়া। আর সে বিভাগপতির সৰ্ব্বদে কোন কথা জানে না বা জানিবার চেষ্টা করে না।

যেহ এমন জিনিষ যে তাহাতে কুটিলতা, বার্ষপনতা, হিংসা, ঘেণ কিছুই দাপ লাগে না। শুণ এমন জিনিষ যে, শুণের শুণে মাহুদ মাহুদকে মনঃপ্রাণ বিলাইয়া ভালবাসিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে। কার্য্যে একাত্মতা, স্বভাবে ধন্য, ব্যবহারে সরলতা দেখিয়া বিভাপতি সুধীরকে বেহতরা দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। বিভাপতির আদরের মধ্যে ভূমিয়াও সুধীর এক দিনের অল্প ভুলিল না যে, সে আশ্রিত আর বিভাপতি তাহার প্রতি-পালক। এই ভাবে দিনের পর দিন চলিতে লাগিল।

এক দিন বিভাপতি সুধীরকে বলিলেন, “তোমার কাছে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন হ’তে তোমার অতাব মত যে টাকাকড়ির দরকার হ’বে তা চাইলেই পা’বে।”

সুধীর উত্তর দিল, “বাবু, আমার যে শুণ তা’র পক্ষে আপনার যা’ বাচ্ছি তাই যথেষ্ট; এর উপর আর টাকা কড়ির দাবী করুতে পারি না।”

সুধীরের কথা শুনিয়া ক্ষণকালের অল্প বিভাপতি ভবিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, যে অর্বের অল্প সারাজীবন ধরিয়া তিনি কত অসং উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, একটা ক্ষুদ্র বালক কিনা সুখের একটা কথাই সেই অর্ব প্রত্যাখ্যান করিতে পারে! সুধীর কি মহৎ! তিনি কি ক্ষুদ্র। চিন্তার সহিত সুধীরের প্রতি ঘেহ তাঁহার ক্ষম্যে শত শুণে বর্দ্ধিত হইল। বিভাপতি আবার বলিলেন, “টাকাকড়িতে তোমার কিছু প্রয়োজন না থাকতে পারে; কিন্তু আমি আগেই শুনেছি তোমাদের অবস্থা ভাল নয়, বাড়ীতে তোমার মা আছেন, তাঁ’র টাকার দরকার।”

সুধীর বলিল, “বাবু, মায়ের টাকার দরকার সত্য; কিন্তু যে বা আমার মত একটা হতভাগাকে পর্ডে ধারণ করেছেন, তিনি কেমন করে সম্মানের উপার্জন ভোগের আশা করুতে পারেন?”

বিভাপতি বলিলেন, “আচ্ছা, তোমার বাড়ীর ঠিকানাটা আমার লিখে দাও। আর তোমার মা’কে চিঠি লেখ যে, আমি আমার এখানে আছি, ফোন কষ্ট নাই। তাঁ’কে যা’ কিছু সাহায্য করবার আমি করব।”

সুধীর দীরভাবে বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া দিল।

(৭)

সুধীরের নিরুদ্দেশের পর করুণাময়ী কাদিয়া কাদিয়া দিন কাটাইতেন। যে ছই চারি বিঘা জমী ছিল ভাগীদাররা আর তাহার ভাগ দেয় না, বর বাড়ী

সংসার অভাবে জীর্ণ। লোক নাই, অর্থ নাই। স্বপ্ন—দুঃখের দারুণ জ্বালা, আর কার্য—দিবাবাত্রি ক্রন্দন। দুঃখের এমনই বাহ্যিক যে সে একা আইসে না, দুই একটা সঙ্গী না লইলে ভাল আসর জমে না। অনিরমিত আহারনিগ্রহ করুণাময়ী জ্বরে পড়িলেন। দুঃখীর জন্ত কে কাদিবে? কে দুঃখীকে দেখিতে গিয়া চিকিৎসার ভার লইবে? কে তাহার জন্ত পথের ব্যবস্থা করিতে বলিবে? করুণাময়ী রোগ-যন্ত্রণার ছট্-ফট্ করিতেছেন, মুখে একটু জল দিবার লোক নাই; কিন্তু চক্ষুর জল সমানভাবে করিতেছিল।

বৈকালে ডাকপিয়ন করুণাময়ীর ঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিল, “কে আছে গো?” বাহার সৌভাগ্য খুব তাহার বাড়ীতেই ডাকপিয়ন বাতারাৎ করে। ডাকপিয়নের কাণ লোককে টাকা আর চিঠি দেওয়া। টাকার বখেই উপকার হয়, আর বাহার পত্র আইসে জানিতে হইবে, তাহার দুই একজন আত্মীয় বন্ধ থাকে। খুব সম্ভব। ডাকপিয়নকে দেখিয়া পাড়ার বহুদের গিহি রামমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি গো! স্বরকার কি? সুবীরের মাগের জ্বর হয়েছে?”

পিয়ন বলিল, “টাকা আছে, আর একখানা চিঠিও আছে।”

টাকা! করুণাময়ীর নামে চিঠির উপর টাকা! কে পাঠাইল জানিবার জন্ত রামমণি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, পিয়নকে তাহার অনুগ্রহন করিতে বলিয়া করুণাময়ীকে ডাকিলেন, “বিহি! কেমন আছে? আসতে আর পাই না, ছেলেপিলে নিয়ে সারাদিনই কাছ কর্ছ। তোমার নামে তাকে টাকা এসেছে—নাও।”

করুণাময়ী করুণবরে বলিলেন, “টাকা!—আমার নামে! যদি তোমরা কেউ আমার সুবীরের খবর বলতে পার ত বল। আমার আর কেউ নাই।”

পিয়ন বলিল, “চিঠিও একখানা আছে।”

করুণাময়ী পূর্ণাপেক্ষা কিছু উত্তেজিত হুয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার চিঠি? পড়।”

পিয়ন নিজে পত্র খুলিয়া অনেকক্ষণ হরিয়া বাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, “চিঠি দেখছি সুবীরের, সে এখন কলকাতার বিতেশ্বর বাবুর বাড়ীতে আছে; আর এই পঁচিশ টাকা কে পাঠিয়েছে, নামটা ভাল, এঁা—এত জড়ান যে পড়বার ঘো নাই।”

কেন যের অন্ধকারে চপলালোক চমকিত হইল। করুণাময়ী আর কিছু

বলিতে পারিলেন না। স্বামিণি স্ত্রীর অশেষ প্রশংসাবাদ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন, আর পিতন তাহার পারিশ্রমিক চারি আনা ও একটি টিপ সহি লইয়া, নগর পৌনে পঁচিশ টাকা ও পত্রখানি করুণাময়ীকে দিয়া চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে স্বামিণি প্রতিদিন করুণাময়ীর বোঁজ-খবর লইতে লাগিলেন। কথাটা কিন্তু একে একে বৈজ্ঞান্যের কাণে গেল। বৈজ্ঞান্য এত দিনে স্থির করিলেন, স্ত্রীর নিশ্চয়ই উমার বিবাকে বাধা দিয়াছে, মহিলে টাকা লইয়া ছয় মাস ঘরিতা বিভাগতি বিবাহের দিন স্থির করেন না কেন? বিবাহ তদ হইলেও ততটা দুঃখের বিষয় হইত না; কিন্তু হাজার টাকার মায়া সঞ্চরণ কর। বৈজ্ঞান্যের পক্ষে বড়ই কষ্টিন। এত দিনে বৈজ্ঞান্য করুণাময়ীর উপর অত্যাচার করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। প্রাণের প্রাণ ব্যক্তি বলিয়া বৈজ্ঞান্যের উদ্ভেজনার সাধারণের অমত থাকিলেও স্ত্রীর ও স্ত্রীরের না একবরে হইলেন। স্ত্রীরের সম্বন্ধে অববা দুঃখা কীৰ্ত্তিত হইয়া বৈজ্ঞান্যের কাছে এক পত্র গেল।

(৮)

বিভাগতি বৈজ্ঞান্যের পত্র পাইয়া স্ত্রীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি স্ত্রীর?”

স্ত্রীর অপরাধীর সুরে উত্তর দিল, “আজ্ঞে—হাঁ।”

বিভাগতি বলিলেন, “নাম গোপন করেছিলে কেন?”

স্ত্রীর বলিল, “আজ্ঞে আমার এই নাম গোপনের উদ্দেশ্য কাহারও সঙ্গে প্রত্যয়না নয়, আমি যা’কে না বলে বাড়ী হ’তে চলে এনেছি, ইচ্ছা ছিল যেত দিন বাঁচ’ব গোপনে গোপনে জীবন কাটা’ব, কিন্তু—”

বিভাগতি স্ত্রীরের কথার বাধা দিয়া বলিলেন, “বৈজ্ঞান্যকে চেন? তিনি তোমার সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন।”

“আমি তাঁ’র কোন অনিষ্ট করি নাই। বৃহৎ না পেয়ে তাঁ’র ঘরের সঙ্গে বেগুতে যেতাম। শেষে যখন তিনি নিবেদন করলেন, আর যেতাম না।”

“বাপু! আমার কাছে কথা লুকিও না। ভিতরে কোন কথা না থাকলে এক জন এক জনের বিরুদ্ধে এমন করে লিখতে পারে না। তবে তুমি কেন, আমার দ্বারা তোমার ভাল বই মল হ’বে না।”

“মা’র একখানা চিঠি পেয়েছি। তিনি লিখেছেন যে, বৈজ্ঞান্য কোমার

তা'র মেয়ের সখ্য করছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত দিন স্থির হয় নাই। তা'র শারণ্য আমি নিশ্চয়ই পাক দিয়েছি। তিনি আমাধিকে একঘরে করেছেন, ভাগীদারদিগকে ফসলের ভাগ দিতে নিবেধ করেছেন, এর পর আর যে কি করবেন তা' তিনিই জানেন।"

স্ববীর একটি বীর্ঘ নিখাস ছাড়িয়া চুপ করিল। বিদ্যাপতি কিছুকণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বৈদ্যনাথের মেয়েকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

"আপত্তি না থাকলেও আমি ঠিক জানি, তিনি আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কখনই দিবেন না।"

"আপত্তির মধ্যে এক দেখছি পাল্টা বর বটে কি না এইটে দেখা, তা' আমি দেখছি, দুই বরই সমশ্রেণীর। যা'ক, আমি যদি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি তবে ত তোমার কোন আপত্তি হ'বে না? আর তোমার মা'র মত লওয়ার তার আমার। আরও দেখ, আমার ছেলেলিগে নাই, তোমাকে ছেলের মত দেখি, ভবিষ্যতে তুমি মা'তে কষ্ট না পাও, তা'র ব্যবস্থা আমি ঠিক করে দিয়ে যা'ব।"

"আপনি মা' ভাল বুঝবেন, তাই করুন"—বলিয়া স্ববীর উঠিয়া গেল। বিদ্যাপতিক এ সম্বন্ধে অস্বস্তি করা দূরে থাকুক, এ জন্ত সে বিশেষ দুঃখিত হইল। বিদ্যাপতি বৈদ্যনাথের পত্রখানি নাড়াচাড়া করিয়া আপনমনে বলিতে লাগিলেন, "যখন টাকাটা হাত করেছি, তখন বিয়ে ত একটা দিতেই হ'বে। স্ববীর ছেলেটিও বেশ—দেখলেই যায়। জীবনে ত অনেক রকমের অনেক কাজ করে ডের টাকা বোজগার করলাম। যখন খানিক এগিয়েছি তখন বিদ্যাপতির বিদ্যার নোড়টা একবার বৈদ্যনাথকে দেখিয়ে দিয়ে এ সব কায একদম বন্ধ করাই ভাল।"

(৯)

এত দিনের পরে বিদ্যাপতির নিকট হইতে বিবাহের দিন-স্থির-পত্র পাইয়া বৈদ্যনাথ ভাবিতে বসিয়াছেন। পত্রে লিখা আছে—“কলিকাতা হইতে একটা পাড়াগায়ে বিবাহ দিতে যাওয়া কলিকাতাবাসীর পক্ষে কম অগৌরবের বিষয় নহে, তবু যখন কথা দিয়াছি, তখন কেমন করিয়া পিছাইয়া আসি! যাউক, এখনকার পণ্ডিতদের সহিত পরামর্শ করিয়া আগামী ১৫ই শ্রাবণ বিবাহের দিন স্থির করা হইল। আপনি ঐ তারিখের পূর্বদিন পাড়ী

সমস্তবিদ্যাহারে কলিকাতার আসিয়া উপস্থিত হইবেন । নাপিত ও পুরোহিত ব্যতীত সৰ্বে অন্য কোন লোক লইয়া আসা বাহুল্য বোধ করি । বাবা-জীবনের এখন পরীক্ষার সময়, কায়েই কলিকাতা ছাড়িয়া এক দিনের জন্য কোথাও যাওয়া মুক্তিপক্ষত মনে করি না ।”

অনেকক্ষণ চিন্তার পরে বৈদ্যনাথ কলিকাতার গিয়া বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন । শুভ যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল,—দিন অতি নিকটে ।

বিবাহের পূৰ্ব্বদিন বৈদ্যনাথ নাপিতপুরোহিতের সহিত উমাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার পৌছিয়া একটি ছোট বাসা ভাড়া করিলেন ; তাহার পরে বিদ্যাপত্তির সহিত দেখা করিতে গেলেন । বিদ্যাপত্তি সমস্তই অস্তিত্ববাদন করিয়া তাঁহাকে বলিতে বলিলেন । তিনি প্রত্যুত্তিবাদন করিয়া বলিলেন । ভাষ্যক টানিতে টানিতে বৈদ্যনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার এখানে আশ্রমের গাঁয়ের একটা বৃক্ষ ছোকরা—‘স্বধরে’ ছিল না ?”

বিদ্যাপত্তি বলিলেন, “হ্যাঁ, ছিল ।”

বৈদ্যনাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন সে কোথায় ?”

বিদ্যাপত্তি উত্তর দিলেন, “কোথায় জানি না ।”

বিদ্যাপত্তি পূৰ্ব্বেরই শ্রবীরকে লুকাইয়া থাকিবার জ্ঞাত বলিয়াছিলেন । বৈদ্যনাথ একতরপ নিশ্চিত হইয়া পাত্র আশীর্বাদ করিতে চাহিলেন । বিদ্যাপত্তি বলিলেন, “মশায়, আশীর্বাদেটাশীর্বাদ বিয়ের সময় হ’বে, আপনাদের পাড়ারগাঁয়ের ঐ একটা মন্ত কুসংস্কার ।”

এই কথা বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন । বিদ্যাপত্তির কথা কয়টিতে আর সেই হাসিটুকুতে বৈদ্যনাথের কুসংস্কার ছর হইল । গোবুলি লগ্নে বিবাহের জ্ঞান স্থির করা হইল ।

(১০)

বৈদ্যনাথের কলিকাতার বাসার উভয় পক্ষের নাপিত-পুরোহিত, বৈদ্যনাথ, বিদ্যাপত্তি, বিদ্যাপত্তির চারি পাঁচ জন বন্ধু, এই কয়েকজন লইয়া বিবাহ-সভা গঠিত হইল । বাহিরের অল্প কোন লোকের তাহাতে নিমন্ত্রণ হয় নাই ।

লগ্ন উপস্থিত, কিন্তু ভজনও পাত্রের দেখা নাই । বৈদ্যনাথ বিদ্যাপত্তিকে বলিলেন, “বেহাই মশায়, পাত্র আনতে পাঠান, লগ্ন ভয় করে কি হবে ?”

বিদ্যাপত্তি বন্ধু হস্তিটাদকে বলিলেন, “ভায়া, তবে বাবাজীকে নিয়ে এস ।”

হরিচাঁদ পাত্র আনিতে ছুটিলেন। অনেকক্ষণ পরে পাত্রকে বাহিরে বোড়ার গাড়ীতে রাখিয়া হরিচাঁদ বেগে গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বলিলেন, “যেখানে বিবাহ হ’বে সেখানে হ’তে আলো লগাইয়া নিব। বাবাণী গোথে চশমা দেন, আলোর ছটা চশমার ভিতর দিয়ে গোথে লাগলে কষ্ট হ’বে।”

বিদ্যাপতি বলিলেন, “সে ত ঠিক কথা।”

আলো লগান হইল। পাত্র আসিয়া আসনে বসিল। পাত্রের মাথায় বাউরি চুল, গোথে চশমা। বৃহৎ আলোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না, শুধু বৈষ্ণবনাথ মনে মনে বলিলেন, “এম, এ, পাস্ হেলেন, আবার বড় সৌভাগ্য।”

সেই ক্ষুদ্র বাসার একটি কুঠরীতে বাসর হইয়াছিল। যদি পাত্রপাত্রী তিন্ন অস্ত্র লোক জন্মিয়া হাশির রোল না উঠাইলে “বাসর” নাম না সাধে, তবে না হয় উমার বাসরকে “বাসর” না-ই বলিলাম।

ঘরের ভিতরে বিছানার এক পার্শ্বে উমা ঘরার মত পড়িয়া ছিল। সুবীর ডাকিল, “উমা !” উমা নিশ্চল, নির্ঝল্। সুবীর তাহার হাত টানিয়া লইয়া বলিল, “উমা, আমি সুবীর, তুমি কি এ বিবাহে অস্বীকৃতি দিবে ?”

উমা চমকিতভাবে উঠিয়া বসিল, হির বৃত্তিতে কিছুক্ষণ সুবীরের দিকে চাহিয়া আবেগতরে বলিল, “তুমি !”

সে আর কিছু বলিতে পারিল না। সেজারের একটি টুং শব্দের মধ্যে যেমন সাতটি তারের সাতটি বিভিন্ন শব্দ একত্র সমাবিষ্ট হয়, সেই রকম “তুমি” কথাটির মধ্যে—মনের মাহুতকে স্বপ্নের ভিতরে পাইয়া প্রাণে যত কথা যত ভাব উজ্জ্বলিত হয়—সব ছিল। সে বাহা চাহে তাহাই পাইয়াছে, তাহার আর কি বলিবার আছে ? তবে তাহার প্রার্থনা যেন এই সুহৃদের মত তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন এই ভাবে যায়। সেটা কিন্তু তাহার মনের কথা। বাহিরে তাহার বলিবার কিছুই না।

পরদিন সকালে মদন নাপিত বৈষ্ণবনাথের কাণে কাণে বলিল, “জামাই বেগুতে ঠিক আমাদের গাঁয়ের সুবীরের মত। যোগ হয় সেই সুবীর।”

পদে কাঁটা বিবিলে যেমন পাত্র শিহরিয়া উঠে, বৈষ্ণবনাথ ঠিক সেইরূপ অসুস্থত্ব করিয়া বলিলেন, “সে কিরে, মদন।”

মদন বলিল, “ডেকে আনি, একবার জামাই দেখুন।”

বৈষ্ণবনাথ বলিলেন, “আচ্ছা, এ দিকে ডাক।”

মদন সুবীরকে ডাকিয়া আনিয়া, তাহাকে যে চিনিতে পারিয়াছে এ ভাব

জানাইল না। সূর্যের বৈজ্ঞান্যের সমুদ্রে আসিয়া আত্মনিমিত্ত হইয়া প্রণাম করিল। বৈজ্ঞান্যের সমুদ্রে চক্ষু সূর্যকে চিনিয়া ফেলিল। এখন আর সূর্যের উপর রাগ প্রকাশের কোন উপায় নাই, কেন না রাগের ফলাফল উনার উপর পড়াইবে। বৈজ্ঞান্য সূর্যকে কোন কথা না বলিয়া বাসা হইতে বাহির হইয়া বিদ্যাপতির বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপতি তখন কি একখানা দলিল দেখিতেছিলেন, বৈজ্ঞান্যকে দেখিয়া হানিমুখে অভ্যর্থনা করিলেন।

বৈজ্ঞান্য কোমলতর বলিতে লাগিলেন, “আপনার কি এত অনিষ্ট কর্ত্তেছি যে আমার সঙ্গে এই রকম চালাকি করুনেন।”

বিদ্যাপতি বলিলেন, “বেছাই মশায়, রাগ করুনেন না। এ সমুদ্রে পরে আলোচনা করা যাবে।”

বৈজ্ঞান্য যৌবকস্মৃতি লোচনে চাহিয়া বলিলেন, “পরে আর আপনাকে আলোচনা কর্ত্তে হবে না। আপনি যে এ রকম জুয়াচোর তা’ যদি আমি একটু আগে জানতাম”—

বিদ্যাপতি কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধতর বলিলেন, “তবে ফাঁসি দিতাম, বলুন।”

বৈজ্ঞান্য গম্ভীরতর বলিলেন, “ঠাট্টা করবেন না, যা’ কর্ত্তবার ভালই করুনেন, এখন যানে মানে আমার হাজারটি টাকা ফেরত দেন।”

বিদ্যাপতি ব্যাকসুরে বলিলেন, “আগেই ত মশায়, আমাকে জুয়াচোর ঠাণ্ড করতেন, তবে আর কেন টাকাকড়ি ফিরে পাবার আশা করেন? এখন সোজা বেরিয়ে যান।”

বৈজ্ঞান্য বলিলেন, “আমি টাকা না পেলে কোন মতে যাব না, সহজে না দেন পুলিশ ডাকুন।”

“আচ্ছা, তবে একটু শিলা দিই” বলিয়া বিদ্যাপতি তাঁহার বানসাম কাশুরাকে ডাকিলেন। কাশুরা হাজির হইলে তিনি বৈজ্ঞান্যের হাত-পা বাঁধিতে আদেশ দিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া বিকল চেঁচায় পরে বন্দী হইয়া বৈজ্ঞান্যের চক্ষু ফুটিল।

সূর্যের পূর্বেই বুঝিয়াছিল যে, বৈজ্ঞান্য বিদ্যাপতির নিকটে গিয়া বিবাদ আরম্ভ করিবেন। কিছু পরে বিদ্যাপতির বাড়ী গিয়া সূর্য দেখিল, সে বাহা

ভাবিয়াছে, তাহাই ঘটিয়াছে । সুধীরকে দেখিয়াঃ লজ্জায় যুগার বৈদ্যনাথ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন । সুধীর আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাড়াতাড়ি বৈদ্যনাথের বহনযোচন করিয়া যুক্ত করে বিদ্যাপতিকে বলিলেন, “আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, আমি এ পর্য্যন্ত কখন অবাধ্য হই নাই, আর কখনও হ'ব না ; কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে ক্ষমা করিতে হ'বে ।”

বিদ্যাপতি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সুধীর ! তোমাকে আমি ছেলের মত দেখি । এক্ষেত্রে কেন, যত দিন বাচ'ব তোমার কোন দোষ গ'র'ব না । মেয়ের বিয়ে দিবে যত্নরক্রে আমাইএর কাছে ভিতরে ভিতরে বাণী প'ড়'তে ছর, আমি সেই বাণমনটা বাইরে ও'কে দেখিয়ে দিলাম ।” তাহার পর বৈদ্যনাথের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, “বেহাই মশায়, কিছু মনে ক'রবেন না ; এটার নাম কি আনেন ? এর নাম হচ্ছে গিয়ে—‘প্রজাপতির নির্জঙ্ঘ’ ।”

সংগ্রহ।

—:•:—

ইতিহাস।

রাজা শীতারাম রায়।

কিছু দিন পূর্বে অনুবাসিপুর 'বেঙ্গল পাঠ এন্ড এসেট'-গত্রে প্রস্তুত যোগীন্দ্রনাথ সামান্যর শীতারাম-সম্বন্ধে একটি অবলম্বিত লিখিত ছিলেন। সেই অবলম্বনে নিম্নলিখিত অবলম্বিত লিখিত হইল।

এক দিন বাঁহার অমিত তেজঃপ্রভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ উদ্ভাসিত হইয়াছিল—বাঁহার কীৰ্ত্তি-কাহিনী আশ্রিত যশোহরের নানা সরোবর, দীঘিকা, মন্দির, অষ্টালিকা প্রভৃতিতে দেবীপ্যাসান রহিয়াছে, সেই বীর-কুল-চুড়ামণি রাজা শীতারাম রায় বীর, মহা, কালবিক লোক প্রভৃতি বিবিধ আখ্যায় ঐতিহাসিকবৃত্ত কৰ্ত্তৃক আখ্যাত হইয়াছেন। এসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইষ্টার্ট তাঁহাকে মহা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষদপুরের প্রচলিত পল্লবাদি গ্রন্থ করিয়া ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি দেখিয়া সে ব্যাঘ্রা নব উদ্ভিত হয় না। যবে হয়, ইষ্টার্ট আশ্রিত বশবতী হইয়া অবশিষ্ট উক্তি করিয়াছেন।

শীতারামের সময় লইয়া অনেক বিচারবিতর্ক হইয়া আসিতেছে। ভরৎসংগত ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই শীতারামের মৃত্যুকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তারিখে নবাব কলিকাতার ইংরাজ সর্ভদের দিকট বেপত্র প্রেরণ করেন তাহার নর্থ পাঠে আখ্যায় দেখিতে পাই, শীতারাম ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। নবাবের তিরি নর্থ এইরূপ :—

“আপনার তিরি পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আপনি আমাকে লিখিয়াছেন, মিটার রোজ = নামক জনৈক ইংরাজবণিক টাকা ও রাসপত্র লইয়া বাঁহার কালে বাঘদসত্তের দিকট নৌকার দাবিকরণ কর্ত্ত্বক নিহত হইয়াছেন এবং তাহার শীতারামের জবীদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আপনি আমাকে আরও লিখিয়াছেন যে, আমি গত্র পাঠ দ্বারা চাকার নবাবকে এই বর্ণে আদেশ প্রদান করি বাহাতে তিনি ঐ সকল মহানুভূত করেন এবং সূচিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে জবীদারকে বাধ্য করেন। আপনার অভিপ্রায় যত

• মি: রোজ হেষ্টিংসের এলেক্ট ছিলেন।

আমি সৈয়দ রেজা খাঁকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়া আপনায় নিকট পত্রখানি পাঠাইলাম। আপনি এই পত্রখানি উাহার নিকট প্রেরণ করিবেন।”

পূর্ববর্ণ নবাবের চিঠি পাইয়া উাহার নিকট আবার যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—“আমি ইতঃপূর্বে আপনাকে জানাইয়াছি যে, মিষ্টার রোজ নামক জনৈক বেতাক বণিক বাণিজ্যের নিকট বিহত হইয়াছেন এবং হত্যাকাণ্ডীরা সীতারামের জমীদারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি এই বিষয়ের অনুসন্ধানের নিমিত্ত একজন ইংরাজকে প্রেরণ করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি তাহার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করেন নাই।” *

রাজা সীতারামের নাম দীনাপতিয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ দয়ারামের নামের সহিত অভিহিত হইয়াছেন। দয়ারাম নবাব-কর্তৃক সীতারামকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত অভিযানের নায়ক ছিলেন; উাহার কাণ্ডগোপে শ্রীত হইয়া নবাব উাহাকে “রায় হাইদা” এই উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন। x

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই আশ্বিনী তারিখে, মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট পূর্ববর্ণের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরিত হয়,—“আমি এখন শুনিতে পাইলাম যে, কোম্পানির এক নতুন সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী বোয়ালিয়া হইতে কাম্বোজবাহার সূত্রিতে আনিবার কালে, রাজপাহার জমীদার দয়ারাম তাহা আটক করিয়াছে এবং আরও শুনিলাম আপনায় সাহায্য-কৃত্য নামে একজন কর্তৃপক্ষী সেই সৈন্য লইয়াছে; এখনও কেহও সেহ নাই।” উল্লিখিত চিঠিগুলির মর্ম্ম যদি সত্য বলিয়া ধরিতে হয়, তবে সীতারাম ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নিশ্চিতই জীবিত ছিলেন।

সীতারাম মুর্শিদাবাদী বর্গের সময়ে কর্ণাল বা সনন প্রাপ্ত হইবেন। মুর্শিদাবাদী ১৭০৪—১৭২০ খৃষ্টাব্দ মধ্যে—“পদিতো” পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিলেন, সূত্রানুসারে সীতারাম যে ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইংরাজের History of Bengal অণেকা ওয়েষ্টল্যান্ডের বিবরণ আমরা এখানে বলিয়া গ্রহণ মুক্তিকৃত বলিয়া মনে করি।

ইংরাজ সীতারাম-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—“কথিত আছে, সৈয়দ আবু তোরাব নামক জনৈক সম্রাট বংশোদ্ভূত ব্যক্তি কোনও উমিরের চেয়ে বঙ্গালার ভূষণ। রাজ্যের কোম্পানীর পক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। এই কোম্পানীর অধিকারে সীতারাম নামে একজন দুর্দমনীয় জমীদার বাস করিতেন। সেই জমীদার সর্বদা দস্যুগণকেই থাকিতেন। এই সমস্ত দস্যুগণের সহায়তায় সেই জমীদার রাজ্যে ব্যাপ্তি করিতেন, নগরিতে লোক লুণ্ঠন করিতেন এবং কোম্পানীর শাসন বা মানিত্য প্রাধান্যের হইতে গো বেহ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেন। আবু তোরাব এই জমীদারকে পরাস্ত করিবার জন্য নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু নবাব উাহাকে সাহায্য করিলেন না; অধিকন্তু দস্যুতা, পরস্পর-পরস্পর প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সীতারামের সহকারী নবাব এই ধারণার বশবর্ত্তী হইলেন।

* Long, Selections from the Records of Government.

x Calcutta Review, 1873.

“অবশেষে কৌজনার নবাবের সাহায্যের আশা পরিত্যাগপূর্বক আপন সান্তে শীঘ্র বঁাশীকে
অনৈক আকৃশন কর্তব্যেরী বিমুক্ত করিলেন। তিনি দুই শত সুলজিত অস্ত্র-সমভিবাচারে
সস্তা-সমনবে যাত্রা করিলেন। কিন্তু শীতারাম পূর্ক হইতেই এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া দানান্তরে
চলিয়া গয়েন। শীতারাম যে স্থানে পলাইয়া দিয়াছিলেন, সেই স্থানে কৌজনার ঘটনাক্রমে
সঙ্গীতারোপ করিতেছিলেন। তিনি আত্ম ভোরনকে কৌজনার বলিয়া জানিতেন না;
তাহাই তাঁহাকে হত্যা করেন। কিন্তু সেখানে কৌজনারের পবিত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি অতি
দুঃখিতান্তরপে কৌজনারের স্মরণেহ ভূষণায় প্রেরণ করেন।”

নবাব আত্ম ভোরনকে মৃত্যুতে বৎসরোনাতি ভীত ও দ্বিজিত হইলেন; কারণ, তিনি
জানিতেন, সস্তাটি যদি জানিতে পারেন যে, তিনি কৌজনারের আর্থনায়ত সস্তাদমনে তাঁহাকে
সাহায্য করেন নাই, তাহা হইলে তিনি দ্বিজিত হই তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। নবাব তত্ক্ষণে
বকসু আলি বঁাশীকে কৌজনার পক্ষে বিমুক্ত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে শীতারামকে আক্রমণ
করিলার জন্য আদেশ করিলেন। শুণু উহাই নহে, শীতারামকে অবকৃত করিতে সাচান
করিবার জন্য তিনি জমীদারবর্গের উপরও আদেশ প্রচার করিলেন। অবিকৃত ঔচাধিককে
কঠোরভাবে বলা হইল, যদি কাহারও জমীদারী দিয়া শীতারাম পলায়ন করেন, তবে সেই
জমীদারকে জমীদারী হইতে বঞ্চিত করা হইবে এবং তাঁহার উপর কঠোর শাস্তির
ব্যবস্থা হইবে।

বকসু আলি বঁাশীতারামকে সপরিবারে বন্দী করিয়া কৌহলুখলে আবদ্ধ করতঃ
মুশিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তথায় শীতারাম শু ভদীর অস্ত্রের সহায়বর্গকে ধুলে
চড়াইয়া দ্বারা হত এবং তাঁহার পুত্রকস্তামিকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হয়।

তখন বঙ্গদেশে বীর ভূইয়ায় অর্থাৎ দ্বাদশটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। যে সমস্ত জমীদার যেন
একটু শক্তিশালী হইয়া বঙ্গদেশ বা নবাবের নিকট কর-প্রেরণে তেমন একটু আগ্রহ প্রকাশ
করিতেন না হয় সেই প্রেক্ষার স্বর্কমণ্ডীর জমীদারগণকে বশীভূত করিলার জন্য, মহেত্
কতোচাযের বিরোহালবী জনৈক পাঠান সর্দারকে দমন করিবার জন্য শীতারাম, হয় স্বয়ং
সস্তাটী না হয় তদানীন্তন নবাব সারোভা বঁাশী কর্তৃক একমল সৈন্ত সমভিবাচারে প্রেরিত
হইয়াছিলেন। শীতারাম উপর্যুক্ত কার্যে কৃতকার্যতা লাভ করার, “জাইবীর” বরণ
নলবী পরগণা প্রাপ্ত হন। *

শীতারাম কিন্তু “নায়ে দুখনতি” এই কথাটি বিশেষরূপে জানিতেন। তাই তিনি বিক্রী
পর্বাত বাইরা সস্তাটী উরঙ্গমেদের নিকট বসে অরাজকতার অভিযোগ করিলেন।
বলা বাহুল্য, সস্তাটী তাঁহার প্রতি অভ্যাত ঐতি হইয়া তাঁহাকে দমন ও “হাজা” উপাধি
প্রদান করিলেন।

দিল্লী হইতে কিরিবার পথে শীতারাম মুশিদাবাদে মুশিদকুলী বঁাশীর সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া তাঁহাকে “দমজ” বেন। মুশিদকুলী ভদীর আচরণে ক্রীত হইয়া একধাধি খতব্র
করণ দিয়া তাঁহাকে পরবর্তী কয়েক বৎসরের জন্য করতার হইতে মুক্তি প্রদান করেন।

* নলবী পরগণা একপে পাইকপাড়ার জমীদারের অধীন।

মুশিখাবাস হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সীতারাম বহুদলপুর নগর নির্গমন করায় ।

এই বহুদলপুর নামের উপকতিসম্বন্ধে মন্তব্য আছে ।

ভয়েটল্যাণ্ড বলেন, সীতারাম যে স্থানে আপন বাসস্থান নির্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেধেন, সে স্থানে বহুদল ব'ল নামে একজন মূলদান করির বাস করিতেছেন । সীতারাম তাঁহাকে—হাৰ ত্যাগ করিতে বিবিধ একাধারে প্রবোধিত করিলেন, কিন্তু করির বলিলেন, যদি সীতারাম তাঁহার নামানুসারে নগরের নামকরণ করেন, তবেই তিনি স্থানান্তরে বাইতে পারেন—সীতারাম অগত্য করিরের প্রস্তাবে সন্মত হইয়া নগরের “বহুদল-পুর” নাম রাখেন ।

ভয়েটল্যাণ্ডের উল্লিখিত উক্তির মূলে কোন সত্য মিথিত আছে বলিয়া বোধ হয় না ।

কেহ কেহ বলেন যে, বহুদল আলি নামে একজন করির সীতারামের পরম উপকারী ছিলেন । সীতারাম যখন আধীন হিন্দু-ব্রাহ্মণ হাণ্ডসের প্রজাব করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে মূলদান একজার সনোয়প্রদান করিয়া মূলদান-বর্ণপ্রবর্তক—বহুদলের নামানুসারে নগরের নাম “বহুদলপুর” রাখিতে পরামর্শ দেন ।

হানীর কিম্বদন্তী এই একার যে, একদা সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ অধারোহণে বাইবার কালে অকস্মাৎ অশ্বের হ্রস্ব কর্ণেবে জুবিয়া যায় । তিনি অশ্রুসঞ্চিতস্নান বদনবী হইয়া সেই স্থান হুঁকিতে হুঁকিতে এখানে একটি ত্রিশূল ও পরে লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ-মূর্ত্তি প্রাপ্ত করেন । এই স্থানেই সীতারাম বহুদলপুরে নগর স্থাপিত করেন ।

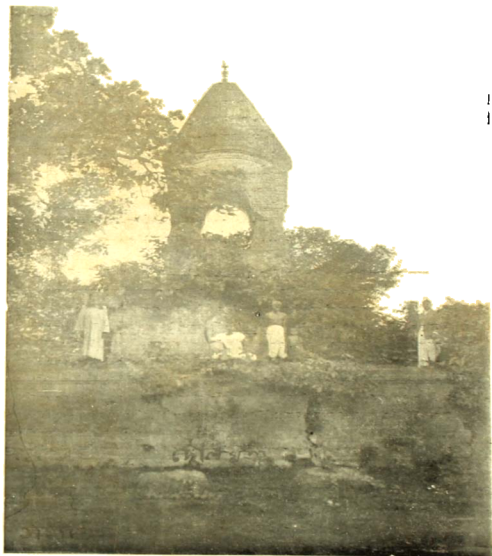
মাক্স সীতারাম রায়ের বিশেষ পক্ষিপালী একমল সৈন্ত ছিল । মেনাহাতী, বজার করির, মুচুকাটী এবং রূপটীস চুলির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

পূর্ব্বকই বলা হইয়াছে, আবু তোরাব তখন ভূষণার কৌলদান ছিলেন । সীতারামের এইরূপ আকস্মিক উপাবে তাঁহার দ্বারে কিছু ভবিষ্যৎ বিপদানকার চিন্তা উদ্ভিত হইল । সীতারামকে পরাজিত ও বশীভূত করিবার অস্ত্র তিনি নবাবের নিকট সৈন্ত প্রার্থনা করেন, কিন্তু নবাব তাঁহার প্রার্থনার কর্পণাত করেন না । ফলে আবু তোরাব একাকী অস্ত্র সংযোগ সৈন্ত লইয়া সীতারামকে আক্রমণ করিতে বাইয়া মেনাহাতীর হস্তে প্রাণ হারান ।

আবু তোরাবের পর বকসু আলি ব'ল নৃহৎ একমল সৈন্ত লইয়া সীতারামকে পরাজিত করিতে বাইয়া, অস্ত্র পরাজিত করেন ।

তখনকার সিংহরাম না সীতারামকে দমন করিতে প্রেরিত হয় । মেনাহাতী ভগবদানারনারী বাহজ্ঞানমুগ্ধ ছিলেন, সুশ্রুৎ সিংহরাম তখন তাহাকে বশী করে । সিংহরাম মেনাহাতীর কলেবরে সহস্র সহস্র বার পানিত তরবারির আঘাত করিল, তথাপি তাঁহার পরীর দিচ্চা করিরায়া নিঃকৃত হইল না । কিন্তু তিনি বেরণার বৎপটোনাতি কাতর হইয়া পড়িলেন । এই আন্তর্গাভনক ব্যাপারের কারণ বলিতে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় মেনাহাতী বলিলেন, তাঁহার নিকট এক একার উষম আছে, সেই উষম রাসদাগরে নিকোণ না করা পর্য্যন্ত তাঁহার পরীর দিচ্চা বিপুল্য প্রোপিত বহির্গত হইবে না ।

ଆସାବର୍ତ୍ତ



নির্দিষ্ট-ভবন সিংহরাম তৎকথাং সেই উত্তর রামসাগরে নিক্ষেপ করিল—বোনাহাতী
বীরে বীরে সর্বহুঃবনানী নৃত্যাক আশ্রয়ন করিলেন ।

বাহুবীর পক্ষ, চূর্ণবিচূর্ণ হইলে, সে আর কত বিন বীতে ? বোনাহাতীর কৃত্যর পর
সীতারাম সিংহরামের নিকট বন্দী হইলেন ।

সীতারামের নৃত্যাসনে বড়ই শোকাবধ দল গুনা যায় । সীতারাম সিংহরামের সৈন্তের
অস্ত্রাঘাতে অটুতস্তাবহার পথিশার্বে পড়িয়া থাকেন । এ দিকে তাঁহার হিঁড়নী করির
বহুধর আলি ভায়া শুনিতে পাইয়া সীতারামের নিকট তাঁহার একজন শিবাকে প্রেরণ
করেন । শিব সীতারামের সেই হইতে রামকীর পরিচ্ছন্ন ও মতক হইতে তাঁহার পান-কুঁ
লইয়া বুড়কেতে উপস্থিত হয় ও সীতারাম বোধে তৎকথাং পরূপক কর্তৃক দিহত হয় ।
ইত্যবসরে বহুধর আলি সীতারামের সংজ্ঞাহীন সেই স্থানান্তরিত করেন । কিন্তু পরদিনই
তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন ।

সীতারাম ১৩১৭ খ্রষ্টাব্দে চূর্ণ-নির্ধাণ-কার্য্য সমাপ্ত করেন । চূর্ণাভ্যন্তরস্থ আসাদ বৈরো
এক মাইল ও আছে আধ মাইল সহধর্মপুত্রের অসংখ্য বশিরাবি ভিন্ন বৃহৎ বৃহৎ বীর্ষিকা-
গুলি অবস্ত দর্শনযোগ্য । সীতারামের রামসাগর সম্বন্ধে এসিদ্ধ ।

যশোহরের পল্লীগ্রামবাসীরা এখনও কথার কথার বলিয়া থাকে যে “সীতারামের স্মৃ” ।
হাক্স সীতারাম ব্যক্তি প্রত্যহ নৃত্যর সন্ধ্যায়ের প্রান করিতেন । স্থানীর প্রচলিত দল এইরূপ
যে, সীতারামের সম্বন্ধে সর্বদা হাবিংপতি সহস্র “কোমালী” প্রাক্তিত, সীতারাম তৈলমর্দন
করিতে মসিলে এই কোমালীরা বীর্ষিকা বসনে প্রস্তুত হইত এবং তিনি তৈলমর্দন সমাপ্ত
করিয়া সেই বীর্ষিকার প্রান করিতেন ।

কবিত আছে, স্মৃসাগরের বহুত অট্টালিকার সীতারাম গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকালঅতিবাহিত
করিতেন । সীতারাম অতুত বনরত্নের অধিকারী ছিলেন । তেরেইলাগত বলেন যে, ১৮৩১
খ্রষ্টাব্দে সীতারামের রত্নপুত্রে ৫০০ স্মৃব বোহর পাঠয়া দিয়াছিল ।

কবিত আছে, সীতারাম একজন স্বর্গকারের পুত্রকে একটি স্বর্গের দেবমূর্তি নির্মাণ করিতে
আদেশ করিয়াছিলেন । স্বর্গকারতম স্বর্গ-বিগ্রহের অনুরূপ আর একটি শিল্পের মূর্তি
নির্মাণ করে । শিল্পা তাঁহার ব্যবহার স্থানীয় কপোতের করিবান্না সীতারাম সেই
বালককে স্বর্গপ্রতিভা প্রদান করিয়া তৎপরিবর্তে শিল্প প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেন ।

অনঙ্গমঞ্জরী ।

—:~:—

(টেনিসমের Godiva অবলম্বনে)

কালের অধুনাতন বিবর্তন-ফল মোরা, বর্তমান নরনারীদল,
অতীতকে যা'রা আজ নিয়ত উড়াতে চাহি পরিহাসে নিন্দায় প্রবল,
ক্লান্ত ও অন্যায় লয়ে নিত্য করি ভাঙ্গাগড়া ;—হেন কথা ভাবি যদি মনে,
একমাত্র আমরাই শিখিয়াছি, ভালবাসা ঢালি' দিতে জনসাধারণে
অথবা মোরাই শুধু ঘৃণা করি অত্যধিক প্রজাদের রাজত্ব-পীড়ন,
তুমি তবে, মহাশয় !—ছিলো হেথা পুরাকালে মহাপ্রাণা নারী একজন,
লক্ষ বর্ষ-অধস্তন রমণীসমাজ হাঁ'র সমুচ্ছল আদর্শে মহান
থনা হ'তে পারে, বহু, শ্রদ্ধা-বিস্মিতচিত্তে নিত্য করি' পুণ-অর্ঘ্যদান ।
এই ত্রিপুরায় ছিলো দুর্দান্ত ভূম্যধিকারী—নাম তাঁ'র, রাজা বজ্রপাণি,
অনঙ্গমঞ্জরী নামে সে ঐতি-সর্ব্ব নারী—তাঁ'র পত্নী, গৃহলক্ষ্মী, রানী ।

একদা যখন রাজ্য স্বীয় রাজ্যমাঝে দিলা বিশেষ রাজত্ব ব্যাখ্যা করি,
বাশগিস্ত হু'নয়ন জননী-প্রজারা যত শিশুসন্তানের হস্ত ধরি'
রানীর চরণ-তলে নিবেদিল আশির্জলে—“মাগো, মোরা র'বে উপবাসী
যদি দিতে হয় কর” । আহতহৃদয়া রানী অশ্রুস্রবী দাড়াইলা আশি,
দীর্ঘ ঐচরণক্ষেপে কুহুরবেষ্টিত যেথা ভীমকায় প্রাণাধিপ তাঁ'র
ত্রয়িতৈছিলেন একা অবিদ্যুত হর্ষাতলে,—অমাত্রক্ষ ক্ষত্রর বিস্তার
চরণের অগ্রে অগ্রে, কেশের গহন বন বশু হ'তে এক হস্ত পিছে—
নিবেদিয়া সকাঁতরে প্রজার হৃদয়ব্যথা, কহে রানী—“আহা কেন বিছে
প্রজারে কাঁদাও, প্রভু ? কর যদি দিতে হয় তবে তা'রা র'বে উপবাসী ।”
বিস্ফারিত-আঁখি রাজা চাহিয়া রানীর পানে উত্তরিলো অবজায় হাসি—
“এই তুমি ব্যাধাটাও সহিতে পার না ?” “পারি মরিতে যবৎ” কহে রানী
অনঙ্গের কর্ণহুলে অঙ্গুলির টোকা দিয়া উচ্চহাস্তে বলে বজ্রপাণি
“কাজটা সহজ বটে !” “কেমনে বুঝাব হায়, কি না আমি করিবারে পারি,
যে পরীক্ষা চাহ লও, মুছাও,” কহিলো রানী, “দদিত্বের এই আশি-বারি ।”

“উত্তম ! এতই যদি, উলঙ্গ জমিয়া এস অশ্বপুষ্ঠে সমস্ত নগর ।
রাজস্ব করিব রূপ, প্রেক্ষাগ-শেষে যবে পশিবে এ প্রসাদ-তিতর ।”
অল্লাসকর্কশপ্রাণে উচ্চারিয়া বাজহাস্তে এ দারুণ রেবদিক্ত বাণী
বস্ত্রপদক্ষেপে রাজা যুহুর্ন্তে তাম্রিলা কক্ষ ; শুক, ক্রুর, চিত্রাৰ্পিতা রাণী !

দাড়াইয়া একাকিনী অনঙ্গের চিত্ততলে—বায়ু যথা অগ্নিশিখা-আগে
দশদিক হ’তে ছুটি’ আঘাতে ও প্রতিঘাতে প্রমত্ত ঝটিকারূপে আগে—
অনঙ্গের চিত্ততলে বিচিত্র হৃদয়রুত্তি স্নাতিল সংগ্রামে পরস্পর ;
করুণাই জরী শেষে। এ আদেশ দিয়া রাণী পাঠাইলা দূত স্বতঃপর,
বুলাইয়া সব কথা যেন সে ঘোষণা করে ঢোল পিটি’ প্রতি ঘরে ঘরে—
প্রজার মঙ্গল লাগি’ যেহেতু আকুলা তিনি, আরো তা’রা ভালবাসে তাঁ’রে,
সেহেতু মিনতি ; যেন বিশ্রহস্র-অগ্রে কেহ রাজ-পথে নাহি বাহিয়ায়,
বাতায়ন দ্বার রোধি’ রহে সবে ঘরে ঘরে, কেহ যেন না দেখে তাঁহায়।
প্রবেশি’ আপন কক্ষে, খুলি’ যত বহুমূল্য বসনভূষণ স্বতঃপর,
সরতের চাঁদ যেন আধ-ঢাকা মেঘবাসে, কটিবাস-সমুদ্রাপিত-কর
ইতস্ততঃ করে দেবী ; কি ভাবিয়া পরক্ষেপে সফালিয়া শির আপনায়
দাড়াইলা এলোকেশী ছড়ায়ে অলকগুচ্ছ ঘনকুজ আকাঙ্ক্ষ-বিস্তার !

অগ্নিতে বসন তাজি’ সোপান, প্রাসাদ, কক্ষ, চূপে চূপে অতিক্রমি’ রাণী
স্তম্ভ হ’তে স্তম্ভে লুটি’ চলিলা তোরণে যেন বিকম্পিত সৌরকরখানি !
প্রগাঢ় লোহিতে আর সুবর্ণভূষণে সাজি’ অশ্ব সেবা ছিল প্রতীক্ষায়
করুণার পাদপদ্মে লজ্জার অঞ্জলি দিয়া উট্টিলা করুণাময়ী তা’র ।

অশ্বপুষ্ঠে বিবসনা ! পবিত্র সতীত্ববাসে আবরিত তহু স্নহুয়ার ;
চকণ পবন ওই সমস্তমে চারিবারে লুটে পড়ে পদমূলে তাঁ’র ;
দুঃখিত বাতাস-যত যেন বা সরবে শুয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঘুরে সরে যায় ;
কেবল প্রশস্ত-গ্রাস ক্ষুদ্রমাথা বারিনল চতুর নয়ন মেলি’ চায় ।
হুহুর ডাকিল ঐ—পলকে আরক্ত গন্ত ! অশ্বকুর-শব্দে আপনায়
ধমনীতে ধমনীতে ক্রত-ভীতি-সিহরণ ! চির-অশ্ব প্রাসাদ-প্রাকার
পত ছিঙ্গে ভরা যেন । কল্লিত খিলানগুলি শিরোপরি তাকাইয়া আছে
মহাজনতায় জাগি’ ! তথাপি কল্পিতহিয়া সর্ববাধা অতিক্রমি পাছে

চলিলা করুণাময়ী, যতক্ষণ নয়নে না বিভাভিল পরিখা-সীমার
নগর-ভোরণ-পারে কাশের ধবল নদী মাঠে মাঠে তরঙ্গিয়া যায় ।

সতীকের পুণ্যবাসে বিমণ্ডিত কলেবরে এতক্ষণে গৃহমুখী রানী ;
হেম কালে অকৃতজ্ঞ জগতের নিদর্শন, কে রে নর-সমাজের ক্রানি,
(ভবিষ্যৎগতে তা'র জঘন্য এ রুতয়তা রটে যাক্ প্রবাদের প্রায়)
ভয়ে ভয়ে ছিন্ন করি' কুটীর-কপাটে, ছি ছি রাঙ-পথে উ'কি যারি' চায় !
কিহু এ কি ! সে নয়ন, উদ্বেগ না হ'তে লিঙ্ক, লুপ্তদৃষ্টি অন্ধ তমিপ্রায়,
কি করিয়া কে বলিবে, মুহূর্ত্তে স্বহানচ্যুত উৎপাতিত পড়িল ধূলায় !
বে শক্তি জাগিয়া থাকে সাধু-অস্থঠান-পরে, তাঁ'রি হুঁকি অযোয বিধান,
কাড়ি নিল সে ইঞ্জিয়, এমনি করিয়া যাহা কলুষিত করে তাঁ'র মান ।
কিছু না জানিয়া-রানী চলিলা আপন মনে ; নিরাজ্ঞ মধ্যাহ্ন হেনকালে
হুগপৎ নগরের যতেক ঘটীক। হ'তে ঘামণ চকিত লব্ধভালে
কাঁপাইল সে জনয় ; কিন্তু ততক্ষণে পশি' মহীয়সী আপনার কক্ষে
পরি' বেশ পরি ভূষা, দেবী কবলার মত ঠাড়াইলা প্রভুর সমক্ষে ।

.

ব্রাহ্মণ বে করে বদ, এ অগ্নি-পরীক্ষা দিয়া পুণ্যবতী জানকীর সব,
অবর ঠাহার নাম ; কর্ত্তি চিরস্বরসীর ; এস বহু, ঠাহারে প্রণয় ।

ঐবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ।

আর্য্যাবর্ত



কর্ণের দান ।

—:~:—

বীণা মহামতি কর্ণ
অনি-সমাপনে সিন্ধু বসনে
দীনে বিতরিতে কর্ণ ।
পূর্ণ-গগনে বহু তপন,
শান্ত শীতল প্রভাত-পবন,
বহিছে গঙ্গা কলুষ-হরণ
সোয়া শুভবর্ণ ।

(২)

দীনের নয়নে ঝরিছে অশ্রু,
জদয়ে অপার হর্ষ ;
কহে হুড়ি' কর—“ওগো নবরাজ,
দীন দরিত্রে বাঁচাইলে আশ ;
তোমারি করুণা মর্মে'র মাক,
রহিবে গো চিরবর্ষ ।”

(৩)

দিনের আলোক নিবে নি তখনো
দাড়াল আশ্রয় বিপ্র :
ভ্রম ললাটে চন্দন-রেখা,
সর্ব পরায়ে দীপ্তির লেখা,
কহে ভ্রামণ—“আজ পেছ দেখা
ভিক্ষা দেহ যো ক্ষিপ্র ।”

(৪)

নমিয়া চরণে পূজার অর্ঘ্য—
সঁপিলেন রাজা যত্নে ;
ইজিতে তাঁ'র হৃদয়ের দল

ছুটিয়া আসিল করি' কোলাহল,
ভরিল নয় চরণের তল
বিবিধ ভূষণ-রয়ে ।

(৫)

হাসিলা বিপ্র যুগার হাত্ত
রত্ন করিয়া ভূষা ।
“ধন-আশে আমি আসিনি রাজন,
বহুদূর হ'তে করি' আয়োজন,”—
সুধীর কণ্ঠে কহে ত্রাশন,
“যোর আশা আরো-উচ্চ ।”

(৬)

কহিলা কর্ণ,—“সব দিতে পারি
অধু ব্যতিরেকে বর্ষ ।”
বিপ্রনয়ন হ'ল উজ্জল,
কহিল—“বাক্য করো না বিফল,
চাহি গো কান্ত হেমকুণ্ডল
ভব সম্মত বর্ষ ।”

(৭)

ঈপিয়া উঠিল অল্পচর যত
বেধনা বাজিল বকে!
করুণ-কাতর বহিল সমীর,
উবলি' উঠিল জাহ্নবী-নীর,
ত্রাশন-পানে চাহিলেন বীর
রিঙ উদাস চকে ।

(৮)

নিশ্বাস ফেলি' ভাবিলা কর্ণ—
“বুকিহু তিকা-যর্ষ ।
জীবন-সন্ধ্যা আসিছে বনায়ে
নিজা আসিছে নেত্রে জড়ায়
মরণ-রাশি পড়িছে ছড়ায়
শাপ শতেক কর্ণ ।

(১)

“তোমারি ইচ্ছা ও গো দ্বাঙ্ক দ্বাঙ্ক,
 হোক তবে হোক পূর্ণ।
 সমরে পার্শ্ব লভুক্ বিজয়,
 লবি কোন ক্ষোভ, নাহি কোন ভয়,
 তোমার দয়ায় যোর যদি হয়
 বিজয়গরিমা হুঁ।”

(১০)

স্বপ্নাল বিপ্র—“দীর্ঘ কি যেহু,
 জন্মি হ’ল কি পো বার্ষ ?
 এত দূর আসি’ যেতে হ’বে ফিরে।”
 শুনি হুঙ্কলনা কহিলেন বীরে,—
 “কর্ণের কাছে জাহ্নবী তীরে
 ভিক্ষা হ’বে না বার্ষ।”

(১১)

এত বলি বীর শাণিত অস্ত্রে
 ভেদিল পৌর চৰ্ম ।
 সাক্ষ্য স্বরূপ সম শোভে বলী,
 শোণিত-উৎস উঠিল উছলি’ ;
 “লব দেব”—বলি দিল করে তুলি
 কুণ্ডল-সহ বর্ষ ।

(১২)

পূজ-কীৰ্ত্তি যেহিয়া নেয়ে
 ডুবিল সঙ্ক্যা-স্বৰ্ণ ।
 প্রবীণ জলিল পৰ্ব-কূটায়,
 স্রাত পাৰ্বীরা নীড়ে এল ফিরে ;
 বাজিতে লাগিল জাহ্নবী-তীরে
 কর্ণ-মহিমা-ভূৰ্ণ ।
 ঐশ্ব্যবিকচক্র ভট্টাচার্য ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।

—:~:—

(৩)

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কথায় আমরা বলিয়াছি,—উঁহা'র শক্তি-
কেন্দ্রেই উঁহা'র চরুশক্তির বীজ নিহিত ছিল । উঁহা'র দেশ-বাংসল্য সখকেও
সেই কথাই বলিতে হয় । দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশবাংসল্য সাধারণতঃ রাজ-
নীতিকের স্বদেশবাংসল্য—কচিং কবির স্বদেশবাংসল্য—কুত্ৰাপি স্বদেশ-
প্রেমিকের স্বদেশবাংসল্য নহে ! অর্থাৎ যে স্বদেশবাংসল্য সর্বোত্তম তিনি
তাহা দেখাইতে পারেন নাই । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছিলেন—

“ব্রাহ্মতাব ভাবি মনে,

দেখ দেশবাসিগণে

প্রেমপূর্ণ নয়ন ফেলিয়া ।

কত রূপ ব্রহ্ম করি,

দেশের কুহুর ঘরি,

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ।”

“স্বদেশ বাতরম্” শব্দের অর্থ বহিঃশত্রু সকল পাঠককে এই কয় ছত্র
পদ্য মুখস্থ করিতে বলিয়াছিলেন । এই যে বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া দেশের
কুহুরকেও আদর করা ইহাই স্বদেশ-প্রেমিকের স্বদেশবাংসল্য ।
সমালোচকের দৃষ্টিতে দেশেও যে দৈহিক লক্ষিত হয়, স্বদেশ-প্রেমিক সে দৈহিক-
বিবরে অন্ধ । গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন—

“শীতকাল-কলেবর যেরুবানী কাছে,

তা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠ দেশ কোথাও না আছে ;

বাত্যাকুল সাগরের সন্দ-সত্তার,

দীর্ঘ রাত্রি—তাহাতেই গরু কত তা'র !

নয় নিম্নো প্রাকৃতিক ধর প্রবিকরে,

বর্ষ বায়ু, তালী মদ্য তা'রি গরু করে ;

উক জলে স্নান করে, আভগ পোহায়

কৃতজ্ঞ হনরে পূজা করে দেবতায় !

দেশবাংসলের গরু—যেবা যবে যাই,

শ্রেষ্ঠ দেশ জগদ্বি—তুলা তা'র নাই ।” •

• The Traveller—শ্রীকৃষ্ণ অরুণোদয়প্রসাদ ষোড়শত অঙ্কবাদ ।

কবি মণ্টগমরীও এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন—

আছে দেশ শ্রেষ্ঠতম সৰ্ব্ব দেশ থাকে—
বিধাতার আশীর্বাদ যেথায় বিরাজে ।

আছে শ্রেষ্ঠ সুখময় স্থান মনোহর ;
প্রিয়তম সেই স্থান—অনিম্মা-সুন্দর ।

কোথা সেই স্থান ?—কোথা সেই দেশ আর ?
বদেশবাৎসল নয়, হের চারি ধার—
যে দেশে, যেথায় তুমি কর না প্রয়াণ
সে দেশ পদেশ তব—গৃহ সেই স্থান ।

এই যে বদেশবাৎসল্য ইহা ইংরাজ নাটককার, কবি, রাজনীতিক সকলেরই রচনায় ও বক্তৃতায় আত্মপ্রকাশ করে। রচনায় এই বদেশ-বাৎসল্যের বিকাশ যে সমসাময়িক সমাজে সেন্সপিয়রের নাটকগুলির-সমাদয়ের অন্যতম কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেন্সপীয়ার যখন নাটক লিখিয়াছিলেন তখন রজ্যায় টেমস নদীতীরে অপরিচ্ছন্ন স্থানে সংস্থাপিত ও কর্মমাক্ত পরঃপ্রণালীপরিবেষ্টিত ছিল। দৃষ্টপটাদি প্রায় ছিল না ; লোক সব করনা করিয়া লইত। ছয় আনা, হুই আনা—এমন কি এক আনাতেও প্রবেশাবিকার পাওয়া যাইত। বৃষ্টি হইলে অনাবৃত স্থানে উপবিষ্ট দর্শকগণ বারিসিক্ত হইত। পৰিপার্শ্বস্থ মুক্ত পরঃপ্রণালীর দূষিত বায়ুতে তাহারা অভিভূত ছিল ; তাহারা সহজে অসুস্থ হইত না। অভিনয় আরম্ভের পূর্বে দর্শকগণ মদ্যপান করিত, ফলাহার করিত, সময় সময় পরস্পরকে প্রহারও যে না করিত এমন নহে। কখন কখন অভিনেতাকে প্রহৃত হইতে হইত ; সময় সময় কবিকে কখনে তুলিয়া উৎকিণ্ড ও পাতিত করা হইত। মদ্যপানের পর মত্ততা লাভ হইলে দর্শকদিগের বমনাদির অল্প মুক্ত-মুখ পিপা আনা হইত। হুর্গকে লোক অস্থির হইলে রজমকে সুগন্ধী কাষ্ঠ আলাইয়া ধুবে হুর্গকে দূর করা হইত। রাজা প্রজা সকলেই সমান। ব্যবহারে সংঘের অভাব সপ্রকাশ। জল্পসমাজের ভাবা অশিষ্ট। সমাজের

উচ্চস্তরস্থিতির গৃহে যে গীত হইত তাহা এখন মদ্যবিক্রয়স্থানেও ক্রত হয় না। * এই সমাজের জন্য সেক্সপীয়ার তাহার নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তাহার দর্শকগণ যে তাহার চরিত্র-বিরোধ-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইত এমন বোধ হয় না। তাহার ষটনাট্যচিত্রো বিখ্যাত হইত—অশিষ্ট রসিকতার উৎস্র হইত—আর ইংলণ্ডের বর্ণনার মাতিয়া উঠিত। সেক্সপীয়ার যে স্থানেই ইংলণ্ডের বর্ণনা করিয়াছেন—সেই স্থানেই তাহার বদেশবাৎসল্য উল্লিখিত উঠিয়াছে। টেনিসন ইংলণ্ডের কবি। তাহার কাছে ইংলণ্ডের ক্রটি কোথায়? x বিদেশ-প্রত্যাগত এনক প্রেমিকেরই মত তাহার সমস্ত রক্তের মধ্যে ইংলণ্ডের দ্বার টানিয়া লইল। † ভারতবর্ষ হইতে বদেশে কিরিয়া লড* ডাক্তরিন বলিয়াছিলেন—“To our fond imagination, in whatever distant lands we may be serving, amid all our troubles and anxieties, England rises from our view as she did to the man of Crecy, like a living presence, a sceptred isle amid inviolable seas, a dear and honoured mistress, the mother of a race which it may truly be said has done as much as any other for the general, moral, and material happiness of mankind.” আপনাদের সবই ভাল এই ভাবেই রাডিয়াড* কিপলিংএর প্রত্যাশের কারণ লক্ষিত হইবে। ম্যাথু আর্লড যাহাকে Sprit of insularity and contempt for foreign ideals বলেন, তাহা ইংরাজ-চরিত্রে যেমন প্রবল তেমন আর কুত্রাপি নহে। আপনার ষেপায়ন সঙ্গীতা ইংরাজের গর্বের ধন। কিপলিং তাহাকে সেই ভাবেই দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। প্রবাসী ইংরাজের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

করে ষটে বাস তা'রা দেশ দেশান্তর ;
 হৃদয় তা'দের কিন্তু রয়ে এক স্থানে।
 জননীর মুখে শুনি—শিশুর অন্তর
 স্নেহে ইংলণ্ড তা'র দেশ বলি' জানে।

* Taine—History of English Literature.

x You ask me ইত্যাদি কবিতা ঐষ্টব্য।

† Enoch Arden.

জাতীয় শ্রুত হুংখ, আশা অভিল্যব, এমন কি দুর্ভাগ্যের সহিত এই সহানুভূতির জন্যই গভীর গীতোপযোগী গভীরোদাত শ্রুতের অভাব সবেও কিপলিংএর কবিতা ইংরাজ পাঠক-সমাজে অসাধারণ আদরলাভ করিয়াছে।

বিক্রেতলালের কবিতায়—রচনায় এইরূপ ভাবের প্রাচুর্য থাকা দূরের কথা অব্যবহিত পরিলক্ষিত হয়। দেশের কুহুর লইয়া আদর করা পয়ের কথা দেশের ঠাকুররাও তাঁহার কাছে “কাগমলা” পাইয়াছেন। তিনি সংস্কারকের সচুপদেশ দিয়াছেন, স্বদেশ-প্রেমিকের প্রেমের উজ্জ্বলিত ধারায় সকল ক্রটি আবৃত করিয়া দিতে পারেন নাই।

এবাসে মৃত বস্তুর শব ইংলণ্ডে সমাহিত হইবে—তাহাতেও টেনিসন যেন কিছু সাধনা পাইয়াছিলেন—

সেই ভাল ; সেও কিছু, শেবের শয়ন
হ'বে তা'র ইংলণ্ডের মৃতিকার তল ;
স্বদেশের ভারলেট ফুলের দল
ভস্মরাশি হ'তে তা'র স্মৃতিবে মোহন। *

ভারতে ঐকিকবি নরদেবতা রামচন্দ্রের মুখে এই ভাবের যে অভিব্যক্তি করাইয়াছেন—কোন সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই—

“ইয়ং বর্ণপুরী লক্ষা যিআস্বাতাং ন যোচতে
জননী জন্মভূমিষ্ঠ বর্ণাদপি গরীরনী।”
এই বর্ণপুরী লক্ষা ভাল নাহি লাগে কোন মতে
জননী ও জন্মভূমি গরীরনী দৌড়ে বর্ণ হ'তে।

চীনবাসীরা যে স্থানেই থাকুক না কেন শব চীনে সমাহিত করিতে না পারিলে তাহা দুর্ভাগ্য বিবেচনা করে। মুসলমান যে স্থানেই থাকুক না কেন নামাজের সময় মক্তার দিকে মুখ করিয়া বসে। সমালোচকের নিকট এ সবই সংস্কার—হয়ত কুসংস্কার। কিন্তু সংস্কারই সমাজ নিরস্ত্রিত করে।

বিশ্ব সমাজে সংস্কারের শাসন অত্যন্ত কঠিন। যে বর্ষ অন্য বর্ষাবলম্বীকে সহজে ক্রোড়ে স্থান দেয় না, আপনার অন্তর্ভুক্তির সংখ্যাবিস্তারের চেড়া করে না সে বর্ষ যে প্রত্যাধিক আচারব্যবহারও নির্দিষ্ট নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়া লোককে নির্দিষ্ট আদর্শের অঙ্গসরণের বাধ্য করিতে সচেষ্ট হইবে ইহাতে বিশ্বের কারণ নাই। বিক্রেতলালের মত শিক্ষাশাপিতপ্রতিভা বুদ্ধিমান

বাক্তি যে ইহা বুদ্ধিতে পারিতেন না এমন নহে। কিন্তু তিনি তাহা বুদ্ধিতে চাহেন নাই। বিলাত হইতে ফিরিয়া তিনি যখন প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে প্রবেশের কথা ভুলিলেন, অমমই অতিমাত্রায় বিচলিত হইলেন—‘একঘরে’ লিখিলেন,—তাহাতে হিন্দু সমাজকে তীব্র ও অসংযত ভাবায় গালি দিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন—“হিন্দুকে আজ জাতি বলিলে আমার = শত্রুরে বোধনা হয়, গায়ে জর আসে ;—এক কথায় আপনাকে শালা বলিতে ইচ্ছা করে।” তিনি যৌবন কালে ক্রোধবশে ‘একঘরে’ লিখিয়াছিলেন। তখন তিনি বিদেশে ত্রিশ জাতীয় সভাতার সোহে মুক্ত—ত্রিশ জাতীয় সমাজে বাস করিয়া আদিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই পুস্তকে প্রকাশিত মত কখনও পরিবর্তিত করেন নাই। তাহার দৃষ্টির পর তাহার সাহিত্য-সুন্দর, নর্থ-সচিব, অন্তরঙ্গ বন্ধ বিজয়চন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছিলেন—“ঐ গ্রন্থে (‘একঘরে’) যে তীব্র ভাবায় সামাজিক অনেক ভ্রাতৃমির পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়াছিলেন তাহা প্রথম যৌবনমূলক, চপলতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবির অনেক ব্রহ্মণীল আত্মীয়বন্ধ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ঐ কথায় দ্বিভিত্তিক সমাজের লোকদিগের নিকট বিজেন্দ্র-লালের আদর ও প্রতিপত্তি থাকিবে। বিজেন্দ্রলাল সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন, এবং স্বাভাবিক সৌজন্যে সকলকে মুক্ত করিতেন বলিয়া কেহ কেহ বিখ্যাত করিয়াছিলেন যে সত্য সত্যই বুদ্ধি কালের প্রভাবে বিজেন্দ্রলালের মতের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। বিজেন্দ্রলাল ইহা বুদ্ধিতে পারিয়া ২৭ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত ‘একঘরে’ পুস্তিকাখানি এই প্রকার ভূমিকা লিখিয়া পুনর্মুদ্রিত করিলেন যে বহুকাল পূর্বে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, এখনও যে তাহার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই, এই পুনর্মুদ্রণ হইতেই পাঠকেরা তাহা বুদ্ধিতে পারিবেন।” = দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার বিজেন্দ্রলাল যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বিজয় বাবুর লিখিত কথা স্পষ্ট বলা হয় নাই সত্য, কিন্তু অসম্মান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—“১৮৮৫ সালে ‘একঘরে’ প্রথম প্রকাশিত হয়। বহুদিন হইল মুদ্রিত পুস্তকগুলি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। নানা কারণ বলতঃ ইহার নূতন সংস্করণ করি নাই। কিন্তু এখন নানাবিধ হইতে পুনঃ পুনঃ অন্তরুদ্ধ হইয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। আমার বিশ্বাস যে এই ক্ষুদ্র

পুত্রকথানি সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছে। ইহার ভাষা অত্যধিক ভীত হইয়াছে। ইচ্ছা ছিল যে ইহার ভাষা মোলায়েম করিয়া পুত্রকথানি পুনর্মুদ্রিত করিব। কিন্তু দেখিলাম যে ভাষা করিতে গেলে পুত্রকথানি আদ্যন্ত নূতন করিয়া লিখিতে হয়। অতএব পূর্বে প্রকাশিত সংস্করণের স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ বাদ দিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল।” সমাজের উপকার-বিষয়ে এই পুস্তকের কৃত-কর্মসম্বন্ধে গ্রন্থকারের বারংবার ইশপের গল্পে ত্ব-পূজোপনিষ্ট মশকের আপনায় ভারসম্বন্ধে বারংবার মত ভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব নহে। “বাদ দিয়া” গ্রন্থকার যাহা রাখিয়াছিলেন তাহার ভাষা ও মত উভয়ই অসংযত। তিনি হিন্দুসামাজহুদিগকে সোধেন করিয়া বলিয়াছিলেন,—“আমরা আপনাদের ন্যায় ভণ্ডামীর কুসুম দিয়া, জুরাচীর ময় পড়িয়া, নীচাশয়তার মন্দিরে, মিথ্যার স্বর্ণপ্রতিমা গড়াইয়া পূজা করিব। আমরা আপনাদের স্তায় প্রভাবণার বর্ষে আচ্ছাদিত হইয়া, ভীততার অন্ধকারে, উচ্ছ্বেষের কূঠার, ন্যাগের, ব্রহ্মের সত্যের প্রাণে বসাইব; জ্ঞানের দুর্গ অবরোধ করিব; উন্নতির স্রোত রোধ করিব; বিধবার, পরিত্যক্তার সন্তানের, ভ্রাতার বুক কষ্টমতার ছুরী বিধিন; আর আপনায় জাতির ঋতিগ্রে,— ভাবী কন্যাদায়ের ঋতিগ্রে, সন্তান্য জামাতার কৌলীন্য বা অর্ধের ঋতিগ্রে,— জাতিচ্যুত পুত্রকে, কন্যাকে, জামাইকে, শুকমুখে, স্থিরবরে হাত নাড়িয়া, প্রেমের ভাষায় বলিব ‘যাও তুমি আমার কেহ নও’।” ইহাট কি হিন্দু-সমাজের প্রকৃত চিত্র? এত পাপ বন্ধে লইয়া কোন সমাজ কি কালজরী অমরত্ব লাভ করিতে পারে? এত দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ কি কখন সৎসং বিপ্লবের মধ্যে আপনায় স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুর রাখিতে পারে? তাহার পর তিনি প্রায়শ্চিত্তের কথা বলিয়াছিলেন—“হাঁ, প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু বলুন কোন্ পাপের?—আপনারা যাহা গোপনে করেন, আমরা তাহা প্রকাশ্যে করি বলিয়া? ও আপনারা যেখানে অসত্যের, অশ্রদ্ধের প্রেরণ লন, আমরা সেখানে সত্যের পাথে আগিয়া দাঁড়াই বলিয়া? আরাকসের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিব? কোন্ লোভে? এই সমাজে চাকিয়ার (টুকিয়ার?) জন্য প্রায়শ্চিত্ত? এই জালময়, গল্পময়, কীটময়, ছেঁড়া সমাজে যাইবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত? এ স্বর্গতার দালানে, এ শঠতার ভাণ্ডার ঘরে, এ নীচাশয়তার আঁতাহুড়ে টুকিয়ার জন্য প্রায়শ্চিত্ত?—আপনাদের উন্নয়নতা অথবা দৃষ্টতা যদি এই সমাজে টুকিয়ার জন্য বিলম্বিত ফেরতদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন।

—বরং আমরা আপনাদের সমাজে এতদিন যে ছিলাম, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন, রাজি আছি। যে সমাজে পদে (পদে ?) ভীকৃত্য, সত্যের মানি, নির্দয়তা; যে সমাজে পদে পদে মিছা কথা, বিবেকের বেতাবৃত্তি, সে সমাজে হইতে এতদিন বাহির হইয়া আসি নাই কেন, ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসেন ত রাজি আছি।” বিজ্ঞেস্ত্রাণল যে সমাজের অন্ধে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিতপালিত হইয়াছিলেন, সেই সমাজকে কেবল উপেক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন নাই; পরন্তু তাহাকে লোন্ডের নিকট ঘৃণিত করিতে বসেই চেষ্টা করিয়াছেন। আর সমাজ-শাসনের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধি করিয়া যে সকল বিলাত-প্রভাণ্ডিত বাঙ্গালী—কেবল বাঙ্গালী কেন ভারতবাসী—প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহারা উদ্বাদ বা মুখ নহেন। তাহারাও অশিক্ষিত, অধিকন্তু তাহারা অধীর।

অকৃত্য তিনি বলিয়াছিলেন,—“হিন্দু জাতির জাতীয়ত্ব অনেক কাল গিয়াছে। তাহার প্রাণ—বিধ্বাস, চলিয়া গিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দু বাজারই টিকি রাখুন, ফেঁটা কাটুন, ভগবদগীতার পাত উল্টোন; সে কেবল ইংরেজ বিধেবিত্তা বা আপনায় জিনিষে মমতার নামান্তর মাত্র। হিন্দু ধর্মের আসল বিধাস বাহা ছিল তাহা গিয়াছে। • • সত্য বটে, যে এই পক্ষ বিংশতি কোটি হিন্দুর মধ্যে এখনও অন্ততঃ বিংশতি কোটি হিন্দু, হিন্দু ধর্মকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নাকারে বিশ্বাস করে। কিন্তু সে বিংশতি কোটি অশিক্ষিত। শিক্ষার বিস্তারের সহিত তাহাদেরও আন্তরিক বিশ্বাস অবসিহত হইবে।” x যে হিন্দু ধর্ম যুগে যুগে বিতর্ক-শতশাখ গ্রহণ বন্যপতির মত অব্যবহিত ছাদ্রায় লোককে শাস্তিদান করিয়াছে ও করিতেছে, সেই ধর্মকে বিজ্ঞেস্ত্রাণল প্রাণহীন বলিয়াছেন। অথচ তিনি তাহার এই উক্তির সমর্থনে আবশ্যিক যুক্তির অবতারণা করিতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্মযাজকগণ মধ্যে মধ্যে এইরূপ কথা বলিয়া থাকেন। তাহাদিগকে বিরূপ করিয়া পরিহাস-রসিক মার্ক টোয়েন (সামুয়েল ক্রিমেল) বলিয়াছিলেন, বারাগসীতে ভীষণতরঙ্গের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া খৃষ্টধর্ম যাজকগণ বলেন, এই পুনরুত্থানে যুহুর চিহ্ন সপ্রকাশ; ইহা যুহুর পূর্বগামি চাকলা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু জগতে কোন ধর্মের যুহুর মত অনিশ্চিত ব্যাপার আর নাই। •

x ভারতী, ১০২২।

• More Trampa Abroad.

“পূণ্যভূমি” ব্যাঘ্রশব্দী হইতে “ভারতীয় রাজধানী দ্বিতীয় প্রদীপ” নবমীপ পর্য্যন্ত হিন্দু তীর্থস্থানে যাত্রীদিগের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে হিন্দু ধর্মকে কেহ যে প্রাণহীন বলিতে পারে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু বিজ্ঞেন্দ্রলাল ভাষার একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—এখনও যে “বিশ্বেশতি কোটি হিন্দু, হিন্দু ধর্মকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নাকারে বিশ্বাস করে,” “সে বিশ্বেশতি-কোটি অশিক্ষিত” আর “শিক্ষার বিস্তারের সহিত তাহাদেরও আন্তরিক বিশ্বাস অস্বহিত হইবে।” এ বিশ্বাস হিন্দুধর্মদেবীর পক্ষে হতানার সামান্য উপায় হইতে পারে, কিন্তু ইহার সত্যাসত্য কে নির্ণয় করিবে? এখনও হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসই কি অশিক্ষিতের নিদর্শন? ভাস্করানন্দ বিদ্যুদানন্দ হইতে দয়ানন্দ বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলকে অশিক্ষিত বলা যে স্পর্ধার পরিচায়ক সে স্পর্ধাকে তিরস্কারের উপযুক্ত ভাষা আছে কি?

হিন্দুধর্মে শিক্ষিত ব্যক্তির বিশ্বাস, বিজ্ঞেন্দ্রলাল এমনই অসম্ভব মতে করিতেন যে, তিনি শিক্ষিত হিন্দুর হিন্দুধর্মে বিশ্বাসকে ভণ্ডামী বা ইংরাজ-বিশেষিতা বলিতেও কুটিত করেন নাই। ধর্ম-বিশ্বাস বিবেকবুদ্ধিপ্রণোদিত হইতে পারে না; বিবেক ধর্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। বিজ্ঞেন্দ্রলালের উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি কোন ধর্মেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পারিলে তিনি এমন কথা বলিতে পারিতেন না। আমাদের দেশের কথা—

“যেনালা পিতরে বাতা যেন বাতা পিতামহাঃ।

ভেন যায়্যাং সতাং মার্গং ভেন সচ্ছন্ ন বুয্যতিঃ” (মহু)

দিয়াছেন যেই পথে পূর্ব পিতৃগণ,

প্রকৃষ্টে সে পথ কর তাহাতে গমন।

গীতার উক্ত হইয়াছে, “অধর্মে নিধনং প্রেরঃ পরবর্ধো ভয়াবহঃ।”

বিজ্ঞেন্দ্রলাল এই মতের অস্ববর্তী হওয়া দূরে থাকুক পিতৃপিতামহাদ্বন্দ্বিত ধর্মকেই বিজ্ঞপের লক্ষ্য করিয়া লোকসমাজে নির্মিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি হিন্দুধর্মের কোন্ ভাব দেখিয়াছেন? যে ধর্ম মানবের সামাজিক ও নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া বৈবশ্য সামঞ্জস্য সংস্থাপিত করিয়াছে—যে ধর্ম অধিকারীভেদে জড়বাদ হইতে মার্যবাদ পর্য্যন্ত বিবিধ মতের আপাতঃদুঃষ্ট বৈবশ্যের মধ্যে যে সার সত্য নিত্য, তাহারই কথা অদ্বৈত বরাইবার চেষ্টা করিয়াছে ও সে চেষ্টার সকলতা লাভ

করিয়াছে—বে ধর্ম উদারতার অন্য সকল ধর্মকে পরাক্রান্ত করিয়াছে বলিলেও অস্বীকার হয় না—বিশেষতঃ সেই হিন্দুধর্মের স্বরূপ বুঝেন নাই; বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি তাহাকে বিক্রপবাণে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার বিক্রপবাণ শাণিত হইলেও তাহার অঙ্গ বিদ্ধ করিতে পারিয়াছে কি ? তিনি যদি ভারতবাসীর—হিন্দুর—ব্রাহ্মণের সংস্কার লইয়া সত্য সত্যই সে ধর্মের স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিতেন তবে তিনি বিক্রপ করিয়া হিন্দুধর্মসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন সত্য সত্যই সেই কথা বলিতেন—

“ছেড়ে না রে এমন ধর্ম ছেড়ে না রে তাই !”

তুমি ও আমি ।

(ইংরাজী অবলম্বনে)

তুমি চক্ষুযা রুচির কান্তি, আমি পারাবার বালা !
আকাশ-বাগানে হাস যবে তুমি সুখ-বসিষণ করি',
আশা তরঙ্গ উত্থলে আমার উচ্ছ্বাস, হৃদি-আলা !
যত ধ্বজ, রক্ত বিবাহ-পাহাড় লুকা'য়ে রাখে, লো, যরি !

কিন্তু, কিরায়ে যখন লগু আমা হ'তে চাক্ষু যুববানি, অরি !
নীচে পড়ে' যায় তরঙ্গ বয়, পাহাড় ব্যস্ত হয় ;
ধরার আঁধার ভীর-রেখা হেরি' ভীত হই, প্রেমযরি !
তুমি চক্ষুযা, আমি পারাবার—কোথা ইথে সশয় ?
ঐবিকৃতভূষণ মল্লযদার ।

কবি বিহারীলাল ।

(৫)

স্বপ্নের ধ্যান ।—বিহারীলাল স্বপ্নের উপাসক ছিলেন,—রূপের ধ্যান করিতেন । কবি শৈলী বলিতেন, ধ্যানময় অবস্থায় কবিরা যে দৃশ্য দেখিতে পান, যোগভঙ্গ হইলে তাহা তজ্জাবেশে দুই স্বপ্নের মত আপষ্ট ও বিলীন হইতে থাকে, স্মৃতগাং অক্ষর ভাবে তাহা অঁকিতে পারেন না । সেই কারণেই বোধ হয় “যোগেচ্ছ” বিহারীলাল বলিতেন—

অতি অপরূপ রূপ

কেবল স্বপ্নে দেখি ; দেখাইতে পারিনে ।

কহে সে রূপের কথা, বসন্তের তরুণতা,

সমীরণে ভেঁকে বলে নির্জনে কানন ফুল

শব্দে, স্রবে হরিণীর আঁধি করে ঢুল ঢুল ।

কবি সেই রূপ-সাগরে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । তাঁহার ‘বাধুরী’ কবিতাটি সত্য-শিবস্বপ্নের একটি আবেগময় উচ্ছ্বাস, বিষম্যাপী নিরস্ত্রিত ঐক্যতানময় শৌলধা-বিকাশের এক অপূর্ণ শব্দ । বসন্তের কুসুমিত তরুণতায়, ইন্দ্রধনুর বিভিন্ন বর্ণরাশে, শারদনভের শুভ্র মেঘমালায়, ঘুমন্ত শিশুর স্বপ্নহাস্তে, প্রভাতের শান্তোচ্ছল শুক তারায়, স্নাতদেহা বিদলিতকেশপাশ পতিসোহাগিনী যুবতী সতীর আনন্দ-হাসিত অধরে, ফেনিল তরুণময় অধুরাশির শুভ্র হাসে, তরুণনের ইষ্টবৃষ্টি দর্শনোৎকল্ল আননে, মানববসন্তের বৃষ্টিমান প্রেম্যানন্দে, জনকজননী, দারাসুত, সখা-সখিগণের মেহভক্তি-প্রেমপ্রীতিরসের উদার উচ্ছ্বাসে, জগে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, অনিলানলে, নিত্যের সৃষ্টির অজয় রহস্যলীলায়, সর্বত্র, সর্বভূতে স্বপ্নের অনন্ত বিস্তার, চিন্ময় বিকাশ দেখিয়া কবি বিশ্বের ও উল্লাসে আত্মহারা হইয়া গাহিয়া গিয়াছেন—

কোটি কোটি স্বর্গ ভাষা,

পূর্ণিমা তরু আঁঠি

স্বপ্নাশি স্বপ্নতরে

অলস অদল পান্না,

মনোহরা ধরাধারি

কি বিলস গল্পমহে

কি যেন মহান শ্রুত বাজিতেছে সমন্বয়ে,
 তাহি এ সৌন্দর্য্য গানে কি যেন উদয় প্রাণে ।
 কে যেন কতই প্রাণে একা লীলা করে ।

উদার উদার দৃষ্ট এই যে বিচিত্র বিশ্ব
 পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে ত্রেহ কাহার বিনোদ পেহ ।
 কাহার কতলা মনে আত্ম'মিন'খাম্বী ।
 তিনি এর অবিচ্যুতী অপপ্রাণ রূপিত ।

এতাকে বিহাজমান সর্গভূতে অধিষ্ঠান
 জুনি বিশ্বময়ী কান্তি শীত অস্থখা
 কবির যোগীর বাণ তোলা হেনিকের আশ
 মানব মনের জুনি উদার হৃদয়া ।

সারদার গান ।—যে শ্রেণীর কবিরা বৈচিত্র্যময় মানব-চরিত্রের আলোখ্য প্রদর্শিত করিয়া অগৎকে বিমোহিত করিয়াছেন, অথবা ঘটনা-বহুল বিব্রাট কল্পনাময় মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া অনুরহ লাভ করিয়াছেন, বিহারীলাল সে শ্রেণীর কবি নাহেন । কিন্তু আর এক শ্রেণীর কবি আছেন ; তাঁহাদিগকে গায়ক কবি বা গীতিকবি বলে । দোয়েল পাণ্ডিয়ার বসন্ত-প্রভাতী গানের মত, তাঁহাদের স্বভাবজ গান, স্বপ্নের অনিবার্য উচ্ছ্বাস, অগৎকে যাতাইয়া জুলে । সে গান মর্ত্যলোক ছাড়িয়া মানবকে বর্গলোকের আশাস দেয় ; সে গানে মলিন ব্রুতিকা—পৃথিবীর কথা নাই । তাহা কঠিন স্পর্শ সহ্য না । ঘটনা বর্ণনা বা চরিত্রসৃষ্টি, উপদেশ বা উত্তেজনা গদ্যে হইতে পারে, কিন্তু গায়ক কবিদিগের মনের কথা গীতে বা কবিতার ভিন্ন আর কিছুতে ব্যক্ত হয় না । বিহারীলাল শেষোক্ত শ্রেণীর কবি ।

বালাকান হইতে যে ধ্যানযোগ শিক্ষা করিবার জন্য বিহারীলাল ব্যাঙ্কল হইয়াছিলেন, যে স্বপ্নপ্তি তাঁহারই বলিয়া প্রতি রজনীর অন্ধকার কবিকে আবাস দিতেছিল, সেই যোগ, সেই শক্তি 'সারদাংকল' রচনার সময় কবির আরবাবীন হইয়াছিল । এতদিন কে যেন তাঁহাকে অশ্রুনির্নির্দেশ করিয়া ডাকিতেছিল, কি যেন সুবর তাঁহার কর্ণে বাজিতেছিল, তিনি কি যেন একটি ছায়াময়ী সৌন্দর্য্য-মূর্তির পশ্চাতে ছুটিতেছিলেন । সে মূর্তি চকস চরণে আলোরায় মত কবিকে ধরা দেয় নাই । কবি অপদেবতাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় অস্থির হইয়াছিলেন ; এবং তাঁহার মনের আকুলতা কতই কবিতারূপে

বিজনে আঁধারে তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছিল, তিনি কত কি পরিচিত, সাধারণ কথাও বলিতেছিলেন। এইরূপ সাধারণ কথা বলিতে বলিতে, পরিচিত গান গাহিতে গাহিতে, কবি এক দিন এমন কথা বলিয়া ফেলিলেন যাহা মৌলিক এবং বাহার মহিমায় কবি নিজেই আত্মহারা হইলেন। এমন গান গাহিলেন যাহার অন্তরময়ী রাগিনী গায়ক ও প্রোতা-উত্তরকেই মুগ্ধ করিল। বিহারীলালের নিজের কথায়, তখন—

কবির প্রাণেতে পশি আচবিতে কে রূপসী,
বীণা করে খেলা করে হসিত বয়ানে,
অলস অপাঙ্গে চায় কবি নিজে মোহ যায়,
জগৎ জাগিয়া উঠে এক মাত্র গানে!

‘সারদামঙ্গল’ বিহারীলালের সেই গান। গান যেমন কি এক অনির্বচনীয় অতল গভীর ভাবের আয়াদের প্রাণ মন উবেলিত করে, এবং অসীমের প্রান্তদেশে লইয়া গিয়া জনেকের জন্য আশাদিগকে (তাঁহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিকোণ করায়, ‘সারদামঙ্গল’ও ঠিক সেইরূপ করে। ‘সারদামঙ্গলের’ ভাবাই কেবলমাত্র গানের ভাষা নহে; উহার কল্পনা, উহার অভিব্যক্তি, উহার অস্থিমজ্জা উহার প্রাণ সমস্তই সঙ্গীতময়। কবি আলীবন একান্ত মনে সারদার আরাধনা করিয়াছিলেন—

ভক্তি ভাবে এক তানে

মজেছি তোমার ধ্যানে,

কমলার ধনে মানে নহি অভিলাষী।

যুক্তি তাই সারদা প্রিয়ভক্তের কাতর সাধনা সফল করিয়াছিলেন। বিহারীলালের সারদা কেবলমাত্র কবিতা ও সঙ্গীতকণার সৃষ্টিদাত্রী, বান্ধেবী নহেন; ইনি বিশ্বব্যাপিনী সৌন্দর্য্য ও প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি; ইনি জগদ্রাতা। সারদাকে বিহারীলাল প্রথমে কবিগণের চিরন্তন প্রধামত মাক্তভাবে ভাবিয়াছেন, পরে কাব্যগুরুহরের আরম্ভস্থল স্বত্ত্ব বিধত্ত্ব করিয়া কখন ভগিনী কখন বা কস্তা এবং পরিশেষে প্রণয়িনী ভাবে আত্মদান করিয়াছেন এবং প্রসন্নময়ী সারদা, প্রেমময়ী রূপেই ভক্তের হৃদয়গগন অধিকৃত করিয়াছিলেন। বিহারীলাল ভক্তি ছাড়িয়া প্রেমকে অবলম্বন করিয়াছিলেন,—ভালই করিয়াছিলেন; ভক্তি দূরের বস্তু—প্রেম নিকটের। বিহারীলাল আত্ম-ধ্যাকে মস্তক হইতে নাগাইয়া হৃদয়ে ধরিয়াছিলেন,—যথার্থ প্রেমিকের পরিচর

দিয়াছিলেন। বিহারীলাল সাধনার বনকে গ্রী-মুষ্টিতে দেখিয়াছিলেন;—যদি
জগতের কোন পদার্থে শিবসুন্দরের ছায়া একাধারে প্রতিফলিত থাকে তাহা
শ্রেয়-করুণা-সুখ-কোমলতায়ময়ী নারী-মুষ্টিতে। বিহারীলাল সুন্দরের উপাসনা
করিয়াছিলেন। সুন্দর হইতে মহান্ জগতে আর কি আছে তাহা জানি না;
সকল স্তম্ভ সুন্দরের অন্তর্ভুক্ত; কোন পাশ্চাত্য মনোবী বলিয়াছিলেন, সুন্দরই
জগতের আদি কারণ, সুন্দর হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতি। বিহারীলাল
সুন্দরকে ভজনা করিয়া জগজ্জননীকে দেখিয়াছিলেন, জগদ্ধাত্রীকে পাইয়া-
ছিলেন। বিহারীলালের প্রেমপূজা ইন্দ্রিয়-লালসা-বিরহিত; অতি উদার,
অতি মহান্, অতি পবিত্র। বিহারীলালের উপদেশ—সুন্দরের ধ্যান কর, সুন্দরে
শ্রেয় স্তম্ভ কর এবং সেই মহা প্রেমে জীবন উৎসর্গ কর—আত্মপ্রসাদ লাভ
করিবে, পরমানন্দ পাইবে, কৃতার্থ হইবে। ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে পৌণ্ড্র্যে
আমাদিগের এই শিক্ষা দান করে।

অবশ্য, মুখ্যতাবে কোন উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে ‘সারদামঙ্গল’ রচিত
হয় নাই। ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে পুণ্যের জয় পাপের ন্যাস্তি প্রভৃতি কোনও
আধ্যাত্মিক শিক্ষা নাই। ‘সারদামঙ্গল’ বদৈশ্বর্য্যের বজ্রাতিশ্রেয় প্রভৃতি
কোনও মহতী বাসনা উদ্দীপিত করে না। কোনও শিক্ষা বা উদ্দেশ্যের
অন্বেষণ না করিয়া ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যকে কাব্য ভাবেই উপভোগ করিতে
হইবে। কাব্য প্রসাধন কলায় অদ্বীত। প্রসাধন কলায় সুখা উদ্দেশ্য
সৌন্দর্য্যসৃষ্টি; যে সুন্দর সার্বভৌমিক ও বিশ্বজনীন, যে সুন্দরসম্বন্ধে দেশ-
কালভেদে মানবের মতপার্থক্য নাই, যে সুন্দর মানবের সঙ্কীর্ণ রুচির বা
সুদূর নীতির সীমান্ত হইয়া উপভোগ করিতে হয় না। সেই চির সুন্দরের
অগণ্য বিকাশের কোনও একটিকে মানবের চিত্তপ্রগোড়র করিতে পারিলেই
ললিত কলায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সুন্দরের অসুস্থিতি মানবমনে আনন্দ ও মহত্ব
আনিয়া দেয়,—কবি, গায়ক, চিত্রকর বা ভাস্করের নিকট অপর কোনও
শিল্পীর প্রত্যাশা করিবার প্রয়োজন হয় না। সে হিসাবে ‘সারদামঙ্গল’
ললিত কলায় চরমোদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছে। কাব্যরসে রসিক পাঠকের
নিকট ‘সারদামঙ্গল’ অতি উচ্চ অঙ্কের কাব্য, কবিরের অপূর্ণ উদ্ভাস,
বিমল আনন্দের অনন্ত উৎস বলিয়া চিরদিন সম্যক্ হইবে।

ত্রিনবরত বোধ ।

স্নেহের বন্ধন ।

—২০—

(১)

বিনীত ভাবে—তার কণ্ঠে অন্নপ্রসাদ কহিলেন,—“আমাকে অন্ততঃ এক মাসের জন্য বাড়ী যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।”

মাহুল পরাণচন্দ্র কহিলেন—“এখন তোমার বাড়ী যাইবার কি প্রয়োজন ? এখন নীত আসিয়া পড়িল, উৎকৃষ্ট তুলার জন্য আগ্রায় যাইতে হইবে ; বিশেষতঃ পত বায়ের চালানের তুলা ভাল ছিল না। এবার তোমাকে স্নায় হইয়া নতুন মহাজনের সহিত যোগাযোগ করিতে হইবে এবং বাহাতে সুবিধা দরে ভাল তুলা পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সময়ে কিরূপে তোমার বাড়ী যাওয়া হইতে পারে ?”

অন্নপ্রসাদ মাহুলের কথায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি পুনরায় বিনীত স্বরে কহিলেন,—“অন্ততঃ ১-১২ দিনের জন্যও যাইবার অনুমতি প্রদান করুন। মাতা ঠাকুরানীকে দেখিবার নিমিত্ত আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আমি যত সতর পারি, প্রত্যাবর্তন করিব।”

পরাণচন্দ্র একটু বিরক্তিরে কহিলেন—“তুমি ছেলে মানুষ, ব্যবসায়ের ব্যাপার এখনও সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পার নাই। আমি তোমার উপর আমার এই বিরাট ব্যবসায়ের ভার দত্ত করিয়াছি কেন ? তোমারই ভালর জন্য। ভার বহন করিতে না পারিলে, বুদ্ধি-প্রভাবে মন স্থির করিতে না পারিলে কোনও কর্ণেই সফল পাওয়া যায় না। এত বড় ব্যবসায়ের কর্তৃত্বভার তোমার উপর—তাহাতে নীতকৃত্ত আগন্তপ্রার। এ সময়ে আগ্রায় তুলা প্রস্তুত পদিয়াশে আমদানী করিতে না পারিলে সৰ্ব্বস্বের পরিশ্রম নিরর্থক হইয়া যাইবে। তাহা কি তুমি বুঝ না ? যাহা হউক, এ সময়ে আর কথা কহিও না—সুস্থিরচিত্তে আপন কর্ণে নিযুক্ত হও। আমি দ্বিদি ঠাকুরানীর স্থল সংবাদ আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি”—তিনি প্রস্থান করিলেন।

তাপিনের অন্নপ্রসাদ নিত্যকাল বিষম চিন্তে মগ্নকের কেশরাশি অঙ্গুলি-সঞ্চালনে বিশ্রান্ত করিতে করিতে অক্ষয়ভিক্ষু গমন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর বদনমণ্ডল চিত্তাপূর্ণ।

(২)

পর্যাপ্ত হইয়া সে সময়ে কীর্য্যাহারের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ধনী মহাজন বলিয়া পরিচিত ছিলেন । ব্যবসায়ই তাঁহার ধনোপার্জনের প্রধান পন্থা । মূতা, তুলা, বস্ত্র, কার্পাস, চাউল প্রভৃতি নানা দ্রব্যের ব্যবসায় তাঁহার ছিল এবং তাহা ছাড়া তিনি বাহাদুরী কাঠের ব্যবসায়ও করিতেন । সে দিকে যখন সুবিধা পাইতেন, সেই দিকেই তিনি প্রচুর অর্থনিয়োগ করিয়া লাভের মাত্রা বৃদ্ধি করিতেন । সকল রকম দ্রব্যের ব্যবসারেই তিনি সিদ্ধহস্ত এবং হিসাব-নিকাশে এতদূর পারদর্শী ছিলেন যে, কাগজ-পত্র দর্শনমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিতেন । এই সকল কারণে পর্যাপ্ত হইয়া সে সময়ে উক্ত অঞ্চলে এক জন ব্যবসায়কুল শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন । একান্ত বাড়ী—প্রাণালীভক্ষণে চতুর্দিকে ইষ্টক প্রাচীর নিবদ্ধ । দোল চুর্ণোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুর ধ্বং নানা উৎসব তিনি সম্পন্ন করিতেন । কোন বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্যের ক্রটি হইত না । বাড়ীতে পরি-জননের সংখ্যাও নিত্যই অল্প নহে ; ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, মাতুল, ভ্রাতৃপুত্র, ভাগিনের প্রভৃতি বাতীত কয়েক জন অনাথ আত্মীয়পুত্রকেও তিনি প্রতিপালন করিতেন । সেই ক্ষুরধ্ব শৌধ্যানি কপোতগুহ্মনয়ং নরকণ্ঠধ্বনিতে সর্বদাই মুখারিত ছিল । পর্যাপ্তহস্তের স্বয়ং প্রশস্ত-স্তির । সে ক্ষম্যে কোনও দিন হিংসা-বোধের ভরসা উঠে নাই এবং বিবাদের কালিমায় তাঁহার বদনমণ্ডল কোন দিনই সমাচ্ছন্ন হয় নাই । তিনি সদাই প্রসন্নমন ; যুগ্মযুগ্ম হস্ত সে মুখে সর্বদাই লাগিয়া আছে । প্রতিভালোকে তাঁহার ললাট দেশ উদ্ভাসিত । দাস-দাসীগণের প্রতিও তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না ; সকলেই তাঁহাকে দেবতার স্তায় ভক্তি ও যত্নের গ্রাস্ ভোগ করিত । অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত কোন দিন কেহ তাঁহার নিকট কোন অভিযোগ উপস্থিত করে নাই এবং তাঁহার বাড়ীতে কখনও কোনরূপ বিবাদবিসম্বাদের কথাও শুনা যায় নাই ।

একমাত্র ভাগিনের অন্নবাপ্রসাদকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন । অন্নদাবানু শৈশবে পিতৃহীন হইয়া মাতুলের স্নেহযত্নে লালিত পালিত হইয়া পিতার অভাব এক দিনের অল্পও অনুভব করিবার অবসর পায়েন-নাই । মাতুল তাঁহাকে শৈশবকাল হইতে কোলে পিঠে করিয়া মাতৃব করিয়াছেন ।

ভাগিনের প্রতি পর্যাপ্তহস্তের অসামান্য স্নেহ লক্ষিত হইত এবং ভাগিনের অন্নদাবানুর পক্ষেও সে স্নেহ-বন্ধন ছিল করা সাধ্যাতীত বলিয়াই তিনি এত

দিন মনে করিয়া আসিয়াছেন । কিন্তু আজ দুই দিন তাহার চিন্তাকাশে এমন একখানা পতীরক্কবর্ণের মেঘ উঠিয়াছে যাহার প্রভাবে তিনি সকল দিক ভালরূপ দেখিতে পারিতেছিলেন না । একটা অজ্ঞাত দূর্ভাগ্য— একটা অসদ্ব্যবস্থা কখনো তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে । যতক্ষণ না সে বাসনা পূর্ণ হইতেছে ততক্ষণ তাহার শান্তি নাই ; তিনি আজ পনের বৎসরকাল তাহার মাতুলের বিশাল কারবারের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সুচারুরূপে তাহা পরিচালন করিয়া আসিতেছেন—কোন দিন কোন কর্মচারীই তাহার কোন বিষয়ে ত্রুটি ধরিতে পারে নাই । কর্মক্ষুশল মাতুল এমন ভাবে তাঁহাকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভাগিনেয় যেন কালে একজন বাণিজ্য-ক্ষুশল শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া বঙ্গদেশে পরিচিত হইয়া উঠেন । তাঁহার একটি পুত্র অল্পবয়সী বাবুর সময়সী ছিল ; পরাণচন্দ্র প্রাণোপম পুত্রকেও ভাগিনেয়ের যত যত্নে শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন নাই ।

অবশ্য ভাগিনেয়ের অসামান্য বুদ্ধিকৌশল, অসাধারণ ধৈর্য্য তাঁহাকে মোহিত করিয়াছিল বলিয়াই এমনটি হইতে পারিয়াছিল । নিজের প্রকৃতি-দত্ত গুণ না থাকিলে, কেবল শিক্ষা লোককে গুণবান্ করিয়া তুলিতে পারে না ; স্বভাবতঃ সংস্কার না থাকিলে কেবল প্রহার ও তড়না বালককে বিদ্যাদান করিতে সমর্থ হয় না । আবৃত সংস্কারকে উন্মোচিত করাই শিক্ষার কার্য্য । প্রকৃতিতে যাহা নাই, তাহা আসিবে কোথা হইতে ? অল্পবয়সী বাবুর প্রকৃতিতে কতকগুলি গুণ নিহিত ছিল বলিয়াই মাতুল শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহাকে অতি শীঘ্র গুণবান্ করিয়া তুলিয়াছিলেন ।

(৩)

অল্পবয়সী তখন আর কিছু না বলিয়া বনান্তে “পদীতে” আসিয়া উপবেশন করিয়া আপন কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন । যথারীতি তখনকার কার্য্য সমাপনান্তে তিনি যখন আহার্য্যার্ণ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশজন্য উঠিলেন তখন চিন্তা আবার তাঁহাকে আক্রমণ করিল । সে আক্রমণে তাঁহার হৃদয় আত্মোন্মিত—আতুলিত । তিনি সে আতুলতা গোপন করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না । তাঁহার হৃদয়ে যে বাসনার বহি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অতি শীঘ্র নিরূপিত হইবার সম্ভাবনা নাই । তিনি অতিমাত্র চিন্তাতরে বীরে বীরে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ; কিন্তু পা যেন আর উঠে না । মাতুলকে তিনি বিলম্ব চিনিতে পারিয়াছিলেন ।

ভাঁহার যুগ এখনও বিমলিন দেবিলে বৃদ্ধের মনে বড় কষ্ট হইবে—হয়ত মনে সম্বোধন করিতে পারে—এইরূপ চিন্তা করিয়া অন্নদাবাবু অতি কষ্টে মনো-ভাব গোপন করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন ভাঁহার দেবতুল্য শুভ্র কেশ মাড়ুল বাড়ীর বালকবালিকা ও অন্যান্য স্কলকে আহ্বান করিতেছেন।

পর্যাপ্তরূপে কোনও দিনই একাকী আহ্বার করিতে পারিতেন না। মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে স্বয়ং সকলকে ডাকিয়া এক সঙ্গে আহ্বার করিতেন। কোনও দিন ঘটনাক্রমে ২৪ জন লোক কম হইলে ভাঁহার ভাল আহ্বার হইত না। প্রাচীন কালের অনেক সংসারে এইরূপ অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধনের কথা আমরা শুনিতে পাই। এখনও এই বদলে অনেক গৃহস্থ আছে, বাহাদুর অন্ততঃ একজনকেও অন্নদানে পরিতৃপ্ত না করিয়া তবে স্বয়ং আহ্বার-কার্য সম্পন্ন করেন না। কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে। তাহা দেশের দুর্ভাগ্য।

বাহা হটক, আহ্বার শেষ করিয়া অন্নদাবাবু বিপ্রানার্ব খীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্নানোত্তর শয্যায় উপবেশন পূর্বক তাড়ুল চর্ষণ করিতে করিতে বৈঠক হইতে হুঙ্কার তুলিয়া লইলেন। চাকর পূর্বেই কালিকার অগ্নি দিয়া দিয়াছিল। আহ্বারান্তে পান তামাক বাজালী বাবুর চিত্রপরিচিত। এমন চিত্রার উল্লেখ ও অপনোদক বস্তু জগতে নিত্যই দুল্লভ।

অন্নদাবাবু চিন্তা করেন—আর এক বার তামাক টানেন। এ সময়ে পত্নী কাত্যায়নী বেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি অনেকটা আরাম পাইতেন। কিন্তু পর্যাণচক্রে সংসারে বৃদ্ধগণকে এক এক বিষয়ের কর্তৃত্বভার বহন করিতে হইত। বৃদ্ধগণ যথারীতি সেই কর্তব্য সম্পন্ন করিতেন এবং ভাঁহার উপর বয়স ও অবিকারী হিসাবে ব্রত, নিয়ম, পূজা, অর্চনা প্রভৃতি দেবকার্য সম্পাদন করিয়া তবে আহ্বার করিতে পাইতেন। প্রাক্তিতে আহ্বারাদি শেষ করিয়া প্রাচীনগণ স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করিলে তবে বৃদ্ধগণ স্বাবীর কক্ষে প্রবেশের অবিকারিণী হইতেন।

অন্নদাবাবু শয্যায় কিছুকণ ছটকট করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং কটি হইতে মস্তক পর্যন্ত বারংবার আন্দোলিত করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন—“আমি যে আমার বনবর্তী, হইরা পিতৃপন পুত্রনীপ স্নেহময় মাড়ুলের ব্যবসায় হইতে পাঁচ হাজার টাকা উঠাইয়া লইয়াছি, তাহা

তিনি অতি শীঘ্র জানিবার সম্ভাবনা; না থাকিলেও কার্যটা কি ভাল করিয়াছি ? মন্দই বা কি করিয়ায় ? টাকা শু আমায়ই মামায়—লোক কথায় বলে, 'মামায় বেয়ে ভাগ্যে মামুদ'। ইহাতে কোনই মন্দ কার্য হয় নাই—অন্ততঃ আমার বিবেক তাহাকে মন্দ বলিয়া স্বীকার করে না।" হায় অন্নদা! বাবু! তুমি ভুল বুঝিয়াছ! তোমার বিবেক যাহা মন্দ বলিয়া স্বীকার করে না, সাধারণের বিবেক তাহাকেই যথেষ্ট মন্দ বলে—ও দিক্‌টা দেখিবার অবসর তোমার হইল না কেন?

তিনি পুনর্বার ভাবিলেন—“মামা আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন সত্য; কিন্তু তাঁহার শু স্বয়ংক্রম হইয়াছে। যদি তিনি ঘট্যৎ পরিদ্রা যাতেন, তবে তাঁহার পুত্রগণ যে আমাকে এইরূপ কর্তৃত্বভার দিবে, তাহার শু কোন কারণ দেখি না। তিনি জীবিত থাকিতে থাকিতে পুত্রীয় টাকা হস্তগত করিয়া পৃথক্ তাহে পৃথক্ ব্যবসায় করাই আমার পক্ষে এখন কর্তব্য। নতুবা চিরজীবন পরের দাসত্ব করিয়াই জীবন কাটাইয়া দিতে হইবে।

পাঠকগণ সম্ভবতঃ এককণে অন্নদা বাবুর চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি নিজের ভবিষ্যৎভাবনার অস্থির হইয়া এই বিষয় কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন। এককণে কোন রকমে মাতুলের চক্ষুর অন্তরালে বাইয়া একটা পৃথক্ ব্যবসায় করাই তাঁহার লক্ষ্য। মামা কিছুতেই তাঁহার নাথে বিশ্বাস-দাতার মামলা রুজু করিতে পারিষেন না এ বিশ্বাস তাঁহার খুবই ছিল; আর উক্ত টাকার কথা তাঁহার মাতুল শীঘ্র জানিতে পারিষেন, এ ধারণাও অন্নদা বাবুর ছিল না। এককণে যে কোন রূপে হউক, পলায়ন করাই তাঁহার অভিপ্রেত এবং সেই জন্যই তিনি বাড়ী বাইবার জন্য মাতুলকে বরিত্তা বলিয়াছিলেন।

তিনি যখন মামাকে রাজী করিতে পারিলেন না, তখন মামীর নিকট বাইয়া তাঁহার মাতুলদেবীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বাড়ী বাইবার জন্য বরিত্তা বলিলেন। সরলচিত্তা স্বস্তি মামী অন্নদা বাবুর কথা শুনিয়াই কর্তার উদ্দেশে হুই একটি কথা বলিয়া বলিলেন—“বাবা! তুমি আজই তোমার রাজির পাড়ীতে বাড়ী বাও। আমি তোমাকে ছুটি দিলাম। আমার ব্যবসায় বড়, না তোমার মাতুলদেবী বড়।” বলা বাহুল্য, মামীরও তাঁহার প্রতি স্নেহের অভাব ছিল না। সে স্নেহের গুণঃ পরিশোধ করা সাধারণ শ্রেণীর ভাগিনেয়ের পক্ষে সাধ্যাতীত।

অন্নদাবাবু এতক্ষণে অনেকটা আশস্ত হইলেন। তিনি নিশ্চিত মনে গরীতে আসিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক গাড়ী আনয়নজন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং কাগজপত্র ও কাপস পরিষ্কার করিয়া দৌহ সিঁদুক বন্ধ করিয়া অধীনস্থ কর্মচারীকে কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিলেন। সে উপদেশের মর্ম্ম—তাঁহার অবিদ্যামানে উপস্থিত কোন্ কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল। তাহার পর তিনি বাটার মধ্যে আহারার্থ প্রবেশ করিলেন। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখেন, দক্ষিণ দিকের বাতাড়ায় বসিয়া তাঁহার মামী স্বামীকে তাঁহারই কথা বুঝাইতেছেন। মামী বলিতেছেন—“বাহার মুখ দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইয়াছি। মনের টান, বড় টান; সে মা'কে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছে, আর তুমি তাহাকে নিবেদন করিয়াছ? আশৈশব কোলে পিঠে করিয়া বাহাকে মানুষ করিয়াছ, ব্যবসায়ের খাতিরে তাহার একটা আবদার রক্ষা করিতে পার না? তবু তবু বাছাকে মনঃকষ্ট দিয়াছ।”

পরগণ্ডে কোন্ কথা না বলিয়া মুহু হাস্য করিলেন মাতা। সে হাসিতে স্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ সুসজ্জিত ছিল; কিন্তু অন্নদাবাবুর তাহা বুঝিবার সামর্থ্য সে সময়ে ছিল না। তিনি তাঁহার মাতুলের মুহু হাসিতে শিহরিয়া উঠিলেন—তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, “মামা কি অন্তর্য্যামী?”

মুহুর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া লইয়া অন্নদাবাবু কথাটা আর একবার পাড়িবার জন্য কি বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পরগণ্ডে বাধা দিয়া বলিলেন—“আর তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না। এখন কথা এই, যত শীঘ্র পার তোমার মা'কে দর্শন করিয়া চলিয়া আসিও। যেন বেশী বিলম্ব না হয়। তুমি কি জান না যে, তোমাকে এক দণ্ড না দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি?”

দৃঢ়চেতা পরগণ্ডের কণ্ঠস্বর স্পষ্ট। তাঁহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছিল; কিন্তু অন্ধকারে কেহই তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর পাইলেন না।

তিনি পুনরায় বলিলেন—“আমার বয়স হইয়াছে; তোমাদের ভবিষ্যৎ ভাবনার আমি অস্থির। এ সময় বাড়ীতে যেন অবধা বিলম্ব না হয়।”

অন্নদা বাবুর কর্ণে কথা প্রবেশ করিল মাতা। তাহার অর্থবোধ করিবার শক্তি সে সময়ে তাঁহার ছিল না। তিনি লৌহ সিঁদুকের চাবীর ত্যাগ

মামার হাতে দিয়া বলিলেন—“বান্ধে কাগজ পত্র ও সিন্দুক টাকা নোট সমস্তই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; আপনি সময় মত দেখিয়া লইবেন।”

পর্যাপ্তকৈ কহিলেন, “তাঁহার জন্য আমি চিন্তা করি না, তাহা দেখিবার ইচ্ছাও আমার নাই। কিন্তু মনে রাখিও—বাড়ীতে যেন বিলম্ব না হয়। আমি তোমার ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িল।”

অন্নদাবাবু আর তথায় দাঁড়াইতে পারিলেন না। তাঁহার সর্বশরীর যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, “মামা কি সব জানিতে পারিয়াছেন? তাঁহার মনস্তত্ত্ব কি ভবিষ্যতের যবনিকা তেজ করিয়া দর্শন করিতে পারে? আমি কি করিলাম?” বাহা হইবার হইবে বলিয়া তিনি ক্ষতপদে আহারার্থ প্রস্থান করিলেন।

(৪)

রাত্রি ১১টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অন্নদা বাবু পলায়ন করিয়া কেমন ভাবে নূতন ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন, এই চিন্তায় বিভোর। এমন সময়ে পত্নী কাত্যায়নী বীরে বীরে কক্ষনগো প্রবেশ করিলেন। পদশব্দে চমকিত হইয়া অন্নদা বাবুর চিন্তাহ্রদ ছিঁড়িয়া গেল; তিনি ঘরের দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিয়া দেখেন, তাঁহারই পত্নী কক্ষনগো প্রবেশ করিতেছেন। লজ্জায় তাঁহার মুখ রান হইয়া গেল। তাঁহার মনে হইল, যে পদশব্দ আমার চিরপরিচিত—যে মুখ দেখিবার জন্য আমার চক্ষু সদাই ব্যস্ত, সেই পদশব্দ ওপ্ততরের, সংবাদ আনিয়া দেয়, সেই মুখই লজ্জা প্রদান করে! বাস্তবিকই কি আমি দ্বন্দ্ব করিতে বসিয়াছি?

পত্নীকে নিকটে বসাইয়া অন্নদা বাবু কহিলেন, “মাতা ঠাকুরানীকে দেখিবার জন্য কয়েক দিনের জন্য বাড়ী বাইব। তোমাকেও সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহা হইয়া উঠিল না। যদি বেশী বিলম্ব হয়, তবে লইয়া বাইবার ব্যবস্থা করিব।”

দেখিতে দেখিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল। কিন্তু অন্নদাবাবুর নিদ্রা নাই। তিনি বিছানার পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। নিদ্রা আজ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—তাঁহার নিকট আসিতে তাহার সাহসে কুলাই—। তেছে না। তাঁহার চক্ষু বার জালা করিতে লাগিল; তিনি উঠিয়া বসিলেন।

বাধা বধার বত প্রবল, বেগ তথায় তত বর্দ্ধিত। অন্নদাবাবু দ্বার খুলিয়া

বাহির হইয়া পড়িলেন । তখন শেষ কার্তিকের ঠাণ্ডা বাতাস তাঁহাকে যেন কিছু শান্তি প্রদান করিল ।

ঊষাধেবী রান সূৰ্ত্তিতে আপনাত্মক আপন-সংবাদ ঘোষণা করিয়াহাত অন্নবা বাবু বাটীর বাহির হইয়া গাড়োয়ানকে ডাকিতে লাগিলেন । সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলে তিনি তাঁহাকে পাড়ী হাঁকাইবার আদেশ দিয়া ছাওনীর মধ্যে প্রবেশ পূৰ্ব্বক চীৎ হইয়া শয়ন করিলেন । কীৰ্ত্তাহারের আকাশ বাতাস, ভূমি জল যখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল, তখন তিনি নিদ্রামগ্ন ।

যখন তাঁহার নিদ্রাতত্ত্ব হইল তখন বেলা ১১টার উপর । তিনি তাড়াতাড়ি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমরা কত দূর আসিয়াছি ?”

গাড়োয়ান রম্ভান সেথ কহিল “বাবুজী, ঐ দেখুন, সম্মুখে সাতঘরা গ্রাম । আমরা সাত কোশ পর আসিয়াছি ।”

“যোটে সাত কোশ ?”

সাতঘরার নাম শুনিয়া অন্নবা বাবু শকট হইতে অবতরণ করিলেন । তাঁহার গাত্র তখন উত্তপ্ত—সামান্য জ্বর হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল ।

তিনি গাড়োয়ানের মাথার তাঁহার বিছানা বাস্তু তুলিয়া দিয়া সাতঘরার জনৈক আশ্রয়স্থল গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শয্যাগ্রহণ করিলেন ।

তিনি গাড়োয়ানকে বলিয়া দিলেন,—“আমার শরীর হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে । এই স্থানে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া তবে বাড়ী যাইব । তুমি এখন বাড়ী চলিয়া যা—কিন্তু সাবধান । আমার নামাকে কি অল্প কাহাকেও যেন এ কথা বলিস না !”

রম্ভান গাড়োয়ান বলিল, “তাও কি বলি ? আপনাত্মক বাইরা বুড়া হইয়াছি এ কথাটা হজম করিতে পারিগ না ?” সে প্রস্থান করিল ।

বলা বাহুল্য সে অন্নবা বাবুর বাইরা বুড়াও হয় নাই এবং তাহার উদর কোন দিনই কোন কথা হজম করিতে অভ্যস্ত হয় নাই ।

(৫)

অন্নবাবু দুই দিন অনাহারেই কাটাইয়া দিলেন । জ্বর সামান্য হইলেও প্রবল দৃষ্টিভঙ্গ্য তাঁহার আহারে রুচি ছিল না । স্নাত্তিতে তিনি দেখিলেন—যেন তাঁহার মাড়ুল সমস্ত ব্যাপারই জানিতে পারিয়াছেন । তিনি যে দিন পাঁচ হাজার টাকা হস্তগত করেন, তাহার দুই দিন পরেই মামা

তাহা জানিতে পারিয়াছেন । লক্ষ্যিক টাকার মূলধনের ব্যবসায়ের লাভ লোকসান তাঁহার ঘুৰে ঘুৰে ছিল । হিসাবনিকাশে তিনি এতদূর সূক্ষ্ম ছিলেন যে, কাগজপত্র দেখিবাখাতাই তাহার মণ্ড উপলব্ধি করিতে পারিতেন । কত লোক তাঁহার পরামর্শ পাইবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিত কে তাহার সংখ্যা রাখে ? এমন লোককে কি ফাঁকি দেওয়া যায় ? কিন্তু তাঁহার মাতুল যেন টাকার জন্য কোন চিন্তাই করিতেছেন না । তিনি তাঁহারই ভাবনার অস্থির ! তিনি যে শ্বেহের বন্ধনে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বন্ধন ভিন্ন হইলে বৃদ্ধের মৃত্যু যেন অবশ্যস্তানী । তাঁহার মাতুল আজ দুই রাত্রি নিদ্রা ঘাইতে পারেন নাই ; কেবল ঘর আর বাহির করিয়া বেড়াইতেছেন । তিনি মানসনয়নে স্পষ্ট দেখিলেন—তাঁহার শ্বেহশীল মাতুলের সমস্ত স্বয়ং তাঁহার প্রতি শ্বেহেই পরিপূর্ণ ! তিনি যে নৈশব হইতে তাঁহাকে ‘মাতুল’ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন, কার্যাকুল করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন ! তিনি যে তাঁহার অতি প্রিয়—দক্ষিণহস্ত-বস্ত্রপ ! কিন্তু তিনি তাহারই পরিবর্তে তুচ্ছ ভবিষ্যতের ভাবনার অন্ধ হইয়া যাহা করিয়াছেন, তাহা মস্তান্তরেই নানান্তর—বিবাসম্বাতকার অসন্ত দৃষ্টান্ত !

হঠাৎ তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল । তিনি অসুস্থ টীংকার করিয়া উঠিলেন । কিন্তু গভীর রাত্রিতে শৈশব অন্য কাহারও কর্ণসূত্রে প্রবেশ করিল না ।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল । নবোদিত স্তম্ভ অরুণ-কিরণে যখন গৃহ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল, তখন তিনি উঠিয়া বসিলেন । আজ তাঁহার স্বয়ং অনেকটা লঘু ।

ব্যসায়ের আহার সম্পন্ন করিয়া কিছুকণ বিশ্রামান্তে অন্নদা বাবু তাঁহার কুটুম্বকে কহিলেন—“আমার বিছানাপত্র এই স্থানেই রহিল ; সময় যত লইয়া ঘাইবার ব্যবস্থা করিব । শীতকালের বেলা, রোদ্রে বড় বেশী কষ্ট হইবে না । আমি এখন আসি।”—এই বলিয়া তিনি পাঁচ হাজার টাকার নোটপুঁজুর ব্যাগটি হস্তে লইয়া বেলা ৪টার সময় লাভঘরা হইতে রওনা হইয়া কীর্ণাহারান্তিমুখে চলিতে লাগিলেন ।

(৬)

রাত্রি ৮ টার সময় অন্নদাবাবু কীর্ণাহার প্রাপ্যের পূর্বপ্রান্তে “পরান দীলিত”—যে দীর্ঘিকা তাঁহারই ইচ্ছায় ও ভবিষ্যে তাঁহারই শ্বেহের দেবত্ব

মাতুলের নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে—সেই দীর্ঘিকার পাহাড়স্থিত বিততসহস্রাংশ পত্রবহল বিশাল বটবৃক্ষের তলে অন্ধকারে আপনাকে লুকাইত করিলেন ।

অন্নদা বাবুর কিছুতেই সাধ্য হইল না যে, সহস্র চক্ষুর দৃষ্টির মধ্য দিয়া তিনি এখানে প্রবেশ করেন—অথচ তাঁহার কার্য্যের কথা কেহই বিন্দুবিসর্গ অবগত নহেন ! দুর্ভাগ্য এমনই ভীতিপ্রদ যে, কর্ম্মীর মন কোন অবস্থাতেই ভীতিশূন্য হয় না । চলিতে ভয়, বসিতে ভয়, শয়নে উপবেশনে, ভোজনে বিশ্রামে সকল অবস্থাতেই অকারণ ভয় আশিয়া উপস্থিত হয় । অপরাধী প্রবল বাসনার বশে, সুখকামনায় তাহারই ইচ্ছিন্নগণসাহায্যে অপরাধ করে, আবার সেই ইচ্ছিন্নগণই কার্য্যান্তে তাহাকেই ভয়প্রদর্শন করে ।

আজ নির্ভীক বলিষ্ঠ অন্নদাবাবুর পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে । তিনি অন্ধকারে লুকাইত থাকিয়া গভীর নিশার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । বিবেক এখন তাঁহাকে কেবলই পীড়া দিতে লাগিল এবং কৃত্ত ভবিষ্যতের ভাবনা এখন কোথায় পলায়ন করিল । এখন তাঁহার প্রবল উৎকর্ষা—কিন্তু সে স্নেহময় মাতুলের চরণে পতিত হইয়া আপনাকে এই বিষম যন্ত্রণার হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন ।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল । তিনি দিয়াশলাই আলিয়া বড়ী দেখিলেন, রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে । বিশাল কীর্ণাহার প্রায় গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন—কেবল মধো মধো প্রায়া কুহুরের চীৎকারধ্বনি এবং শৃংগালের রব নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে । অন্নদা বাবু ধীরে ধীরে বুকমূল হইতে বাহির হইয়া দীঘির পূর্বদিকে বাধা রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । একটু অগ্রসর হইতেই দীঘির সমস্ত অংশ তাঁহার নয়নগোচর হইল । গভীর নীল জলরাশি অন্নদা বাবুকে দেখিয়া যেন উপহাস করিতে লাগিল ; উপরে অকিঞ্চান্নী গ্রহনক্ষত্রগুলা যেন তাঁহার অনূষ্টে যে শুণ্ড লিপি লিখিয়াছিল, তাহা জানাইবার জন্ত সেই নীল জলের উপর পড়িয়া কেবলই হাস্য করিতে লাগিল । বহুদূরব্যাপী সুগুণ রাজপথ—অন্নদা বাবুর পদার্থপথে যেন সজাগ হইয়া তাঁহার গমনে বাধা দিতে লাগিল—রাস্তার দুই পার্শ্বের চির পরিচিত বাড়ীগুলো আজ যেন দৈত্যের দ্বারা ধাঁড়াইয়া আছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । তিনি ভীতিভাঙ্কিত হইয়া স্পন্দিতবক্ষে কোন

দিকে লক্ষ্য না করিয়া ক্রতপদে তাঁহার মাতুলের সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া কাঠনির্মিত কপাটে পদাঘাত করিবারাত্র ভীষণ শব্দে কপাট খুলিয়া গেল।—তিনি সবেগে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেই দেখিলেন,—তাঁহার মাতুল তাঁহার অনন্তস্নেহময় স্তন্য লইয়া তাঁহারই প্রতীক্ষায় দণ্ডারমান। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অন্নদা বাবু তাঁহার বক্ষে পতিত হইলেন,—৫০০০ হাজার টাকার নোটপূর্ণ ক্ষুদ্র ব্যাগ তৎপূর্বেই মাতুলের পদতলে পতিত হইয়াছিল !

পর্যায়চক্র আনন্দাশ্রম বিসর্জন করিতে করিতে তাঁহার প্রাণপ্রিয় ভাগিনেরকে আবার স্নেহের বন্ধনে বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তিনি নিশ্চয় বুকিয়াছিলেন, তাঁহার ভাগিনের দুই রাত্রির বেষ্টি কোথাও স্থির থাকিতে পারিবে না। তাই তিনি আত দুই রাত্রি কেবল স্বয়ং আস্তর বাহির করিয়াছেন। বাস্তবিকই তিনি কি সর্বজ্ঞ ছিলেন !

১০ বৎসর পরে ৮২ বৎসর বয়সে যখন তাঁহার মাতুল নন্দর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, তখন তিনি যে উইল করিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল—

“আমার সমস্ত সম্পত্তিতে আমার তিন পুত্রের সহিত মদীয় স্নেহের বন্ধনে বদ্ধ ভাগিনের অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে সমান অংশে অংশীদার করিলাম।”

শ্রীভারদ্বাজ চট্টোপাধ্যায় ।

হরিদ্বার হইতে লক্ষণখোলা ।

(২)

আমরা বিশ্রামান্তে গঙ্গাতীরে স্নানতর্পণ সমাপন করিয়া তত্তীৰ্বর্তী মন্দির-
ঘার রুদ্ধ দেখিয়া কেবলমাত্র হুণ্ডটি দর্শন করিয়াই সামান্য জলযোগ ও
বিশ্রামান্তে বেলা ১১-টার সময় 'লক্ষণখোলা' দর্শনার্থ প্রস্থান করি।
কৈলোঠের মধ্যাহ্ন । কালোচিত আতপতাপে পাহাড়ী পথের দুই কোণ গমন
করিতে যেরূপ কষ্ট হইবে আশঙ্কা করিতেছিলাম, তদনুরূপ বিশেষ কষ্ট
অনুভব না করিয়া এক ঘণ্টা সময়মধ্যেই আমরা পাহাড়ের 'চড়াই উতরাই'
সমাপনান্তে লক্ষণখোলার সুপ্রসিদ্ধ সেতু-সমীপে উপনীত হই ।

সে সময়ে কেসার বদরিকাশ্রমের যাজ্ঞীর বড় ভীড় । পথে দলবদ্ধ হইয়া
স্থানে স্থানে তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছেন । যাত্রীগণকে, সুবতী কুলবধু
অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে আগ্রস্ত করিয়া ছুড়পোষা শিশু পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া
এই দুর্গম পথ অতিবাহনে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভাগতে
এখনও ধর্ম্মভাবের প্রভাব সম্পূর্ণ অবিকলিত রহিয়াছে বুঝিয়া বেশ একটু
চিন্তাপ্রসাদ লাভ করিলাম । পাশ্চাত্য শিক্ষার যোহে নগরাদিতে সনাতন
ধর্ম্ম ভাবের কিঞ্চিৎ শিথিলতা পরিলক্ষিত হইলেও মাতৃজাতির ক্ষমারে উহা
অব্যাহত প্রভাবেই বিরাজমান, এ কথাই সারবস্তা লক্ষণখোলার পথেই
বর্ণে বর্ণে হৃদয়কম করিতে পারিয়াছি । বৃদ্ধগণ স্ব অথবা প্রয়োজনীয় জ্বা
শস্ত্রের সহিত শক্তিহীনতাগ্রস্ত নীচে নীচে চলিতেছেন । সঙ্গীরা হয়ত
দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের অধাবসার ও বৈধব্য
অনুভব বিচলিত হয় নাই । অদূর মাত্রায় প্রবেশান্তর্গত স্থাননিবাসিনী
কামিনীগণও জ্বাদি মন্তকে লইয়া এই দুর্গম পথে হাঁটিয়া চলিয়াছেন ।
কাহারও কাহারও হাতে জগদ্রাধপুত্রী হইতে আনীত বক্রযুগ বেত্র দেখিয়া
জিজ্ঞাসা করিয়া আনিলাম, তাঁহারা এই বৎসরই জগদ্রাধ দেবকে দর্শন করিয়া
বদরিকাশ্রমে বাইতেছেন । উক্ত বেত্র তথায় অর্পিত করিবার জন্যই নীত
হইতেছে । ইহার জন্য নাকি অধিক ফলপ্রাপ্তি আছে । ধনা অধাবসার,
ধনা ইহাদিগের ধর্ম্মপ্রভতির দৃঢ়তা ! দীর্ঘপথ অতিক্রমণে অসমর্থ দুই এক

জনকে কপিপান নামক মনুষ্য-বাহিত লগ্নু যানের সাহায্যে অগ্রসর হইতে দেখিলাম ।

পরেই “কৈলাস ভবন” নামক একটি সন্ন্যাসীর মঠ । তাহাতে বহু পণ্ডিত সন্ন্যাসী বাস করেন । পথের দুই ধারেই সন্ন্যাসীর “আখড়া” । কেহ বা ভাগবত পাঠ করিতেছেন ; কেহ ক্ষুর ক্ষুর দেববিগ্রহ লইয়া তাঁহাদিগেরই সেবার ব্যস্ত । কোথাও বা “ভাণ্ডারা” প্রস্তুত হইতেছে । তাহার অদূরেই হস্ত যন্ত্রিগণও পাকাদি করিতেছে । পাবে শীতলপ্রবাহিনী কলুষনাশিনী লক্ষ্মী । তাহার পরপারে দেববৃন্দের প্রিয় নিকেতন অত্রভৈরৱী হিমালয়-শৃঙ্গ । আমরা এই অপূর্ণ নৃত্যের মধ্যে থাকিয়া এক অননুভূতপূর্ণ চিত্তবাহ্য লাভ করিতে লাগিলাম । পর্বতম ভাগীরথীর শীতল শীতলসংস্পর্শে সূচিয়া গেল । অবশেষে আমরা লক্ষণখোলার পুলের উপর পাড়াইয়া যেন এক নবজীবনের লভান পাইলাম । ভূনির্মাছি, পুলটি পূর্বে দুইটি দড়ির মধ্যে ক্ষুর ক্ষুর কাঠ-খণ্ড পাদবিক্ষেপজনা দাখিয়া গঙ্গার এক পার হইতে অপর পার পর্যন্ত লম্বমান ছিল । ধারণা চলিবার জন্য সমান্তরালে আর এক দাছি দড়ি তাহার কিকিৎ উপরেই বিস্তারিত থাকিত । সর্বদা দোহুলামান বলিয়া ইহার নাম কোলা । এইরূপ কোলাভাতির দড়ির পুল পাহাড়ী খড়্ অতিক্রম করিবার জন্য নাকি অনেক স্থানেই আছে, বিস্তারিতা ও বিপৎপাতের অধিক আশঙ্কা প্রযুক্ত ইহারই প্রাসিদ্ধি অধিক । পুলটি দুইটি পাহাড়ের গায়ে লেগেছে । এই উচ্চ স্থান হইতে পড়িলেই গঙ্গাপর্বে চির সমাধি ; কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই । এই স্থানে নদীর বেগ এত অধিক যে, নৌকাদি চলাচলের সম্ভাবনা নাই । পর্বতগাত্র হইতে যে সমস্ত কাঠ কাটা হয়, তাহা নদীতটেই ভাসাইয়া দেওয়া হয় । সেগুলি স্রোতের বেগেই বাহিত হইয়া সমস্তল ক্ষেত্র পর্যন্ত চলিয়া যায় ; বোধ হয়, হরিদ্বারাদি রেলসমীপবর্তী স্থানে ধরিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করা হয় । জল অধিক গভীর বলিয়া বোধ হইল না ; কারণ, নদীপর্বে মধ্যে মধ্যে প্রস্তরখণ্ড মস্তক উত্তোলিত করিয়া রহিয়াছে । নদীর তলভাগ এই জাতীয় ছোটবড় হাড়িতে সমাচ্ছন্ন, তাহাতে বহু কাঠ আটকাইয়া রহিয়াছে দেখিলাম । এই প্রস্তরভাণ্ডার জন্য গুণ টানিয়াও নৌকা চালান বিপজ্জনক । একে এই বেগবতী ধারার দিকে চাহিলেই প্রাণ উড়িয়া যায়, তাহার উপর আমার সেই “চুলের সাকো” তাহা দিয়া মাথার নিষ্করণ পরীরেই তার লইয়া চলা একরূপ অসম্ভব । তাহার উপর আবক্ষক ব্যবহার

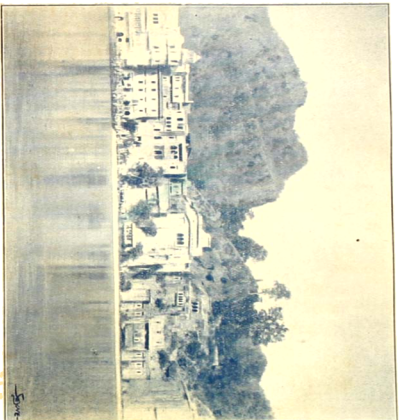
মোট লইয়া যাওয়া যে কিরূপ ভয়ানক, তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে। ভগবান বদরীনারায়ণ কেম্বারনাথের দর্শনের উৎকট আকাক্ষার বশবর্তী হইয়াই লোক উপায়াস্ত্রান্তভাবে এই দুঃসাহসের কার্যে ঝাঁপ দিত। কাহার কাহারও ভাগ্যে হয়ত তথা হইতে গঙ্গাগর্ভেই স্থল প্রদান বড়িত। এইজন্য এই শতট্রৈলোক্যিকরূপে বহুপরিকর হইয়া কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ বর্ধমান ব্যবসায়ী স্বর্গামল শিবপ্রসাদ সুনসুনওয়ালা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে সেই দড়ির কোলার স্থানে বর্তমান লৌহকাঠময় সেতুটি নির্মিত করিয়া যাত্রিগণের ঐকান্তিক আশীর্বাদে পরম কল্যাণ লাভ করিয়া আসিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মপুতানার অধিবাসী হইলেও, বাঙ্গালার ব্যবসায়-লব্ধ অর্থে তাহার এই অতুল কীষ্টি অর্জিত হইয়াছে বলিয়া ব্রাহ্মপুতানাবাসী-দিগের ন্যায় লব্ধ গৌরবে আমরা অন্তরাধিকারের অথবা দানি করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। অর্ধের ইহার অপেক্ষা আর অধিক উপযোগ কি হইতে পারে? পূর্বে বোধ হয় দড়ির পুলে পার হইতে কর দিতে হইত। জীবন উৎসর্গ করিয়া প্রাণটি হাতে করিয়াও যদি কেহ পরপারে পৌঁছিতেন, তাহার আবার কর না দিয়া নিষ্ঠুরি ছিল না। সেতু-নির্মাণা যথোদয় সে করের হস্ত হইতেও যাত্রীদিগকে চিরকালের জন্য অব্যাহতি দিয়া তাহাদিগের বিগুণ আশীর্বাদভাজন ও অধিকতর যত্নী হইয়াছেন। স্তত্রায় সুনসুনওয়ালা যথোদয়ের কল্যাণ কামনা করিতে করিতে পুলটির পরপার পর্যন্ত গিয়া বেড়াইয়া আসিতে আবাদিগেরও কোন বাধা হইল না। পুলটির নির্মাণ-প্রণালী প্রায় পূর্ববৎ আছে; দুই পাছাড়ের সাজে দুইটি প্রস্তর-নির্মিত পিলপা। তাহা হইতে দুইটি প্রকাণ্ড লৌহ বন্ধু পাশাপাশি হইয়া বৃত্তবৃত্ত (arc) আকারেই স্থলিয়া রহিয়াছে। তাহারই মধ্য প্রদেশে পুলটি স্থলাইয়া দেওয়া রহিয়াছে। পুলের দুইটি সীমা পিলপার সাজে কেবল লাগান আছে। পুলটি কাঠের, স্তত্রায় হালকা,—রেলীং আছে, স্তত্রায় গবাদি পশুও পার হইতে পারে। কিন্তু চলিবার সময় উহা একপ ভাবে চলিতে থাকে যে, আবাদিগের ন্যায় কীণপ্রাণ বাঙ্গালীর দ্বারা এখনও তাহাতে ভীতির উদ্রেক হয়। কিন্তু গোবৎসগুলি অবাধে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিলাম, হয় পাছাড়ের গুরু বাঙ্গালার বাহুব অপেক্ষা সাহসী! ক্রমে বাঙ্গালার কৃত ও বর্তমান ভাবিতে ভাবিতে ও বাঙ্গালীর দান, বর্ধ, অর্থব্যয় প্রভৃতির আলোচনা করিতে করিতে আমরা

পুনরায় সেতু অতিক্রম করিয়া গঙ্গার দক্ষিণ পারেই ফিরিলাম । সে স্থানেও সন্ধ্যাতের বিয়া নাই । জলসজ্জ হইতে সেতুতলবাহিনী গঙ্গাবারি পানে স্নিগ্ধ হইয়া আমরা বার্ষভ্যাগের ও সৌভ্রাত্যের অদ্বিতীয় আদর্শ লক্ষণের মন্দিরের উদ্দেশে চলিলাম । তথা হইতে গঙ্গার কি স্নান দৃশ্য, বায়ুর কি দরীরমনঃস্নিগ্ধকারী শক্তি ! আমাদিগকে দীর্ঘই ঋষিকেশে ফিরিয়া দিনের মধ্যেই হরিদ্বারে ফিরিতে হইবে । স্মরণে সন্ধ্যা ৯ জ্যোতি পাহাড় পৰ্য্যন্ত ভাবিয়া আকুল হইয়াই, অদিক কালের জন্ত সে গুপ্ত সন্তোষের দোহা নিত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই ত্যাগ করিতে হইল । বহিষ্কৃত শিবমন্দির দর্শনের পর, উপরিস্থ লক্ষণ-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জনের অগস্ত্য দৃষ্টান্ত লক্ষণের সৌম্য মূর্তির দর্শন লাভে ও মন্দিরটির স্নিগ্ধতাগুণে বহিঃ সন্তোষের সহিত আমাদিগের অন্তর্মলও যেন অন্তরিত হইয়া গেল । লক্ষণের একক মূর্তি আর কোথাও আছে কি না জানি না । যে স্থানেই দেখিয়াছি লক্ষণকে রামচন্দ্র সীতাদেবী প্রভৃতির সত্ত্বেই দেখিয়াছি, কোঠ ভ্রাতার উজ্জলতর আভার তাহার মূর্তিটিকে কোন স্থানেই তাদৃশ স্কুটিয়া উঠিতে পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না । কি রামায়ণাদির বর্ণনায়, কি চিত্রে, কি ভাস্কর্য্যে, সর্বত্রই তাহার আভা যেন কিছু ভিত্তিমিত । একক পাইয়াই এ স্থানে যেন তাহার বরূপ অমূল্যবের কতকটা সুবিধা পাইলাম । আশ্চর্য্যসর্গের কি মহনীয় বিগ্রহ ! সঙ্গ সঙ্গ উর্ধ্বলার আত্মনিগ্রহের কথাটাও মনে পড়িল । কাব্যে কল্যায় সর্বত্রই তিনি প্রত্যাখ্যাত; তাহার আত্মত্যাগের, তাহার পতিভ্রাতার সাক্ষ্যবহনে সকলেই পরাধীন । স্মরণে সন্ধ্যা সন্ধ্যা সন্ধ্যা তাহার আশ্চর্য্যসর্গকে আমরা অস্ত্রান্ত সর্বপ্রকার আত্মবলি হইতে মহত্তর ভাবিয়াই যেন এই দম্পতির আশ্চর্য্যত্বের মূল মূর্তির একত্র সমাবেশ দেখিবার জন্ত ব্যাকুলতা অনুভব করিতে লাগিলাম । অবশেষে তাহাতে হতাশ হইয়া উত্তরাইয়ের পথে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টে ঋষিকেশে প্রত্যাবর্তন করিলাম । এই স্থলে বলিয়া রাখা উচিত, এই লক্ষণের মন্দির হইতেই এ পুণ্যটির নাম লক্ষণকোলা হইয়াছিল । ইহার সংস্কৃত আকারের সেই নাম প্রাদেশিক উচ্চারণে 'লক্ষ্মণ কোলা' বলিয়াই প্রসিদ্ধ । ইহা এখনও লোহার কোলা ব্যতীত আর কিছুই নহে

আমরা ঋষিকেশের কালা কখনীওরালার সঙ্গ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পাহারী সাত ও তদনুসৃত্ত অশ্বচ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের ব্যবস্থা দেখিয়া হরিদ্বারস্থলে প্রস্থান করিলাম । কালীকখনীওরালার সঙ্গ বীধার সাহায্য

করিতে ইচ্ছুক ভাষাদিগের যে কোন প্রকারের দান সত্ত্বেও পরিচালনা-
কার্যের সহায়তাকল্পে গৃহীত হয়। ভাষারা কেবল যাত্রীদিগকে আশ্রয়
ও প্রয়োজন হইলে আহাৰ্য্য দিয়াই ক্ষান্ত নহেন, বদরিকাশ্রমের প্রত্যেক
যাত্রাকেই পথে উদরানয়ের সম্ভাবনা বলিয়া বিনামূল্যে তদ্রিবারত ঔষধ
পৰ্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অস্বরোধ করিয়া থাকেন। স্থানে
স্থানে তাহার জন্য বিজ্ঞাপন পত্রাদি দেওয়া রহিয়াছে। ঐদৃশ অস্বস্তি যে সৰ্ব্বথা
সাহায্যদানযোগ্য তদ্বিষয়ে বোধ হয় কাহারও বিমূঢ়তা সন্দেহ নাই।
পরিপার্শ্বে শুদিকেশের অগ্নির একজন সন্ন্যাসীর কুটীর দর্শনার্থ গমন করিয়া
জানিলাম, পূর্বাশ্রমে তিনি কান্দীবাসী 'নাগর' ব্রাহ্মণ ছিলেন; আমরাও কান্দী
হইতে আগত জানিয়া তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ আদর ও বেহ প্রদর্শিত
করিলেন। ইনি বেশ শিক্ষিত; আমাদের সাহিত্য ইংরাজী ভাষারও কথোপ-
কথন করিলেন। ইহার আশ্রমে মল্ল উপাধিধারী একটি বাঙ্গালী ব্রাহ্মপুত্র
যুবক দেখিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, যুগ্মনোচিত চপলতা বশতঃ গৃহ
ত্যাগ করিয়াছেন কি না? উত্তরে জানিলাম, পিতৃমাতৃহীনতার পর বীত-
রাগ হইয়াই সংসার ছাড়িয়াছেন। আমরা সম্পূর্ণ সংশয়গ্রস্ত হইতে না
পারিলেও এই সূত্র হিমালয়পাদমূলে বাঙ্গালী যুবককে সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত
পালনে বহুপরিশ্রম দেখিয়া মনে মনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম
না। সেই 'সঙ্গে সঙ্গে' আপনাদিগের সংসারপরভরতা অরপ করিয়া মনে
বিভার আদিতে লাগিল। কিন্তু তাহা কতকণের জন্য? অশ্বানবৈরাগ্য
যদি মানসজগৎ হারী প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইত তাহা হইলে জগতে
আমাদিগের জায় বহু সংখ্যক অগম্যসংসারকে পড়িয়া জীবনান্ত
পৰ্য্যন্ত এরূপ হাবুডুবু খাটতে হইত না। আমাদিগের বিদায়প্রহণকালে
সন্ন্যাসীর দিবার মত অপর কিছুই নাই বলিয়া তিনি আমাদের ব্রত
আমাদিগের প্রত্যেকের হস্তে দিয়া প্রীতি বচনে আপ্যায়িত করিলেন। আমরা
পূর্বনির্ধারিত সেই চালু পথ পন্থাপ্রণে অতিক্রম করিয়া একবার স্বাকানি ভোগ
করিতে করিতে সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে হরিবার-প্রান্তস্থিত বনসমীপে উপনীত
হইলাম তদনিগম, ব্যায় ভ্রুক বন্যভী প্রভৃতি ভয়ানক, জন্তু সময়ে সময়ে
দেই জঙ্গলে দেখা দিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে আমাদিগের বাঙ্গালী-বনের সে
সময়ের অবস্থা সর্বত্রই অস্বপ্নের। কোন গতিকে ঈশ্বরের নাম অরপ করিতে
করিতে অন্ধকার ঘোর হইয়া আসিবার পূর্বেই বনভূমি অতিক্রম করিয়া

गरीबगढ़ .



Public Press, Calcutta.

२ दिवस ।

রাত্রিকালে আমরা হরিবারে প্রত্যাবর্তন করি। তাড়াতাড়ি আশ্বাশ্বাষি শারিরা পাতা মহাশয়ের প্রণাম লাভান্তে তাঁহার দাবি মিটাইয়া, আমরা ডেরা ডাঙা সঙ্গে দেই রাত্রিতেই হরিবার ঠেপনে আসিরা তইরা থাকি ; পরে টেপ আসিলে হরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করি।

উপসংহারে বগা উচিত, উপরোক্ত ক্ষুদ্র বিবরণ পাঠের পর যদি কাহারও বর্ণিত স্থানগুলি দর্শনের ইচ্ছা হয় তিনি যেন এক নিম্নান্বেষেই সব দেখিবার অতিশ্রমে আমাদিগের স্রায় তাড়া হড়া না করেন। এত অর্থ ব্যয় করিয়া বঁহারা তীর্থ-দর্শনে নিম্মাপ হইবার জন্যই হউক বা প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্যাবলী দর্শনে মনকে পুলকিত করিবার বা হিতকর বাহুসেবনে শারীর স্বাস্থ্য-বিধান জন্যই হউক, এতদূর স্থানে আসিবেন একটু ব্রহ্মিরা বসিরা দেখিলেই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য বাহাই হউক না কেন সুসিদ্ধ হইবে। আমরা এ অতি-জ্ঞতা পূর্বে লাভ করিতে না। পারায় যে অনুবিধা ভোগ করিয়াছি, সর্ব শেষে, সেই হৃৎকের কথাটুকুও সকলকে জানাইরা রাখিলাম। প্রিয় পাঠক, মনে রাখিবেন, তীর্থদর্শন বা দেশভ্রমণ চাকরী নহে, যে ১০টা হইতে ৩টার মধ্যে কোনরূপে কার্য্য শারিরা ফিরিতে হইবে, সফল করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবেন।

ঈশানিতমোহম সুখোপাধায় ।

— — —

সুজন ও দুর্জন ।

(সংক্ৰান্ত হইতে ।)

সুজনের মুখ হ'তে যদি বাহিরায়
বিষম সোণের কথা, ওণ কহে তা'র ।
দুর্জনে করিলে কিন্তু গুণের কীৰ্ত্তন,
দোষ যদি' অনুমান করে লক্ষ্যম ।
যেখ বধা জলধির লবণাচ্ছ লয়ে,
বিতরে বিমল ব্যগ্র তা'র বিনিময়ে !
সুতল গোরস পান করি' অহিগণ
হুসেহ গরল রাশি করে উদ্বিগণ ।

ঐশ্ব্যোন্নয়নাথ বস্তু কবিশেষণ ।

বিষ্ণুদাস হাজরা ।

—:—:—

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্যদেবের সমকালে অগ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটক কতিপয় ষাণ্ডনামা ব্যক্তির নামানুসারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মেল-বিভাগ করেন ; শুভরাজধানী মেল তাহাদের অন্ততম । শুভরাজ ধাঁ'র নামে এই মেল গঠিত হয় । (১) তাঁহার প্রকৃত নাম মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি হুলগ্রহ-প্রসিদ্ধ দেবল বন্দ্যের সংশ্লিষ্ট । (২) পৌড়ের রাজসরকারে কার্য্য করিয়া মাধব শুভরাজ ধাঁ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । এই কালে গোড়াবিশেষের অধীনে বহুতর বাকালী কাব্য করিতেন এবং সরকারের কার্য্য অসম্পন্ন করিয়া সম্মান-হ্রস্ক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । পুরন্দর ধাঁ, স্রুজি ধাঁ, শুভরাজ ধাঁ প্রভৃতি বাকালী কর্ম্মচারিগণের নাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠকের নিকট নুতন নহে । ফরিদপুর জিলায় তেলিহাটী পরগণার অন্তর্গত শুভপুর গ্রামে শুভরাজ ধাঁ'র নিবাস ছিল । তাঁহার গোবিন্দ, পরমানন্দ, বিষ্ণুদাস হাজরা ও প্রসন্নচন্দ্র নামে চারি পুত্র ছিলেন । তন্মধ্যে বিষ্ণুদাসের নাম যোড়শ শতাব্দীর ঘটনা-হরের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত বলিয়া আবহা তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি ।

(১) Calcutta Review ও বঙ্গীয় সমাজ

(২) দেবলের পৌত্রের নাম হলধর আশুল তট্টাচার্য্য । তাঁহার নাম হুলগ্রহে দৃষ্ট হয় । দেবীবরের বেলমালায় আছে :—

আশুল বংশে নাম মাধব বীভূতি ।

শুভরাজ ধাঁ'নী সে ছিল উপাধিধারী ।

মাধবের বাণের বিয়ে পীতৃভূক্তী হয় ।

গৌরীধর পাক ধোগ পরেতে সে পায় ।

গৌরীর বনমধ্যে একান্ত সে ছিল ।

ভায় কস্তা কীষ্টি চট্ট বিবাহ করিল ।

অজ্ঞাপতি পাক সঙ্গে দোবে হুল হল ।

বনমধ্যে বলাৎকার রক্ত লেগে দেল হ—বেলমালা ।

ওয়েষ্টল্যান্ডের যশোহরের ইতিহাসে কিয়ৎ পরিমাণে বিষ্ণুদাসের কথা অবগত হওয়া যায়। তিনি বলেন, বিষ্ণুদাস হাজরা তপস্চর্যায় অলৌকিকী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। নিজেই ইরোপাঙ্গনায় কালবাণন করিবার নিমিত্ত তিনি তত্ত্বসূত্র শৈল্পিক তখন পরিভ্রাম্য পৃথক যশোহর জিলার অন্তর্গত আধুনিক নলডাঙ্গা গ্রামের সম্মিষিত গড়াত্তি নামক স্থানে আগমন করেন; সে সময় উক্ত স্থান গভীর অরণ্যে পরিবৃত্ত ছিল। এই বিজ্ঞান বনে কুটীর নির্মাণ পূর্বক তিনি তপস্বৎ চিন্তায় কালপাত করিয়াছিলেন—ইত্যাদি।

বিষ্ণুদাসের জীবন-কাহিনী ঘনবোয় হুহেলিকার আচ্ছন্ন হইয়া আছে; বিবিধ অলৌকিক ঘটনাবলী তাঁহার নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া একত্রে ইতিহাসকে বিবৃত করিয়া দিয়াছে। নলডাঙ্গা রাজবংশের বর্তমান উত্তরাধিকারিণ বিষ্ণুদাস হাজরাকে আপনাদের বংশের মূল পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করেন। ওয়েষ্টল্যান্ডের গ্রন্থে যত্নে বর্ণিত পাই, এক দিন কোনও মুসলমান শালন-কর্তা যশোহরের বেগমতী নদী দিয়া নৌকাযোগে ঢাকা হইতে প্রত্যাপন করিতেছিলেন। সঙ্গে প্রচুর বাগ্যাত্রা ছিল না—নলডাঙ্গার নিকটে আসিয়া তাঁহার বাগ্যাত্রার নিঃশেষ হইয়া যায়। এই দুরবস্থার সময় বিষ্ণুদাস তপোবলে প্রচুর বাগ্য সামগ্রী উপহার করিয়া মুসলমান শালনকর্তাকে অনাহার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুদাসের কাছে প্রীত হইয়া নলডাঙ্গা ও নিকটবর্তী আর চারিখানি গ্রাম তাঁহাকে অর্পণ করেন। তাহা হইতেই নলডাঙ্গা রাজবংশের ভাবী জমিদারীর সূত্রপাত হয়। (৩)

করেক বংশের অতীত হইল নলডাঙ্গার বর্তমান রাজার যত্নে ও অর্থব্যয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা অধিকারণ যথোপাধ্যায় নলডাঙ্গা রাজবংশের একখানি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে যে, উপরি উক্ত উপহারদাতা মুসলমান নহেন; তিনি রাজপুত—সম্রাট্ আকবর সাহের সেনাপতিপ্রধান যান-নিংহ। কোনও কার্যব্যাপদেশে যশোহর আসিয়া বিষ্ণুদাস কর্তৃক উপকৃত হইয়া প্রতিদান স্বরূপ তিনি এই উপঢৌকন দিয়াছিলেন। (৪) কিন্তু আমাদের বিবেচনার ইহা নিতান্ত অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদের বিশেষ অধ্যয়নদ্বারা নিম্নলিখিত তথ্য অবগত হইয়াছি। যে সময় গৌড়ের সিংহাসনে পাঠান নরপতি সৈয়দ হুসেন সাহ উপবিষ্ট ছিলেন সেই সময় বিষ্ণু-

(৩) Report on the District of Jessore

(৪) The Naldanga Raj Family.

দাস হাজরা অবৈত প্রভু নিত্যানন্দের ভক্ত শিবা বীর ওঃসেন ঐগালিমের সহিত নলডাকার অবস্থান করিতেছিলেন। (৫) তৎকালে প্রসিদ্ধকীর্তি দক্ষিণ রায় বর্ষোৎসবের ত্রাঙ্গণ নগরে স্বাধীনতার বিজয়-সৈন্যবাহী উদ্ভূত করিয়া ছিলেন। রুসেন সাহ তাঁহার বীরত্ব-প্রদীপ লীলায় নিৰ্ম্মাণিত করিয়া যোগে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। দক্ষিণরায় কৃতমুখে যুদ্ধলম্বন সেনার আগমন-বার্তা শুনিয়া বীর, রাজধানীর চতুঃপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ বশভিগ্ন করিয়া যুক্তিকানিমে খাদ্যদ্রব্য প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রথমবার পাঠান সেনার পরাজয় হয় এবং পাঠানগণ কালীগঞ্জের সমুদ্রবাহিনী চিত্রা মদী পার হইয়া মলডাকার সারিধো শিবিরসন্নিবেশ করে। এই সময় তাহাদের রসদ নিঃশেষ হইয়া যায়। ঐগালিম ভূগর্ভে লুকাইয়া আহার্য্য সামগ্রীর সন্ধান আনিতেন। তিনি পাঠান সেনার এই বিলম্ব দর্শনে একান্ত হত্যাচিন্ত হইয়া গোপনে যুক্তিকানির হইতে কিয়ৎ পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পাঠান শিবিরে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে দক্ষিণ হইতে গোরগাজী দক্ষিণ রায়ের সৈন্তদল আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন। দক্ষিণ রায় তাঁহার অতিশক্তি বৃদ্ধিতে পারিয়া সৈন্যে তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত দক্ষিণাতিমুখে অগ্রসর হইলেন। অল্প সংখ্যক সাত সৈন্ত পরাজিত পাঠান সেনার পুনরাক্রমণে বাধা দিবার নিমিত্ত বেগবতী নদীতীরে অবস্থান করিতে লাগিল।

ইতোমধ্যে গালিমের শিবা বিজুদাসের হৃদয়ে বার্ষন্যধনের ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। পাঠান সেনাপতি বিজুদাস কর্তৃক কার্য্য-উদ্ধারের সন্ধান দেরিরা তাঁহাকে বলোতে বশীকৃত করিলেন। আসন্ন বলোতের আশায় উৎফুল্ল হইয়া বিজুদাস পাঠান সৈন্যগণকে ভূগর্ভস্থিত গুপ্ত আহার্য্য দ্রব্যসকল দেখাইয়া দিলেন এবং দক্ষিণরায়ের সেনার গতিবিধির বিষয় গোপনে অবগত হইয়া পাঠান শিবিরে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। সেই দিন বিজুদাস যে বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন তাহার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠার উজ্জলভাবে বর্ণিত

(৫) এক্ষণে মলডাকা রাজবাড়ীতে যে গালিমপোগাম বিগ্রহ আছেন তিনি এই ঐগালিমের সন্দেহ। পরে উত্তরাধিকার হুজ্জে তাহা মলডাকার রাজবংশের অধিকারে আইসে।—লেখক।

না থাকিলেও তাহাতেই দক্ষিণ দ্বারের বীরত্ব-গরিমা চিরতরে বিলীন হইয়া যায়। শিবের এই নিদারুণ অসাধারণ ব্যবহার স্বভাবিকত্বসল, বর্ধপ্রাণ পালিমের, জনের পেলের জারি বিঘ্ন হইল। তিনি বিষ্ণুদাসের উপর বিরক্ত হইয়া চিরদিনের মত নলডাঙ্গা হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন। তাহার পর কেহ আর সেই মহাত্মার বর্ণন পাওয়া নাই।

বিষ্ণুদাসের সাহায্যে হুসেন সাহেব সেনাপতি দক্ষিণদ্বারের সেনাকে পরাজিত করিলেন। সেই সুযোগে দক্ষিণ দ্বারের শোধিতে বঙ্গমাতার বন্ধ রক্তিত হইয়া গিয়াছিল।

বিষ্ণুদাসের কার্যে ঐতিহ্য হইয়া হুসেন সাহেব সেনাপতি তাঁহাকে নলডাঙ্গা ও অপর চারিখানি গ্রাম দান করেন। তাহা হইতেই উক্ত রাজবংশের বিশাল সম্রাটের স্ত্রীপাত হয়, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। বিষ্ণুদাস যে হুসেনদাস শাসনকর্তার নিকট হইতে এই সম্পত্তি উপহার প্রাপ্ত করেন ওয়েটল্যান্ডের জার দাঁটারও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (৬) কিন্তু নলডাঙ্গার বর্তমান রাজগণ ইহা আদৌ স্বীকার করেন না, নলডাঙ্গা রাজবংশের পারিবারিক ইতিহাসেও বিষ্ণুদাসের কলঙ্কের কথা নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার আশ্রয়দাতার পূর্বপুরুষের কলঙ্ক-কাহিনী সত্ত্বে সাধারণের চক্ষু হইতে দূর চাষিতে চেষ্টা করিলেন।

আমাদের বক্তব্য এই যে,—

(১) হুসেন সাহেব সেনার আগমনে দক্ষিণ দ্বার জুগুর্ভে বাহাদুরী লুকাইয়া গিয়াছিল। পরাজিত পাঠান সৈন্য অন্যদ্বারে কষ্ট পাইতেছিল। এই সময় বিষ্ণুদাস পাঠান সেনাপতি কর্তৃক ধনলোভে বশীকৃত হইয়া গুপ্ত দান-সম্বন্ধ হইতে প্রচুর বাহাদুর্য্য বাহির করিয়া দেন।

ওয়েটল্যান্ডের এষে আছে,—

(২) "The hermit, however, called them and when he learnt their wants, he asked each person to name what

(৬) "Having in time of need miraculously supplied the Muhomedan Governor with provisions, he received as a reward five adjacent villages which formed the nucleus of the family state."—A Statistical Account of Bengal

ছন্দরের মূল্য ।

—১০১—

(১)

রেবার সহিত ঋতুসঙ্গি মানকজির বিবাহ হইবার কথা চলিতেছে এ কথা জানিত না এরূপ লোকই বোম্বাই সহরে ছিল না ।

সকল সাপ্তাহিক পত্রেই এ কথার আলোচনা চলিতেছিল । সকলেই অন্তরের সহিত এ মিলন প্রার্থনা করিতেছিল । প্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক ‘প্রভাতভূত’ লিখিয়াছেন,—“ঋতুসঙ্গি মানকজি বোম্বাইয়ের বিখ্যাত পরলোকগত ধন-কুবের মানকজির একমাত্র পুত্র । ইনি ধনে মানে পারঙ্গী সমাজে অধিষ্ঠিত । এরূপ ধন, বিদ্যা ও রূপের একত্র সমাবেশ আর দেখা যায় না ; ইহার জ্ঞান সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন যুবকের এই ত্রিশ বৎসর অবধি কেন যে বিবাহ হয় নাই তাহা বলিতে পারি না । ঐশ্বরী রেবার পিতাও একজন ধনী বণিক ; তবে তিনি বংশ-গৌরবে ঋতুসঙ্গির সমকক্ষ নহেন । এই দুই ধন-কুবেরের ধন্যাপি একত্রিত হইলে তাহার অসুরত্ব হইয়া উঠিবে । ঐশ্বরীও রূপে ওণে ঋতুসঙ্গির উপরুক্ত পাত্রী ; আরও সর্বাঙ্গকরণে এ মিলন প্রার্থনা করি ।”

ঋতুসঙ্গি মানকজির আর বাহা বাহাই থাকুক না কেন একটি জিনিষের বড় অভাব ছিল ; সেটি ছন্দর । তিনি বলিতেন, উপন্যাসনাটকে নায়কনারিকার যে প্রেমভাবের থাকে তাহা নভেল নাটকেই শোভা পায়, বস্ততাঃ বাস্তব জীবনের সহিত তাহার কোন সঘর্ষ নাই । লোক বলে,—“আমি তোমার বড় ভালবাসি” বা “তুমি এমন ক’রে আমি ছন্দয়ে বড় আঘাত পা’ব” ঋতুসঙ্গি বলেন, এ সকল কথার কোন মূল্য নাই ; রমণী পুরুষের সুখের জন্যই দুই ; তাহাদের সুখঃখ লইয়া পুরুষ মাথা খামাইবে কেন ? অথবা আমি-জীর মধ্যে একজনের পীড়া হইলে অন্তে তাহার অন্ত উৎকণ্ঠিত হইবে কেন ? এ সকল কেবল একটা কণিক মোহ । বাস্তবিক মানব-দেহের মধ্যে এমন একটা কিছু অস্তিত্ব নাই যাহাতে আঘাত পড়িলে সারা মনটা তিক্ততায় পরিয়া উঠে । তাহার এই অতিনব মতের প্রতিবাদ করিতে বড় একটা কেহ সাহস করিত না ।

সেদিন বৈকালে রেবা উদ্যানঘাটো একাকিনী বসিয়াছিল। খারসদজি মানকজি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়ে নানি বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে রেবা অভিমানের স্বরে বলিল,—“তিন দিন তুমি আমাদের এখানে আস নি; আমার উপর তোমার ভালবাসা ক্রমে কমে আসিতে।”

বুড় হাঙ্গিয়া খারসদজি বলিলেন,—“ভালবাসা ?—ভালবাসা কি, রেবা ? এতদিন চেষ্টা করেও তোমরা কা'কে ভালবাসা বল তা' আমি বুঝতে পারলাম না।”

ঐবা বক্সি করিয়া রেবা বলিল,—“ভালবাসা কি জান না ? এ যে এক নতুন কথা বলচ তুমি ! এত দিন কি আমি তবে প্রতারণিত হয়েছি ? সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে তোমায় যে ভালবেসেছি তুমি তার বিন্দুমাঝেও প্রতিদান দাও নি !”

খারসদজি তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—“খাম, রেবা, খাম। নভেনে বা বিয়েটারের টেনেই এক্স কবা শোভা পায়। আচ্ছা, রেবা, ট্রিক করে বল দেখি, আমার বংশগৌরব যশঃ ও মান দেখেই কি তুমি আমার বিবাহ কর্তে রাজি হও নি ?”

“মিথ্যা কথা ! রমণী পুরুষের বংশগৌরব বা মান যশের মুখ চাহে না ; চাহে শুধু প্রেম—তার ভালবাসার প্রতিদান।”

“ওন, রেবা, আমি আবার বলছি, প্রেম, ভালবাসা এ সব নভেনের কথা বাস্তব জীবনের সঙ্গে তা'দের কোন সম্বন্ধ নেই—এত দিন তুমি মিছে আমার অহুসরণ করেছে।”

“আমিও বলছি এ সবই সত্য ; যার জন্ম আছে সেই তা' মর্মে মর্মে অহু-তব কর্তে পারে।”

“মামুষের দেহের যথো জন্ম বল যে একটা কিছু আছে এমন ত আমার মনে হয় না। আচ্ছা কা'কে তুমি ভালবাসা বলতে চাও ?”

“যে ভাব ছুটি বিভিন্ন স্বভাব জন্মকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করে, উভয়কে একত্র করে, মিলিত করে তাহাই প্রেম।”

“আমি তোমার এ প্রেম কখনও বুঝতে পারলুম না, আর কখন পারবও

না। তুমি যা'কে প্রেম বল আমি তা'কে মোহ বলি। বাস্তবিক প্রেমের অভিনব আমি কখনও বিশ্বাস কর্তে পারব না।”

“তোমার মত হৃদয়হীনকে আমি প্রেম যে কি তা বুঝতে পারবো না। আর তা'র কোন আবক্তকও দেখি না। কথায় বলে—‘বস্ত্রে বৈবে প্রেম আর নেজে বসে রূপ’ হয় না। আমি মনে করছি, যত দিন না তুমি প্রেম কি’ বুঝবে, বাস্তবিক ভালবাসতে শিখবে, তত দিন আমাদের এ বিবাহ বন্ধ থাক। আমি তোমার প্রাণ ভরে ভালবেসেছি, কিন্তু তাই বলে একজন হৃদয়হীনকে আমি বিবাহ কর্তে কিছুমাত্র রাজী নই। যদি কখনও প্রেম কি বুঝতে পার, তবে তখন তোমায় আমি সামনে পতিবে বরণ করব।”

বারনদজি মানকজির আশ্বসন আহত হইল। তিনি প্রগল্ভতা বালিকার এ প্রগল্ভতা একান্ত অমার্কজনীয় মনে করিলেন; কিন্তু তিনি যে রেবার রূপের কাদে একেবারে আশ্বহারা হইয়া বসি গিয়াছেন সে কথা স্বরণ হওয়ায় বাহিরে বিশেষ অশ্রীতির লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না; আহত ভাব গোপন করিয়া প্রশ্ন ভাবে বলিলেন,—“কিন্তু রেবা, ভেবে দেখ, আজ তুমি হেলার যা' হারাতে বসেছ পরে লত সাধনায়ও তা মিলবে না।”

হালিয়া রেবা বলিল,—“তা' আমি জানি; কিন্তু সে লত বিশেষ দ্রুতি নই; যদি সত্য জীবনেও তোমার এ ভ্রম না ভাঙে তবে তোমারই স্বতি বুকে নিয়ে পরলোকের পথে যাত্রা করব তবুও তোমায় এখন বিবাহ করব না। আমি আর কোন পুরুষকেও বিবাহ করব না।”

অগত্যা বারনদজি আশ্রয় ভাগ করিয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বালিকার এ ভ্রম তিনি দূর করিবেন। দুই দিন পরে রেবা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে হঠকারিতার বশবর্তী হইয়া সে আপনার কি ক্ষতিটাই করিয়াছে! তখন অনুরোধে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি তরিয়া উঠিবে। ভাবিতে ভাবিতে তিনি ক্ষুদ্র চিত্তে আপনার স্মৃতির শব্দে আয়োজন করিলেন; বাহুবলে শব্দ গন্তব্য পথে ছুটিয়া চলিল।

(২)

সেদিন বোম্বাই সহরে একখানি নূতন মাটকের অভিনয়ের জন্য হলুদুল পড়িয়া গিয়াছিল। বিখ্যাত লেখকের রচিত সেই নব মাটকখানির প্রথম রজনীর অভিনয় উপলক্ষে এত অধিক বর্ণকের সমাগণ হইয়াছিল যে, মাটাক্ষেত্রে আর স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না। রয়েল সিট হইতে আরম্ভ করিয়া

পালাগ্রী পর্য্যন্ত অসংখ্য নরনারীতে পূর্ণ; আর কোন স্থানে ভিল ধারণেরও স্থান নাই ।

সে দিন রাত্রি আটটার অভিনয় আরম্ভ । লক্ষ্য ছয়টার সময়েই রঙ্গ-
মন্দিরের সৰ্গ স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল । তখনও দলে দলে দর্শক আসিয়া
স্থান লাভের জন্য ব্রথা প্রেয়াস করিতেছিল । নিরুপায় দেখিয়া থিয়েটারের
কৰ্ত্তৃপক্ষ টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন ।

তখনও অভিনয় আরম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল । নাট্যমন্দিরের
উজ্জ্বল গ্যাসালোকগুলি নীরবে পুড়িয়া পুড়িয়া আপনাদিগের কর্তব্য করিয়া
বাইতেছিল । সমবেত নরনারীগণের মিলিত কঠোরচিত্ত কলরবে চতুর্দিক
প্রতিধ্বনিত হইতেছিল । অধিকাংশ দর্শকের দৃষ্টিই সরল সিটে উপবিষ্ট
ধনীর উপর নিবদ্ধ । সকলেই কোতুহলপূর্ণ নেত্রে তাঁহার দিকে
চাহিয়া ছিল । কেহ কেহ তাঁহার সুরপের প্রশংসা করিয়া বহুর নিকট আপন
বক্তব্য শেষ করিতেছিল ।

রয়েল সিটে যিনি বসিয়াছিলেন তিনি আমাদিগের পরিচিত ধনকুবের—
খারসদজি মানকজি । রেবার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি তাঁহার
প্রতিভা পুরণের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিলেন । কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার
কোন সুযোগ ঘটে নাই ।

যথাসময়ে ঐক্যতান বাদনের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হইল ।
প্রথমেই কয়েকটি নটী নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল । তাহারিগের মধ্যে এক
জন রমণী অতুলনীর স্ত্রী । মুক্ত দৃষ্টিতে খারসদজি তাহার দিকে চাহিয়া
রহিলেন । দর্শকগণের বহু “বহৎ আচ্ছা” প্রভৃতি উৎসাহমূলক বাক্যের
সহিত পটপরিবর্তন হইলে খারসদজি মনে মনে একটা মৎসব স্থির করিয়া
লইলেন । সেই রমণীই সে দিন এই রম অভিনয়ের নায়িকার অংশ গ্রহণ
করিয়াছিল ; খারসদজির মনে হইতেছিল, সে যেমন স্বাভাবিক ভাবে,
অভিনয় করিতেছিল তেমন আর কেহই পারিতেছিল না । কি অশ্রদ্ধ
তাহার গীতভঙ্গী, কি স্বাভাবিক তাহার কথা বলিবার ভাব । মুক্ত নেত্রে
খারসদজি তাহার অভিনয় দেখিতে লাগিলেন ।

রাত্রি প্রায় পাঁচটার সময় অভিনয় শেষ হইল । নিশা-আগরণ-প্রান্ত দর্শক-
বৃন্দ একে একে বকালয় ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল । বাহিরে তখন
আর বিশেষ কেহ ছিল না ; হুত্রে হুত্রে ছই এক জন থিয়েটারের কৰ্ম্মচারী

ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছিল ; প্রত্যাহার উপর দুই একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী অভিনেত্রীদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল ; আকাশ তখন ক্রক মেঘে আবৃত ; দুই এক ফোটা করিয়া বৃহবারিপাত আরম্ভ হইয়াছিল । ফুটপাথের উপর একজন যুবক ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল,—যেন সে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । তাহার মুখ একখানি ক্রমালে আবৃত থাকায় যুবকানি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না ।

কতকণ পরে একে একে অভিনেত্রীরা বাহির হইয়া য় গাড়ীতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল । যুবক প্রত্যেকের নিকটে দিয়া উৎসুক নেত্রের কাহার অঙ্গসন্ধান করিল ; কিন্তু পাইল না । সে তথাপি নিরাশ হইল না ; অপেক্ষা করিতে লাগিল ।

সন্ধ্যাবেশে যে রমণী নারিকার অংশে অভিনয় করিয়াছিল, সে বাহিরে আসিল । তাহার তখন আর সে রূপ নাই, সে লাবণ্য নাই ; তাহার স্থানে নারিকার মলিনতাও ব্রাভি । নিশাভাগরণহেতু অত্যধিক ব্রাভি তাহার নারিকার-নিপীড়িত যৌবন লালিমাকে ব্রান করিয়া ফেলিয়াছিল ।

যুবতী গাড়ীতে উঠিবার জন্য বাহির হইবার উদ্যোগ করিলে পশ্চাৎ হইতে রেষপূর্ণ স্বরে যুবক বলিয়া উঠিল,—“এ নীতে যে বাত হ’বে !”

যুবতী তাহার দিকে মুখ না ফিরাইয়াই বলিল,—“তা’তে ম’শায়ের যে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি আছে এমন ত মনে হয় না ।”

“ঘষেই ঘষেই, সুন্দরী ! আমি তোমার মাচ বড় পছন্দ করি;—তোমার অভিনয়ভঙ্গীতে মুগ্ধ !”

“সেটা আমার সৌভাগ্য বলতে হ’বে । সেই জন্যই কি এতকণ এ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন !”

“হ্যাঁ, সে জন্যও বটে, আর, আর একটু বরকাদও আছে ।”

যুবতী গাড়ীর পা-স্থানে পা দিয়া গাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে যুবক হস্ত প্রসারিত করিয়া তাহাকে বাধা প্রদান করিল । যুবতী ক্রক স্বরে বলিল,—“আপনি কি ব্রকম ভ্রমলোক মশার । হংসপীড়িতা মিশ্রদ্বারা রমণীর উপর একি অত্যাচার আগনার ?”

যুবক হাসিয়া বলিল,—“আরে রাগ কর কেন ? আল বিনি ঘরেল লিটে ‘বদেছিলেন তাঁ’কে চিন ?”

“তা’ আর চিনি না । খায়লদ্বিক্……………”

“রমণীর কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই যুবক যুব হইতে রুমালখানি টানিয়া লইল । গাড়ীর আলোকে তাহার যুব দেহিয়া সবিম্বয়ে যুগলী বলিয়া উঠিল, —“আপনি—আপনি — !”

“হ্যা, অঙ্গুরী, আমি । তা তোমার এখন কোন বিশেষ কাণ আছে কি ? একবার আমার সঙ্গে বেতে পারবে ?”

রমণী বিনা বাক্যব্যয়ে যতক সম্ভালিত করিয়া সম্মতি জানাইল । তখন তাহার দুই জনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল । যুবক যুব বাহির করিয়া চালককে বলিল,—“ম্যাপডিলন হোটেল ।” গাড়ী পূর্ণ বেগে ছুটিয়া চলিল । বলা বাহুল্য যুবক খারসদজি মানকজি ।

যথা সময়ে হোটেল উপস্থিত হইয়া তাহার দুই জনে তোজন শেষ করিল, তাহার পর দীর্ঘ অবতরণিকা শেষ করিয়া খারসদজি বলিল,—“আমার একটা ছদয়ের দরকার ; তুমি বিক্রয় করবে ?”

“হুদয় ! বিক্রি ?”

গভীর ভাবে খারসদজি বলিল,—“হ্যা, হুদয় বিক্রি । অবশ্য তা’র জন্য যা’ মূল্য বলবে আমি তা’ দেব । আর এই যে আমার হাতে হীরের আংটিটা দেখ্ছ, এটাও দেব ।”

রমণীর চক্ষুঃস্রব লোভে অলিয়া উঠিল । লুচ্চ দৃষ্টিতে সে একবার সেই আংটির দিকে চাহিয়া দেখিল ।

খারসদজি বুঝিলেন, ঔষধ বরিয়াছে । তিনি অঙ্গুরী হইতে অঙ্গুরী উন্মোচিত করিয়া রমণীর হাতে দিয়া বলিলেন,—“খেলো জিনিষ মনে কর না, এর নাম অন্ততঃ দশ হাজার টাকা হবে !”

রমণী লুচ্চ দৃষ্টিতে অঙ্গুরীটি দেখিতে লাগিল ।

খারসদজি জিজ্ঞাসা করিলেন—“কেমন রাজি ?”

রমণী কিয়ৎক্ষণ নীরবে চিন্তা করিল ; তাহার পর বলিল,—“আংটিটা পেনে কাল বলতে পারি ।”

খারসদজি একবার কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—“বেশ তবে তাই ; কিন্তু আংটিটা আমি দিতে পারছি না ; কাল তা’র বদলে টাকা দেব । কাল এই সময় এখানে একবার আস্বে ?”

রমণী সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল । বিজয়গর্বে খারসদজির হৃদয় ভরিয়া উঠিল । এত শীঘ্র যে তিনি কৃতকার্য হইতে পারিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও

ভাবেন নাই। কিন্তু রমণীর ভাব দেখিয়া তিনি প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই। কি একটা অজ্ঞাত বিষয়ের ছায়ার তাহার মুখখানি বিষন্নতা-মাখা করিয়া রাখিয়াছিল। এ বিষন্নতার কারণ তিনি ঘোটেই বুঝিতে পারেন নাই।

(৩)

হোটেলের ঘরে একটা ছোকরা কাগজওয়ালা চীৎকার করিতেছিল—
“বড় ঘরের বড় কথা, অদ্বুত-কাহিনী, খারসদজির বিয়ে বন্ধ, রেবা বাই মৃত্যু-শয্যা!”

খারসদজি হোটলে প্রবেশ করিবার সময় একখানি কাগজ কিনিয়া লইলেন। নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাগজখানি খুলিতেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল—

“প্রেমের-পরিণাম।”

“খারসদজির সহিত রেবার বিবাহ স্থগিত।”

“রেবা বাই মৃত্যু-শয্যা।”

“আমরা বিখ্যাত মহত্রে অবগত হইলাম যে খারসদজি মানকজির সহিত রেবা বাইএর যে বিবাহ-প্রস্তাব চলিতেছিল তাহা একপে.স্থগিত রহিল। এই কথা রেবা বাইএর কর্নগোচর হওয়া অবধি তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছেন। বাহি যে কি তাহা কোন চিকিৎসকই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। তবে কি এ প্রেম-ব্যাপি?” ইত্যাদি।

তাহার পর লিখিত ছিল—

“(বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদ)

“আমরা বিশেষ সংবাদ দাতার পক্ষে অবগত হইলাম যে রেবা বাইএর জীবনের আশা বড় একটা নাই। অনিলাম, তাঁহার শেষ অন্তিমাব খারসদজি বেন মৃত্যুর পূর্বে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইত্যাদি—”

যথা সময়ে নটী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। খারসদজি দেখিলেন, তাহার মুখে বিষয়ের ছায়া এলয়ের অন্ধকারের মত গঢ় হইয়া উঠিয়াছে। তিনি সে বিষয়ে কোন কথা না করিয়া পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন,—“ওনে নাও।”

রমণী নোটগুলি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ঘুরে নিক্ষেপ করিল। বিষয়মুগ্ধ খারসদজি অধূরে গাঁড়াইয়া তাহার এই অদ্বুত কার্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

রমণী গ্রীষ্মভঙ্গী করিয়া কহিল—“একজন তোমার জন্য মরণের দেশে যাত্রা কর্তে বসেছে আর তুমি এ দিকে দশ বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা ঘুণা বারনারীর জন্য কিনি যেচ্ছ। এত হেঁচকু তুমি ! হি !”

“কিন্তু তুমি জন্মের বিক্রি কর্তে—”

“হ্যাঁ, কাল আমি জন্মের বিক্রি কর্তে রান্না দিলাম কিন্তু আজ আর নই।”

“কেন শুভে পাই ?”

“কি হ'বে শুনে তোমার ? বা'র জন্ম নেই তা'র সেকথা মা শুনাই ভাল।”

“জন্ম নেই ? আমার ? হ্যাঁ একদিন তাই বনে করেছিলুম, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে বুঝি ঐ গোছের কি একটা আছে। কিন্তু তা'তে কি ? আমি টাকা দিয়ে জন্ম কিনব, তা' আমার জন্ম থাক আর না থাক ! যাক্ সে কথা এখন, তুমি রান্না নও কেন তাই বল।”

রমণীর মুখে একটু বিবাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—“এত যদি সাধ হয় তা' আমার সঙ্গে এস।”

রমণী বাহির হইল। ধারসন্নিবিষ্ট তাহার অঙ্গসংলগ্ন করিলেন। শীতের নিস্তরঙ্গ রজনী। চতুর্দিক বেন বিবাদের তরঙ্গ ! বৃক্ষপত্র হইতে বীরে বীরে শিশির বিন্দু করিয়া পড়িতেছিল। বেন কাহার বিন্দায় উপলক্ষে তাহার নীরবে অশ্রুপাত করিতেছে ! রমণীর অঙ্গসংলগ্ন করিয়া ধারসন্নিবিষ্ট নীরবে গমন করিতেছিলেন,—সারা জগত নীরব ! কি একটা বিরাট গাভীবা পৃথিবীর চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া ছিল !

গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা একটি পতনোন্মুখ কুঠীরদ্বারে উপনীত হইলেন। দার খুলিয়া রমণী বেগে গৃহে প্রবেশ করিল। শত গ্রন্থি-যুক্ত ছিন্ন শব্দ্য বস্ত্রাবৃত কি একটা পড়িয়া ছিল। রমণী আতঙ্কিত আগ্রহে সেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। বলিল,—“বাবা আমার, বাহু আমার, একবার মা বলে, ডাক ! দেখ, বাবা, কত টাকা এনেছি। আর দারিদ্র্যের সঙ্গে তোকে মুক্ত কর্তে হ'বে না, বড় পোকের মত লুপে বসেছে দিন কেটে যা'বে। ওঠ, বাবা, ওঠ। একবার চোখ চেয়ে দেখ ! দেখ, তোর অভাগিনী মা তোকে ডাকছে—আর বাপ আমার কিরে আর !” রমণীর দীর্ঘ গত প্রাবিত করিয়া বাঁধতাল। জন্মের স্রোতের মত অজ্ঞান বারে অজ্ঞান প্রবাহিত হইতে লাগিল। কতকণ পরে আত্মসংলগ্ন করিয়া রমণী বলিল,—“ধারসন্নিবিষ্ট। অনেক কষ্টে

তোমার এভাবে সম্মত হয়েছিলুম। হাজার পরিবর্তনও কেহ ক্ষম্য বিক্রি করে না। কিন্তু আমার বাছার প্রাণ রক্ষা হ'বে ভেবে আমি তাতেও রাজি হয়েছিলুম। 'হায়! হায়! টাকাটা যদি কাল দিতে তা' হ'লে বোধ হয় বাছা আমার বাঁচত। এই ছুঁধের ছেলে; কিন্তু সারাদিন এর মুখে একটা স্তূদের কথাও দিতে পারি নি; এমনই হতভাগিনী-মা আমি—এমই দৈন্ত্যনশা আমার। বুকেছ, এখন কেন আমি আর ক্ষম্য বিক্রি কর্তে রাজি নই?' রমণী তাহার বৃত পুত্রকে আবার আহুল আগ্রহে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

রমণীর করুণ কাহিনী শুনিতে শুনিতে খারসদলির কঠিন প্রাণও কোমলতা ধইয়া গিয়াছিল। তিনি আর সে দৃষ্ট দেখিতে পারিলেন না; দ্রুতপদে কুটীরখানি ত্যাগ করিয়া তিনি মুমূর্ষু রোগের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। অর্ধ-বিনিময়ে যে ক্ষম্য ক্রয় করিতে পারা যায় না সে কথা তিনি অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব করিতেছিলেন। আর তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রেতের লস্ত লোক করিতে পারে না এক্ষণ কাণীই নাই।

ঐহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

সংসর্গে ।

—:~:—

যলিন অদার যবে

অনলের লতে পরশন,

ধূরে যায় যলিনতা,

হয় তার উজ্জল বরণ ।

নীচমতি হীন জন

সাহু লব্ধ করে যদি লাভ,

নীচতা ঘুচিয়া যায়,

লভে সেও নির্ঝল স্বভাব ।

ঐযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ।

ফরাসীবিপ্লবের ইতিহাস ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

(ভীষণ হত্যাকাণ্ড)

—:—

প্রজা ও ক্রায়প্রদর্শিত পদ্ধতিসরণে, ফরাসী দেশের সামাজিক, রাজ-
নীতিক এবং সর্ববিধ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত ক্রতসূত্ৰ হইয়া গিরন্দিগণ
কৰ্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সংহারনীতিপরায়ণ জেকবিনগণের
বিক্রমচাচার নিবন্ধন তাঁহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল । জেকবিনগণ
পাশব শক্তির সাহায্যে কার্যোদ্ধারের নিমিত্ত অহোনিশি ইতর সাধারণকে
পাপকার্যে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন । স্তবরাং উজ্জ্বলার
প্রবাহে সমাজ-বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপক্রম হইল । রাজসিংহাসন উৎপাটিত
হইলে ক্রধিরলোলুপ রবসপিয়র, ড্যান্টন, ম্যারাট প্রভৃতি জেকবিন নেতৃগণ
রাজভক্ত মানবমণ্ডলীর ক্রধিরোপহারে বিকট মাতৃপুঙ্কার আয়োজনে প্রবৃত্ত
হইলেন । জেকবিনপ্রধান মিউনিসিপালিটী এই দৈনন্দিক কার্যাসূচীতে
অহুষ্ঠিত চিত্তে সন্মতি প্রদান করিলেন । জেকবিন নীতিপরিচালিত ইতর
সাধারণের ধ্বংসের পরিশীমা রহিল না ।

প্রভাবিত অসাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড নিবারণ পূৰ্বক ক্রায় এবং ব্যবহার-
শাস্ত্রের মৰ্যাদা সংরক্ষণের নিমিত্ত গিরন্দি-প্রধান ব্যবস্থাপক সমিতি শান্তি-
শয় উদ্যম সহকারে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন । মিউনিসিপালিটীর
নোদিতপিতামহ সভ্যগণকে পদচ্যুত করিয়া অভিনব সভ্য নির্বাচনের নিমিত্ত
প্যারিসবাসিগণের প্রতি বোষণা পত্র প্রচারিত হইল । টুইলারি প্রাসাদের
মূল্যবান সম্পত্তি অপহরণের অপরাধে মিউনিসিপালিটীর সভ্যগণ সমিতিগৃহে
অভিযুক্ত হইলেন । সেই অভিযোগের উত্তর প্রবণ মানসে সমিতি অভিযুক্ত
ব্যক্তিগণকে নির্দ্ধারিত দিবসে সমিতিগৃহে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান
করিলেন । সমিতির কার্যতৎপরতা দৃষ্টে শান্তি-অভিলাষী ব্যক্তিমাঝেই
আনন্দিত হইল । কিন্তু শান্তিসংস্থাপনতৎপর ব্যবস্থাপক সমিতির ঈদৃশ শক্তি
কোথায় যে তাঁহারা পাশব শক্তির সহায় জেকবিনগণের যথেষ্টাচার নিবারণে
সমর্থ হইবেন ? সমিতি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া মিউনিসিপালিটী অভিযুক্ত

সভামণ্ডলী বিচারের নির্দ্ধারিত দিবসে সমিতিগৃহে উপস্থিত হইলেন বটে ; কিন্তু তাঁহারা দ্বিবিধরী পুরুষ সিংহগণের ন্যায় সংখ্যাভীত অস্ত্রধারী পরি-
য়ুক্ত হইয়া বিজয়-পতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক আগমন করিলেন। কে বলিবে
যে তাঁহারা চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন ? সমিতির সাধ্য কি যে
তাঁহারা ঈশ্বর শোকের কেনাশ্রী স্পর্শ করেন ? অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের আড়-
ম্বর দৃষ্টে সকলেই ভক্তিত হইলেন। ব্যবস্থাপক সমিতির সভাপতি এবং মহা-
মান্য ভার্ণিয়ড্ এই শব্দটোও কর্তব্য বিন্মত হইলেন না। তিনি অভিযুক্ত
ব্যক্তিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন :—

“ব্যবহার শাস্ত্র হইতেই শাসনসম্পর্কায় সমগ্র শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে।
কিন্তু প্যারিসের বর্তমান মিউনিসিপালিটি ব্যবহার-শাস্ত্রের অল্পমোদিত নহে।
সাময়িক প্রয়োজনানবন্ধন এই মিউনিসিপালিটির সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্তমান
সময়ে ইহার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। ইহার অতিরিক্ত বিদ্যুত না হইলে ফ্রান্স-
বাসীরা প্যারিস নগরে ব্যবহার শাস্ত্রের প্রতিকূল শক্তির বিকাশ দৃষ্টি করিয়া
কি মনে করিবে ? সমিতি বীর কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপনারা
আপনাদের কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্ঘ হইবেন না।”

সভাপতি মহোদয়ের এই সারগত বাক্য শ্রবণে সভামণ্ডলী করতালি
প্রদানে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিন্তু ট্যালিয়ান্ নামক মিউনিসিপালিটির
প্রতিনিধি মিউনিসিপালিটির পক্ষসমর্থন পূর্ব্বক বলিলেন :—

“সভাপতি মহোদয় এবং সভামণ্ডলি, আমরা এ ব্যবৎ অবধা লাহুন। ভোগ
করিয়াছি। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ নির্দ্ধারণের অগ্রে তাহাদিগকে
দোষহীনতা প্রতিপাদনের সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। সমিতি সে সুযোগ প্রদান
না করিয়াই আমাদের অপরাধনির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাই কি সন্দিগ্ধতার
পরভা ? টুইনারি প্রাসাদ আধকারকালে, আমরা যাহাই করিয়া থাকি না
কেন, ক্ষমতাবাহিত কোন কাব্য করি নাই। আমরা জনসাধারণ কর্তৃক
স্বদেশের সংরক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। নিয়োগকালে জনসাধারণ
আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ করেন নাই। সুতরাং টুইনারি প্রাসাদে আমরা
কোন কার্য্য করিয়া থাকিলে, তন্নিমিত্ত আমাদের কোন প্রকার দায়িত্ব নাই।
আপনারা জনসাধারণের প্রজ্ঞা ও ভক্তির পাত্র ; নতুবা অদ্যাপি প্রজ্ঞাপীড়ক
তুপতি প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না। কেবল আপনাদের অল্পমোদে
প্যারিসবাসীরা এ ব্যবৎ কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্ঘ রহিয়াছে। আমরা স্বদে-

শের হিতকরে জনসাধারণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বর্ষব্যয়কগণকে করারুদ্ধ করি-
য়াছি । অনতিবিলম্বে জননী কম্বুজ্বি তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি-
বেন । সুতরাং আপনারা দেখিবেন যে, সমস্ত কার্যেই জনসাধারণ সফল হই-
য়াছে । আমাদের সঙ্গে আঘাত করিলে সে আঘাত জনসাধারণের দেহে
সীড়ার উৎপাদন করিবে” ।

ট্যালিয়ানের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সংখ্যাতীত অস্ত্রধারী সশস্ত্র-গৃহে
প্রবেশ পূর্বক অনেববিধ উচ্ছৃঙ্খল্য আরম্ভ করিল । একজন লোক সভাপতি
মহোদয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, “মিউনিসিপালিটির সভাপতি জন-
সাধারণের প্রতিনিধি । আমরা তাহাদের লক্ষ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে
প্রস্তুত ।”

ইতর সাধারণের উচ্ছৃঙ্খলতা দৃষ্টে সমিতির সভ্যবৃন্দ স্তম্ভিত হইলেন ।
তাঁহারা কহুহাতে পতিত হইয়াছেন, সুতরাং কাহারও যুগ হইতে বাক্য
নিঃসৃত হইল না । অনন্তোপায় হইয়া সভাপতি সভা তল করিলেন ।
এইরূপে পাশব শক্তির প্রচণ্ড প্রতাপে অধর্মের জয় হইল । বর্ষ স্ত্রিয়াক
হইয়া অবনত মস্তকে সেই জেকবিন-প্রপীড়িত দেশ হইতে পলায়ন করিল ।
সুতরাং বদুচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা চতুর্দশ বর্ধিত হইল । দেশের এক প্রান্ত
হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শোণিত-প্রবাহে প্রাবিত হইল । শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি-
গণের চুদাশার পরিসীমা রহিল না ।

অনন্তর (২য় সেপ্টেম্বর, ১৭১২ খৃঃ) জেকবিনপ্রধান মিউনিসিপালিটি
সর্বপ্রকার অন্তরায়বিমুক্ত হইয়া সংহার-মুক্তি যারণ পূর্বক অসাময়িক নিউ-
তার-পর্যাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন । বর্ষব্যয়ক ও ভূস্বামিগণ
যথায় তথায় বৃত্ত হইয়া পারিস নগরের ভিন্ন ভিন্ন কারাগারে প্রেরিত হই-
লেন । সংখ্যাতীত মার্শালপ্রকৃতি নরাদম হোটেল ডি ভিল্য তখনে আবৃত্ত
হইল । মিউনিসিপালিটি তাহাদিগকে প্রচুর অর্থদানে সংহার-মন্ত্রে বীক্ষিত
করিয়া গর্হণীভি, বাবহার শাস্ত্র, ও মনুষ্যত্বের মূলে ফুটরাঘাত করিলেন ।
অনন্তর রাজিষ্ঠার সময় সেই মরশার্দুলরাই ভৈরব হুকারে গগন বিদীর্ণ
করিয়া বাতজলধের স্তায় আবে নামক কারাগৃহের সন্নিধানে উপস্থিত হইল ।
অব্যবহিত পরেই ৮০ জন বর্ষব্যয়ক হোটেল ডি ভিল্য বৃত্ত হইয়া কয়েকখানি
শকটে সেই কারাগৃহে প্রেরিত হইলেন । শকটগুলি কারাগারের নিকটবর্তী
হইবামাত্র শিষাচরণ বলপূর্বক ছয়দুই বর্ষব্যয়কগণের বাহিরে আনিয়া শাপিত

ক্লাপারের প্রচলিত আধাতে তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিল। কারাবাসীদের অস্তিমকাল উপস্থিত হইল। কিন্তু বর্ধমানকগণকে সংহার করিয়া বাতুক-বিশেষের স্তম্ভে অতুং বর্ধমানের সকার হইয়াছে। অপরাধ নির্ধারণের আগে কোন ব্যক্তির সঙ্গে অত্যাধাত অকর্তব্য এইরূপ মনে করিয়া তাহার সাধারণ বাতুকহুলের পদ্ধতি পরিহার পূর্বক বর্ধ-শিলাসা নিয়ন্ত্রিত নিষিদ্ধ এক অতুংপূর্ব, অস্তমপূর্ব, বিচার-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিল। বাতুকদল কতিপয় ব্যক্তি সমিতির সভ্য নির্ধারিত হইল। বাতুকপ্রেম সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইল। অত বাতুকগণ শাশিত ক্লাপারহস্তে যমহস্তগণের স্তম্ভে বাসদেশে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্যান্তের সুযোগপ্রাপ্তির নিষিদ্ধ বিকট রবে চিৎকার করিতে লাগিল। অন্যন্তর সেই অতুং বিচার সমিতির অতুং বিচার আরম্ভ হইল। কারাবাসীগণ দলে দলে "সমিতি"-সমক্ষে আনীত হইলে সংহারকার্য্য আরম্ভ হইল। অবিলম্বে মস্তক ছেদন করিলে পামর-গণের শৈশাচিক রুতি সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ হয় না; সেই লজ্জা তাহার হস্ত-অঙ্গাদিগণের হস্তপদাদি ছেদন পূর্বক পরিশেষে শিরশ্ছেদন করিতে লাগিল। হস্তভাগ্য ব্যক্তিগণের আর্ন্তনালে পাষণ্ড বিগলিত হইত। কিন্তু কে তাহা-বিশেষে সেই ক্লাপারহস্তগণের হস্ত হইতে পরিচাল্য করিবে? তগবান? তগ-বান করাশী দেশ হইতে নির্ধারিত হইয়াছেন।

কারাবাসীগণ পক্ষ প্রাপ্ত হইলে, বেরিই নামক মিউনিসিপালিটীর অনৈক সভ্য বাতুকগণকে কহিলেন :—“সংসারবাসীগণ তোমরা কতিপয় মন্ত্রাধমকে বরাধাধ হইতে মুক্ত করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিয়াছ। মিউনিসিপালিটি তোমাদের ষণ্ড কি প্রকারে পরিশোধ করিবেন, তাহা তাবিত্তা স্থির করিতে পারিতেছেন না। পারিভ্রমিক স্বরূপ আমি তোমাদের প্রত্যেককে ২৪ ফ্রাঙ্ক প্রদান করিতে অস্বীকার হইয়াছি। তোমরা যে মহৎ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, কদাচ তাহা হইতে স্বলিত হইও না। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমরা কোন ভ্রুংসিং কার্য্য করিও না। পরধনহরণপূর্বক হস্ত কলুষিত করিও না। স্তারাস্তারে তোমরা যে পুরকার প্রাপ্ত হইবার উপরুক্ত, মিউনিসিপালি-টীর নিকট তাহা প্রত্যেকেই নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে।”

বার্ষিকগণ কারাগৃহে বার্ষিককুলচূড়ামণি পরহিতস্ত্রস্ত সর্বপ্রধান বর্ধমানক-প্রবর আয়নের চুইশত বর্ধমানক পরিবৃত্ত হইয়া উপবিষ্ট। অকস্মাৎ “স্বদেশ-বৎসল” বাতুকদল বিকট রবে চিৎকার করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল।

সেই কৃতান্ত ছুরাচারনিগের আগমনে কতিপয় ব্যক্তিপ্রাণভয়ে সন্ত্রিস্ত উদ্যান-
স্থিত বৃক্ষশাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পাপাশ্রয়গণের চক্ষুতে ধূলিপ্রদাম
সম্ভবপর নহে। তাহার। বন্ধু ও বন্ধুদের সাহায্যে সর্কোয়ে গুল্কারিত
ব্যক্তিগণের প্রাণ সংহার করিয়া পরিশেষে অন্যান্য বর্ষযাজকগণের নিধন
সাধনে প্রেরিত হইল। পরহঃশকাতর আরনেন্সর ঈশ্বর নৃশংস ব্যাপার দৃষ্টে
বর্ধপীড়িত হইয়া সেই বধ্যমান, হত এবং হত্যাকারী মানবগণের পারলৌকিক
কল্যাণের নিমিত্ত কলুবনাশন ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতে
লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। বর্ধরগণ
উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “বর্ধ প্রচারক আলসর কোথায়?” তিনি বলি-
লেন, “আমি এই স্থানেই আছি।” তখন জনৈক ব্যক্তক বলিল, “তুমি
অশেষবৎসল ব্যক্তিগণকে হত্যা করিয়াছে?” তিনি বলিলেন, “আমার
জীবনে আমি কোন ব্যক্তির অনিষ্ট করি নাই।” “তবে আমিই তোমাকে
যমালয়ে পাঠাইব” এই বলিয়া জনৈক ব্যক্তক সেই বার্ষিকপ্রবর মহা-
পুরুষের গ্রীবাদেশে অস্ত্রাঘাত করিল। বর্ধাত্তিক যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়াও বর্ধবীর
ভগবানের নাম বিদ্বত হইলেন না। তখন সেই নরাধম তাঁহার বদনমণ্ডলে
পুনর্য্যার অস্ত্রাঘাত করিল। তৎক্ষণাৎ গিরিদেহ হইতে বারিধারার ন্যায়
তাঁহার দেহ হইতে রুবিরবারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথাপি তিনি
দীর্ঘবে ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৃতীয় আঘাতে তিনি
ধরাশায়ী হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

কুমারী ল্যাথেল। নারী অলৌকিক দ্রপদাবগাসম্পন্ন। সরলহৃদয়া বালিকা
রাজ্যের প্রতি নিত্য অঙ্গুরক্তা ছিল। রাজপরিবারবর্গ টেম্পল ভবনে অব-
স্থিত হইলে ল্যাথেল। তথায় আসিয়া রাজ্যের সহিত একত্র অবস্থান করিতে
লাগিল। কিন্তু অত্যন্তকাল মধ্যেই মিউনিসিপালিটীর আদেশক্রমে বালিকা
তত্ত্ব কারাগৃহে প্রেরিত হইল। এক দিবস অকস্মাৎ কতিপয় ব্যক্তক বালি-
কার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “যদি তুমি রাজা ও রাজ্যকে বর্ধাত্তিক
দ্বণা করিতে পার, তাহা হইলে আমরা তোমার জীবন নষ্ট করিব না।”
বালিকা উত্তর করিল, “আমি উহাদিগকে দ্বণা করিতে পারিব না।” তখন
জনৈক ব্যক্তক বলিল, “আচ্ছা, তুমি ‘ফগাসি জাতি দীর্ঘজীবী হউক’ এই
কথা বল।” হৃদয়ের আবেশে বালিকার কণ্ঠতোষ হইল। তাহার মুখ
হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। তখন পানরগণ কালবিপদ না করিয়াসেই

বালিকার সুকোমল দেহে অত্যাঘাত করিল। বালিকা তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া জীবঙ্গীলা সঞ্চরণ করিল।

রুদ্রির-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, সহসা নিবৃত্ত হয় না। আমি এবং কৰ্ম্মি কারাগৃহের স্রায় পারিশের প্রত্যেক কারাগৃহে,—রাজপথে এবং অস্ত্রাশ্রয় প্রকাশ্য স্থানে প্রতিদিন ভীষণ কাণ্ডের অভিনয় হইতে লাগিল। ভেদ-বিনগণের অবৈধ উত্তেজনানিবন্ধন শোণিতপ্রবাহে যোদিনী প্রাবিত হইল।

(ক্রমশঃ)

ঐশ্বর্যজন্য বোধ ।

তন্ময় ।

জানি না কোথায় তুমি, জানি না সে কত দূর,
জানি না পশে কি সেখা প্রাণের আকুল সুর।
তবু তো বুকে না ক্ষুদ্রি, তবু তো মানে না প্রাণ,
সারাদিন সারা নিশি গাহে শুধু তব গান ।

একদিন ছিলে বেধা, দিগেছিলে ভালবাসা,
মুখে মুখে আগাইলে কত সাধ কত আশা ।
সকলি ফুরিয়ে গেছে, আজ আর কিছু নাই,
আঁধার—আঁধার শুধু আবরিল চারি ঠাই ।

মনে হয় একদিন দগধ মকর বুকে
বহালে কি সুখ-বারা তুমি দেবী, সকৌতুকে ।
তাহারি স্মৃতির রেখা এখনো উজলতর,
আকাশে বাতাসে বুঝি ভালে তা'রি কলবর !

আপনা হারারে তাই মগন তোমারি ধ্যানে,
বদি কভু দেখা দাও ত্বিষিত তপিত প্রাণে !

ঐকীবেদ্যসুখার দত্ত ।

কিশোরীচাঁদ মিত্র ।

উপক্রমণিকা ।

বৃহীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি মহান যুগপরিবর্তনের কাল বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাকালে আমাদের দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল । নারায়ণ ও বুড়, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্য যে দেশ প্রেম ও করুণার, জ্ঞান ও ভক্তির স্রোতে এককালে প্রাবিত করিয়াছিলেন, কর্ণ ও ত্রোণ, ভীম ও অর্জুনের বীর্য-পাথর যে দেশ এককালে উদ্ভেলিত হইত, দেবব্রতের দৃঢ়তা, হরিনন্দনের দান, দধীচির আত্মোৎসর্গ স্বরণ করিয়া যে দেশ এককালে দোরবাধিত বোঝ করিত, কপিল ও গোতম, কৈমিনী ও পাতঞ্জলী, ব্যাস ও কণাদের অপূর্ণ জ্ঞান-সাধনা যে দেশকে মহিমমণ্ডিত করিয়াছিল, বাল্মীকী ও বেদব্যাস, কালিদাস ও ভবভূতি যে দেশকে বীণাপাণির বীণাধ্বনি স্তনাইয়াছিলেন, সেই ভূবারমণ্ডিত হিমালয় হইতে বীচিবিন্দু তারত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আমাদের এই সোণার দেশ তখন অরাজকতার বিধ্বস্ত, অত্যাচারে পীড়িত, লাঞ্চিত ও নুজিহীন । তখন অধর্ম ও অবিদ্যা জনসাধারণের হৃদয়ে প্রবল প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে । 'যে দেশে জ্ঞানের সূর্য্য প্রথম উদিত হইয়া জগতের অজ্ঞান-ভিমির বিনষ্ট করিয়াছিল সেই দেশ তখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আপনি মগ্ন । পমাজ কুলংকারের দূরনিগড়ে আবদ্ধ । আর সে নিজাম সাধনা নাই, আর সে আত্মোৎসর্গ নাই । নারায়ণ অথবা বুড়ের উপদেশ, ভীমার্জুনের বীর্য-পাথর, দেবব্রতের দৃঢ়তা কর্ণ অথবা দধীচির আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত আর বার্ষিক দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিকলিত হয় না, বিপ্লবের তাণ্ডবে বাণীর কৌণ বীণাধ্বনি নীরব ।

দেশ তখন প্রাচ্য আদর্শ হারাইতেছে । প্রতীচ্য জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তখনও দেশ উদ্ভাসিত হইরা উঠে নাই ।

এই সময়ে বড়ের অন্ধকার আকাশে আলোকে বেধা দিল । অতি অল্প লোকই প্রথমে সে আলোক দেখিতে পাইল । রামমোহন রায়ের বর্ষ ও সমাজ-সংস্কারবিষয়ক চেষ্টা তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যে অতি অল্প লোকেই সহানুভূতি আকুণ্ঠ করিয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই

তিনি তাঁহার বহুপূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অল্পকিট সন্মতের কার্যের উপকারিতা ও মহত্ব স্বজবাসিগণের দ্বারা আরও বেশ উপলব্ধি হইতেছে তখন সন্দেহ হয় নাই। বেশ তখনও তাঁহার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। রাজা রাধাকান্ত দেবের দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তিও সতীদাহনিবারণবিষয়ক বিধির বিরুদ্ধে এবং বহু বিবাহের সমর্থনে আন্দোলন করিয়াছিলেন। “বিবর্ত্তা” নামক গ্রন্থে প্রস্তাবিত হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলে কোনও হিন্দু সম্মানসিগকে সে বিদ্যালয়ে পাঠাইবেন না, ইহা তৎকালীন হিন্দু নেতৃগণ দ্বারা হাইড্‌ ইউকে প্রকারে বলিতে কুষ্ঠা বোধ করেন নাই। তখন কুসংস্কার আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন যে, কামকমল সেনের দ্বারা বুদ্ধিমান ব্যক্তিও “আদর্শ শিক্ষক” ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ হইতে অপসারিত করা বুদ্ধিভুল বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সত্যের আলোক কত দিন অসত্যের অন্ধকারে অন্ধৃত থাকিতে পারে? জ্ঞানের জ্যোতিঃ কত দিন অজ্ঞান-তিমিরে নিমজ্জিত থাকে? কুসংস্কার কত দিন ভ্রান্ত ও বুদ্ধির বিরুদ্ধে দৃঢ় করিতে পারে? শেষে বিপ্লব সূচিত হইল। এই বিপ্লবে পান্ডিত্য শিক্ষার মূর্ত্তন আলোকপ্রাপ্ত রামমোহন দ্বারা প্রবর্ত্তিত হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রগণ প্রথম অভিনেতা।

যদি এই ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য বঙ্গীয় যুবকগণ পান্ডিত্যেব দেশের কুসংস্কার ও কল্যাণের দূরীকরণের চেষ্টা করিতেন তাহা হইলে হয়ত আমাদের দেশ আরও দ্রুত গতিতে উন্নতির সোপানে উন্নীত হইত। কিন্তু যেমন রাষ্ট্র-বিপ্লবে তেমনিই ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবে। বিপ্লব বৃদ্ধি অমিতাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বাহ্যলোভ দ্বারা। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সেরাজ্যে অগ্রগততা ও অমিতাচার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা বেশ উপলব্ধি করিয়াছিল। অমিতাচারের সৃষ্টি করিয়াছিল আমাদের দেশেও তেমনি এই নব্য ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ সংস্কারের নামে নানাপ্রকার অমিতাচার ও বাহ্যলোভের অবতারণা করিলেন। প্রাচীনে বাহ্য আছে সকলই কুসংস্কারবিশিষ্ট, প্রাচীনে বাহ্য আছে তাহাই সত্য, স্বন্দর ও বহুলময় এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এই নব্য সংস্কারকগণ প্রাচ্য আচার-ব্যবহার পদদলিত করিয়া প্রাচ্য আচার-ব্যবহারের অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। “ইহারা নূর ও পোষাকের দ্বারা পথ প্রদর্শন করিয়া মদ্যপানের মধ্য দিয়া বুদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন” (Were “cutting

their way 'through ham and beef and wading to liberalism through tumblers of beer') কৃষ্ণমোহন প্রকৃত্তে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিলেন। একজন ছাত্র প্রকৃত্ত সভায় বলিলেন, “যদি আমার জগরে অস্ত্রাঙ্কন হইতে কিছু ঘৃণা করি তাহা হইলে সে হিন্দুধর্ম।” প্রকৃত্তে অখাদ্য আহার করিয়া হিন্দুগণ “সংস্কারকের” গৌরব অহুত্ব করিতে লাগিলেন। তদা যায়, হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র গোয়াংগে ভিন্ন অক্ত কোনও মাংস আহার করিতেন না! মদ্যপান এতদূর প্রচলিত হইয়াছিল যে রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় ব্যক্তিও এই সময়ে আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াছিলেন। বিপ্লবের প্রভাবসম্বন্ধে ইহার অপেক্ষা আর কি প্রমাণ আবশ্যক?

কিন্তু এই নব্য “সংস্কারকগণের” কয়েকটি অসাব্যারণ গুণ ছিল। এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ না করিলে ঔহাদিগের প্রতি অন্যায়া করা হয়। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ঔহাদিগের সেই অল্পপম উদ্যম, দ্রৌশিক্ষাপ্রবর্ত্তনে ঔহাদেব সেই আন্তরিক চেষ্টা, বহুবিধাৎ প্রকৃতি আচারের সংস্কারের জন্য ঔহাদেব প্রয়াস, অভিক্ষেপবাসিনগণের জন্য রাজনীতিক অধিকারলাভের নিমিত্ত ঔহাদেব প্রয়াস, যাহা সভ্য ও কল্যাণকর বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা প্রচারের জন্য ঔহাদেব প্রাণগণ চেষ্টা ও আত্মত্যাগ, ঔহাদিগের অসামান্য মানসিক বল ও বদেপ হিতৈষণা প্রকৃতি স্বেচছাবলী আমাদিগের অরণ করা কর্তব্য।

আমরা বলিতেছিলাম, বেঙ্গল রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে দেশে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচারের আবির্ভাব হয় আমাদিগের এই ধর্ম ও সমাজ-বিপ্লবের সময়ও চতুর্দিকে সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অমিতাচারের দৃষ্টান্ত দেখা যাইতে লাগিল। কিন্তু বেঙ্গল রাষ্ট্রবিপ্লবগুলি নিতান্ত নিকল হয় না, ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষ আপনাদের ত্রম দেখিতে পারেন, উভয়পক্ষ ত্যাগস্বীকার করেন এবং সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করেন এহলেও ঠিক সেইরূপ হইল। অতিমাত্রায় দক্ষগণীল সমাজনেতৃগণ ক্রমে ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যাবল্লিগের গুণগুলি প্রত্যক্ষ করিলেন; সুস্থিতে পারিলেন, রামগোপাল ঘোষ প্রকৃতি নব্য-বল্লিগের মধ্যে কত শক্তি নিহিত আছে এবং ঔহাদিগকে ত্যাগ করিলে সমাজের কত ক্ষতি। অপর পক্ষে নব্য “সংস্কারকগণ” অমিতাচার ও অত্যাচারের বিবয়র ফল প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন যে, সর্ধ বিষয়ে প্রতীচীর অল্প-

করণই বাছনীর নহে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর পক্ষের মধ্যে সম্মিলনের চেষ্টা হইতে লাগিল।

উত্তর পক্ষ পরস্পরকে কিরূপ প্রভা করিতে আরম্ভ করিতেছিলেন তাহা একটি দৃষ্টান্তবারা আমরা দেখাইতে চাহি। প্রজা রাণাকান্ত দেব ও রামগোপাল যোগকে যদ্যক্রমে রক্ষণীয় ও সংস্কারপ্রার্থী পক্ষের নেতা বলিলেও চলে। ইহারা পরস্পরকে কিরূপ ভাবে দেখিতেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রামগোপাল স্বতি-সভায় ৬৮কলাসম্পন্ন বহুর বক্তৃতা হইতে প্রতীক্ষমান হইবে—

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা টাউন হলে চাট্টার সভায় রাম গোপালের বক্তৃতা সৰ্ব্বত্র প্রসংসিত হইয়াছিল। বক্তৃতা শেষকরিয়া রামগোপাল যে আসনে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন সেই আসন হইতে নামিয়া আসিলে প্রজা রাণাকান্ত দেব স্নেহপূর্ণ ভাবে তাঁহাকে বলিলেন— “তববান, তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন যে তুমি দীর্ঘকাল অপেক্ষের সেবার আশ্রয়স্থি নিবৃত্ত করিতে পার। তুমি আমাদের সমাজের মুখপাত্র— আমাদের জাতির অলঙ্কার।” রামগোপাল নতমস্তকে বলিলেন, “আমি যে আপনাকে আশ্রয় হত্যাণ করি নাই ইহা শুনিয়া আমি পূরুষ পক্ষিত হইলাম। কিন্তু দেশের স্বাধা, আপনি দেশের যে স্থায়ী হিত করিবেন সে হিতসাধন আমার সাধ্যাতীত।”

আর একটি দৃষ্টান্ত—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটি নিমন্তণায় বর্তমান স্থানে ঘাটকে স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন সেই সময়ে রক্ষণশীল হিন্দুগণের প্রতিনিবিরুদ্ধ দণ্ডায়মান রামগোপালের তীব্র প্রতিবাদ ও অস্বীয় বক্তৃতা।

এই ক্ষুদ্রই বলিতেছিলাম, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল আমাদের দেশের ইতিহাসে একটি সুসংগঠিত সময়—একটি মহা সঙ্কটকাল (Critical period) বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। ইহারা অস্বভাবে দেশের হৃদয়কোরকদাচারগুলি পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন এবং ইহারা এতটা আদর্শ ভাগ্য করিয়া অস্বভাবে প্রতীচ্যপদ্ধতি প্রচলনের প্রয়াস পাইতেছিলেন। ইহারা উত্তর পক্ষই যেন চক্ষুতক্ষণ করিলেন; এতটা বাহা সূত্র তাহার রক্ষণে, প্রতীচ্যে বাহা মঙ্গলময় তাহার গ্রহণে, এতটা এবং প্রতীচ্যে বাহা কুৎসিত তাহার পরিবর্তনে দেশের প্রকৃত উন্নতির পথ দেখিতে পাইলেন। এই সময়ে যেন আমাদের বঙ্গবিধাণ ও সমাজ কিরূপ আকৃতি

ধারণ করিবে তাহাই নিদ্রপিত হইতেছিল। বাহারা মৃতধর্মকে পুনরায় সঞ্জীবিত ও হুনসংসারিক সমাজকে উন্নত করিবার নিমিত্ত আপনাদিগের প্রতিভা ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন, বাহারা আমাদিগের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রদর্শন ও হুমম করিয়া দিয়া গিয়াছেন সেই সকল মহাপুরুষ চিরকাল আমাদের ভক্তি ও প্রজ্ঞার পাত্র। রামমোহন রায়ের উপনিষদের ধর্মের অন্ততম প্রচারণক, বহুবিবাহনিবারণবিষয়ে সর্ব প্রথম আন্দোলনকারী অধ্যাত্ম সামাজিক সংস্কারের জ্ঞাত প্রমত্তবান দেশের শিরোমুখিত ও ত্রীশিক্ষা-বিভাগের অন্ততম উদ্যোগী কিশোরীচাঁদ যিহ্ন এইসকল ব্যক্তির মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন।

কেবল ধর্ম ও সমাজে নহে, রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রেও এই একই সময়ে এক নূতন আলোক দেখা দিল। বারকানাথ ঠাকুর যে রাজনীতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মহাত্মা জর্জ টমসনের উপদেশে, নব্য ভারতের ডিম্বস্থিনিস্ রামগোপালের নেতৃত্বে, প্যারিচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ, রাজেন্দ্রলাল ও দিগম্বর, রাধাকান্ত ও রমানাথ প্রভৃতি মহাত্মগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহা এক অপূর্ণ শক্তিগম্য হইয়া উঠিল। এই সময় দেশব্রত হরিনন্দ্র ও দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ‘হিন্দুপেট্রিট’ পত্রিকার সম্পাদনে রাজনীতিক আন্দোলনের এক নূতন পথ দেখাইলেন; তাহাদের গভীর পাণ্ডিত্য দূর-দর্শিতা ও কৃতিত্ব দেখিয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল। ড্যালহৌসীয়া অস্তায় উপায়ে রাজ্যবিক্রয়, সিপাহীযুদ্ধের সময়ে অদূরদর্শী ইংরাজগণের জাতিবিষেব ও প্রতি-বিংগা গ্রহণচেষ্টা, এবং দরিদ্র প্রজাবণের প্রতি নীলকরণের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে চইটি শক্তিশালী লেখনী নিয়োজিত হইল। যনীবা কিশোরীচাঁদও ইহাদের সহিত রাজনীতিক ক্ষেত্রে মিলিত হইলেন। সভায় বাহার নির্ভীক বক্তৃতা সাধারণের হৃদয়ে এক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা উৎপাদন করিত, ‘ইন্ডিয়ান ফিল্ড’ বাহার প্রতিভা প্রদীপ্ত রাজনীতি ও দেশোন্নতি-বিষয়ক প্রবন্ধাবলী সকলকে বিশাল কর্মক্ষেত্রে উচ্চরঙে আহ্বান করিত, অর্ধশতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে সেই কিশোরীচাঁদের লোকমত গঠনে ও লোকশিক্ষাপ্রদানে কিরূপ অসামান্য প্রভাব ছিল একপে তাহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব করা অসম্ভব।

বাহালা সাহিত্যে বিভাগাগর, অক্ষরকুমার, প্যারীচাঁদ, যবুহদন প্রভৃতি পান্ডিত্য দিকায় প্রভাবাপন্ন সাহিত্যসংস্কারকগণ এই সময় এক যুগান্তর

প্রবর্তন করেন। কিশোরীচাঁদ আলীবন ইংরাজী সাহিত্যেরই চর্চা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার কখনও কোনও রচনা লিখেন নাই। কিন্তু এই নূতন ভাষাসংস্কারে তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি ছিল। এবং এই সহানুভূতি তাঁহার অসংখ্য বক্তৃতার ও প্রবন্ধাবলীর মধ্যে অতি উজ্জ্বলভাবে পরিদৃষ্টমান। দেহলুপবিধবংশী, গুণ কল্যাণদ্বায়ী। আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের দেশের নীতিশাস্ত্র ইহাই শিকা দেয়। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বে আমাদের দেশের সেই মহাসঙ্কট সময়ে যখন দেশ অবনতির সোপানে অতি ক্রান্তগতিতে অবতরণ করিতেছিল, তখন বেশকল মহাপুরুষ, শত অত্যাচার শত নিগ্রহ সহ্য করিয়া বর্ষের জন্ত, নীতির জন্ত, রাজনীতিক অধিকারের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন অপূর্ণ মানসিক বল, অক্লান্ত দেশবিষ্টেতা, নিবারণ পরোপকারিতা, বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি ও বলিষ্ঠ যত্নবাহের প্রোঞ্চল দুটোই দেখাইয়া আমাদের দেশের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেহত্যাগ করিলেও জীবিত আছেন। আমাদের বর্তমান বর্ষাধিবাস, আমাদের সামাজিক আচারব্যবহার, আমাদের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা যে সকলের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে আমরা সকলে ক্ষুদ্র অথবা মহৎ শক্তি লইয়া নিরাস অথবা আশাপূর্ণ ফলদেয় বিচরণ করিতেছি, বিফলকাম অথবা সফলকাম হইতেছি, সেইসকলের মধ্যে তাঁহাদিগের শক্তি নিহিত আছে। আমাদের মধ্যে সে ভাব অদৃষ্ট, সে শক্তি অজানিত রহিলেও ইহা নিশ্চয় যে আমরা তাঁহাদেরই পুণ্য পদাঙ্কের অনুসরণ করিতেছি, তাঁহাদিগেরই স্মৃতি কর্মক্ষেত্রে তাঁহাদেরই রোপিত বৃক্ষের ফল আহরণ করিতেছি। আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, সেইজন্য এই সকল মহাপুরুষের পবিত্র স্মৃতির পূজা করি না; তাঁহাদিগের প্রদর্শিত মহৎ আদর্শের অনুসরণ করি না; তাঁহাদিগের গুণাবলীর অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি না।

আমাদের দেশে এক নূতন আলোক দেখা দিয়াছে—এক নূতন ভাব প্রবেশ করিয়াছে, এক নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষের দ্বারা এক অকৃতপূর্ণ উত্তেজনার ও চাকল্যের সৃষ্টি করে। এই চাকল্য জীবনের লক্ষণ; কিন্তু আকাঙ্ক্ষা অনেক সময় মানুষকে উগ্রভাব করে, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে। ইহা হইতে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। তাই জ্ঞানীরা সময়ে মহাপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন। সেইজন্য এই সময়ে আমাদের দেশের যথার্থ কর্মবীরগণের মহৎ জীবনের আলোচনার

উপকারিতা বিশেষরূপে যেন উদ্ভূত হয় । তাঁহাদিগের কাব্যাদেশী স্বরূপে চিত্তে উন্নত ভাবের উদয় হয়, নিরাশ ক্ষম্যে আশায় আলোক প্রবেশ করে, আত্মত্যাগসুখা জন্মে, পরোপকার প্রভৃতি মনের উচ্চ হৃদয়সুখ অসাধারণ স্মৃতি লাভ করে । এই সকল কারণে আমাদের বহু অক্ষমতা সংশোধন আমরা কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্রের জীবনকথার আলোচনা করিতে সাহস করিতেছি ।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইতে চলিল তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমকালীন ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই তাঁহার অজ্ঞানময় করিয়াছেন ; সুতরাং তাহার কর্মবহুল জীবনের বিস্তৃত বিবরণ এক্ষণে প্রদান করা এক-প্রকার অসম্ভব হইয়াছে । পুণ্যতন কাগজপত্রাদি হইতে আমরা তাঁহার বিবরণ বতব্বর অবগত হইতে পারিয়াছি তাহাই এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইবে । যোগ্যতর ব্যক্তি কিশোরীচাঁদের কথা লিখিবার ভার গ্রহণ করিলে ভাল হইত । কিন্তু হৃদয় যেসকল কাগজপত্রাদি এখনও পাওয়া যায় সেসকলও পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং আমাদের দেশের একজন কর্মবীরের কীর্তিকাহিনী চিরকালের জন্য বিস্তৃতির অভাবে নিমজ্জিত হইবে, এই আশঙ্কায় আমরা আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছি ।

শ্রীমদ্রথ নাথ ঘোষ ।

হতাশ ও আশা ।

হতাশ কাঁহল ক্ষোভে,—বিজগী-চকলা—

আগে যায় পিছু ডাকে বড় হুই আশা

চালব না আর তার উদ্ধাম আছরানে,

চাহিব না ফিরে করু হুল ভালবাসা ।

আশা বহে, জ্ঞান না কি হে হতাশ ঘীর—

এত করি গড়ি যা, তা সব ভুমি ভাক ;

আমি আগে না ডাকিলে যেন জেনে ছিন্ন—

এত দিন হ'ত ভব জবলীলা সাক ।

শ্রীদগংপ্রসন্ন দাস ।

পুরাতনের পুনরাবর্তন।*

—*(*)—

* রথনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়াল লাইব্রেরীতে গঠিত (৭ই ডিসেম্বর ১৯১৩)

ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন গাহিয়াছেন The old order changeth yielding place to new (পুরাতন চ'লে যায় নূতন আসে সেধায়)। এ কথা সত্য হইলেও আংশিক সত্য কেন না কালচক্রের আবর্তনে আবার পরিশেষে পুরাতনকেই নূতন রূপে উপস্থিত হইতে দেখি। ইংরাজীতে এই জ্ঞানই History repeats itself এই প্রবাদ-বাক্যটি প্রচলিত আছে। মানবজাতি ভূয়োগর্পনের গুণে যে সকল সত্য আবিষ্কার করে, প্রবাদ-বাক্য অল্প কথায় তাহাষ্ট প্রকাশ করে। অতএব এই প্রবাদ-বাক্যের মধ্যেও যে প্রকৃত সত্য নিহিত আছে, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনে এই প্রবাদ-বাক্যের সত্যতা কতটা প্রমাণীকৃত হইতেছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই সংসামান্য আলোচনা করিব।

স্বধাদেব নিম্নার অঙ্ককার বিদূরিত করিয়া যখন উদিত হইলেন তখন প্রভাত হয়। প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন, তাহার পর সন্ধ্যা, তাহার পর রাত্রি; অবশেষে পুনরায় প্রভাত। সকলই পূর্বের তুলনায় নূতন; কিন্তু প্রাকৃতিক জগৎ। পরদিন আবার যখন প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হইল তখন প্রাকৃতিক নিয়মে পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হইল। এইরূপ করিয়া দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, তাহার পর আবার রাত্রি, আবার দিন। গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ও পুনরায় গ্রীষ্ম প্রকৃতি হইতেছে। পৃথিবী যেদ্রুপ সূর্যের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া অবশেষে বর্ষাশেষে আবার বসন্তাহনে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, প্রকৃতির অজান্তে জ্যোতিষ্কও সেইরূপ এক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় নির্ধারিত সময়ের পর সেই স্থানেই আসিয়া উপস্থিত হয়—১৯১০ খৃষ্টাব্দের হেলির ধূমকেতু তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অতএব দেখা গেল যে, প্রাকৃতিক জগতে এই নিয়মই বলবান।

পুরাকালে আধ্যাপন যেরূপপ্রমাণ করিতেন এরূপ সত্য যায়। আর্ধ্য

অধিগণের অন্তর্ধানের পর হইতে যেহেতু যে মহুস্ত কখন আবিষ্কার হইতে সমর্থ হইবে ইহা লোক সহজে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। কিন্তু আবার আজ সেই যেরূপ পুনরায় মহুস্তের গন্তব্যের মধ্যে আসিয়াছে, দেখা হইতেছে।

হিন্দুগ্রন্থে পুশকরণে বিমান-বিচরণের বর্ণনা প্রবণ করিয়া অনেকেই ইহাকে “আমণ্ডবি গন্ত” বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু সেই পুশকরণ কলিকালে পুনরায় Aeroplane রূপে স্পষ্টরূপে বর্তমান হওয়ায়, হিন্দু গ্রন্থগুলি লোকগণের হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে না কি ?

মুনিগণের যোগেশ্বরে গৃহে বসিয়া সকল স্থানের সংবাদ দিতে পারিতেন ইহাও “স্তম্বধুরী কথা” পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু নব আবিষ্কৃত Wireless telegraphy, telepathy, thought-reading spiritualistic seances কি তাহারই প্রকারভেদে পুনরুৎপত্তি নহে ? এমন কি আজকাল হুরোপে ও আমেরিকায় যোগের দিকেও নজর পড়িয়াছে।

ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ বহুকাল পূর্বে আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তথায় আধুনা প্রাপ্ত হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। তৎপরে বৃষ্টির নবম শতাব্দীতে Norsmen কর্তৃক আমেরিকা পুনরায় আবিষ্কৃত ও অধিকৃত হয়। কিন্তু কালক্রমে আমেরিকা সভ্য মনুষ্যজাতির অজ্ঞের হইয়াছিল। বৃষ্টির পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কলম্বাস কর্তৃক সেই বহুপূর্বে আবিষ্কৃত আমেরিকা আবার হুতন করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সারনাথ, পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা, চীনের উত্তরে অবস্থিত গোবী মরুভূমি, হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই এককালে বহুজনপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। কালে সেগুলি লোপ পাইয়াছিল। হুরোপে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই আবার বাহির হইয়াছে, আমাদের দেশে সারনাথ আবার দেখা দিয়াছে ; পাটলিপুত্রও টাটার কল্যাণে উকি তুলি দিতেছে ; তক্ষশিলাও উদ্ধার হইতেছে, শীঘ্রই প্রকাশ পাইবে। যে স্থানে অধুনা গোবী নামক মরুভূমি বিস্তৃত, সেই স্থান পুরাকালে বহুজনাকীর্ণ নগর প্রাকৃতিতে পূর্ণ ছিল। কালের কুটিল ইচ্ছিতে মরুভূমির বালুকা আসিয়া সেই দেশকে ভূগর্ভে প্রাণিত করিয়া ফেলে। বহু শতাব্দীর পর সেই

বালুকারানি আপন) হইতেই উদ্ভিষা যাইতে আরম্ভ করিয়াছে সেই পুরাতন দেশ আবার দেখা দিয়াছে ।

মানবজাতির ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানবসমাজ-পটনের প্রারম্ভে “সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান” ছিল । “কোর যা’র য়লুক তা’র,” “লাঠি যা’র মাটি তা’র,” Might is right, এই রাজনীতি । নিম্নমাত্রাসারেই তখনকার সমুদায়গণ চালিত হইতেন ।

এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ সকলে মিলিয়া একজন রাজ্য নির্ধারিত করেন ও এইরূপে Monarchyর সৃষ্টি হয় । ক্রমে একজন লোকের শাসন অসহ্য হওয়ার সমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শাসনের ভার গ্রহণ করেন ও Oligarchyর সৃষ্টি হয় । কিন্তু ক্রমে এই প্রণালীর শাসনও অসহনীয় হইয়া উঠিলে জ্ঞানপদবর্গ আপনাদিগের শাসনভার আপনাদিগেই গ্রহণ করেন এবং এইরূপে Democracyর (সাধারণতন্ত্র প্রণালীর) আবির্ভাব হয় । কিন্তু এই সাধারণতন্ত্রও শেষে অশাসনে অসমর্থ হওয়ার সমাজে বিপ্লবলা উপস্থিত হয় ; এবং পুনরায় “কোর যা’র, য়লুক তা’র,” প্রথা প্রবর্তিত এবং তাহার পরই আবার একজনের শাসন (One man rule—Monarchy) আবশ্যক হয় । এইরূপে এই তিন প্রকার শাসন-প্রণালী পর্যায়ক্রমে আসা বাওয়া করিতেছে । গ্রীক ও রোমান ইতিহাসে ইহার স্মৃতি স্মৃতি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । আধুনিক যুরোপীয় রাজ্য-সমূহেও এই প্রথা অসুস্থারে কার্য চলিতেছে এবং অসুস্থ প্রচলিত সাধারণতন্ত্রের শেষ তাবিয়া অনেকেরই পক্ষিত হইয়াছেন ।

১১০৫ খৃষ্টাব্দে যখন ক্রিয়া ও জাপান যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তখন আমেরিক দেশে প্রায় পনের আনা লোকই জাপানের জয়লাভ হয় এই প্রার্থনা করিতেন এবং “অসম্ভব জাপান” প্রবল পরাক্রান্ত ক্রিয়াকে পরাজিত করিয়া যখন পৃথিবীর একটি প্রেষ্ঠ রাজ্যের আসনে উন্নীত হইল তখন History repeats itself এই কথাটি সকলেই আনন্দ সহকারে বলিয়া বেড়াইতেন । কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি । মানব ইতিহাসের প্রথম আমলে আসিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশবয়সী সভ্যতার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল ; পৃথিবীর অন্তর দেশসকল তখন অজ্ঞান-অন্ধকারে গভীর নিম্নায় নিমগ্ন । মিসর, ব্যাবিলোনিয়া, ক্যালডিয়া, আসিরিয়া, মিডিয়া, পারস্ত, চীন ও ভারতবর্ষ [এবং পরে গ্রীস ও রোম] এই দেশে

সমুদ্রই মানব-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল। মিসর কিরূপ উন্নত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় অনেকেরই অবগত আছেন। পৃথিবীর সম্রাটধ্বংসের মধ্যে মিসরের গৌরবময় অস্তিত্ব। ইহা ব্যতীত আরও কত বিষয়ে কত প্রকারে মিসর মানব-সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্য মনীষিগণ এখন যুক্তকণ্ঠে মিসরের নিকট গ্রীসের, তথা যুরোপের অগ্নি স্বীকার করিতেছেন; তাহাদের অনেকেরই মত মিসরের সাংকেতিক লেখা (Hieroglyphics) হইতে যুরোপের অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশও এককালে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার সকলেই অতীতের কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের পরেই গ্রীস ও রোম উন্নতির চরম সীমার উত্তীর্ণা ধ্বংসযন্ত্রে প্রদান করিয়াছিল। এক শত বৎসর পূর্বে কেহ বলিতেও পারেন নাই যে, গ্রীস ও রোম আবার উঠিবে। কিন্তু আজ আবার দেখিতেছি, গ্রীস ও রোম ক্রমেই নববলে বলীমান হইয়া পৃথকীকৃত উন্নতির অগ্নি ব্যগ্র হইয়াছে। চীন বহুশতাব্দী স্তব্ধস্থিতি ভোগ করিয়া আগ্রস্ত হইয়াছে ও এখন সমগ্র জগতের লক্ষ্যস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রীস ও রোম পড়িয়াছিল উঠিয়াছে, জাপান শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, চীন অধিকারের মানকতা ভাঙ করিয়া পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে এবং মিসর, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া প্রভৃতি দেশ লইয়া আজকাল বেশ একটু আলোচনা চলিতেছে। কে বলিতে পারে এই নাড়াচড়ার ফলে অধুনা ভবিষ্যতে ইহারা দানোহ পাওয়া মড়ার মত গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবে না ?

যখন মিসর প্রভৃতি ব্রাহ্মসমূহ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত, তখন যুরোপের গ্রীস ও রোম ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশ অজ্ঞান-অন্ধকারে মগ্ন, কিন্তু গ্রীস ও রোমের পতনের পর হইতে আর পর্যন্ত সভ্য (civilised) বলিলে পূর্বে নগণ্য ও অজ্ঞাত উত্তর ও পশ্চিম যুরোপকেই বুঝায়। আবার এক দিকে যেমন দেখিতেছি, পৃথিবীর পুরাকালের সভ্যদেশসমূহ ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত হইতেছে, যুরোপের অধুনা উন্নত দেশসকল ভেদনই যেন হীনপ্রত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মত একজন “কালো বাদামী” একথা বলিলে হাস্যপান্ড হইতে পারে কিন্তু ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ভাবুক অল্প দিন পূর্বেই বলিয়াছেন Europe has played out her part, এবং তিনি

ভাষার মতের যথেষ্ট প্রমাণও দিরাছেন। যে মুসলমানরা একদা ভীষ বিক্রমে সমগ্র সভ্য দেশ জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আক ভাষাদেবাই প্রধান সম্রাট The Sickman of Europe হইয়া রাজারকার্য পূর্বের দূষাপেক্ষা হইয়া গ্রহিতাছেন। যুরোপ যেন অগ্রগত হইয়া নব জীবন লাভা-কাজী পুরাতন সভ্য দেশসমূহকে নিজ আসন প্রদান করিতে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস হইতেও এ কথা সপ্রমাণ হয়। মহা-ভারতের সময় হইতে দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ইংরাজরা আসিয়া কলিকাতায় ভারতের রাজধানী স্থাপন করেন। এখন ভাষাগ্রাই আবার কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী রাজধানী করিয়াছেন। ইংরাজগণ কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হইলে বঙ্গলার প্রথম শাসনকর্তার পদবী ছিল গভর্ণর। তাহার পর বড়লাট ও পরে ছোট লাট বঙ্গের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। বিধির বিধানে এখন আবার সেই গভর্ণরই ফিরিয়া আসিয়া-ছেন। লর্ড এলগিন্, লর্ড মিল্টো, লর্ড হাডিং, প্রভৃতি বড়লাটগণ পূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসন অধিকার করিয়া গিয়াছেন। এখন আবার লর্ড এলগিন্, লর্ড মিল্টো, লর্ড হাডিং ফিরিয়া আসিতেছেন। ইংরাজ পূর্ণগত মিল্টো প্রভৃতি না হইলেও ভাষাদের বংশধর। *

Political History of Mankind হইতে পূর্বোক্ত প্রবাদ-বাক্যের যথার্থতা প্রমাণীকৃত হইতেছে কি না, পাঠকবর্গ এখন অনায়াসেই তাহার বিচার করিতে পারিবেন

রাজনীতিক ইতিহাস পরিত্যাগ করিয়া এখন আমাদের সামাজিক সভ্যতা, আচার-ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, এই প্রবাদবাক্য এ সকল বিষয়েও

* একই নামের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে (কখনও কখনও একই ক্ষেত্রে) এসিদ্ধি লাভ করেন, ইহাও একটি রহস্য। যথা, বেঙ্গলীর প্রতিষ্ঠাতা - দ্বিধিগত প্রবোধ ও বিখ্যাত নটরাজ ও নাটক-কার - দ্বিধিগত প্রবোধ, সম্রাটের দর্পণের - ভাবানীতরণ বন্দোপাধ্যায় ও 'সম্রাট' - ভাবানীতরণ বন্দোপাধ্যায় (ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়), হাইকোর্টের এসিদ্ধ উকীল ও অল্প - ব্যয়কাম্যের বিদ্র ও হাইকোর্টের বর্তমান উকীল ব্যাবহারশাস্ত্রে উচ্চ উপাধি-ধারী ঐচ্ছিক ব্যয়কাম্যের বিদ্র, সেন্ট্রাল সুপ্রিমারী প্রভৃতি বিধান - আওতাধীন বন্দোপাধ্যায় ও সেন্ট্রাল সুপ্রিমারী প্রভৃতি বিধান - বিধিবিদ্যালয়ের আইনজ্ঞানেন্দ্রের ঐচ্ছিক আওতাধীন বন্দোপাধ্যায়।

সমান বলবৎ কি না। ইংরাজরা ভারতবর্ষ অধিকার করার কিছু পরে সামাজিক আদ্যাদেশ দেশের অনেক পান্ডিত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই সভ্যতা। হিন্দুধর্মের উপর, Old dying superstition বলিয়া বীতরাগ, হযেন ও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণোচিত সত্যা আত্মিক করা, পূজা করা, শিখা রাখা, গৌফ দাড়ি কামান প্রভৃতি কার্যকালিকে তাঁহারা “সাপের মস্ত” pig’s tail ও অসভ্যতার পরিচায়ক প্রকৃতি বলিয়া উপহাস করিতেন। তাঁহারা “সাহেবি ধরণে হাসিতে, সাহেবি ধরণে কানিতে, সাহেবি ধরণের খানা খাইতে বড়ই ভাল-বাসিতেন।” বৃটান হওয়ার সংখ্যাও হ হ করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছিল; কিন্তু আজ কাল কি আর সে ভাব আছে? এখন পূজা আত্মিক করা, শিখা রাখা প্রভৃতিকে গৃণ্য করা মূরের কথা, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আধোচিহ্নিত আচার-ব্যবহারের অভাবে তাহার তান করিয়াও মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। ষাঁহাদের প্রথম প্রথম ঐরূপ উদ্ভট মত ছিল, তাঁহারাও এখন সে-উপনিষদ প্রচারে ত্রুটি হইয়াছেন। দেশে আবার হিন্দুধর্মের বন্যা আসিবার সূচনা হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইংরাজী সভ্যতা-বিস্তারের পূর্বে নির্ভাবান্ হিন্দুধর্মেরই গৌফ দাড়ি কামাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু পান্ডিত্য সভ্যতা প্রাপ্তির পরে গৌফ-দাড়ি-কামান গীতি-বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ কাল আবার নবা সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌফ-দাড়ি-কামানই ফ্যাসান্ হইয়া পড়াইয়াছে। আমার এক সহপাঠী কলিকাতার বি. এ. পড়িতে আইসেন; আসিয়াই গৌফ দাড়ি কামাইয়া ফেলেন। এক দিন আমার সকলে বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় তাঁহার পিতা, পুত্র কলিকাতার নূতন আসিয়া কিরূপ আছে, দেখিবার জন্য মেসে আসিলেন। আসিয়াই পুত্রের মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—“কি হে বাপু, তুমি যে দেখুচি কলিকাতার এসেই কার্জন সাহেব সেজে ব’সে আছ, ব্যাপার কি?”

আধুনিক সভ্যসমাজে একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা প্রভৃতিতে আহারাদি-সম্বন্ধে নিয়ম পালন করা কেবল “মুখ বদলাইবার কলি” বলিয়া অল্প দিন পূর্বে পর্য্যন্ত বিবেচিত হইত। কিন্তু অধুনা অনেকেই বেঙ্কার একাদশী প্রকৃতি পালন করিতেছেন, এমন কি, বড় বড় ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত একাদশী মাউক পূর্ণিমা অমাবস্যা মাউক, তবে রোগীকে অল্প পথ্য দেওয়া যাইবে, এইরূপ বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এহকাল হইতে ভারতের পাণ্ডগণ নত্ন গ্রহণ করিতেন। ঠাঁটি
বাঙ্গালী কবিও 'নন্দা লোনা, দধি চোখা' বলিয়া ঠাঁহাদিগকে ঠাঁটা করিয়া-
ছেন। কিন্তু সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার
নত্ন। সহচর সিগারেট পাখে ঘাটে, রেল গাড়িতে, শ্রমারে,
সভায়, সকল স্থানেই আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ
করিতে লাগিলেন। ক্রমে বোধ করি অনেকের চেতনা হইল যে, এ মুখ
উজ্জ্বল নহে, মুখাঘি হইতেছে। তাই আকস্মিক ছাত্রগণের অনেকের সিগা-
রেট ছাড়িয়া মাগুলি তাম্রকূট নত্নে অত্মরাস।

পূর্নকালে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকরা উকি পড়িতেন। কিন্তু ইতি-
হাসে দেখিতে পাওয়া যায়, মানবজাতি যখন অসভ্য থাকে, তখনই তাহারা
উকি পরিয়া থাকে; সুতরাং ভারতবর্ষ যখন পান্ডাত্য
উকি। সভ্যতার সংস্পর্শে সভ্য হইতে লাগিল; তখন উকি পরায়
প্রথা তিরোহিত হইল। স্তনিতে পাওয়া যায়, একজন
বাঙ্গালী মিভিলিয়ান তাহার স্ত্রীর অঙ্গ হইতে উকি ভুলিয়া দিবার নিমিত্ত
প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আবার যেরূপে লম্ব করিয়া
হাতে বৃকে উকি পরিতেছেন। স্রোত ফিরিয়াছে।

পুরাকালে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ নাকি জুতা
স্ত্রীলোকের পরিতেন ও সভায় যাইতেন। ঠাঁহাদিগের মধ্যে বড়
জুতা ও বিস্তা বড় বিদ্রুবাও ছিলেন। জানি না কোন্ পাশে এই সুদীর্ঘ-
কাল ঠাঁহাদিগকে এ 'সকল হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইয়া-
ছিল। এখন বোধ করি, প্রায়জিন্তের অবসান উপস্থিত, এ জন্য মহিলাগণ
পুনরায় জুতা পরিতেছেন, উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন, "সরস্বতী" উপাধি
পাইতেছেন এবং সভায় যাওয়া কোন্ ছাত্র, বক্তৃতা পদ্যস্ত করিতেছেন।

ইহা নিশ্চিত যে, পূর্নকালে আমাদের দেশের লোকরা এত চাকুরিপ্রিয়
ছিলেন না। ঠাঁহারা ইহাকে স্বত্তি বলিতেন। ঠাঁহারা স্বাধীনভাবে
চাকুরি জীবিকা অর্জন করিতেন ও এখনকার মত অর্জনে শীর্ণ
ও হইয়া অকালে ভবলীলা সাজ করিতেন না। কিন্তু
ব্যবসায়। উন্নতিশীল সভ্যতার আলোক যতই উজ্জ্বল
হইতে লাগিল, ঠাঁহাদের বংশধররা ততই বুকিতে পারিলেন যে, দাসত্ব
ভিন্ন নৃমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। আর এমনি বড় ছোট সকলেই

চাকরির জন্য লালায়িত হইলেন। বড় ঘরের ছেলে সন্ধান লাভের জন্য ডেপুটীগিলির উমেদারি করিয়াছেন, এমন দিনও গিয়াছে। স্বাধীন ব্যবসার হের হইয়া দাঁড়াইল। কেহ 'ব্যবসায় করি' বলিলে লোকসমাজে আর তাঁহার আদর ছিল না। কিন্তু এখন আর সে নেশার কেষ্ট নাই। এখন আমাদের দেশের লোক চাকরির জন্য লালায়িত হইলেও, 'মহাশয়, আপনি কি করেন?' জিজ্ঞাসা করিলে অনেক চাকুরিজীবী অতি দুঃখের সহিতই যেন বলেন, 'মহাশয় দাসত্ব, চাকুরি করি।' এখন পূর্বের মত অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত নহেন।

পূর্বে আমাদের দেশে কবিরাজী চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল ও তাহাতেই চিকিৎসা। রোগীর রোগ সারিত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার পর হইতে পুৰিবীতে ডাক্তারি ছাড়া চিকিৎসা নাই (যেমন কাহ ছাড়া গীত নাই), ইহাই লোকের ধারণা জন্মিল। সকলেরই মত হইল, কবিরাজী চিকিৎসা কি চিকিৎসা? কবিরাজী চিকিৎসার নাম হইল হাড়ুড়ে চিকিৎসা; ফারণ, কবিরাজ গাছ-পালা সিদ্ধ করিয়া খাইতে বলে, তাহাদের নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, সোডা প্রভৃতির স্তর জীবন্ত ঔষধ নাই। তাহারা পথা দেয় দুধ, ঘোল, মসুর ডালের দুধ, কাঁচা কলার কোল ইত্যাদি। ঘোল ও জলা, কি সর্ষপাশ! ও খাইলে ত রোগী সস্ত সস্ত নিউমোনিয়া হইয়া যাত্রা পড়িবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অনেকেই চৈকিয়া শিখিয়াছেন যে, আমাদের দেশে আমাদের আত্মীয় চিকিৎসাই ভাল। সেই জন্য আমরা আবার কবিরাজী চিকিৎসার আদর দেখিতেছি। আর ঘোল ত এখন ডাক্তার-দিগের সর্ষপাশিষ্করসকারী ঔষধ হইয়াছে।

আমাদের দেশে পুরাকালে ফল-মূল ও দুগ্ধই সাত্ত্বিক আহার বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু যে দিন "সাহেবরা" বলিলেন,—“মাংসই মানবের প্রধান খাদ্য। খাদ্য” সেই দিন হইতে যা ভগবতীর উপর বাহুদের অশ্রদ্ধা ও চণ্ড কাট্লেট্-লিক্-কাবাব কোথাকোথায় আসক্তি জন্মিল। এখন হেব"মহাশয়রা অনেক স্থলেই আমাদের বহুপূর্বস্বদীকৃত বিষয়গুলিকে আপ-মাদের উর্ধ্ব মস্তিষ্কের উদ্বৃত্ত ফল বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাহারা এখন দুগ্ধকেই শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলিয়া ডিক্রি দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের 'সত্য' মহাশয়রাও স্তর বদলাইয়াছেন ও এখন দুগ্ধের জন্য মাথা কুটিতেছেন এবং গোরকিশী সত্যায় বোগ দিতেছেন। অতঃপর আর বোগ হয়, তাহারা "সত্য

ইংরাজী খানা—যাংস. ডিম। প্রিয় মহোদয়গণ, কলা: পৈণে ও আমরা খাইব কি ৭ও ত বানরে খায়.দ্ব—সে আবার আমরা কি খাইব,ও ত বাছুরে খায়”.—বলিবেন না। এখন আবার শরীররক্ষার জন্ত অনেকে “সাহেবি” খানা ভোগ করিয়া হিন্দুর প্রকৃত খাদ্য খাইতে অভিলাষী হইয়াছেন।

পান্চাতা-শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকগণ কিছুকালপূর্বে পর্য্যন্ত “সাহেবি” ধরণের পোষাক জ্বাট, কোট, পেট্‌লান পরিধান করিতে অভিনয় পোষাক ভালবাসিতেন। কিন্তু এখন আর সে ভাব পরিচ্ছদ। নাই। কোট, গাণ্ট পরা অনেকেই এখন নাগ-পাশে বন্ধন বলিয়া মনে করেন ও তাহাকে এখন লোক “সংসাজী” বলে। হোমরা চোমরা: ব্যাগিষ্টাররাও এখন প্রীতিমিলনে বুতীচাদর পরিয়া আসিতেছেন।

পূর্বে আমাদের দেশে একরূপ জামা ব্যবহৃত হইত, তাহাকে সত্য ভবা ইয়ং-বেঙ্গল বিজ্ঞপ করিয়া “রামজামা” বলিত। সেই রামজামার পর কত প্রকার শার্টিংরই না আবির্ভাব হইল! ডবল, প্লেট, সেক্‌মণিয়র কলার, কার্জন কলার ইত্যাদি ইত্যাদি। নূতনের পর নূতন! এখন সর্ক্যাপেক্ষা সৌধীনতার জামা হইতেছে “আন্ধির চুড়িদার”। যিনি সেই রামজামা ও এই চুড়িদার দুইই দেখিয়াছেন, তিনিই অকপটচিত্তে বলিবেন, বিংশ শতাব্দীর চরম বিলাসিতার জামা “আন্ধির চুড়িদার”সেই পুরাকালের রামজামার নব-সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

এক শত বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের লোকরা জুতা খুব কম পায়ে দিতেন। পূজার সময় এক ঝোড়া করিয়া জুতা হইত; সে ঝোড়াটি ভাষারা সর্কদা পায়ে দিতেন না, কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে জুতা ঝোড়াটি বগলে করিয়া লইয়া গিয়া গ্রামের বাহিরে কোন পুকুরশী বা ডোবা পাইলে সেখানে পা ধুইয়া জুতা পরিয়া “ভজলোক” লাগিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেন। এখনকার সময়ে যেমন বাবুয়া কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে জুতা পুলিশার এবং খুলিয়া রাখিলে চুরি যাইবার ভয়ে সবট ভোজনে বসিয়া যান, তখন সেরূপ ছিল না। বঙ্গদেশী আন্দোলনের পূর্ক পর্য্যন্ত নগরপদে বাকী সত্য সমাজের অল্পপন্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারকালে ষাষারা মা মরিলেও জুতা খুলিতে ইতস্তত: করিতেন, ভাষারাও খোলা পায়ে বেড়াইতে লাগিলেন। ভাষার পর আবার যখন ডাক্তার “সাহেবরা” বলিতে লাগিলেন এবং Chambers's Cyclopaedia of Popular Knowledgeএ লিখিত হইল যে, চরণ-

কমল ধূলিরেণুর সঙ্গে একেবারে সন্মিলিত হইলে বাত্মানি হয়, তখন অনেকের চট্কা ভাঙিল। এখন তাই আবার নরপদে থাকা পূর্বের যত লজ্জার বিষয় নহে।

প্রথমে আমাদের দেশে জুতা বলিলেই লোক নাগরী জুতা বা তাম্বু কোন জুতা বুঝিত। ক্রমে সত্যতাবিধ আমাদের যতই উপরে উঠিতে লাগিল আমাদের জুতাও বোধ করি ততই ভাষার সহযোগী হইবার অভিনাবে আমাদের মস্তকের দিকে ঘাবিত হইল। প্রথম চটা ও নান্দা, তাহার পর সু, তাহার পর বুট, অবশেষে শিকারের সঙ্গে সম্পর্ক নাহি অথচ হাটিং বুট বাট্ট পর্বত উঠিল। ইহার পরই কিন্তু পুনরাবর্তন আগ্রহ হইল। এখনকার সর্গাপেক্ষা বাবুগিরির জুতা ঐসিয়ান্ রিপার ও পাম্প সু—একটি কি নাগরী জুতারই সভ্য সংস্করণ মাত্র নহে? এমন কি, ধোঁহ নাগরী পর্বত সভ্যসমাজে চলিয়াছে। যেখানে উৎপত্তি, সেইখানেই নিবৃত্তি।

দশ পনের বৎসর পূর্বে কাগড়ের ছাতার ছাঙেল ছিল গোল। তাহার পর কত ব্রকবের ছাঙেলই না দেখা গেল! ষ্টিল ছাঙেল, তাহাতে ছাতা ফুহরের মুখ, বাঘের মুখ, গোলাপ ফুল প্রকৃতি অঙ্কিত। কিন্তু লোকের বিলাস-প্রিয়তা আর কিছুতেই মিটিল না; পরন্তু অনুবিধা ভোগ করল অসহ হইয়া উঠিল। ষ্টিল ছাঙেলে পোষাক বারাপ হইয়া যাইতে লাগিল এবং বিজ্ঞান পড়িয়া জ্ঞানচক্ষু উদ্বীলিত হওয়ার ষ্টিল ছাঙেলের ছাতা লইয়া দ্রুতির সময় বাহির হওয়া মুকিল হইয়া উঠিল; কারণ, মস্তকে বৃত্ত ষ্টিল ছাঙেলযুক্ত হস্তের লৌহবস্ত্র উপরে থাকার মস্তকে বস্ত্রাঘাতের সম্ভাবনা! (বাকি কি?)। ছাঙেল গোল না হওয়ার মান্য দিকেই গোল বাবিতে লাগিল—ছাতা কুলাইয়া রাখা যায় না, ছেলেরা কাঁখে ছাতা আটকাইয়া দিয়া কুলের ছুটির পর বই হাতে করিয়া বাড়ী বাইতে পারে না, ইত্যাদি। কায়েই ‘পুনরুৎপত্তি’ ছাড়া আর গভীরতর না দেখিয়া আবার সেই গোল ছাঙেলই উপস্থিত, তবে একটা কিছু হইলে উহা নিজের ছাপ না রাখিয়া যায় না বলিয়া এখনকার ছাঙেল গোল হইলেও উহা পূর্ণাপেক্ষা কিছু চিত্র-বিচিত্র বটে।

ইংরাজী নেশা ধরিলে বাঙালা ভাষা ত অসভ্য বর্করের ভাষার সাহিত্য ও (barbarous brutish language এ) পরিণত হইয়াছিল। সভ্য সমাজে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙালায় কথা বলা বা বাঙালা লেখা লজ্জার কথা হইয়া-

ছিল। সকলেরই বাসনা ছিল, ইংরাজীতে বস্ত্র দেখা। এখন সে নেপা। কাটি-
রাছে। এখন মহৎ জুড় সকলেই বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিলাভনে বদ্ধপরি-
কর। এখন সকলেই জননী বক্তব্যকে ভালবাসিতেছেন। কেহ কেহ স্বজা-
তির মধ্যে পত্রাদি লেখায় বিশেষী ভাষা ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা
করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আমলে বাঙ্গালা ভাষার বেশ আদর
ছিল; এমন কি, বাঙ্গালা লইয়া বি, এ, পাশ করা চলিত। মধ্যে বাঙ্গালার সে
প্রতিপত্তি একরূপ উষ্ণিয়া গিয়াছিল। এখন বাঙ্গালার পুরাতন অবস্থা ফিরিয়া
আসিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার ত কথাই নাই; এমন কি, ব্রহ্মর জাৰ্মানিতে পর্য্যন্ত
সংস্কৃতভাষা হইতেছে। অস্ত্রে পরে কা কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-
Chancellor F. R. A. S. F. R. S. E. প্রতি বিদেশের আমদানী উপা-
ধির পার্শ্বে সরস্বতী ও শাস্ত্রবাচস্পতি উপাধিকে স্থান দিতে পৌরষ বোধ
করেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম অবর্তনের সময় এ দেশের পক্ষে পান্ডিত্য শিক্ষা
অথবা প্রতীচ্য শিক্ষা উপযোগী, ইহা লইয়া যথেষ্ট মতবৈধ ও বাগবিতণ্ডা
হইয়াছিল কিন্তু পরিশেষে লর্ড মেকলের মতই প্রোচাত্ত লাভ করার ইংরাজী
শিক্ষাই তারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতীত ইংরাজী শিক্ষার তথাকথিত
বিষয়ের ফল-সম্পর্কে আবার সেই পুরাতন দুয়া উদ্ভিয়াছে, এ দেশের পক্ষে
পান্ডিত্য শিক্ষা ভাল, না প্রচীন শিক্ষা ভাল? ফলে পুনরায় Islamic
studies, Sanskrit studies এর অধ্যয়ন।

সার বালা রাধাকান্ত দেব যখন লক্ষ্যকল্পের সম্পাদন শেষ করেন,
তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। আবার
একালে ঐশ্বর্য্য নগেন্দ্রনাথ বসু প্রচাৰিবিদ্যায়মহর্ষব
বিধানের সমাদর। মহাশয় বিখ্যাত সম্পাদন-কার্য্য সমাপ্ত করার তাঁহা-
কেও সেইরূপ অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে।
সত বৎসর কবি রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছে,
তাঁহাও নূতন নহে; কারণ, পূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাদ-বধ কাব্য
শেষ করিলে তাঁহাকেও ঐরূপ অভিনন্দন প্রদান করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ
তাঁহার বাঙ্গালা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ইউরোপীয় বন্ধুদিগকে
ভনাইতেছেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তও ইউরোপ প্রবাস-
কালে ঐকি এইরূপ করিয়াছিলেন।

৮য়ারকানার ঠাকুর বিলাতে গিয়া খুব বাহবা পাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার বিপক্ষীয়গণ রটাইয়াছিলেন যে, তিনি বড় ধরের ছেলে, “যোগাড়ে জয়া” হইয়াছেন। আমাদের সময় তাঁহারই বংশধর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিলাতে গিয়া বেশ নাম কিনিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও অনেকে তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই রটাইয়া প্রবাদবাক্যটির মাধ্যমে প্রশংসা করিতেছেন। মাইকেল ও কান্তকবি উভয়েরই দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু প্রবণের আরও উল্লিখিত প্রবাদ বাক্যটির একটি বিধানময় প্রমাণ দিতেছে।

আজ কাল আমরা চারিদিকেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতেছি : বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকে হয় ত মনে করেন, ইংরাজরা আসিয়াই অজান ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে আনিবার নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। মুসলমানদিগের আমলে আমাদের দেশে সেরূপ কোন বিশেষ প্রাতিপত্তিনাদী বিশ্ববিদ্যালয় না থাকিলেও মুসলমান আগমনের পূর্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভূবনবিখ্যাত ছিল। সুতরাং এ কালের বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতনই কিছুই মাই, ইহা পুরাতনেরই পুনরুৎপত্তি মাত্র।

বিদ্যালয়গণের মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ প্রচলিত হওয়ার পূর্বে বালকগণকে ছবি ও ছড়ায় বর্ণ ও বানান শিক্ষা দেওয়া হইত, কবিতায় ক এ করাত, খএ খরগোস, ও “মিঠাই খাইব, কোবার ক খ শিক্ষা। পাইব” ইত্যাদি। বিদ্যালয়গণের মহাশয় সেগুলিকে নিক্ষেপিত করিয়া যানেন। এখন আবার প্রথম শিক্ষার পুস্তকগুলি পড়ো দেখা হইতেছে, যথা—“কাকাতুয়ার মাঝায় কুটি, খেক-শেয়ালি পালায় ছুটি।”

পূর্বে আমাদের দেশে দণ্ডরি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বইগুলির উপরে একখানি মলাট দিয়া রাখা হইত। এখনকার মত পুস্তকগুলির পুস্তকের ধার সমান করিয়া কাটা হইত না, কোন দিকে বা পুস্তকের মলাট। পাতাগুলি মলাট হইতে বাহির হইয়া থাকিত, সুতরাং পুস্তকগুলি দেখিতে বিশেষ সুক্ৰী হইত না। তাহার পর পুস্তক এবং মাসিক পত্রিকাগুলিকে পুস্তকের মলাটে সম্বদ্ধ করিয়া ও তাহাদের পাতা কাটিয়া ছিমছাম করিয়া বাহির করা হইত। এইরূপে পুস্তকগুলির Get up ক্রমেই ভাল হইতে থাকে। “কিন্তু নীচগন্ধত্যাগরি চ দশা চক্রেমি ক্রমেণ” এই তত্ত্ব

কি সরস্বতীর দরদারেই মিথ্যা হইতে পারে ? তাই আজ কাল আবার যাহুলি বই বাধানর কদর হইয়াছে । পুস্তকের পাতা ও ধার কাটিয়া না দেওয়া এবং একখানা মোটা রঙিন কাগজ ছাপাইয়া, তা বঁকাই হউক বা বড়ই হউক না কেন, কোন এককোণে পুস্তকে মলাটবন্ধপ আটকাইয়া দেওয়াই হাল ফাশানের সঙ্গাপেক্ষা অল্পর *Get up* হইয়াছে । ১৩১৮ সালের পুজার 'মানসী' রবীন্দ্র-মঙ্গল, নগেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতিই তাহার নিদর্শন । সাবধান ! ইহাকে যেন কেহ *studied negligence* বলিবেন না । ইহাই আধুনিক *artistic beauty*—কলানৌশল্য !

পূর্বে আমাদের দেশে কবির লড়াই হইত । মধ্যে কিছুকালের হইতে উহা সভা জাতির অল্পপুঙ্খ বলিয়া উঠিয়া গিয়াছিল । এ জন্য অন্য দেশে কবির কবির লড়াইএর আয়োদ উপভোগ হইতে সভাতার বাতির লড়াই । আমাদিগকে কিছুকাল বকিত থাকিতে হইয়াছিল । কিন্তু এই রস আমাদের মঙ্গাপত্ত ছিল, তাই কালচক্রের অহুগ্রহে অগুনা সেই উপভোগের সামগ্রী পুনরায় কিরিয়া আসিয়াছে । তবে এ বার ঠিক-কুঁড়ি লড়াই নহে । একটু রূপান্তর । এবার সংবাদপত্রের ও মাসিক-পত্রের লড়াই ; কিন্তু সমান উপভোগ ।

ইংরাজদিগের আগমনের কিছু পূর্বে আমাদের দেশেও চিত্র-বিভার চর্চা ছিল । তখন অনেক দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত হইত, কিন্তু সৈন্তলি আধুনিক বিলাতি ছবির মত অত স্পন্দর হইত না । ইংরাজ-ছবি ।

দিগের আগমনের পর হইতে আমাদের দেশের ছবির কিছু উন্নতি হইতে থাকে । চিত্রে কোন ভাব পরিস্ফুট না হইলে ভাষায় তাহা বর্ণন করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর উপায় কি ? তাহার নিদর্শন এখনও আমাদের দেশে রোজাদিগের জুত বা বিধ নাখাইবার নিমিত্ত জুপুঠে অঙ্কিত চিত্রে দৃষ্ট হয় । সে ছবিগুলি কি তাহা বৃত্তিতে হইলে রোজা মহাশয়কে বিজ্ঞাসা করিতে হয়, এটা কি, ওটা কি ? উত্তর হয় বহু, মাফ হইয়াদি । আধুনিক নবনবীভিকর চিত্রগুলি দেখিয়া সে বস্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইত না । কিন্তু সকল বস্তুই যখন প্রত্যাধর্জনশীল তখন চিত্রই ব্যক্তি পাপ করিল যে, চিত্রনির্বাসন দত্ত ভোগ করিবে ? বিবির নিরমাহুদারে চিত্রবিদ্যা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতে করিতে আধুনিক বদা-খ্যাত ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে আসিয়া উপস্থিত এবং কতিপয় অগ্রগণ্য

মাসিক পত্রিকার পরিচালকগণ উক্তটির সেই জীবন্ত চিত্র 'চিত্রপরিচয়' লব্ধ সগর্বে মুদ্রিত করিয়া এবাদ বাক্যটির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা আমাদের অশেষ বক্তবাদের পাত্র, কারণ তাঁহারা না থাকিলে আমাদের সাবেক চিত্র-পদ্ধতি মহাপ্রস্থানের উদ্ভোগ করিতেছিল; তাঁহাদের কৃপাতেই আবার ফিরিয়াছে।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যখন দেখিতেছি সকলই ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তখন ইহা হইতে কি কেহ মনে করিবেন যে, পৃথিবীতে উন্নতি বলিয়া কোন পদার্থ নাই? পৃথিবী কি তবে "কণুর চোক ঢাকা বলসরে মত" কেবল ঘুরিয়াই মরিতেছে? না তাহা নহে। লকটচক্র যেরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে অগ্রসর হয়, চিল যেরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমেই উর্দ্ধে উন্মিত হয়, দার্কিলিঙ্কের রেণুগাড়ী যেরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে আরোহণ করে, আমাদের পৃথিবীও সেইরূপ পুনরাবর্ত্তন করিতে করিতে ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। *

ঐনরেজেনাথ মুখোপাধ্যায়, ।



* All movement is rhythmical—After going to one extreme a reaction in course of time carries it to the other extreme, and then comes eventually a re-action—Herbert Spencer's Facts & Comments.

সিদ্ধান্তম-পথে ।

— :: (০) :: —

(বিখ্যামিত্র সহ ত্রীরায লক্ষ্মণ ।)

ধরাভলে একি নব অবতার
 নয়নের পথে খেলে,
 প্রবীণ পাতুর মেঘের স্মৃতি
 মঙ্গলধনে হেলে !
 লিছে লিছে তাঁর শিল্প শশীরবি
 ছবির মাণ্ডরী ধায় ।
 নীবিড় কাননে গভীর আঁধার
 পিছারে পিছারে যায় !
 বিছায়ে অরণ্যে গৌর ভ্রামর
 লাবণ্যলহরী চলে,
 গজা যমুনা লামাপানী যেম
 মিশামিশি ফুঁহলে !
 কিশোর বয়সে কিশোর লাগিছা,
 কুমার-বৃগল হেন
 গিরি-সঙ্কর গহনে দুর্গম
 এ পথে পার্বক কেন ?
 ভুলে ভীষ্মহু, তুণীয়ে ভীক
 পরগোছা পিঠে লাজ,
 লতার লড়ায়ে যেন বিষধর,
 কোমলে কঠোর কাষ !
 কোমলই বা কিসে, নিমিষেতে ছুটে,
 তারা যেন দূর আগে,
 মূনির হকার না ফুটিতে মুখে
 উপনীত গিছ ভাগে ।
 দেখামাত্র গিরি, চড়ে তার শিরে,
 না দেখিতে পুন নায়ে,

পাঠিত পাঠ্যে **অসন গাড়িয়ে**

ଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଠାରେ ।

ସୁହ ବାଳ—ଫଟେର ସଖନ ଚନ୍ଦ୍ରମ

নিম্নিত্ব উঠায় ছুটে,

সজল নৈকটে বসে পা গেলিয়ে

ସ୍ୱସ୍ତ୍ୟସ୍ତୁ କୁଟେ ।

[illegible]

ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶଙ୍କର ମାୟ ।

অলখিতে বনে কোকিলের ডানে

ବାଢ଼ାସ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତ୍ତ ଡା'ମ୍ ।

বাটলার বেগে দ্বাদশ বীজ—শিত্ত

হেলে মুগ-শিত্ত ধরে,

ହେନିରେ ହରିଣୀ ଓଁ ଠାଣେ ନୁହ

ଧରେ ତା' ରୁଦ୍ଧରେ !

হাসি কহে যুনি, তুমি রে বাছনি

ଅଥବା ନାହିଁ ତୋ-ସବାର ?

কবি কহে বটে বিপ্রাশেরই তরে

মহা ভূমি এ-দৌহায ।

ঐশ্বর্যদামোদর অতিথীর্থ-বিদ্যা-বিনোদ ।

ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ —



শ্রী: বাসু দেবপ্রসাদ শর্ম্মা—

সংগ্রহ।

বিবিধ।

ভারতীয় মিউজিয়ামের ইতিহাস।

খ্রিস্ট ২৮শে শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় বাহুবলের বিখ্যাত অট্টালিকাগুলি এক মহতী সন্তান মহামতি লর্ড কারমাইকেলের সভাপতিত্বে মাদ্রাস ডাক্তার ডায়াক্টোব সুযোগ্যবায়র সহায়তায় মিউজিয়াম বা বাহুবলের ইতিহাস বিস্তৃত করিয়া এক উপায়ে প্রস্তুত পাঠ করেন। আমরা তাহার সাহায্যে ‘অ্যান্থ্রোপোলজি’ পাঠ্যকর্মের প্রথম লিপিবদ্ধ করিলাম।

ভারতীয় বাহুবলের ভারত মহাদেশের মধ্যে একটি জনপ্রিয় সাধারণের শিক্ষার অঙ্গাঙ্গীভাবের। ইহার ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

পঞ্চ বর্ষ পূর্বে কেবলমাত্র কয়েক জন উৎসাহী শিক্ষিত ব্যক্তি একত্র হইয়া দেশের ভাষা, ইতিহাস ও প্রভৃতির আলোচনা এবং ভৎসনায় দেশীয় উৎসাহ জনের তথা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সামান্য অর্থের সাহায্যে এই কলিকাতা মহানগরে ভারতীয় বাহুবলের প্রথম প্রতিষ্ঠাপন করেন। পরে খ্রিস্ট ১৮৬৪ সালে হইয়া বাইলেও কর্তৃপক্ষীয়তায় স্থাপিতাদিগের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ও আবেদন সত্ত্বেও এ দেশে বাহুবলের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে সন্নিহান হইয়া এই প্রকল্পে সাহায্যদান করেন নাই। পরে এই বাহুবলের স্থাপিতাদিগের উপস্থিতিতে অল্পোৎসাহ ও আবেদনের ফলে কর্তৃপক্ষীয়দিগের মনোযোগ অল্পটুকু হইয়া এবং প্রথমে কয়েকজনের উৎসাহে যে মহৎ কার্যের সূচনা হইয়াছিল তাহা সন্তোষজনক সাহায্যে ও অর্থের অভাবে তাহা ক্রমশঃ ভারত সাম্রাজ্যের উপযুক্ত, রাজধানী কলিকাতায় যোগ্য স্থান বাহুবলে পরিণতি লাভ করে। সামান্য কয়েকজনের অঙ্গাঙ্গীত্বে যে এতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিবে তাহা স্থাপিতাদিগের পূর্বে আশা করিতে হইত। বোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বর, পরিচয়, উৎসাহ ও ঐকান্তিকতা ভিত্তিতে প্রচলন প্রসব করিল।

ভারতীয় বাহুবলের সমাজ ইতিহাসে অবদান করিতে গেল আমাদিগকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ঘটনাবলীর অল্পসময়ে প্রস্তুত হইতে হইবে। যে সময়ে এই দেশে ব্রিটিশ-প্রভাব প্রাতিষ্ঠিত হয় সেই সময়ে যাহারা এ দেশের কার্যে আগুনাদিগের প্রথম উৎসাহ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন সার উইলিয়াম জোসেফ ব্রিটিশ ১৮০৪ অব্দে এডিনবার্গ মেডিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রতিভার স্বাভাবিক বিকীর্ণতার সহকারে তিনি মেলব, এডিনবার্গ মেডিক্যাল সোসাইটির উদ্দেশ্য সমগ্র আলিয়ার প্রাকৃতিক ও মানবচিত্তের বস্তুর তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের সমাজ আলোচনা ও অনু-সন্ধান। তবে অষ্টাদশশতাব্দীর বক্তৃতার সার উইলিয়াম জোসেফ বাহুবলের পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠাকল্পকল্পে বা সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্যের মধ্যে যে বাহুবল—প্রতিষ্ঠা, অন্যতম তাহার বিষয়ে প্রকাশ্য ভাবে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বরং তখন বা তাহার কিছু দিন পর পর্যন্ত সোসাইটির নিজস্ব কোন আবাসস্থান ছিল না। তবে সোসাইটির সভাপতি ক্রমশঃ নানাবিধ কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন এবং ১৮১৬ খ্রিঃ অব্দে

দ্বিঃ হইল যে, বেধন করিয়াই হউক এই সমস্ত ত্রয উপযুক্ত তাবে সংস্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য একটি গৃহ নির্মিত করিতে হইবে । ঠাণ্ডা সংগ্রহের চেষ্টা হইল । কিন্তু তখন আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইল না । পরে ১৮০৮ খৃঃ অব্দে পত্ৰগনেষ্ট এসক্স জুনিয়র উপর উপর পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে সোসাইটী অট্টালিকা নির্মাণ করিলেন । তাহার পর ত্রয় বৎসর অতীত হইল ; বাহুবর সংস্থাপনের প্রস্তাব কার্যে পরিণতি লাভ করিবার দিকে অগ্রসর হইল । এই সময়ে স্কটল্যান্ডের অবস্থোবে বানীকৃত ভেনবার্কবাসী উল্লিখিত, ডাক্তার নাথানিয়েল তত্ত্বালিক পাতিত্যগুণে কারাবাদনুষ্ঠান হইয়া বাহুবর সংস্থাপনপ্রস্তাব করিয়া ও স্বয়ং তাহার অবৈতনিক তত্ত্বাবধান (Curator) হইতে খীড়ত হইয়া সোসাইটীকে পত্র লিখিলেন । তিনি খীর সংগ্রহ হইতে একটি করিয়া duplicate সোসাইটীকে দান করিয়া সোসাইটীর বাহুবরের সূচনাকার্যের সহায়তা করিতে চাহিলেন । দ্বিঃ হইল, বাহুবর দুই অংশে বিভক্ত হইবে—এক অংশ প্রত্নতত্ত্ব, মানবজাতিতত্ত্ব ও শিল্প-বিজ্ঞান বিষয়ক, অপর অংশ কৃত্তর ও প্রাণিতত্ত্ব সংক্রান্ত । প্রথম বিভাগ সোসাইটীর পুস্তকালয়-রক্ষকের অধীন করা হইল । ডাক্তার তত্ত্বালিক দ্বিতীয় বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন । অনন্তর এইরূপ একাদি করা হইল যে, প্রাত্যহিক রীতিনীতিবিষয়ক-অথবা ইতিহাসসংক্রান্ত বাহা কিছু প্রেরিত হইবে, প্রাত্যহিক স্বভাবল অথবা কলাবিদ্যা সম্বন্ধে যে কিছু বিশেষবস্তুক ত্রয সংগৃহীত হইবে, তৎসমুদায়ই বাহুবরে সাক্ষরে সংরক্ষিত হইবে । বাহাতে বাহুবরে শিলালিপি, বাতুলিপি, হিন্দু অথবা মুসলমানের প্রাচীন স্মৃতি-স্তম্ভ, হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা, প্রাচীন মূর্ত্তা, স্বতলিখিত প্রাচীন প্রত্নবিদ্য, বৃত্ত ও সর্পিণ্ডের উপকরণসমূহ প্রাত্যহিক বিশেষতত্ত্বাপক বর্ণনাক্রান্ত উৎসবে ব্যবহৃত পাত্রাবলী কলাবিদ্যার অথবা বাহসাহিত্যপোষী (দেনজ) কর্তব্যাবন বস্ত্র, ভারতের সূত অথবা হস্তিত্ত্ব প্রাপ্তিগণের ককাল অথবা অস্থি প্রভৃতি তত্ত্বতত্ত্বকলাবি, প্রাচীর বাতুল্য অথবা উদ্ভিদ প্রবাসনুষ্ঠান, আকরোদ্ধৃত বাতুলিত, বাহা একত্র মিলিত বাতুল, সর্ব একত্রের স্বনিম পদার্থ এবং ঐ একত্র ইতিবৃত্ত ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বিচারক ত্রয চুক্তিত হইতে পারে তত্ত্বতত্ত্ব অর্থ ও আদর্শ প্রার্থিত হইল । এইরূপে সংপ্রতিষ্ঠিত বাহুবর বহোদায়নীয় প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার তত্ত্বালিকের তত্ত্বাবধানে দিম দিন উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল ।

তর্বেল ইন্সট্রট, ডাক্তার টাইটলার, জেমারল বেকেরি, বিট্রার হলদন, ক্যান্টেন ভিলেন ও বাহু ত্রায়কনল সেন গ্রন্থ সংগ্রাহকসমূহ নৈশের বিভিন্ন স্থান হইতে সানাবিধ চিত্রাকর্ষক এবং কোতুললপ্র ত্রয সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । ডাক্তার তত্ত্বালিকের কার্য ত্রায়ের পর দ্বাদশ ১০-হইতে ২০-টাকা পর্যন্ত বেতনে পূর পর করজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন । ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে পাবার কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া বাতুল্যতে সোসাইটীর গ্রন্থ আর্থিক কতি হইল এবং তত্ত্বতত্ত্ব তত্ত্বাবধায়কদিগকে বেতন প্রদান করা দুর্দ-হইয়া পড়িল । প্রথম কোটের প্রদান বিচারপতি ও সোসাইটীর সভাপতি ভর এডওয়ার্ড রাহান বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ও ভারতবর্ষীয় প্রজাবৃন্দের শিক্ষার জন্য ভারতের এবং সন্নিকট

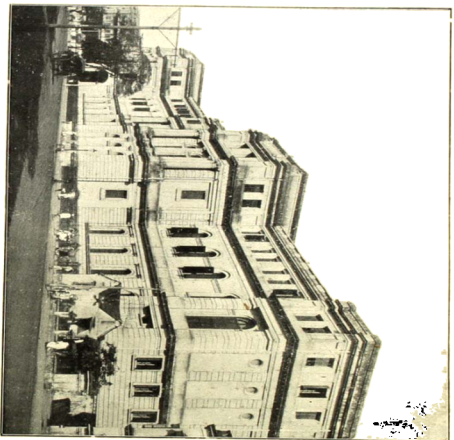
অন্যদিকদ্বয়ের দ্বাবাদি সংরক্ষণার্থ সরকারসংস্থাপনের নিত্যক আবশ্যকতা বিস্তৃত করিয়া তদ্ব্যবহারকের বেতন নির্দিষ্টার্থ সরকারের নিকট মাসিক ২০০১ পত টাকা সাফায়া আর্থনা করিলেন। কিন্তু সপার্বন বড়লাট কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অনুমতি ব্যতিরেকে এ প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে অসমর্থ্য প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সরকার স্বীকার করিলেন যে, সুযোগে যেমন বাছুর সাধারণ বন্যপার হইতে পরিচালিত হয় সেইরূপ এ বেলেও বাছুরসংস্থাপন পর্যবেক্ষণের সহায়তা ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

সোসাইটির সভাপতি পুনরায় আবেদন করিলে এই বাছুরকে সরকারী সম্পত্তি করিয়া প্রস্তাব বিলাতে পাঠাইয়া ভারত সরকার অণুততঃ সোসাইটীতে কিছু সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইলেন। এই সময়ে ডাক্তার শিলাপুন জবাবদায়ক নিযুক্ত হইলেন। ইহার পরে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণবিদ ডাক্তার মলিয়াও ইহার পদে বৃত্ত হইলেন। এ দিকে সোসাইটী কর্তৃপক্ষের ব্যয়ে এ বেলে সরকারী বাছুর সংস্থাপনক্রিয়ায় যে আবেদন করিয়া ছিলেন ভারত সরকার তাহার সমর্থন করিয়া সেই প্রস্তাব বিলাতে পাঠাইলেন। তখন বিলাতে পুনরায় সমস্তদাপেক ও অনুবিধানগুলি। সেইরূপ ১৮০৯ খ্রষ্টাব্দের পূর্বে পর্যবেক্ষণ কোর্ট অব ডিরেক্টরদের উত্তর পাইলেন না। তাহার বাছুরদের সংরক্ষণ এবং তদ্ব্যবহারকের বেতন নির্দিষ্টার্থ মাসিক কেবল ৩০০ টাকা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারকে বিশেষ প্রয়োজনে অর্থ দান করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ডাক্তার মলিয়াওদের পর ডাক্তার হরেন হোবান উইলসন কর্তৃক নির্ধারিত বিটোর এডওয়ার্ড ট্রাইব তদ্ব্যবহারক নিযুক্ত হইলেন। তিনি তাহার পূর্বাধিকারীর অপেক্ষাও বিচক্ষণ সংরক্ষণবিদ ও প্রকৃতিবিজ্ঞানবিদরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই লব প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিশেষ উদ্যান সহকারে কার্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি ভূতত্ত্ববিদ ছিলেন না, সেইরূপ তৎসংক্রান্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা-ব্যাপারে বিশেষ অনুবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। কারণ, তখন বাছুরের ভূতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহ যথেষ্ট হইরাছে।

ভারত সরকারের সমর্থোচিত সাহায্যে সোসাইটীর এই অনুবিদ্যা বৃদ্ধ হইল। ১৮০৯ খ্রষ্টাব্দে রাণীসজ্জের বনীর অধিকারীরাষ্ট্রের সমস্তোৎপাদক কার্য পরিদর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া এবং ডাক্তার হেলকার প্রভৃৎ বিজ্ঞানবিৎসমূহের অনুপ্রেরণা সরকার কলিকাতা মহানগরীতে বাছুর সংস্থাপন করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। ১৮৪০-খ্রষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ খ্রষ্টাব্দে যে মাসে ক্যাপ্টেন ট্রেমেনহোল্ড বহু দূরত্বাশ্রয় আর্থ লইয়া বিলাত হইতে প্রত্যাপ্ত হইলেন। ইনি এই সকল সংগ্রহ করিতে বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দ্রব্য সমিতির গৃহবধো প্রদত্ত হইল এবং ইহার অল্প অংশ একজন তদ্ব্যবহারকের ব্যয় বলিয়া ভারত সরকার মাসিক আদত ২০০১ টাকা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিটোর শিডিংটন তদ্ব্যবহারক নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে সংস্থাপিত হইয়া ভূতত্ত্ববিদ্যার বাছুর সমিতির গৃহই অধিকার করিয়া গেল। ১৮৬৬ খ্রষ্টাব্দে যখনই তাহারদের সংগ্রহাংশ ১২০ হেক্টর জমিতে স্থানান্তরিত করিলেন এবং আনাইলেন যে, তাহার

সমিতির অধিকারস্থ দাবতীর আনন্দও গ্রহণ করিতে অন্তত । কিন্তু সমিতি যদিও সুবিলেয় বে কৃতদ্রাবন, পথাবেককপণের কর্তৃত্বাধীনে সংগ্রহ কার্য্য ত্রুতক করিয়া পরিচালিত হইবে তথাপি তাঁহার সমিতির অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া স্থানান্তর-অতাবে অসদ্বিত্তিজ্ঞাপন করিলেন ।

সরকারের সংগ্রহাংশ স্থানান্তরিত হওয়াতে কিছুকালের জন্য কার্যকর্য্যাদি স্থব অন্ততঃ এবং আশিত্ত-বিষয়ক সাময়ীপত্রাঙ্কের স্থান দানের জন্য স্থনা হইল । কিন্তু সমিতির সভাপ্রশ্নের সমবেত চেট্রার এবং মিট্রার স্রাহিষের কর্তৃত্বপটুতায় আশিত্তরসংক্রান্ত বহু জ্ঞা সংগৃহীত হইয়াছিল । এই কারণে অল্পদিনেই স্থনা পেল যে, অচিরে স্থানান্তাবহেতু সে সংগ্রহের পুষ্টিসাধন অগ্রতর হইয়া দাঁড়াইবে । ভবন সোমাইটীর সভাপন ১৮৮৬ খ্রষ্টাব্দে এই বর্ষে একপানি আবেদন পত্র ভারত সর্গেরেই সমীপে প্রেরণ করিতে অনন্ত করেন যে, তাঁহার কলিকাতায় একটি Imperial Museum প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারের পুস্তকগুলি বাতীত দাবতীর সংগৃহীত জ্ঞা তাহাকে দান করিতে অন্তত । দিপাধি বিস্ত্রোহের সময় সরকার বিস্ত্র ব্যাকার সোমাইটীর এই প্রস্তাব উপস্থাপনবিধয়ে কিছু কাল বিলম্ব হইয়াছিল । দুই বৎসর অতীত হইলে আবেদন পত্র প্রদান করিয়া, তাঁহার Imperial Museum এত স্থাপনকরে সেট্রে হইলেন । ভারত সরকার যদিও কলিকাতা মহানগরীতে এইরূপ বাহুবর সংস্থাপিত করিয়া, তাহাতে ঐশ্বর্য্যিক ও ঐতিহাসিক প্রকৃতি এককালে আবেদন ও শিক্ষাপ্রদ জ্ঞোবর সংস্থাপন আশ্বনাশের কর্তব্য মধ্যে পরিণত করিয়াছিলেন, তথাপি অর্থব্যয়ে স্থিতিত হইয়া প্রস্তাব সর্ব্বল করিলেন না । সোমাইটীর সভাপন কিছু এ বিধয়ে নিরতিশয় অব্যবসায়ী ছিলেন । তাঁহার এতদ্রুদ্দেশ্যে স্পার্ষন ভারতস্রিতির নিকট আবেদন করিলেন । এইবার তাঁহারের উদ্যম সফল্য লাভ করিল । সোমাইটীতে ও ভারত সরকারে যে কথাবার্তা চলিতেছিল তাহা ১৮৮৭ খ্রষ্টাব্দের মধ্যভাগে পরিণমাত হইল । এই সময়ে এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইল যে, আশিত্ত, কৃতত্ব ও অন্ততর সংক্রান্ত বাহুবর জ্ঞানস্রক্ষাদিপের তত্তাবধানে ও পূর্ণমেটের অধীনে থাকিবে । এবং সেই সকল জ্ঞা রাখিবার স্রীতিমত স্থানের অত্র সর্গেরেই বন্দোবস্ত করিবেন । ১৮৮৬ খ্রষ্টাব্দের ভারতীয় বাহুবর বিধয়ক আইনে ইহাই স্থির হইল এবং সমিতির উদ্যোগী সভাপ্রশ্ন কর্তৃক অর্থ শতাব্দী ব্যাপিয়া সংগৃহীত সাময়ীপত্রার ম্যাসরক্ষাদিপের কর্তৃত্বাধীনে স্থানান্তরিত হইল । বঙ্গের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেপ সৌকর এই জ্ঞানস্রক্ষাদিপের সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । কলিকাতার প্রধান বিশপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত চানসেলার এবং সোমাইটীর সভাপতি ও অপর তিনজন প্রতিদ্বি বোর্ডের সভ্য নির্ধারিত হইলেন । আইনতঃ সব স্থির হইলেও বাহুবর নির্ধাণব্যাপারে স্থানের স্রীতিমতর অন্য সামতি নির্ধারিত সভ্যে দিপতিত হইলেন । বঙ্গের প্রাক্ত পালকর্তা সার আশ্বনাশী ইন্ডেন ও বিজ্ঞানবিদ ডাক্তার টমাস ভল্লভাস এই সভ্য হইতে সোমাইটীকে উদ্ধার করিলেন । তাঁহারের সমবেত অহুরোব পত্র গাইয়া ভারত পূর্ণমেট বাহুবর নির্ধাণজন্য সোমাইটীকে দেক লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন । এই



কলকাতা বিজ্ঞান ভবন :

উপায়ে বাহুবরের উদ্ধার এবং পুষ্টি সংপাদিত হইল। তখন অনেকে ইহাতে আশঙ্কিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু এ কার্য যে বিশেষ দুঃসম্ভাবনারই পরিচায়ক আশা আর কেহ ভাবিতে সমর্থ করেন না। এই সময় হইতে বাহুবর সরকারের অধীন হইল; কিন্তু আজও বঙ্গবলের জনসম ইহাতে “সোসাইটি” বলিয়া থাকে।

ভাঙ্গার পর সার্বভৌমত্ব বাহুবরের কর্তৃত্বাধীনগণের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, উপযুক্ত ত্রাণ নিয়মের স্থানান্তরিত করণ বিত্তের পরিপ্রসঙ্গাধা এবং উৎসাহবহ ব্যাপার হইলেও সু-এসিড ডাক্তার আয়োজন কর্তৃক সে কার্য অতি সুচলিতরূপে সম্পন্ন হয়। ইনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর এখন তত্ত্বাবধায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে আস্থার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। বাহুবর-আশান অন্ততঃ ব্যাপারে ডাক্তার আয়োজন বিত্তের মেন্স উডবেরনের নিকট বিশেষ সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিত্তার উত্তরবঙ্গ সরকারী নির্বাচিত হইলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার আয়োজন পদত্যাগ করিলে ইনি অসাধারণ কার্যাত্মকতা এবং কর্তব্যপরায়ণতা প্রত্যয়ে উদ্যোগ পথেই প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই কনসার্বা মহান্মত্বের অধরে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণ বাহুবর মন্দিরে প্রবেশ লাভাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। বাহুবর প্রথমতঃ ১৩জন ন্যাস-বক্ষীর দ্বারা স্তম্ভ ছিল কিন্তু কালক্রমে উদ্যোগিণের সংখ্যা বর্ধিত হইতে থাকে। অবশেষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উদ্যোগের সংখ্যা ১৭ জন অবধারিত হয়।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রথমে বাহুবরে প্রথমতঃ প্রাপিতত্ব, অন্ততঃ তুচ্ছত্ব বিবরণক বস্ত্রনিয়ম সংগৃহীত হইত। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে ভারত সরকার অর্থনীতিক প্রশাসনিক সংরক্ষণ বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে স্থানভাবে প্রস্তাব গ্রহণ সম্ভব হইল না। ১৮৮০ সালের কলিকাতা আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক শ্রেণি হইলে প্রস্তাব হইল, প্রশাসনিক বক্ষীর অর্থনীতিক সংগ্রহ বিভাগে যে সকল বস্ত্র প্রশাসিত হইয়াছিল, বাহুবরের কর্তৃপক্ষীয়গণ সেই সকল গ্রহণ করিতে পারেন। অন্তঃপর এ প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে ১৮৮১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে বাঙালী সরকারের ও স্ত্রাসরক্ষীদিগের অধীনে বাহুবরের অর্থনীতিক ও কল্যাণবিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি হয়, এবং ভারতীয় শিল্পসম্মেলে আন্তঃ জৈলোকান্য ধূপোপাধায় বিভাগের এখন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আবার স্থানভার অসুস্থ হইলে সবার স্ট্রিটের বিকে গৃহ নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিত্তার খাঁসটনের কর্তৃত্বাবধানে অর্থনীতিক, কল্যাণসম্পর্কী ও মানবজাতিতত্ত্ব-বর্ধিত বাবজীর সামগ্রী এই-নতন গৃহে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শিল্প-পার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মানবজাতিতত্ত্বাধায় এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বিত্তার ব্যক্তিগত কার্য প্রাপ্তির সময় অর্থনীতিক গৃহে অসুস্থাবস্থায় প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সার্বভৌম হিন্দী বাহুবরকে নিরলিখিত পাঠ ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব করেন— প্রাপিতবস্তুবক্ষী, মানবজাতিতত্ত্ব-বর্ধিত, জুডিসিয়াল, অন্তঃস্থবিষয়ক এবং শিল্পকলা নিবাসবিষয়ক। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে উদ্যোগ এই প্রস্তাব আইনানুসারে কার্যে পরিণত হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কার্যসম্পন্ন এবং অধ্যয়ন গৃহের অভাব সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়।

১৮৯১ খ্রষ্টাব্দে প্রাসন্ন্যকারী এই উদ্দেশ্যে পূর্বদেশটিকে অভ্যন্তরীণীভূত করিতে লাগিলেন । ইহার তিন বৎসর পরে বাহুবন্দে, অধ্যয়ন, অক্লিস, পাঠাঙ্গার প্রভৃতি স্থাপনের ক্ষমতা পূর্বদেশটিকে সম্বলিত জ্ঞাপন করিলেন । বাহুবন্দে পূর্বদেশের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া অতি অল্পকালে সম্পন্ন হইয়া ব্যবহারোগ্যযোগ্য হয় ।

১৯০৪ খ্রষ্টাব্দে তেজগড়ীর উপর বাহুবন্দে পরিবর্তন-ব্যবস্থার লক্ষ্য কার্যক্রম প্রচলিত করি আসিল করেন । ১৯১১ খ্রষ্টাব্দে বাহুবন্দে নৃত্যনাট্যের শিক্ষাপ্রদর্শন পরিদর্শন হয়—শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার কার্য্যালয়ের ক্ষেত্রে, এবং আশ্রিত-বিষয়ক কার্য্যালয় ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নির্ধারণের ক্ষেত্রে যত্ন সহান শিক্ষারিত হয় ।

বাহুবন্দে সমগ্র সামগ্রীসম্ভারের সংকীর্ণ বিবরণ অবশ্যই অনগ্রহ । আশ্রিতপক্ষকারী সামগ্রীসম্ভার অবশ্যই পাঠ ভাণ্ডে বিস্তৃত হইতে পারে । এখন—উদ্যমশীল ও প্রাণবন্ত বাহুবন্দে প্রাণবন্তভাবে এশিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া সফল । দ্বিতীয়—ভাষার আশ্রিত, ভাষার পাইলস ও কর্ণেল আলকর প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্যাবর্ণের সংগৃহীত প্রাণবন্ত । তৃতীয়—সাধারণ অভিধানে সংগৃহীত মহানুভাব প্রাণবন্ত সংগ্রহ । চতুর্থ—অসংখ্য দাতার অসংখ্য দান । ভাষাবর্ণের মধ্যে কার্ভিনাট টেলিগ্রাফ ও উইলিয়াম ব্র্যান্ডফোর্ডের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পঞ্চম—কয়েক জন কর্ণেলারী সংগৃহীত প্রাণবন্ত ।

ভূতবিস্ময়কর বহু সম্ভার—প্রথমতঃ এশিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতির দ্বারা, এবং বিভিন্নতঃ বিদ্যালয়িক্যাল সার্ভিস কর্ণেলারীদ্বারা দাতা সংগৃহীত । প্রকৃতপক্ষে প্রাণবন্ত সম্ভারের অধিকাংশ চিত্তাকর্ষক এবং আশ্রিত আশ্রিত (প্রতিমা, কোষিত প্রভৃতি, মুদ্রা ইত্যাদি) এশিয়াটিক সোসাইটীর সভাপন কর্তৃক অথবা দাতা অগ্রসরিত হইয়া পঠিত কর্তৃক সংগৃহীত । ইহারিধের মধ্যে ভবিষ্যত জেনারেল ক্যানিংহামের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি ভারতীয় প্রকৃতপক্ষে অতি আশ্রিত নিবর্তন বহুতঃ স্মৃতিগুলি অতিশয় বহুতঃকার্যে বাহুবন্দে সংযুক্ত করিয়াছেন । গত ১৯১০ খ্রষ্টাব্দে প্রকৃতপক্ষে বিভাগ ভারতীয় প্রকৃতপক্ষে পরিদর্শকের প্রাণবন্ত প্রকৃত হইলে ইহাতে বহু আশ্রিত মুদ্রা, পুরাতন স্মৃতি ও অন্যান্য বহুতঃ । কোর্টহোলাস্টিক সামগ্রী সমগ্র যুক্ত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত একটি দিগ্ভের ও একটি বর্ণাবর্ণের স্মৃতি বিশেষ দৃষ্টান্ত—সে দুইটি সম্রাট অশোকের রাজত্বের সমকালে প্রকৃত বলিয়া কথিত হয় । এতদ্ব্যতীত বাহুবন্দে যে সমগ্র মুদ্রা সংযুক্ত আছে তাহার অধিকাংশই এশিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক প্রকৃত হইয়াছে । গত ১৮৮০-৮৪ খ্রষ্টাব্দে কলিকাতা অধর্মণীর পর হইতে যে অধর্মণীক বিভাগের প্রকৃত উদ্ভূত হইয়াছে তাহা ইতিপূর্বে বিস্তৃত করা হইয়াছে । দানাবিধ অনগ্রহ, পোষাকপরিচ্ছদ, এবং ভারতের বিভিন্ন জাতি তাহানের অধিকাংশ নির্মাণের ক্ষমতা সকল প্রাণবন্ত করিয়া থাকে যে সকল এই বাহুবন্দে সংযুক্ত হইয়াছে । কলিকাতা অধর্মণীতে ভারতীয় বিভিন্ন জাতীয় নৃত্যনাট্যের অতিশুষ্টিসমূহ অতি যত্নে প্রকৃত হইয়াছিল । যে সমগ্র এই বাহুবন্দে যুক্ত হইয়াছে । ১৮৮৮ খ্রষ্টাব্দে ইহার মধ্যে কতকগুলি স্মৃতি এবং কয়েকবিধ অনগ্রহ সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় । আশ্রিত অনগ্রহ সম্ভার ১৮৯৫ খ্রষ্টাব্দে জাণা প্রদেশের শাসনকর্তা কাকদস কর্তৃক প্রকৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই বিভাগের প্রকৃত

পর্জ্যেৎসুই তৃত্বা সানখী দাখা সার সৌত্রীজ্ঞানোদয় ঠাহর এসক বান্য ব্রহ্মচিহ্ন । ইহার মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় সম্রাট কলাবিদ্যার পরিচায়ক এবং অতীত নিপুণতাসহকারে দাতার ভাবাবেগে প্রযুক্ত । এতদুপরি চিত্রকলার নিদর্শন যে সকল চিত্র ক্রমশঃ বাহ্যবস্তুর গোভাবর্ণন করিয়া আদিত্যে সে সকলে দিষ্টার হ্যাডেল-এবং বিশেষজ্ঞদের পরিচয় ও বস্তু সম্বন্ধে ।

জ্ঞানোন্নতিকল্পে এই সমিতি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহার মধ্যে আদিত্য এবং ভূতত্ত্ববিদ্যক সম্বন্ধে সঙ্গীত সন্দর্ভগুলি অতি বহু সংগৃহীত হইয়াছে । আদিত্য এবং ভূতত্ত্ববিদ্যক সম্বন্ধে একই প্রকারে একাধিক হইয়া জ্ঞানবিত্তের বিস্তার সাহায্য করিয়াছে । কিন্তু হুঃখের বিষয় সাধারণে এখনও এ সকলের তাৎপৰ্য্য সম্বন্ধে বস্তু নাই ।

ভারত সাম্রাজ্যে এই নিপুণতার বাহ্যবস্তুর ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে । ইহার দ্বারা বাহ্যবস্তুর সকল উদ্দেশ্যই বিশেষরূপে সংসারিত হইতেছে । বাহ্যবস্তুর প্রধানতঃ বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা-বিষয়ে জ্ঞানপ্রচারকল্পে তাহার ভিত্তি স্বরূপ আদর্শ সংগ্রহে তৎপর থাকিবে । দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত সংগৃহীত প্রবোধ রীতিমত বিভাগ বিশেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ ও একাধিক করিবে । তৃতীয়তঃ জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার ও তাহাদের এই সমস্ত বিষয়ে রীতিমত প্রীতির উদ্দেশ্যে করিবার প্রচেষ্টা যথোচিত উপায় উদ্ভাবন করিবে । ভারতীয় বাহ্যবস্তুর প্রায় সর্বত্র এই সকল উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছে ।

ভারতীয় বাহ্যবস্তুর সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া এ যাবৎ পতিত ও নিষিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই বাহ্যবস্তুর কর্ণধার হইয়া আসিতেছেন । কোন দিন বোগ্য ব্যক্তির অভাব হয় নাই । অধুনা দিষ্টার হ্যাডেল, ডাক্তার স্মিথ, দিষ্টার হুগার, দিষ্টার পাসি-আউন ও ডাক্তার এডামডেল প্রভৃতি মহোদয়গণ বিভিন্ন বিভাগে ওয়াশিংটনের অগ্নিশীম অতিক্রম্য ও বিশেষ বিদ্যার সাহায্যে কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন । ওয়াশিংটনের বস্তু উৎসাহীরা ঐকান্তিকতাপূর্ণ পরিচয়ের সকলতা যে অবশ্যতঃ তাহাতে সন্দেহ নাই ।

সমানোচনা ।

—:—:—

সমসাময়িক ভারত । *

সর্বত্রই মৌলিকতা বিশেষ সমাপৃত, কিন্তু ইতিহাসে সংগ্রহের আদর অল্প নহে। ইতিহাস সংগৃহীত উপাদানের সংযোজনে রচিত হয়, নবিশে ওহা উপকাস হইয়া যায়। এই অল্প ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংগ্রহকারের গোঁড়ব অভ্যাস অধিক। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সমাদ্দার ভারতের ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ উপাদান সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয় পাঠককে অপরিণীম কৃতজ্ঞতাঞ্জে বন্দী করিতেছেন। আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই—প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নাই ইতিহাস রচনার উপায় নাই। আমরা অনেকবার এই ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করিয়াছি। ভারতের শিল্প ও ভারতের সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে। উপাদানের অভাব নাই। সেই উপাদানরাশি সংগ্রে বিঘ্নেহিত ও সংযোজিত করিয়া ইতিহাস লিখিবার লোকের অভাব। ভারতের শিল্প ও সাহিত্যে ভারতের ইতিহাসের অনেক উপাদান রহিয়াছে। চীনের, জাপানের, কোরিয়ার, যাবার শিল্পেও সে উপাদানের অভাব নাই। এই সকল ব্যতীত আরও একপ্রকার উপাদান আছে। সেগুলি বিশেষ মূল্যবান। সেগুলি বিদেশের পর্যটকাদির ভারত-বিবরণ। ভারতবর্ষ পণ্যসম্ভারে প্রতীচাকে ও বর্ণনিকার প্রাচ্যকে আকৃষ্ট করিত। বহু পর্যটক বাণিজ্য ব্যপদেশে বা শিক্ষার্থী হইয়া ভারতে আসিতেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণে সমসাময়িক ভারতের বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। গ্রীস, রোম, চীন তিন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে সমসাময়িক ভারতের যে বিবরণ পাওয়া যায় ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা অমূল্য। অধ্যাপক সমাদ্দার মহাশয় সেই সকল বিবরণ চীকাসহ বাঙ্গলায় প্রকাশিত করিতেছেন। তিনি বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর মহোপকার সাধনে ব্রতী হইয়াছেন।

কেহ কেহ বলিবেন, এ সকল বিবরণের ইংরাজী অনূবাদ যখন আছে, তখন আর বাঙ্গলা অনূবাদ কেন? উহাও বুঝেন না, ইংরাজের ইতিহাস

* সমসাময়িক ভারত—ঐযোগেশচন্দ্র বাব মহাশয় প্রকৃত, বোম্বাইপুর (পাটনা) বেনারস সমাদ্দার এংলো-ভার্টিক প্রকাশিত। মূল্য প্রতি ২৩ ১২ টাকা মাত্র।

রচনার পথ সুগম করিবার জন্য ও ইংরাজী সাহিত্যের সম্পদ হৃদয় কর্তৃক ইংরাজ যেমন সে সকল বিবরণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার পথ সুগম করিবার জন্য ও বাঙ্গালী সাহিত্যের সম্পদ হৃদয় কর্তৃক বাঙ্গালীর তেমনই সে সকল বিবরণের বাঙ্গালী অনুবাদ প্রকাশ করা কর্তব্য । সমাদার মহাশয় বাঙ্গালীর এই কর্তব্য সাধনে প্রস্তুত হইয়াছেন ।

আরম্ভে গ্রন্থকার পুস্তকের যে উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার কতকংশ উদ্ধৃত করিলাম—“পাটনা কলেজের কৃতপূর্ব অধ্যাপক এবং বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা, সুপণ্ডিত ম্যাক্রিডল সাহেব, গ্রীস ও রোম দেশীয় প্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রাচীন ভারতবর্ষসম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বা ন স্ব গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবিষয়ক যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ সকল সংগ্রহ ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া ভারতবাসী এবং বহুতঃ পৃথিবীর সকল দেশবাসীরাই প্রস্তুত উপকার সাধন করিয়াছেন । ভারতবাসীর উপকার করিয়াছেন, কারণ আমরা প্রাচীন ভারতের একটা স্থল চিত্র, যাহা আমাদের অস্ত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাহা এই গ্রন্থচলিতে দেখিতে পাই । আমরা এবং অপর দেশীয় সকলেই জানিতে পারি যে, প্রাচীন ভারত যেরূপ ভিত্তিরে আচ্ছন্ন ছিল না । এই সকল বৃত্তান্ত যে সকল চিত্র প্রতিভাত করে, অতীতের সেই মোহন চিত্র দেখিতে কাহার প্রাণে না অকৃতপূর্ব আনন্দরাশি উদ্ভূত হয় ? আবার যে কোন বৈদেশিকই ইউন না কেন, প্রাচীন ভারতের এই সকল সমুদ্বল চিত্র, ভারতের বর্ণবিপ্লবের কাহিনী পাঠ করিলে, তিনি আর ভারতকে বন্ধনের দেশ বলিয়া বুঝা করিতে পারিবেন না । অধ্যাপক ম্যাক্রিডল গ্রীস ও রোম দেশীয় পুস্তকাদি হইতে এই সকল বৃত্তান্তসংগ্রহ করিয়া ক্রমে ক্রমে ছয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন । * * * অধ্যাপক ম্যাক্রিডল ষষ্ঠ খণ্ডের যে ভূমিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে এই সকল বর্ণনার আবশ্যকতা ও মূল্য প্রকৃতির আলোচনা করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন, মুসলমান আক্রমণের পূর্বে ভারতবর্ষের অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না । ভারতবাসীরা নিজেরা ইতিহাস লিখিতেন না । যদিও তাঁহারা দর্শন, কাব্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ক ত্বরিত ত্বরিত মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি ঐতিহাসিক কোন পুস্তকই তাঁহাদের দিকট হইতে পাওয়া যায় নাই । প্রাচীন হিন্দুগণের মাধ্যম প্রাপ্তগণই পণ্ডিত ও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন । কিন্তু তাঁহারা প্রথম পিতার ধ্যানে এবং সেই পরবর্তী

আধ্যাত্মিক ভাবে একরূপ লিঙ্গ থাকিতেন যে, অন্যান্য কোন বিষয়েই আবদ্ধ থাকিতেন না। এই জন্য তাঁহার আত্মাবশ্রম ঘটনাগুলিও লিপিবদ্ধ করেন নাই। দৃষ্টান্ত-বস্ত্র, ম্যাক্রিঙল আলেকজান্ডারের অভিযানের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, কোন সংকত গ্রন্থেই ইহার বিবরণ বা উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সকল গ্রীকব্যাক্টিয়ান নরপতি আফগানিস্থান বা উত্তর-ভারতের প্রান্তদেশে রাজত্ব করিতেন, সংকত গ্রন্থে তাঁহাদেরও কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কি প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত করিয়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারও কোন বিশেষ নিদর্শন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। এই সকল দৃষ্টান্তদ্বারা সন্দেহই উপলব্ধি হয় যে, ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস গভীর তনুসাম্পন্ন ছিল এবং গ্রীস ও রোম দেশীয় ইতিহাস ও পুস্তকাদিতে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা বস্তুতঃই অতীব মূল্যবান। ম্যাক্রিঙল বলেন যে, এই সকল গ্রীক ও রোমান বর্ণনা না থাকিলে তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসের কোন উপাদানই পাওয়া যাইত না। অবিকল্প এই সকল উপাদান সংগ্রহ ও বিস্তার করিয়াই প্রাচীন ভারতের একটা ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে।”

গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মেগস্থেনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার বর্ণনা হইতেই বর্তমান পাটনা বা তৎকালীন পাটলিপুত্রের (গ্রীকদিগের পালি-বোধি) কথা জানিতে পারা যায় এবং তাঁহারই বর্ণনামুসারে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে বর্তমান পাটনা সেকালের পাটলিপুত্র। “মেগস্থেনিস পাটলিপুত্রেই চন্দ্র গুপ্তের (গ্রীক সাক্সাকোটাস) দরবারে বাস করিতেন এবং সেদুসাস-চরিতা চন্দ্র গুপ্ত-মহাবীর সহিত সাক্ষাৎকালে অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এইস্থানে অবস্থানকালীন তিনি যে সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন তাহাই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ‘ইন্ডিকা’ নামক পুস্তকে প্রকাশিত করিয়া তৎকালীন ভারতের, ভারতীয় ধর্ম্মপুণের, এক পরিষ্কৃত চিত্র রাখিয়া গিয়াছে।”

মেগস্থেনিসের বিবরণের ভিত্তিতে মাত্র আমাদের বস্তুগত হইয়াছে। অনেক বিষয়ে তাহাই ঐতিহাসিকদিগের অবলম্বন। “মেগস্থেনিসের ইন্ডিকা হইতে পরবর্তী অনেক লেখক ভারতবর্ষের কথা সকলন করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।” “চন্দ্রের বিষয় এই সকল গ্রন্থকারই ভারতবর্ষসম্বন্ধে যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, সে সকল ইহাড়া বিশেষ অঙ্গসম্পাদন না করিয়াই লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ভারতবর্ষকে কেহই চক্ষে দেখেন নাই।”

অধ্যাপক ম্যাক্রিগল এই সকল অমূল্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিয়া গিয়াছেন। সেই বিরাট কার্যের জন্য ভারতবাসী কেন সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আমাদের অধ্যাপক সমাদার মহাশয় বিরাটতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি এইরূপে আপনার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন—“আমরা অধ্যাপক ম্যাক্রিগলের গ্রন্থাবলী, টেনিক পরিভ্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, মুসলমান ঐতিহাসিক সমূহের বর্ণনা ও ইউরোপীয়ান পর্যটকবৃন্দের আলোচ্যাদি অবলম্বনে সমসাময়িক ভারত নামে যে এক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেছি, তাহার প্রথম কল্প ‘প্রাচীন ভারতে’ গ্রীক ও রোমানদিগের, দ্বিতীয় কল্প ‘টেনিক পরিভ্রাজকে’ ফাহিয়ান, হিউয়েন সিয়াং প্রভৃতির, তৃতীয় কল্প ‘মুসলমান ঐতিহাসিকে’ মুসলমান ঐতিহাসিকগণের ও চতুর্থ ‘ইউরোপীয়ান পর্যটক’ কল্পে এই দেশের ভ্রমণকারিগণের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিব। সমগ্র গ্রন্থাবলী কৃত্রিম পদ্ধতিতে বিভক্ত হইবে।”

পঞ্চাংশ খণ্ডে এইরূপ পুস্তক সম্পূর্ণ হইবে কিনা সম্ভেদ। কারণ গ্রীস, রোম ও চীন হইতে আগত ব্যক্তাদিগের বিবরণ বিস্তৃত না হইলেও মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের ও ইউরোপীয় পর্যটকদিগের বিবরণ বিস্তৃত। এলিয়ট মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের লিখিত যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সকল পাঠ করাই সমরসাধ্য। তাহার পর আবার অনেক পুস্তক আবিস্কৃত হইয়াছে। অধ্যাপক সমাদার যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাকে পঞ্চবিংশ খণ্ডে সমাপ্ত করিবার কোন প্রয়োজনও দোষ না। কারণ, সমাদার মহাশয়ের পুস্তকের প্রথম দুই খণ্ড দেখিয়া বৃদ্ধা বাইতেছে এতোক খণ্ডই যত্ন ও সম্পূর্ণ হইবে—কেবল সকল খণ্ডই একখান বিরাট গ্রন্থের এক এক অংশ হইবে।

এতোক খণ্ডে এক একটি যত্ন ভূমিকা প্রদত্ত হইতেছে। সে ভূমিকায় সেই খণ্ডে বিবৃত বিষয়গুলির আলোচনা ও সমালোচনা এবং ঐতিহাসিকদিগের পরিচয় লিখিত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন লেখক এই সকল ভূমিকা লিখিবার ভার লইয়াছেন। ইংরাজী যদি যথোচিত পরিচয় ও অনুসন্ধান সহকারে আপনাদের গৃহীত কার্য সম্পন্ন করেন, তবে এই ভূমিকাগুলিই বাঙ্গালা সাহি-

তোয় অলঙ্কার হইতে পারিবে। কোন কোন ছুরোপীয় লেখকের পুস্তকের বিস্তৃত ভূমিকায় আলোচ্য বিষয়ের যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা দেখা যায় তাহা মূল পুস্তক হইতেও মূল্যবান বলিয়া মনে হয়।

প্রতি বস্তু একটি করিয়া নির্ধারিত ও প্রদত্ত হইতেছে। ইহাতে পাঠকদিগের বিশেষ সুবিধা হইবে, সন্দেহ নাই।

আমরা সাগ্রহে এই অঙ্কটানের সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

এইরূপ পুস্তক ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং সর্বত্র সাধারণ সংরক্ষণীয়। সেই জন্যই আমরা পুস্তকে দুইটি সামান্ত ক্রটির উল্লেখ করিয়া সমাদর সম্বোধনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ এরূপ পুস্তকের ঢাকা আরও বিশদ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঢাকায় মূল্যের বহু অল্পষ্ট ভাব ও কথা ল্পষ্ট করিয়া না তুলিলে সাধারণ পাঠকের নিকট অনেক স্থল ভ্রমোদ্যাই থাকিয়া যায়। আবার এই ঢাকায় ইংরাজীতে বাহ্যে Cross reference বলে তাহা দিলে পাঠকের সুবিধা হয়। এক স্থানে যে কথা পাওয়া গেল, আর কোথায় কাহার বিষয়ণে সেই কথা পাওয়া যায়—একত্র যত কিল্পে অপর এক জনের রচনায় সমর্থিত হয় সে সকল ঢাকায় প্রদান করা কর্তব্য। দ্বিতীয়তঃ এরূপ পুস্তকের ভাষা আরও মার্জিত, সরল ও নিহীল না হইলে বড়ই আক্ষেপের বিষয় হইবে। আমাদের আশা আছে, সমাদর সম্বোধন ভবিষ্যতে এই দুই বিষয়ে অবহিত হইয়া পুস্তকখানিকে সর্বদা সন্মত করিতে প্রয়াসী হইবেন।

‘লক্ষ্মী মা ।’

আমি এ’ লক্ষ্মী বাসে

মূলিনাথ পায়ে পত পত তারী পসরা বহিরা আসে ।
‘ইতু ঘট’ আর ‘হুত’র মধ্যে হলো আবাহন না’র,
তা’র পরে গৃহে পড়িল মাঠের চরণের মূলি তাঁ’র,
মধ্যরে তাঁ’র কতলা হুবার এবম আখ্যানন,
তা’র পর এলো তারে তারে কা’র ভব্র হেরিত বন ।
সবে এ লক্ষী বাসে

মা’র সেবা আর পরসেবা হুয়ে একেব হেরিয়া হাসে ।
বাড়ীতে আসেনি বা,

এ’ কথা বলিলে আলিগে ত আমি কিছুতে শুনিব না
বেতনের ক্ষেতে দেখেছি শিতরে উহার অন্য শিতে
লীম নাচাতলে দেখেছি হুতের ময়নে কাঙ্গল দিতে
বিনারিত বেই হেরিয়াছি তাঁ’র ‘মহাঘের’ গাকে পাকে
মটর শুটার শুজে ঐ ত আত্ম দিয়া যে ভাকে

মা যদি আসেনি যে,
এতদিন পরে তেঁকির উপর আমি ‘পাড়’ বিল কে ?
তাহা ছাড়ো আরো আছে,

মণ্ডলি তাঁ’র হেরেছি উজ্জল অতীত পায়ে পায়ে ।
গালা বনে তাঁ’র মাথার সিঁদুর, হুস্মের বনে শাঁখা,
উঠানে চুয়ায়ে আলিপনাথগে চরণডিক অঁকা ।
তাঁহি তারি নিকে কেমনে বলিব, জমনী আসেনি যে
বাল্যে কেন শাঁখ, তুলনীয় তলে ; এনীপ আলিল কে ?
বাড়ীটির আগে পালে

উড়ে অকল বারু চকল পর ফুলকোর হাসে ।

আর এক কথা এই

অগ্রভাবের দৈন্যদাশন হুণের লেপটি দেই ।
এত যে অস্তর আশীষের বাণী কোথা হ’তে একেবারে,
কতক ধাবারে, কতক ক্ষেত্রে, কতক নদীর ধারে,
কিছু বা পক, কিছু বা ফুল, কিছুতে ধরেছে কল ;
ইহুসতে চুখনহুখা সকিত টল টল ।

মা যদি আসেনি বলা
দায়া বয়সের হুণের বিধান কোথা হ’তে তবে হ’লো ।

ঐকালিদাস দাস

প্রত্যর্পণ ।

(১)

অতি সুন্দর উদ্যান । প্রস্তুটিত পুষ্পের বর্ণজটায়—দুস্ত্রে ও গন্ধে, ক্রিমি-নির্ঝরনিঃসৃত নীরধারার বহু স্বর্ষের সঙ্গে এবং জলকণবাহী পুষ্পসৌরভপূর্ণ বাতাসে স্পর্শে উদ্যানখানি গ্রীষ্মের প্রদোষে অত্যন্ত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে । সুবিস্তৃত সুচারুদর্শন পুষ্পবৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে মধ্যে মণ্ডার পুতলিকা, বিপ্রামালন ও লতামণ্ডপগুলির শোভাও অতুলনীয় । কিন্তু তিনটি সল ও শকীব পুতলিকাই উদ্যানটির সর্ব শোভার আধার ও প্রাণস্বরূপ হইয়া তাহার বক্ষে খেলা করিয়া তাহাকে মর্ত্যে নন্দনের সৌন্দর্য্য দান করিতেছে । এই তিনটি অীষন্ত ভাস্কর্য্য চিত্র উদ্যানের বৃক্ষে এক সঙ্গে এক কালে প্রভাত অরুণের তরুণ ছাতি, চতুর্দশীর চন্দ্রের অনির্ঝরনীর সৌন্দর্য্যময় স্তম্ভ কিরণ এবং সন্ধ্যার মৃদুর কান্তির উপরে অন্তর্গত তলনের রান বিবাদারক্ত রশ্মিটুকুর শোভাকে ছুটাইয়া তুলিতেছিল ।

উদ্যানখানি কদীদার রাধাকান্ত বাবুর । চতুর্দশীর চাঁদের মত বালিকাটি তাঁহার এই বিপুল সম্পত্তির ভবিষ্য উত্তরাধিকারিণী—একমাত্র কন্যা কমলা । তরুণ অরুণমণ্ডল কিশোর যুবকটি তাঁহার পালিত এবং ভাবী জামাতৃপদে মনোনীত অরুণকুমার এবং সন্ধ্যা জ্যোতির সঙ্গে তুলনীয় বালিকা নীহার রাধাকান্ত বাবুর আশ্রিতা আশ্রয়কন্যা ।

কমলা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং নীহারও ছায়ার ন্যায় তাহার ইচ্ছানুসারে চালিত হইতেছে । কমলা প্রস্তাব করিল, উভয়ে বাঁকী ধরিয়া ফুল তুলিতে আগন্ত কন্যা যাউক্, দেখা যাউক্ কাহার বেশী হয় । নীহার নীরবে তাহার কার্য্যের অঙ্গস্বরণ করিতে লাগিল ।

কিছুক্ষণ পরে উভয়ের চরিত পুষ্পগুলি লইয়া তুলনার দ্বারা প্রযোজিত হইল যে, কমলায়ই বেশী হইয়াছে । নীহার কীণ হস্তের সহিত বলিল, "তোমারি জিত, দিদি ।" কমলা নিজের আঁচলখানি তাহার আঁচলের উপরে উপুড় করিয়া সব ফুলগুলি নীহারের অঙ্গে ঢালিয়া ঝাড়িয়া দিয়া বলিল, "তোমার জিত, সব ফুলগুলোই তোমার ! আর এইবার দু'জনে যে করটা পারি মালা গাঁবি ।" নীহার তাহার দুর্জয়প্রকৃতিজাত কীণ ও বৈরাগ্য-মাখা মুখে বলিল, "তোমার সঙ্গে ত আমি পারব না, তাই ।"

“আমার যেটা বেশী হবে সেটা তোরা ।”

কমলা একাগ্রননে মাথা গাঁবিতে গাঁবিতে সহসা মুখ তুলিয়া দেখিল, অরুণ হঠাৎমুহুর নরনে নিকটে ঠাঁড়াইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে । তাহার হস্তে একটা ঐকান্ত ত্র্যাকশ্রিঙ্গ গোলাপ । অরুণ এতক্ষণ একটা বেকে বসিয়া একধানা বহি পড়িতেছিল, তখন যে সে উঠিয়া ফুল তুলিয়া তাহাদের নিকটে আনিয়া ঠাঁড়াইয়াছে তাহা কমলা আনিতো পায় নাই । চোখে চোখে একটা নীরব আনন্দের আদান প্রদান হইয়া গেল এবং কমলা তখন মুখের হাসি-টুকুকে মুকাইবার জন্য জেতে মুখ নামাইল । কেহই কথা কহে না দেখিয়া অরুণ বলিল—“ইস্ । একটা কথা কইবারও সময় নেই দেখছি ।” কমলা মুখ তুলিল না, কথাও কহিল না । নীহার হাসিমুখে চাহিল । একবার বলিল ঐতে একটা কীণ গোলাপী আলো যেন সহসা আকাশ হইতে ছুটিয়া আসিয়া পড়িয়া তাহাকে চকিতে রাঙ্গাইয়া তুলিল । সে বলিল, “অরুণ দাদা কখন এসে ? বোস ।

“অরুণ কমলার পার্শ্বস্থ আসনে বসিয়া পড়িয়া আদরমাখা কণ্ঠে বলিল, “দেখি কেমন বাংলা ছ’ল ?”

কমলা চাহিল না ।

অরুণ বলিল, “দেখ, আমি কত বড় একটা গোলাপ এনেছি ।”

নীহার পাগ্রহে বলিল “উঃ কত যত্ন ! কা’র জন্য এসেছ অরুণ দাদা ? কা’কে দেবে ?”

কমলা এবার মুখ তুলিয়া চাহিল, অরুণ দেখিল, তাহার হস্তস্থিত গোলাপের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মধুর সৌন্দর্য্য সেই মুখে ছুটিয়া উঠিতেছে । মুক্ত অরুণ বলিল, “কা’কে দেব বল দেখি ?

“দিকিকেই দেবে বোঝ হয়” । বালিকার স্মীণ নৈরাশ্যপূর্ণ ক্রিষ্ট বরে সহসা আহত হইয়া অরুণ তাহার পানে চাহিল ; দেখিল তাহার সদা বলিল মুখখানি আগ্রহে বলিল হইয়া গিয়াছে, দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ । ব্যবহৃত এবং ক্রিয়াক্ষত হইয়া অরুণ ফুলটি তাহার নিকটে বরিয়া বলিল, “না, নীহার, তোমাকেই দেব । এই লও ।”

নীহার অপ্রত্যাশিত আনন্দে আত্মদমন করিতে পারিল না, সাগ্রহে ফুলটি লইয়া উজ্জল মুখে কল্পিত বরে বলিল, “কত বড়, কত সুন্দর ফুলটা উঃ ! আমি থাকে দেখিয়ে আসি ।” নীহার আনন্দে অধীরা হইয়া তাহার

অভাবের বিরুদ্ধ চাকলোর সহিত ছুটিয়া চলিয়া গেল । অরুণ দেখিল, কমলার মুখ আবার নত হইয়া পড়িতেছে । সে সাধরে তাহার হস্ত ধরিয়া ডাকিল “কমলা !” কমলা সজোরে নিজের হস্ত টানিয়া লইল । অরুণ বাণিত পূরে বলিল “কমলা, কমলা, রাগ করলে তুমি ?” কমলা ভক্তকণ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে ।

“ছি ছি, কমলা, তুমি কি এটুকুও বৃক্তে পার না, যে এ ক্ষেত্রে তাকে—”

“আমি বৃক্তে চাইনে ! পথ ছাড় আমার ।”

“শোন শোন কর্তা আজ কি বলেছেন ।”

“আমি শুন্ব না ! পথ ছাড় ।”

“এই শ্রাবণ মাসেই আমাদের বিয়ে ।”

“আমি শুন্ব না ; বিয়ে করব না আমি ?”

“একটু স্থির হয়ে শোন কমলা । সব সময়ে ছেলে মানুষী করে না ; এখন ত অনেকটা বড় হয়েছ, একটু জ্ঞান বৃদ্ধি ধরতে হবে । শোন আমার কথা । আমি বৃক্তে পারি, আমি সব সময়ে ঠিক তোমার মনের মতন কায় কর্তে পারি না । তুমি এমন অনেক সময়ই আমার কায়ে কথার আন্তরিক বিদ্রুত হও ; এমনি রেগে ওঠো দেখতে পাই । যদিও তুমি ছেলে মানুষ ছিলে বলে এতদিন সে সব অগ্রাহ্য করেছি, কিন্তু আজ যেন হঠাৎ আমার মনে হচ্ছে তোমার সঙ্গে আমার এ বিষয়ে একটু কথাবার্তা বা বোঝাপড়া হওয়া উচিত । কমলা, ভ্রমেও মনে কর না যে তোমার মনকে—তোমার জন্মের উচ্ছতাকে আমি চিনি না । বেশ চিনি । কিন্তু আমার যেন মনে হয়, আমাকে তুমি ঠিক বৃক্তে পার না । আমার যেখানে যেটা অবশ্যকর্তব্য সেখানে কেন তুমি এমন হয়ে ওঠো ? এই ভাব চির দিনই থাকবে ? কখনো কি তুমি আমার বৃক্বে না ? তা যদি হয়, কমলা, তা হলে এ বিবাহে ত তুমি স্মৃণী হবে না । সবর থাকতে এর প্রতিবিধান করা দরকার । তোমার বাবা যদি বুঝকরেও জানতে পারেন যে, আমি তোমার মনোমত কায় কর্তে পারি না, তোমার মনোমত নই, তা হলে তিনি কখনই—”

কমলা এতক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া অরুণের কথা শুনিতেছিল ; এইবার তাহার পাশ কাটাইয়া অতি দ্রুতপদে পলাইয়া গেল । কিছুই পুঝিতে বা

স্থির করিতে না পারিয়া অরুণও তারাক্রান্ত হৃদয়ে অগণপরে সে উদ্যান ভ্রমণ করিল।

পরদিন প্রভাতে অরুণ কমলার সন্ধানে উদ্যানে আসিল। সে যে সকালে বিকালে সেই স্থানেই থাকে তাহা অরুণ জানিত। অনেক অহুসঙ্কানের পর সে উদ্যানের এক কোণে বহুলভলার কমলা ও নীহারকে দেখিতে পাইল। ছুই জনে ফুল ফুড়ান শেষ করিয়া কদলীর গুহ্রে ফুল পরাইয়া মালা গাঝিতেছে। নীহারকে সঙ্গে দেখিয়া অরুণ তাহাদিগকে দেখা দিবে কি না ভাবিতে ভাবিতে নিঃশব্দপদসন্ধারে হৃৎকণ্ড অস্তরাল দিয়া তাহাদের নিকটস্থ হইতে লাগিল; কেন না চোখোচোখি হইলেই বোধ হয় কমলা এবারও পলাইবে। নিকটস্থ হইয়া সে শুনিল, নীহার বলিতেছে, “প্রাণণ মাসেই তোমার বিয়ে হবে নাকি, দিদি? তখন যে বৃষ্টি পড়ে! যদি বিয়ের সময় বৃষ্টি হয়?”

যুহু হান্তে কমলার ওষ্ঠ চুনির মত জ্বলিতে লাগিল। যুহু করে সে বলিল, “তুই এত বোকা কেন, নীহার? বৃষ্টিতে কি কবুতে পারে? এত বড় বাড়ী, সানিয়ানা, তাঁবু তবো মাহুয় ঠৈ'রী করে কেন?” “তাইত” বলিয়া নীহার চুপ করিয়া আবার ঐশ্বর্য করিল, “অরুণ দাদার সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে; না?” কমলা সম্মুখ পানে চাহিয়া দেখিল, অগ্র কেহ সে স্থানে উপস্থিত নাই, ঐশ্বর্যটিত ঐশ্বর্য কমলের মত মুখখানি নামাইয়া সে শলজকণ্ঠে চুপি চুপি বলিল, “তা কি জানিস্ না?” “কিন্তু তোমার ত তা'তে স্বপ্নরবাড়ী হ'বে না, দিদি; অরুণ দাদার ত নিজের বাড়ী নেই, বাপ মাও নেই, পাখী চড়ে ঘোমটা দিয়ে! বৌ হয়ে স্বপ্নরবাড়ী তুমি এক দিনও যেতে পাবে না।”

“নাইবা পেলাম, সেও আরও ভাল! স্বপ্নরবাড়ী যেতে বিনো কত কঁাদে দেখিস্ নি? আমাদের এই বাড়ীইত তারও বাড়ী; আমার বাবা তো তারও বাবা। আমার এক আয়গাতেই বাপেরবাড়ী স্বপ্নরবাড়ী হবে, সেইত সব চেয়ে মজা! তবে মা তা'রও নেই, আমারও নেই। সে ছলনারই অনুষ্ট। ও কথা থাক। আর এই মালা পাছটা তোর খোঁপায় দিয়ে দি।”

“না থাক” বলিয়া নীহার উঠিয়া পাড়াইয়া সহসা অরুণকে দেখিয়া চমকিত ও বিবর্ণরূপে স্থির হইয়া পাড়াইল। বিগতসম্মেহ হাতোজ্জলযুগ অরুণ তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পাড়াইতেই ফুল ও মালা ফেলিয়া কমলা বিছাড়ের মত অন্তর্হিতা হইল। অরুণ মালাটি ফুগির; লইয়া কমলার দুজের চরিত্রের

কথা ভাবিতে ভাবিতে উদ্ভানের অস্ত্র দিকে চলিয়া গেল। এই যে অতিমানস্রা আপাততঃ সত্যের মধ্যে অগাধ প্রেম ও বেহমাখা একখানি অতি উন্নত জন্ম, এই জন্মটির পরিচয় যেন আবার আত্ম তাহার কাছে নতন করিয়া প্রতিভাত হইল। অপরিণীত সুখে তাহার গুরু জন্ম কুলিয়া কুলিয়া উঠিতে লাগিল, জন্মের আনন্দজ্যোতিঃ মুহূর্হু তাহার সুখের উপর বন রক্তিম বর্ণের তুলী ফিরাইতেছিল।

কমলা ও অরুণ চলিয়া গেলে নীহার নিঃশব্দে সেই স্থানে আবার বসিয়া পড়িল।

(২)

কমলা ও অরুণের বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং বৃদ্ধ রাধাকান্ত ও এক বৎসর হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। কমলাই এখন তাহার বিস্তৃত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিনী।

জগতে বাহাকে সুখ বলে কমলার ও অরুণের তাহা অসুস্থ। কান্তি তাহাদের অভুলনীর—বাহ্য অনিন্দ্য—বিশ্ব অপরিপূর্ণ। ইহা ছাড়া আশা আনন্দ ও পরম্পরের প্রতি প্রেমে তাহাদের জন্ম পরিপূর্ণ। বিদ্যা-ব্যাপ্তি শ্রম, শ্রম, অরুণের ত প্রচুর। প্রবীণ রাধাকান্ত অনেক দেখিয়া শুনিয়াই তাহাকে আশাতৃপদে বরণ করিয়াছিলেন। কমলাও শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী ; দ্বা দাক্ষিণ্য এবং সহনশীলতার অস্ত্র বাল্যকাল হইতেই সকলে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। “লক্ষ্মী-ঐ একেই বলে” তাহার সুধকে গ্রামের ইহা অত্রান্ত মত। এক কথায় অরুণ ও কমলার মত সর্ববিষয়ে অনাবিল সুখী দম্পতী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সবই যদি সুখ আনন্দ ও হাসি, তাহা হইলে বিবির স্ট্র হুঃখ কোথায় যায় ? জগৎ-বৃক্ষের সংসার নামক পত্রটির সুখ ও হুঃখ নামে দুই দিক ; পাতাটির একটি পিঠত কোন মতেই লওয়া চলে না, সুখ লইলে হুঃখটিও অপরিহার্য্য। অপরিণীত সৌভাগ্যবশে কেহ যদি জীবনের হুঃখকে দেখিতে না পায় তাহা হইলে যে কোন একারেই হউক সে তাহাকে বুঝিয়া টানিয়া বাহির না করিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না। শিল্পী বহুতে শৃঙ্খল গড়িয়া নিম্নের পায়ে বাধিয়া পড়িয়া থাকে ! মানবের স্বস্তি নাই—আনন্দে তৃপ্তি নাই—তাই সাধ করিয়া নিম্নের হাতে যুকে কণ্টক বিধাইয়া সে যন্ত্রণার ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। কোন মেয়েলী

ভ্রম-কথায় আছে, একজন সৌভাগ্যবতীর জগতে দুঃখ বাহ্যিক বলে তাহার সহিত জীবনে সাক্ষাৎ হয় নাই ; দুঃখ কি এবং রোগদন কিরূপ তাহা সে জানিত না, তাই কাঁদবার জন্য তাহার জন্ম চকণ হইয়া উঠিল। ছুতানাতা করিয়া কাঁদিয়া—মৃত জীবজন্তু ধরিয়া চীৎকার করিয়া সে শোক দুঃখের অভিনয় করিতে করিতে শেষে ভাগ্য-দেবতার রোগদৃষ্টিতে পতিত হইয়া দুঃখের অতল সাগরে নিমগ্ন হইল। এই তুচ্ছ কথাটির মধ্যে জাগতিক অতি গভীর সত্য নিহিত আছে। অভাব না হইলে সুখের মূলা কেহ বুঝে না, এবং অবিচ্ছিন্ন সুখের মধ্যে মানব বাস করিতেও পারে না। বিধির এমনই অলঙ্ঘ্য বিধান—কৌশল।

তাই অতুল সুখশোভাগোর মধ্যেও কমলার জন্মে কিছু দিন হইতে কিসের যেন একটা ছায়াপাত হইতেছে। কেমন একটা অশান্তি—অশান্তি কিছু দিন হইতে তাহার মনে মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিয়া তাহার পূর্ণ সুখের মধ্যেও একটা দাগ টানিয়া দিতেছে। একটা অজানা দুঃখের বেদনার ক্রোশে—বিরক্তিতে মাঝে মাঝে সে অশীর্ণ হইয়া উঠে। বাবা কোথায়—কিসের এ অভাববোধ—কেন এ অশান্তি অশান্তির জন্য তাহা সে ঠিক বলিতে পারে না ; কিন্তু কাঁটা যে কোথাও আছে তাহা স্থির নিশ্চিত। নাহিলে মাঝে মাঝে এ বেদনা—এ “থচ্ থচ্” এ কিসের ?

অতি শৈশবেই সে মাতৃহারা, বৃদ্ধ পিতার একমাত্র নয়নমণি, তবিসাতে সেই বিপুল ঐশ্ব্যের একমাত্র অধিকারিণী। সে যাহা চাহিয়াছে বা বলিয়াছে শত বাধা—শত অতি বহেও তাহা কখনও অপূর্ণ থাকে নাই। তাহার শৈশবস্মৃতির মধ্যেও অভাব বলিয়া কোন বস্তুর সহিত যে তাহার কখনও পরিচয় হইয়াছিল তাহা তাহার মনে পড়ে না। তাহার সামান্য বিরক্তি—ক্রুদ্ধতা দেখিলেই তাহার বেগার সঙ্গীরা বালিকা কমলারোগীর নিকট হইতে সতরে শত হস্ত দূরে দাঁড়াইয়াছে, আবার তাহার সাহস্রধ আঙ্গানে সাহস্র পাইয়া নিকটে আসিয়াছে। এই ক্ষুদ্র সাত্ত্বজাতিতে শিশুকাল হইতে সে একচ্ছত্রা অধীশ্বরী। আশীর্বাদজনরা পর্যন্ত কমলার শিশুকাল হইতে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কায় করিতে সাহস পায়েন না। তাঁহারা জানেন যে, অতিমানিনী তাহা হইলে অভিযানে ফুলিয়া উঠিবে এবং তাহা হইতে শেষে অনর্থপাত হইবে। এই দ্বন্দ্ব অতিমান ছাড়া তাহার চরিত্রে নানা সঙ্কটের এত আবিক্য ছিল

যে, সকলে তাহার এ অভিমানকে কেবল ভয় করিত মাত্র, তাহাতে বিরক্ত হইত না। সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত এবং এইরূপ সুখসৌভাগ্য-বৃদ্ধিতার সে অভিমানকে সন্তুষ্ট বলিয়া মনে করিত। শিশুকাল হইতে মাতার শাসন না পাইয়া কমলার চরিত্রে এই অভিমানটা একটু অধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাতে ত এতদিন কোন অশান্তি জাগে নাই। অরুণ কমলাকে শৈশব হইতে খুব ভাল করিয়াই জ্ঞানিয়াছে এবং তাহার এ অভিমানকে স্কুলের মালার মত করিয়া বন্ধে জড়াইয়া রাখিয়াছে। (এ অভিমানের দ্বারা বিবাহের পর অরুণের উপরই সম্পূর্ণভাবে পড়িয়াছে আত্মীয় স্বজনরা এখন নিরুপ-দ্রব।) কিন্তু অরুণের এখন মাকে মাকে যেন সেই স্কুলের মালাকে কঠিন এবং ভয় বলিয়া মনে হয়। যে অভিমানের রক্তিম সুখোক্তির কারণ তাহাদের প্রেমকে কেবল সুখের আতপে স্তম্ভিত এবং সুরক্তিম বর্ণে প্রস্তুত করিয়া তুলিত সেই অভিমান যেন সময়ে সময়ে উত্তরকে এখন কঠিন শীতল এবং বিবর্ণ করিয়া ফেলে। পূর্বে কমলা রাগ করিয়া কখনও পাঁচ মিনিটের বেশী মুখ ফিরাইয়া কথা না কহিয়া থাকে নাই; কিন্তু এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—কখনও অর্দ্ধ দিন সময় পর্য্যন্ত—সে অরুণের সঙ্গে কথা না কহিয়া বা গল্পের উদাসীন ভাবে চুই-একটা ছাড়া ছাড়া কথা কহিয়া কাটাইয়া দিয়া থাকে। কমলার মুখে এই মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারভাব এবং উদাসীনতাবই অরুণকে অধিকতর স্পষ্টিত করে। এই তাবই যে তাহার অভিমানের গাঢ় অবস্থা তাহা অরুণ জানে; তাই সে এখন সময়ে সময়ে যেন অত্যন্ত বিরক্ত এবং অসহিষ্ণু ভাবও প্রকাশ করিয়া ফেলে। তাহাতে কমলা অধিকতর গভীর ভাবে উত্তীর্ণা চলিয়া যায়। অরুণও তাই এ কি অস্ত্রার, কিন্তু কমলার সঙ্গে কলহ করিয়া তাহার যে বেশীকণ থাকিবারই উপায় নাই! চুই এক ঘণ্টা রাগে রাগে কাটাইয়া দিয়া অরুণই শেষে আবার অগ্রসর হইয়া তাহার অভিমানী ক্ষমতাকে শাস্ত করে। কিন্তু ইহার মূলতত্ত্ব বুঝাইতে হইলে কয়েক মাস পূর্বের ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

নীহার এখনও কমলার আশ্রয়েই আছে। তাহার বিবাহের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে তথাপি এখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। তাহার চিরকরা মাতার অনুরোধে তাহাকান্ত বাবু যে কয় দিন নীহারের মাতা জীবিতা থাকেন সেই কয় দিন নীহারকে তাহার মাতার নিকটে রাখিতে বাধ্য হইয়া-

ହଲେନ । କିନ୍ତୁ ସେହି କଥା ଆନ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର ଶ୍ରୀତୀକାର ଶାନ୍ତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଡାହାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଢ଼ି ବାଲିଆ ଉଠିଲ । ତିନି ଅଗତ୍ୟା ଉଠିଲେ କୃତାବିତ୍ତ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବ ବିଷୟେ ଅପାତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ନିହାରେର ବିବାହ ଦିତେ ସେ କରୁ ସହର ଯୁଦ୍ଧାର ଶ୍ରୋତାମାନ ହର, ତାହା ତାହାର ମାତା କମଳା ଓ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିକଟେ ମାହିବେନ ଏହିରୂପ ଆଦେଶ ଦିଆ ଲେଲେନ । ମାତାକାନ୍ତ ବାସୁର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର ପର ଶ୍ରୀୟ ବସ୍ତ୍ରର ପୁରସ୍କାର ଆସେ ; ନିହାରେର ସାତା । ଏକ ଦିନ କମଳାଙ୍କେ ବାଲିବେନ ଯେନ କରଲେନ, “ଆମାର କମଳାଙ୍କେ ବା’ ଆଛେ ହେବେ । ସା, ତୁମି ନିହାରେର ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟା ଦେଖିତେ ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ ବଳ ।” ଇତ୍ୟୋମନ୍ତେ ସହରା ଡାହାଣ ଓ ପାଞ୍ଚା ବାଞ୍ଛିଆ ଉଠିଲ । କହେକ ବସ୍ତ୍ରର ଧରିଆ ସେ ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱର ତିନି ଶ୍ରୀତୀକା କରିତେହଲେନ ସେହି ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱା ଏବାର ଆର ଡାହାଙ୍କେ ବଳମା କରଲ ନା । ଅତି ନିଶ୍ଚୟ ତିନି ରୋଗସନ୍ତ୍ରାଣ ହେତେ ମୁକ୍ତିଲାତ କରଲେନ ।

ତୈମବେର ଖେଳାଧୁନୀ ମାଳ କରନ୍ତି । କମଳା ସଦନ ଜୀବନେର ଚିତ୍ର ନବୀନ ଶ୍ରୋତେର ଖେଳା ଖେଳିତେ ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ ସହିତ ନବ ପରିଚୟେ ମିଳିତା ହେଲ, ତତ୍ତ୍ୱନ ନିହାଣର ଖେଳାଧର ଡାଗ କରନ୍ତି । ମାତାର କ୍ରନ୍ଦନସ୍ୱାର ମାତେ ହୁଅ ଏବଂ କରଲ । ସେ ହୁଅ ହେତେ ସେ ଏକବାର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା, ବାହରେର ଲୋକେର ସହିତ ଆର ଡାହାଙ୍କେ କୋନ ସଂଯୋଗ ବା ସଂଯୁକ୍ତି ଯେନ ହିଲ ନା । ତାହାର ଅତ୍ୟାନ୍ତର୍ଗତ୍ୟା ମାତୃତ୍ୱକ୍ତି ଦେଖିଆ ମକଳେ ଅବାକ ହେଇ ବାହିତ । ତାହାର ମାତାର ବା କ୍ତିତି କଥନ ଓ କମଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ ତାହାଙ୍କେ ବାହରେ ଆନିତେ ମାରେ ନାହି । କିନ୍ତୁ ତୁହି ସାମ ହେଲ ନିହାରେର ମାତାର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱା ହେତେ କମଳାଙ୍କେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧେ ନିହାଣଙ୍କେ ନିଜେର ନିକଟେ ଆନିଆ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ତିକେର ମଜ ନାନ କରିତେ ହେତେହେ । ନିହାଣ ଏବେ ସତା ମାତାର କଳ ଡାଗ କରିତେ ଚାହେ ନାହି ; କିନ୍ତୁ କମଳାର ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ ତାହାର ନିକଟେ ଆସିଆ ଏହି ତୁହି ମାତେ ସେ ସେନ ଅନେକଟା ମିଶ୍ରବିକ୍ତିତ ହେଇ ମିଶ୍ରାହେ । ବହୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବିରତ ରୋଗୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଡାହାଣ ସନ୍ତ୍ରାଣ ମର୍ଦ୍ଦନେ ଓ ଖେଳାକ୍ତି ଡ୍ରବେ ଡାହାଣ ତରୁଣ ଜୀବନ ଓ ସେନ ଅବସାହଶ୍ରୀ—ଜୀବ—ହର୍ମ୍ମଳ—ଚିତ୍ରକ୍ତେର ଜ୍ଞାତ ହେଇ ଉଠିଆହେନ । ତାହାର ମକାମନ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଆହେ ତାହା ତାହାଙ୍କେ ଦେଖିଲେ ଏକ ଦିନ ବୁଧା ଯାହିତ ନା ; କିନ୍ତୁ ଏହି ତୁହି ମାତେ ନିହାରେର ତର ଆହା ସେନ ନବ ମାବଣେ ମଜ୍ଜିବିତ ହେଇ ଉଠିତେହେନ । କମଳାର ମର୍ଦ୍ଦନା ମଜ୍ଜନ ଆବହାର ଏବଂ ମଜ୍ଜେ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ ଆନନ୍ଦମୟ ମଜ୍ଜ, ସେହି ବାଲ୍ୟକାଳେର ମଜ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ ଅଟୁଟ କରମାର ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ତିକ୍ତି ନିହାରେର ଜୀବନେର ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ—ନିରମ୍ଭାର ତରୁଣେ କ୍ତେବେ କ୍ତେବେ ମରାହିଆ ଏକଟି କୁର ବନ ହୁଣେର ମଜ୍ଜ ତାହାଙ୍କେ ଆହୋ—ଅନ୍ତର୍ଗତ୍ୟେ—ମୌସବ୍ୟେ

পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। অরুণের সঙ্গ তাহার পক্ষে এমনই সুখময়—
 আনন্দময় এবং লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, নীহার সব সময়ে সে সুখ
 উপভোগ করিবার নির্দিষ্ট যাপকেও ঠিক রাখিতে পারিত না। নিজের
 পড়াশুনা এবং বিষয়কর্ম পরিদর্শনের জন্য অরুণকে অনেক সময়ই বহির্লোকে
 থাকিতে হইত। সে ক্ষমের আশ্রয়ার্থে জানিতে পারিলেই নীহার আর
 অন্য কোথাও ভ্রমিতে পারিত না, আরও কার্য এমনই পড়িয়া থাকিত,
 অসমাপ্ত কোন বাধাই সে সময়ে তাহাকে বাধিতে পারিত না। পুরস্কৃত
 কেহ কেহ যে ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, “এ যে বিষম বাড়াবাড়ি!”
 সে বরু কটাক্ষ ও চাপা স্মৃষ্টি কমলার কাণে গিয়া প্রথমে তাহাকে
 বিচলিত করিতে পারে নাই। কিন্তু সহসা এক দিন যেন এ কথার সত্যতা
 তাহারও মনে প্রতিভাত হইল। অরুণের যে সময়টি চিরদিন কেবল
 কমলার জন্যই নির্দিষ্ট, নীহার ক্রমে যেন এখন সে সময়টুকুতেও তাহাদের
 সঙ্গী হইয়া তাহাদের একান্ত সঙ্গের বাধ্যত্বগ্রহণ হইয়া উঠিতেছিল।
 এক দিন কি একটা কারণে কমলা সন্ধ্যার পর নীহারকে তাহার কক্ষে
 ডাকিয়াছিল। সেই দিন হইতে নীহার প্রত্যহ সেই সময়ে সে কক্ষে উপস্থিত
 হইতে লাগিল। সেই দিন হইতে তাহাদের সে সময়ের বিশ্রান্তালাপের বিষয়
 হওয়ার কমলাও ক্রমশঃ নীহারের নির্লব্ধতার জন্য বিরক্ত হইয়া উঠিল। গল্পে
 গল্পে ঘটনার পর ঘটনা কাটিয়া যায়; অরুণ সোফা বা চেয়ারে বসিয়া একই
 ভাবে হাস্য, মধুর, করুণ নানা রসসম্বলিত গল্প করিতে থাকে, উজ্জল দীপা-
 লোকে তাহার দোবোপম কান্তি অধিকতর মৌল্যবান বোধ হইতে থাকে;
 পাখের সাক্ষাৎ কমলা সদৃশী কমলা; আর ঘরের যেকোন বসিয়া নীহার উচ্চৈঃস্বরে
 নিশ্বাসনয়নে একমনে সেই বাক্যরস পান করিতে থাকে। সে সময়ে তাহার
 স্থান, কাল, পাত্র জ্ঞানও থাকে না। কমলা দুই চার দিন সানন্দ মনেই
 গল্পে বোগ দিত; কিন্তু ক্রমে তাহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল
 অস্বস্তি হইতে অস্বস্তির, অস্বস্তি হইতে বিরক্তির জন্ম। কমলা ক্রমে অসহিষ্ণু
 হইয়া এই সভা তল করিবার জন্য কার্যের ছল করিয়া উঠিয়া বাইতে আরম্ভ
 করিল। কিন্তু নির্দোষ নীহার তথালি নড়িত না, এবং অরুণও তাহার আগ্রহে
 এবং চক্ষুর বিনতিপূর্ণ ব্যাকুল ভাব দেখিয়া উঠিতে পারিত না; কেবল
 কমলাকেই পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিত এবং সে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে
 দেখিয়া সাহসেরে বাধা দিত। ইহাতে কিন্তু বিপরীত ফল হইল, কমলার

বিরক্তি ক্রমে ক্রোধে পরিণত হইয়া সে ক্রোধ পূর্ণ মাত্রার অক্রণের উপরই পতিত হইল। অক্রণ ইচ্ছা করিলেই ত এ বাধা দুই দিনে সারিয়া যায়। নীহারের সেই প্যানপেনে নাকোম্বের “আর একটু বস্বেন না ?” “আর একটু থাক্বেন না ?” “কি এত কায় আপনার বাহিরে ? না উঠতে পাবেন না এখনি” ইত্যাদি কথার জল হইয়া না গিয়া অক্রণ যদি কমলার উচ্চারণের পরই বাহিরে চলিয়া যায়, তিখা অন্তরে সরিয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বাড়ী খুঁকিও ত উঠিয়া বাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু অক্রণের সে বিষয়ে মনোযোগই নাই, সে একটি একনিষ্ঠ ভরু শ্রোতা পাইয়া গল্পের আনন্দেরে বিভোক্ত, তাহাকে অতিরিক্ত দয়া দাক্ষিণ্য দেখাইতে গিয়া নিজেদের কতখানি ক্ষতি হয় সেদিকে অক্রণের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই। চিরদিনই তাহার এই রকম স্বভাব। কমলাই কেবল চিরদিন এইরূপে তাহার সঙ্গের জন্য অগ্রে বাহিরে ছুটুকটুক করিয়া যত্নে। কমলা অক্রণকে যতটা ভালবাসে অক্রণ যদি তাহার অর্ধেকটাও বাসিত, তাহা হইলে সে কখনই এমন নিষ্ঠুর যুগে হাসিয়া গল্প করিয়া সময় কাটাইতে পারিত না। ক্রোধের পার্শ্বে দ্রবন্ত অভিমান আসিয়া ক্রমে কমলার স্তব্ধ অধিকার করিতে লাগিল। রাজিতে শয়নের সময় বা অন্য যে কোন সময়ে অক্রণের সহিত সে একত্র হইত, তখন তাহার সে অভিমান অধিকতর দুর্দ্ব্যস হইয়া পড়িত। চির মানিনী সে স্বামীকে এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার লজ্জা বা অপমানও কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবে না। তাহার কাছে ইহা নিজের অপমান বলিয়াই সে মনে করিত। স্বামী ঘাঘার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নহেন; সে তাঁহার জন্য লাল্যমিত্র এ তাহারপক্ষে বড় লজ্জার, বড় বাধাভরা বেদনার কথা এবং যে নীহারকে রূপা করিয়া সজদানের জন্য সে-ই নিজেদের মধ্যে আনিয়াছে সেই রূপাপাত্রীর সহিত স্বামী একটু অধিক মাত্রার কথা কহেন ইহাতে আবার সে বিরক্ত হইতেছে, এ কথা প্রকাশ হইলে তাহার বড় অপমান। স্বামিজীর একমুখবোধহেতু পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে নির্ভর ও বিশ্বাসভাব জন্মে স্বভাবের বৈষম্য এবং বয়সের তারতম্যের জন্য তাহাদের মধ্যে তাহা বড় বেশী দৃঢ় হয় নাই। স্বামিজী অপেক্ষা প্রগল্ভপ্রগল্ভিনী তাব অক্রণ ও কমলার মধ্যে অধিকভাবে পতিত, তাই মানঅপমানবোধ লজ্জাসঙ্কট-অভিমানের গভী এখন ত তাহার ছাড়াইতে পারে নাই। তাই আসল কথা স্মৃতিতে না পারিয়া কমলা কোন একটা ভুল কারণে বা কথার দ্বারায় যুগ

অন্ধকার করিয়া ভার হইয়া থাকে, কখনও বা অন্ধগের সহিত বাক্যলাপই বন্ধ করিয়া দেয় । বিবিত অরুণ ব্যাপার কি বৃত্তিতে না পারিয়া এবং যখন তখন এইরূপ বিনামোবে গুরু নশু হইতে দেখিয়া ক্রমে বিরক্তও হইয়া উঠে । এক দিন কি কথার অরুণ মনুর ক্রোধের ভাবেই বলিল, “আবার বুকি বুড়ো বয়সে সেই ছোট বেলায় যোগে পেয়ে বসছে ?” অরুণ তাহার বক্তিত অভিমানকে লক্ষ্য করিয়াই এ কথা বলিয়াছিল ; কিন্তু কমলার মনে হইল, তাহার বালাকালের নীহারস্বকীয় ছোটখাটো মানঅভিমানগুলোকে লক্ষ্য করিয়াই অরুণ এটি বোটা স্বরূপে ব্যবহার করিল । কমলা মুখ বিগণ অন্ধকার করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল ।

(৩)

সেদিন সন্ধ্যার পর পল্লের আসরের মধ্য হইতে উঠিয়া কমলা একবার কর্ণাস্তর হইতে ঘুরিয়া আসিয়া সহসা অতি ভীত স্বরে বলিল, “এই রকম গল্প করে দিন কাটালে কি চলবে ? একটা পাত্রটাত্ত বৃদ্ধিতে হবে না ? এর পর কি আর ভাল ঘরের ছেলে পাওয়া যাবে ? পাত্রীটির বে বয়স এইবার পনের ডিক্রুতে চল ! নিয়োটের দরকার নেই কি ?”

অরুণ সহসা কমলার একপ উক্ত ও ভীত স্বরে কণ্ঠে একটু বতমত বাইয়া ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে বলিল, “বাঃ তা কি আমাকে কোন দিন বলেছ ? এইত প্রথম বলছ । তাতে একেবারেই সপ্তম স্বরে হুছ ঘোষণা কেন ? ঠাণ্ডা মুখে বলা যায় না ?”

কমলা বিগণ গভীর ভাবে বলিল, “সপ্তম মূর কি সানে বেরায় ।”

“সাধে না ত কি ? এইত মাসখানেক আ’গের কথা—দেওয়ানজী পাত্রের কথা জিহ্বাসা কর্তেই তুমি রেগে উঠলে যে, বেচারার মা মারা যাওয়ার এখনও হু’ মাস হয় নি ; এখনি দিয়ে ! আর কিছুদিন যা’ক্ ; আবার হঠাৎ এর ভিতরে মত বললে ফেলেছ তা কি করে জানব ? অন্তর্ধ্যামী নই ত ।”

“অন্তর্ধ্যামী না হয়েও সাধারণ বৃত্তিতেও এটুকু মিস্তর বৃত্তিতে পারতে যে, দেওয়ানজীর অশ্রু মতলব ছিল । তাঁর সেই গোমূর্খ নাতিটির সঙ্গে বিয়েটা খটিয়ে বাবার দেওয়া টাকাগুলি হস্তগত করাই তাঁর উদ্দেশ্য । আমি ওয়কব মতলববাজের কথায় কাণ দিই না ।”

অরুণ বিবিত ভাবে বলিল “তাই নাকি ?” তাহার পরে সে প্রচুর সহাস্ত মুখে বলিল “শাঃ—কখন ! আমার যে সাধারণ বৃত্তিটুকুও সেই তা’ এমন করে

একজ্ঞ সত্যর কাণ ধরে প্রমাণ করে দেওয়ারি কি তোমার উচিত হ'ল ; না তোমারি এত খুব মান বাড়'ল ? আড়ালে নিয়ে গিয়ে আমার লম্বা কাণটার হাত দিলে দুজনেরই যে মর্যাদা থাকত ! কি বল, নীহার ?”

নীহার এতকণ আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া ছিল—এইবার একটু হাসিয়া মুখ নীচু করিল। আড়ালে লইয়া গিয়া কণা বলার প্রস্তাব স্বামীর মুখে বহুক্ষণে শুনিয়াও কমলার অভিমানবিড় ছন্দর বিগল অভিমানে বাধিত হইয়া পড়িল। তাহার বাধাপূর্ণ মুখের পানে চাহিয়া অরুণ সাদরে হস্ত প্রসারিত করিয়া কমলার হাত ধরিল ! বলিল “আবার মুখ অমন হ'ল কেন ?—তাই হবে কমল !—আমি পাত্রে চেষ্টা দেখ'ব,—কিন্তু সাহসে আমার একজামিন্ । এত দিন যখন গেল, তখন আর হাস তিনেকে তোমার বোনের এত বেশী বয়স বাড়'বে না। দেবী হলে যদি নিতাস্তই পাত্র না পাওয়া যায়—দেওয়ানজীর নাতি ত উপস্থিতই আছে। তার চেহারাটি অন্ততঃ তোমার স্বামীর চেহারার চেয়ে অনেক ভাল। সেইজন্যই বুঝি তা'কে তোমার এত অপছন্দ হয়—না কমল ?”

কমলাকে রাগাইবার লক্ষ্য অরুণের এই আয়োজন সিদ্ধ হইল। বেদনা তুলিয়া গিয়া মধুর কোপে মুখখানি রাসা করিয়া কমলা বলিল, “পোড়ার দশ! আর কি ! সাত জন্মে বিয়ে না হয় সেও ভাল তবু অমন অগা-পাত্রে মেয়ের বিয়ে দিতে নেই।”

অরুণ এইবার একটু হাসিয়া বলিল, “যা'র উপর বিরক্ত হও তা'র উপর একটু অন্তর্য বিচারও কর, কমল তুমি। এত বেশী বলটা কি ঠিক হচ্ছে ?”

“নয়ত কি ? বেড়ে বয়সে এত দিনে এষ্টে'ল পাশ কর'লে। বাবা কি অমনই পাত্রে নীহারের বিয়ে দিতে অত টাকা দিয়ে গেছেন ? আর আমিই একা বাড়িরে বলি ; না ? ভ্রূপের তুলনা হচ্ছিল যে ? শুন্দলেও গা জালা করে।”

“তাই নাকি ? শুনেও ধড়ে গ্রাণ এল। তাহলে আমিই এ বিষয়ে শ্রেষ্ট ?”

“যাও যাও বাজে বহুনি রাখ। তোমার পাত্রের লক্ষ আল থেকেই চেষ্টা করতে হ'বে।”

“চেষ্টা কর'ব বটে ; কিন্তু সে মিথ্যা চেষ্টা হবে। তুমি যে রকম পাত্র চাও তা' বললেই অমনি পাওয়া যায় না—বিশেষ নীহারের একটু বয়স হয়েছে। একজামিনের পক্ষ ভাল করে চেষ্টা করা যা'বে।”

“তিন মাস পরে তোমার একজামিন—তা’রপরে তুমি খুঁজবে ? অত দেরী কর্ত্তে পা’বে না ?”

“এ আর এত বেশী দেরী কি ? বড় জোর মাস চারেক । নীহারও ততদিন আর একটু সামলাক ।”

“আঃ—তোমার কেবলই ওজোর । নীহার বেশ সামলেছে । তা’র মত তোমায় অত ভাব্তে হ’বে না ।”

কমলার কথার শু শব্দে এমন একটু ক্লান্ততা প্রকাশ পাইল যে, অপ্রতিভ হইয়া অরুণ নীহারের পানে চাহিয়া দেখিল—নীহার তাহার মুখের বিবর্ণতা যেন সামলাইতে পারিতেছিল না । তাহার হাতখানা স্পষ্টই বর বর করিয়া কাঁপিতেছিল ।

অরুণ তাহার পানে চাহিতেই সে এমনই ভীতভাবে চক্কু ফিরাইয়া লইল যে অরুণ সে দৃষ্টিতে বাধিতের বেদনাই মূর্জিত দেখিল । অরুণ কমলার ক্লান্তরকে ঢাকিয়া লইবার মত ভাড়াভাড়ি বলিল, “আমাদের গল্পগল্পের মধ্যে অগ্রমন্য হয়ে নীহার যদি একটু ভাল থাকে বলে তুমিই বাস্ত । দেওয়ানজীকেও তাই বলে তুমি ভাগিয়ে দিলে । মহিলে দেওয়ানই ত এত দিন পাত্র ঠিক করিতে পারতেন । মাতুলোক সামলান কি সোজা কথা—বিশেষ যা’র আর কেউ নেই । আমি এই তিন মাসের পর ঠিক দশ দিনের মধ্যে তোমার পছন্দমত পাত্র ঠিক করে দেব । এই কটা মাস মাত্র যা’ক ।”

কমলা চাহিয়া দেখিল, অরুণের সবাদুকৃতিময় বাক্যে ও আর্জ্ঞ শব্দে নীহার একেবারে যেন অসম্মত হইয়া পড়িয়াছে ; তাহার মত চক্কু হইতে টপ্ টপ্ করিয়া অক্ষ করিয়া কক্ষের যেকের পড়িতেছে । সে বৃন্তে অরুণের চিত্ত যে অধিকতর বিগলিত হইয়া পড়িতেছে ইহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া কমলার চিত্ত আবার অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল । সে সহসা স্তম্ভবৎ বলিল, “এই মাসের মধ্যেই আমি নীহারের বিবাহ দেব ।”

অরুণ তাহার কঠিন ভাবে বিস্মিত ও সহসা অল্প বিরক্ত হইয়া বলিল, “তবুও এক কথা ? আমি এখন পড়া ছেড়ে পাত্র খুঁজতে পারুব না ।”

“না পার আমার অল্প লোক আছে ।”

“বেশ তবে তাই হোক ।”

রাগ করিয়া অরুণ উঠিয়া চলিয়া গেল ; এবং কমলাও সে স্থান হইতে

সরিয়া গেল। কেবল ভীতা। সজ্জিতা নীহার যে বাড়ীর কোন্ কোণে লুকাইসে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

এবার গোটা দুই দিন বাক্যালাপ বন্ধ রহিয়া শেষে যথারীতি নিয়মে স্বামিজীর কলহ তল হইল। অরুণ সেই দিনই কলিকাতার ভগিনীপতি কানাই বাবুকে সুপাত্রেয় সন্ধান দিবার জন্ত অহরোপ করিয়া পত্র লেখায় তিনি কয়েক দিন পরে একটি পাত্রেয় কথা লিখিলেন। কয়েকখানা পত্র লিখাগোবিন্দ পর কমলার আদেশে তাহার এম, এ. পড়ার পুস্তক বন্ধ রাখিয়া অরুণ “যর বর” দেখিবার জন্ত কলিকাতার যাত্রা করিল। কেন না পরের বুধে ঝাল খাইয়া কমলা একটা যাহার তাহার হাতে নীহারকে দিতে পারিবে না।

কয়েক দিন পরে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া অরুণ কমলার সন্ধানে আসিয়া দেখিল, নীহার কমলার কক্ষের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া কি একটা বুনিতেছে। সেই বিবাদের পরদিন হইতে নীহার আর তাহাদের নিকটে আইসে নাই। আবার যে কমলাই তাহাকে নিকটে ডাকিয়া আনিয়াছে তাহা অরুণ বেশ বুঝিতে পারিল। তাহার এই “কণঃভুট কণঃকুট” অব্যবস্থিত চিন্তের পরিচর সে বহুদিন হইতেই পাইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার মূল সূত্রের সন্ধান এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত করিতে না পারাই অরুণের সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। অরুণ আবার একটা ভুল করিল। সে দিনের সেই কলহের স্মৃতিটুকু নীহার ও তাহাদের বন্যে বাহাতে নিঃশেষ ভাবে মুছিয়া যায় এইরূপ একটা ইচ্ছা সহসা তাহার মনে জাগিল। সে দিনের স্মৃতি যে নীহারের মন হইতে মুছে নাই, তাহা তাহার মুখভাবেই অরুণ বুঝিতে পারিল এবং নিজেও অতর্কিতে তাহার সম্মুখে পড়িয়া যে একটা নূতন রকম লক্ষ্যবোধ করিল ইহাতেই সেও বুঝিল যে, সেই অগম্যজনক স্মৃতিই তাহার মূল। এ ভাবটা চেঁচায় ধারা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অরুণ পূর্বের মত অসঙ্কোচ পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া নীহারের নিকটে গাড়াইয়া সহাস্র মুখে বলিল, “আজ যে তোমায় নতুন কাখে ভ্রষ্টা দেখছি। এ সব ত তোমার কোন দিন দেখি নি। কমলা বুঝি তোমায় ও তা’র নেশা বরিষে তবে ছেড়েছে। একেই বলে ‘সদ দোষে শত গুণ নাশে’ অসংস্কারে অপেষ দোষ।”

অরুণের রসিকতার নীহার পূর্বের মত হাসিতে চেঁচা করিলেও তাহার মুখে সে হাসি সূঁচিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দুইটি যেন বিগল ভীত ও সন্ত্রস্ত

হইয়া পড়িল। অৰুণ তাহার এ ভাবকে নষ্ট করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া তাহার আরও নিকটে গিয়া নীহারের শির কণ্ঠটির এক পার হস্তে ধরিয়া সহাস্ত মুখে বলিল, “বাঃ বেশ হচ্ছে ত! কার জন্য এ নতুন শিক্ষা—নতুন চেষ্টা! নতুন লোকের সঙ্গেই নাকি?”

নীহার এইবার একটু হাসিল। কুটিত মুহূৰ্ত্তে বলিল, “কমল দিদি আপনার সঙ্গেই বৃন্দে বেগেছেন।”

“এ ত কমলার বড় অন্যায় আৰ্দ্ভার। এমন জিনিষটি নতুন লোকের সঙ্গেই রাখা উচিত, তা না—বা সে অগতে হ’তে দেখবে সবই পুরোপুরি অন্য ফরমান্ করে যাবে। কই সে বে-আকসল মানবে? এ নিয়ে তা’র সঙ্গে ঝগড়া করতে হবে ত!”

অৰুণের ব্যবহারে এবং অসঙ্কোচ কথাবার্তার নীহারেরও আড়ষ্ট ভাব ক্রমে দূর হইতেছিল। সে মুখ তুলিয়া ঈষৎ ঐক্লম অৰ্ধচ কুটিত ভাবে বলিল, “এই-খানেই ছিলেন এতক্ষণ। আসবেন এখনি। বসুন না।” বলিয়া নীহার সম্মুখ চোরখানার পানে চাহিল। অৰুণ বিনাবাক্যবায়ে তাহাতে বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ উভয়েই আর কোন কথা বুলিয়া না পাওয়ার অৰুণ শেষে বিব্রত ভাবে ভাড়াভাড়ি হস্ত পুস্তক কল্পনা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—“বল দেখি একখানা কি জিনিষ!”

নীহার মুহূৰ্ত্তে বলিল, “বই।”

“সত্যি নাকি। ছুরী কাঁচি ষটি বাটি ছুঁচ স্নেহে নয়, বই। অত্যন্ত অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ আবিষ্কার ত!”

“আপনার হাতে রয়েছে আমি দূর থেকে বই ছাড়া আর কি বলব।”

“আম্বা! এই করকমলেনু। এইবার বল কেমন জিনিষ?”

নীহার যেন সহসা চকিত হইয়া উঠিল; তাহার পাণ্ডু গম্ভীর মুহূৰ্ত্তে রক্তের আভা দেখা গিল। সে ত্রস্ত স্বরে বলিল, “কা’র জন্য এনেছেন। কমল দিদির জন্যই ত!”

অগত্যাই ঘূষের সাহায্য নিতে হয়েছে। তোমার কমল দিদি আমাকে বলদ বীরের মত চারি কাণ্ডের ভরে সোনার লঙ্কার পাঠিয়াছিলেন, তা বলদ বীরের মতই অকর্ণণ্য আমি চারি কাণ্ডের এক কাণ্ড কিছুই করে আসতে পারি নি, তাই ভয়ে ভয়ে একেসর মোহিত সেনের এডিশন কখনা রবি

বাঘুর কাবা' এর কিনে খুন ভাল করে মনোজ্ঞা চামড়ায় ভেলভেটে বাঁধিয়ে
দোনার জলে বইয়ের নাম লিখিয়ে এনেছি। দেখছ না ?”

নীহার মুচের মত অরুণের পানে চাহিয়া রহিল। যেন অরুণ কি
বলিতেছে, তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে চাহে।

অরুণ তাহার প্রশ্ন বুঝিয়া ভেমনই সপরিহাসে বলিল, “বিবীতা! বাস
জগ না মাপালে কেউ কি কারুর গোয়ালে জোর করে ঢুকতে পারে ?
তোমার এই পুরাণ বোঁরাডেই এখনও কিছুদিন বাস কপালে আছে। আমি
কি করব ?”

নীহার ধীরে ধীরে মস্তক নামাইল; কিছুকণ হির ভাবে বলিয়া
থাকিয়া নিঃশব্দে পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল। অরুণ ক্রমে অধীর
হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কই, কমল ত এখনও এল না! দেখি, সে
কোথায় ?” গম্বোদ্যাত অরুণের পায়ের নিকটে নাহার জন্তে পুস্তক
কয়খানা নামাইয়া দিতে দিতে বলিল, “এই ক’খানা লইয়া যান,—দ্বিধির
জন্তেই সবগুলো এনেছেন বোধ হয়,—না ?”

অরুণের সেই বালাকাণের ঘটনা মনে পড়িল। সেই গোলাপ ফুলটি
পেঁচিয়া বোধিত লুছ অগচ ভীত নিরাশাপূর্ণ স্বয়। ঠিক ভেমনই স্বরে—
ভেমনই ভাবেই নীহার কবটা বলিল। সহসা অরুণ যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়
ভাবে দাঁড়াইল,—কেন না, সেই গোলাপ ফুল দানের পরের ঘটনাও তাহার
মনে আসিয়াছিল। কিন্তু তখনই সে ভাবকে মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া সে
নিম্ন স্বরে বলিল, “তোমাও প্রভুও একখানা আছে নীহার—এর মধ্যে একটা
তুমিও পাবে।”

নীহার মাথা নাড়িয়া ভীত স্বরে বলিল না! দিবি রাগ
করবে।”

“কমলাকে তুমি চিন্তে পাত্র নি এখনো, নীহার ? আমার কাছে তা’র
চির দিনই ওই ব্রকম অতিমান করা অভ্যাস; কিন্তু আর সকলকে সে কত-
খানি স্নেহের চোখে দেখে, কতখানি তার কর্তব্যজ্ঞান, উচ্চ মন তা’কি জান
—না এখনও ? আমি না দিলেও সে এখনি এ বইয়ের ভাগ তোমায় দিত।
তা’র সম্বন্ধে অজ্ঞার ধারণা মনে রেখ না। তুমি সজ্জন্মে বই লও।”

নীহার অড়িতবস্ত্রে বলিল, “আপনিই যেটা দিতে ইচ্ছে করেন,
দিন।”

তোমার খেট। ইচ্ছা নিতে পার। ওরু নিজে নিতে পারবে না! অচ্ছা
আমিই দিচ্ছি।”

প্রেমের চির প্রাপ্য সম্মান প্রণয়ীর হস্তের স্বতঃস্ফূর্ত পূজা অরুণ বা
কমলার ভাগ্যবশে এইরূপে করুণাদেবী আসিয়া মাকে পড়িয়া কয়েক বারই
হরণ করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে অরুণেরও হাত ছিল না। কেন না দয়াকেই
এইরূপ বস্তুকেই উচ্চ আসন দেওয়া তাহার প্রকৃতিগত; বিশেষ সে
বাণ্যনাথ হইতেই নীহারকে তেহের কৃষ্টিতে দেখিত। স্তম্ভৈশ্বর্য্য সৰ্বসৌভাগ্য-
ময়ী কমলা যেন তাহার বাণ্যনের দেবী—কামনার সৰ্বসাকল্যাময়ী প্রতিমা।
হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্তিত প্রেমের কূলে অন্তর সৰ্বদা তাহার পূজায় নিযুক্ত।
কিন্তু এই যে বলিমা দীন পদসূহবাসিনী পদদয়াপ্রত্যাশিনী বালিকা তাহারই
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জগতের কুপার পায়ে স্বরূপে অবস্থান করিতেছে সেই
দেবীর বাহ পূজার লক্ষ এই দীন কুপার্বী হৃদয়কে করুণা না করা এ যেন
সেই দেবীরই অপমান বলিয়া অরুণের বোধ হইত। এই দয়ার ধানের লক্ষ যে
সে দেবীর নিজ পূজায় ক্রটি বোধ করিবে এ চিন্তা অরুণের অগস্তব বোধ
হইত প্রেমের এই সদা তিস্কৃত ভাব এবং তজ্জন্ম মান অভিমানও অরুণের
ভত ভাল লাগিত না। কবির “শুক্লের উক্তি” কবিতাটিই যেন তাহার
জীবনে স্মৃতিবান হইয়া উঠিতেছিল—

“সৌন্দর্য্য সম্পদ মাকে বসি কে জানিত কামিছে বাসনা।

ভিক্ষা ভিক্ষা সৰ্ব ঠাই তবে আর কোথা বাই

ভিখারিণী হল যদি কমল-আসনা।

• • • • •

কাছে বাই তেমনি হাসিয়া নবীন ঘোবনময় প্রাণে,

কেন হেরি অজ্ঞানল হৃদয়ের হলাহল

রূপ কেন রাহপ্রভ মানে অভিমানে!”

অরুণ যখন নিজের মনে প্রেম ও করুণার স্বয় সাব্যস্তের বোকর্কমায়
এইরূপে বাস্ত তখন সহসা সে নীহারের ব্যবহারে একটু চমকিত ও বিরক্ত
হইয়া উঠিল। নীহার বহিধানা অকলে ঢাকিয়া যেন অন্তরের অন্তর দিয়া
শুকাইয়া লইয়া পলাইবার লক্ষ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “আমি
বাই।”

“অমন করে পালাচ্ছ কেন ওকি?”—বিরক্ত অরুণের মুখের কথা মুখে

রহিল—নীহারও গতিশক্তিহীন হইয়া সেই স্থানে একেবারে কাঠের মত দাঁড়াইয়া গেল। সম্মুখে কমলা ।

সহসা অপ্রতত অরুণের মুখেও প্রথমটা কথা জোপাইল না। বিনা ঘোষেও সে যেন কতকটা অপরাধীর মত নীরব রহিল। কমলা নিশ্চয় বৃষ্টিতে উভয়কে কণেক নিরীক্ষণ করিয়া গভীর স্বরে বলিতে লাগিল, “তা’র পর ? কাণের কত দূর কি হল ? কবে দিন স্থির করছে ? এই মাসেই ত ?”

অরুণ অপ্রতত ভাবটা কাড়িয়া ফেলিয়া চেয়ার টানিয়া বলিতে বলিতে বলিল “দাঁড়াও বসি আগে। হাঁপ নিতে দাও।”

“তুমিলাম এক ঘণ্টারও উপর বাড়ীর মধ্যে এসেছ ; এতখানি সময়ের মধ্যেও বসি বা হাঁপ নেওয়া ঘটে নি ?” নিজের কাছে নিজেকে অল্প কোন দোষে অপরাধী বোধ না হইলেও অরুণ নীহার এবং নিজের উপরও যেন অনেকটা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রধান কারণ, অনর্থক এই এক ঘণ্টা সময় নষ্টেই অসুস্থতা তাহার চিত্তকে বিভ্রান্ত করিতেছিল। আজ কয়দিনের প্রয়াস হইতে সে গৃহে আসিল ; কিন্তু কমলার সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ বা একটি কথাও না হইয়া একটা যেন অশান্তিকর ব্যাপারের মধ্যেই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইতে চলিল। বিরক্ত ঘটনা নিজে ও নীহার তিনজনের উপর বিরক্ত অরুণের চিত্ত কমলার ক্রক ও বাৎ স্বরে বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। ঘটনাবিপর্ন্যয়ে কমলারও যে সহজভাবে কথা কথা তখন কষ্টিন হইয়া দাঁড়াই-
রাছে তাহা সে একবার ভাবিতে পারিল না। সমস্ত বিরক্তি পুঞ্জীভূত ভাবে কমলার উপরেই নিক্ষেপ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, “অত জবাব দীর্ঘ করা আমার দ্বারা পোষাবে না”।

“বে কাণে পাঠিয়েছিলাম সেই কাণেরই মাঝ জবাব চাইতে এসেছি, আর কিছুই নয়।

“সর্বদা অত লড়ায়ে গোরার মত লক্ষী উঠিয়ে থাকলে সংসার চলে না। বস বলছি, শোন”।

কমলা বলিল না, নিঃশব্দে অরিগর্ভ শব্দীয়কের মত দাঁড়াইয়া রহিল। নিজেরই ক্রটিতে কমলার উপর যে সে একটু অধিক মাত্রায় দোষারোপ করিয়া ফেলিতেছে অরুণ ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিল। কমলাকে নিকটে টানিয়া লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া আগে এই ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিতেই তাহার অন্তর চকল হইয়া উঠিল। কিন্তু নীহারের উপস্থিতিতে তাহা ঘটনা

উঠিল না। অগত্যা কোমল সাপরাধ কণ্ঠে অরুণ বলিল, “ভাবি ত্যাক্ হয়ে এসেছি, কমল। কানাই বাবু পর্য্যন্ত তা’দের ব্যবহারে বিরক্ত হ’য়ে উঠলেন। টাকার খাই তা’দের কিছুতেই মিটে না।”

“আদত কথাটি মাত্র আমি শুন্তে চাই। কোথাও সম্বন্ধ বা দিন স্থির হয়েছে কি না?”

“বেশ হাজিরেও যখন তা’দের দেমান্ধ বাড়তে লাগল তখন কানাই বাবু রাগ করে সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেন।”

“কেন আমি কি টাকার কোন মাপ্ করে দিয়েছিলাম? টাকার ভাবনা না তবে পাড়ই কেন্ ঠিক করা হল না?”

“শুধু সে ক্ষতও নয়, কমল, দেখলাম তা’রা অতি ছোট লোক! কন্যার মা কত টাকা রেখে গেছেন ইত্যাদি এত অভ্যস্তের মত কথা কইতে লাগল যে, আমারও মনে হল যে, তুমিও শুন্নে সেখানে বিয়ের রাজী হ’বে না। তাই আর একটি সংবাদের ছেলের সংবাদ পেয়ে সেইখানে কথাবার্তা এক রকম স্থির করে এলাম। কিন্তু পাড়ের সম্মুখে বি, এ, একজামিন। মাস চারেক পরে নইলে সেখানেও বিয়ে দেওয়া যটুবে না।”

“এই তবে শেষ সংবার! বেশ! সেই যে তিন মাস পরের জিন্দ ধরেছিলে একদারান্তরে সেই কথাই বাহাল ত?”

“এ কি অবুজের মত কথা, কমলা? কানাই বাবুও ত চেঁচা করছেন, তিনিও ত এ ভিন্ন আর উপায় দেখলেন না।”

কমলা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ এতক্ষণে অবসর পাইয়া ভূমি হইতে পুস্তক করখানি তুলিয়া লইল। কমলার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে সে বলিল, “কমলা, ভূমি যে ক’খানা বই ভালবাস তোমার ক্ষেত্রে বাধিরে এনেছি।”

কমলা পুস্তকের পানে ফিরিয়াও চাহিল না দেখিয়া অরুণ কমলার হাত ধরিয়া বই ক’খানা ওঁজিয়া দিতে চেঁচা করিল। তখন কমলা স্বামীর পানে অচকল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল, “আমার ক্ষেত্রে এনেছ এই বই?”

“হাঁ তোমার ক্ষত। দেখ তিতরে নাম দেখা আছে।”

“দেখি” বলিয়া স্বামীর হস্ত হইতে পুস্তক ক’খানা লইয়া কমলা নীহারের দিকে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া অরুণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, “নীহারকেও এক-খানা দিগেছি যে, ও ওলো তোমার। ভূমি ভালবাস বলেই এনেছি। ভূমি নেবে না? একখানাও নিজে রাখ’বে না?”

বাহীর বাধিত শরের প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া কমলা স্তম্ভ শরে বশিল “না! মনরাখা প্রাসাদী কিনিস আমি নিই না।”

“মনরাখা প্রাসাদী কিনিস!” অরুণ প্রথমত হতবুদ্ধি ভাবে রহিল; তার পরেই সক্রোধে বশিল “এত নীচ মন তোমার? এই জন্তই নীহার একটা সামান্য বই নিতেও এত ভয় পাচ্ছিল। এখন বুকুতে পারছি।”

কৃত্র অতিমানের বেলে একটা বিরাট দৈত্য আসিয়া কমলাকে নিমেষে অধিকার করিয়া লইল। কমলার রক্ত কোপ এইবারে অগ্নি উৎসারণ করিল, “আমি নীচ? আর আজন্ম যা’রা পরের দয়্যাতেরই মাটিতে পা রেখে উঠে তাকেই নীচ বলে প্রমাণ করতে সক্ষম। ব্যস্ত তারাই জগতে সব চেয়ে মহৎ। না?”

“আজন্ম যা’রা পরের আশ্রিত—পরের দয়্যাত পুষ্ট তা’রা ত নীচ বতেই পারে। কিন্তু ঐতর্য্য যে মানুষের মনের দৈন্ত ঘুচাতে পারে না তা’র প্রমাণ তুমি অহরহঃই দিচ্ছ।”

“বটে? তা হ’লে এমন নীচের সঙ্গ সে সব মহৎদের ত ত্যাগ করাই সর্ব্বাঙ্গে উচিত।”

“নিশ্চয়ই। মনে ভেব না যে, তোমার কথা কেবল নীহারকেই যাত্রা লক্ষ্য করছে। নীহার ছাড়াও আজন্ম পরদ্রোহপুষ্ট পরের মাটিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে থেকেছে এমন লোক আরও এখানে উপস্থিত আছে।”

“সেত জানছিই। নীহারকে উদ্দেশ্য করে কোন কথা বললে এখন তা’ একা তা’র গারেই লাগে না, তা বেশই জানছি। আমি খুব নীচমনা সত্যই, আর এ রকম কথা কেবল তা’দেরই মুখে শোভা পায় যা’রা—”

“পরের অজ্ঞপ্রবর্ত্তীরা অথচ তা’রাই শরের কর্তা সেজন্য অধিকার কর্তৃত্ব করুতে চায় সেই মূর্খের মূর্খে। না?”

“আমার মুখে কথা শুনে দেবার তোমার কোন অধিকার নাই মনে রেখ।”

“তোমার উপরে আর আমি কোন অধিকারের কথাই মনে রাখতে ইচ্ছা করি না। তোমার এ আশ্রিতের অহঙ্কার যে সর্ব্বদাশী রকমে দিন দিন বাড়ছে তাতে সে-ই তোমার ক্রমশঃ তা’র দাসী করে ফেলছে এ আমি কিছু দিন হতেই লক্ষ্য করছি। পায় যদি এই বেলা সতর্ক হও, উপদেশ দিয়ে গেলাম। মতদিন না নিজে উপার্জনকর হই ততদিন এখানে আর বৃথ দেখাব না।”

“বুধ দেবাবে না ? কোথায় যেতে হ'বে ?”

“যেখানে ইচ্ছা ।”

কমলা কণেক জুজু হইয়া রহিল । কিন্তু অরুণকে ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আবার কোণে রোবে গর্জন করিয়া বলিল, “এখন ত তা' যা'বেই ; এখন কিনা দিন কিনে নিয়েছ ? এখন আর তোয়াক্কা কিসের ?”

অরুণ বুধ না ফিরাইয়া উত্তর দিল, “এর উত্তর যিনি আমার প্রতিপালন করেছিলেন তাঁ'র কাছে দিব, তোমার কাছে না ।”

অরুণ চলিয়া গেল, কমলা প্রস্তর-প্রতিমার মত নিম্পন্দ তাবে দাঁড়াইয়া রহিল । কি হইল না হইল তাহা সে যেন ভাল বুঝিতেও পারিল না, কেবল কর্ণে স্বামীর অসহ্য বাক্যজালা এবং তাহার দুর্জীবহার শূলের মতই বিধিত-ছিল ! এই পরদয়াপ্রভাষী কি সে স্বামীকে বলিয়াছিল ? অরুণ কি তাহা বুকে নাই ! বুঝিয়াও সে কলহ করিবার ক্ষমতা তাহা বেছায়ই গায়ে পাতিয়া লইয়াছে । নীহারের অপমান সহিতে না পারিয়া ক্রীর ভ অপমান সে বজ্রক্ষেপ করিল ! এই অরুণই সেই অরুণ ? না নীহারের লব্ধে সে তিরদিনই এইরূপ পক্ষপাতী ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী বিরগমা দেবী

ভিতর ও বাহির ।

নদীর উপরে খেলে

রখির কিরণ ;

ভিতরে অঁগার বোর

বেরিয়া তখন ।

অথরে বেশিয়া যায়

স্নমদুর হাসি ;

ভিতরে চিতার অগ্নি

তব্ব স্বধরাশি ।

ঐসন্তোষকুমার দুখোপাধ্যায় ।

বাঙ্গলা সাহিত্যে য-ফলা। ❀

‘য’ই য-ফলা হয়। বর্গীয় ‘জ’এর এমন বিচ্ছিন্নধাবৎ, ভুলভঙ্গতিসমূহ রূপধারণের ক্ষমতা নাই বা তাহার সে প্রয়োজনও নাই; কারণ, ‘য’রই এই ‘।’ ফলা আকার দারণ পর্য্যর্পে জীবন উৎসর্গের একটা মহান্ন দৃষ্টান্ত। কিরূপে ইহা হয়, তাহাই দেখা যাউক। আজকালকার বাঙ্গলা সাহিত্যের হঠৈতবীরা দুইটা ‘জ’ লইয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার বামান সহজ করিবার জন্য একটাকে বর্ণমালার ছড়া হইতে বাহির করিয়া দিতে প্রবৃত্ত। য-কারের উচ্চারণ দুইটা আছে, তাই তাহাদের মধ্যে কেহ বলেন, এই একটা অক্ষরে যখন দুইটা ধ্বনির দ্যোতকতা করিতেছে, তখন একটাই থাক, আর কেহ কেহ বলিতেছেন, দুই চারিটা প্রাকৃত ভাষা যখন এটাকে ছাড়িয়া অন্যটাকে রাখিয়াছে, তখন আমরাই বা তাহাদের পক্ষা ছাড়িয়া দিই কেন? এই ছাড়াছাড়ির ব্যাপার লইয়া একদিন কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমাদের বাঙ্গলা ভাষার কাহার কতটা প্রয়োজন, তাহা বুঝিতে বলিয়াছিলাম। অহুসন্ধানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আন্তরিকতা হইয়া গিয়াছে, ছাড়িব কাহাকে?—‘জ’কে যখন কেহই ছাড়িতে পারে নাই, তখন আমরাও পারিব না, এ কথা বিনা প্রমাণেই বলা যাইতে পারে; আর ‘য’—যে ভাবে বাঙ্গলা সাহিত্যে উর্দ্ধপীড়ি সংগ্রহ করিয়া এত বৎসরকাল বিনা ওজরে স্বতঃস্ফূর্ত করিয়া আসিতেছে; জানি না, কোনও আপীল আদালত তাহাকে বেনাম করিবার কোন চক্রম দিতে পারিবেন কি না।

সংস্কৃত ভাষা যে সকল ভাষার ভিত্তি, তাহাদেরই অনেকটা সংস্কৃত ভাষার আইন-কাহুন মানিয়া চলিতে হয়, কায়েই য-কে আবশ্যকমত হইতে হয় কিন্তু সে যে য-ফলা হয়, এটা তাহার বাঙ্গলা স্বাধীনতা, তাহার এ রূপ কেবল বাঙ্গলা ভাষাতেই দেখা যায় এবং কায়ে লাগে। সংস্কৃত ভাষা ইহাকে বাঙ্গলার ন্যায় “জ” উচ্চারণের অধিকার দেয় না। সেখানে সে সর্বদা সর্বত্র নিজের যৌগিক উচ্চারণ বজায় রাখিয়া চলে। সংস্কৃত ব্যাকরণ তাহার উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া দিয়া যে দুইটি বর্ণকে

ভাষার প্রাণ বলিয়া দিয়াছে, সেখানে সে সর্বত্র সেই ই+অ উচ্চারণই বলায় রাখিয়া চলিয়া থাকে। ‘পদযথো পদান্তে বা ‘য’-কার ‘র’ উচ্যতে—ইত্যাদি যে নিয়মটা স্মৃতিতে পাওয়া যায়, সেটা কোন্ সংস্কৃত ব্যাকরণে আছে, আমি তাহা জানি না, বরং স্মৃতিতে পাই। এটা বাঙ্গলা ভাষারই নিয়ম, কেবল সংস্কৃত করিয়া লেখা। ইহাতেও কিন্তু একটা কাকি আছে। বাঙ্গলায় ‘য’—‘র’ হয়, কিন্তু য-ফলা কোথাও ‘র’ এবং কোথাও অন্তরূপও উচ্চারিত হয়—যেমন সত্য, মিথ্যা, কার্ধ্য—এই তিনটিতে য-ফলার ত্রিবিধ উচ্চারণ দেখা যাইতেছে। সত্যকে বাহার ‘সত’ উচ্চারণ করেন, সেটা তাহাদের প্রাদেশিকতার ফল।

ফলা বলিয়া কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণের যে সংক্ষিপ্তাকার বাঙ্গলা ভাষায় চলিত আছে, তাহাদের ‘ফলা’ নাম বাঙ্গালী গুরুমহাশয়রা রাখিয়াছেন। কোন স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্তাকারের এক্ষণ নাম নাই! ৩ ও ৯ যখন সংক্ষিপ্তাকার গ্রহণ করে, তখন বাঙ্গালী গুরুমহাশয়রা অল্পগ্রহ করিয়া তাহাদেরও ফলা নাম দেন,—তাহার একটা কারণও আছে; তাহার স্বরবর্ণ হইলেও বাঙ্গলায় তাহার ব্যঞ্জনের সাহায্যে ‘রি’ ও ‘লি’ নামে পরিচয় দেয়, কাষেই তাহাদের ফলা নাম দিবার যেন একটা হেতু আছে।

প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে বিগতমূর্ত্তি ‘য’-এর সকল প্রকার উচ্চারণের প্রয়োগই পাওয়া যায়, কিন্তু য-ফলার প্রয়োগ যত বেশী পাওয়া যায়, এত আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। প্রাচীনের য-ফলাযুক্ত শব্দগুলির অধিকাংশই আধুনিক সাহিত্যে য-ফলা ভাগ করিয়াছে, আর কতকগুলিতে য-ফলার অন্ত আকার দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে য-ফলা ছাড়িয়া এক পাও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যিনি প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের একখানা পুস্তকও পড়িয়াছেন; তিনিই য-ফলার প্রভাব বুঝিয়াছেন, আর সে প্রভাব পাঠক কেন, ইবরতগুপ্তের ন্যায় গ্রন্থকাররাও এড়াইতে পারেন নাই। আমার এমন মনে হয়, প্রাচীন সাহিত্য হইতে য-ফলা বাদ দিলে, অনেক স্থলে তাহার প্রাচীনত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

এ কালের ভাষার য-ফলার পরিবর্ত্তন কেন হইল, তাহার অবশ্য কারণ দেখাইতে পারা যায়; কিন্তু এতটা হত্যার হইলেও তাহাকে

একবারে ভাগ কৰিবৰ উপায় নাই। এখনও নায়ে অন্যায়, সত্য-মিথ্যার তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেলেও কেবল, পুনোই আছে, 'পাপে' তাহাকে খুজিয়া পাইবার যো নাই, 'দ্রব্যাদিতে' তাহাকে দেখিতে পাই, কিন্তু কোন 'সামগ্রীতে' সে থাকে না, সে 'দ্রব্য' সহচর বটে, কিন্তু চোরের নহে, আবার সে 'জাকৃতি' করে না বটে কিন্তু 'চৌধ্য' তাহার একচেটে ব্যবহার। সে 'বাণিজ্য' করে, কিন্তু 'হোকানদারী' জানে না। সে কার্য করে, 'পণ্ড' করে না, তবে যেক যদি তাহার মাথার চড়িয়া বসে, তাহা হইলে, তাহার পক্ষে 'কার্য' 'অকাৰ্য্য' দুইই 'অনিবার্য্য' হইয়া পড়ে। এতলা কিন্তু সংস্কৃতির কথা, তাই অদম্য; কিন্তু নবীন বাঙ্গলার তাহাকে অনেকটা দমন কৰিয়া ফেলা হইলেও একবারে অগণ্য কৰিতে পারা যায় নাই। কবিতা তাহার এখনও সে পুরাষাটায় দখল বজায় রাখিয়া চলিতেছে। কেন না, রাঢ়েই কি, আর বঙ্গেই কি, এখনও উত্তমজ 'ছেলা-মেয়্যা'র 'ব্যা' হয়, 'ছাইল্যা-মাইয়্যার' জন্য বাপ মা'ও 'ভেব্যা ভেব্যা' দিন কাটে। এতদ্বিষয় ন্যাদামায়া, ভাষাচাকা, ন্যাকামী, ডাকরা, জামড়া প্রভৃতির মধ্যে য-ফলা বেশ মকররি দখল স্থাপন কৰিয়াছে। কেবল সে পশ্চিমবাংলাে নিজহাসে একাধিক অধিকার বিকল্পে স্বীকার কৰিয়া থাকে, মেদামায়া, ভেবাচেকা, নেকাযী ইত্যাদি। আবার বেধুন, পশ্চিমবাংলাে সে একাধিক এইটুকু অধিকার ছাড়িয়া দেওয়াতে ভাষা-জননী হেহপৰবশ হইয়া মধ্যবাংলাে তাহাকে একাধিক অধিকারমধ্যে এমন কতকগুলি স্থানে এমন ভাবে ভোগদখলের স্বৰ ছাড়িয়া দিয়াছেন, তবে কেবল ভোগদখলের স্বৰ কি না, তাই ব্যাকরণ বা অভিধানের আদালতে তাহার এ স্বৰ রেজেইরী করা নাই। যেমন একদা অ্যাকদা, এক—অ্যাক, এমন—অ্যামন, দেখ—অ্যাব। যশোহরের পুৰ্বে কিন্তু য-ফলার এ অধিকার নাই। তবে কতকগুলি স্থানে তাহার adverse right দেখা যায়, যেমন "কেবল" স্থানে "কাবল"।

য—পরিবৰ্ত্তন—সত্য সত্য।

বলিয়া—বল্যা—বইল্যা।

কৰিয়া—কৰ্যা—কইয়া।—করিয়া

য—পরিবৰ্ত্তন ছ—বিছা, বাছ

য— " জ বাহ, কাজ

কোণে বসি আল্যা করি—ছায়ায় থর্যা গলা ।

পাইয়া—পায়্যা, পেয়া

কর্তা ও ক্রিয়া এই সীমার মধ্যে বাক্যগুলির মধ্যে কর্তার বহুক্রিয়ায় উল্লেখ করিয়া বাক্যের সংযোগ করিবার একটি উপায় অসমাপিকা ক্রিয়া । বাক্যলা বাক্যরূপের এই বিধানটা বাক্যগঠনে বড় কান্যকর, কিন্তু সে গঠনের প্রধান সহায়ক এই য়। য—রাড়ের ও বড়ের সকল বাবুকে আপন অধিকারে আনিয়া বে দাড়িটার ঈবিয়া ফেলিয়াছে, সেটা নিয়েছে। একটা সংকিণ্ড আকার। এখানে য-কারের একটা বহুকের পরিচয় পাইয়া থাকি,—সে তাহা-জনমীর সেবার কন্ত, তাহার লক্ষ্যতাওয়ার পূর্ণ করিবার কন্ত, তাহার সাহিত্যে বাক্য-গঠনের সুবিধা কারিবার কন্ত নিজ দেহ পাত করিয়া 'y'-ফলার আকার ধারণ করিয়াছে। রাডে বড়ের ব-কলা বৃত্ত অসমাপিকা ক্রিয়াগুলির ব-ফলা আবার উত্তর বড়ের কথ্য ভাবকে সাহিত্যের যথা বিয়া এক করিয়া তুলিবার কন্ত আপনায় এই 'y' ফলার দেহকে নিপাত করিয়া ঝাড়িয়া দুই টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে। এই ভাদিবার পক্ষে সংকৃত-ব্যাকরণ তাহাকে একটু সাহায্য করে। সে জানে, সেই ব্যাকরণ তাহার উৎপত্তির বাজ—তাহার বাতা পিতা টিক করিয়া দিয়াছে। সংকৃত-ব্যাকরণ বলেন,—ই অ-য। আবার সংকৃত লক্ষ-শাস্ত্র তাহার উচ্চারণও ঈবিয়া দিয়াছেন—“ইয়”। বাক্যের ব্যাকরণ, বাকলা লক্ষ-শাস্ত্র এবং বাক্যলা গুরুনবাস্ত্রের আশাষের লিঙ্ক-পিতামহদিগকে কিন্তু ইহার নাম ‘য’ পিখাইয়া দিয়াছেন, বাক্যলার লক্ষ-ভাতারে কিন্তু এই য উচ্চারণবৃত্ত কোন লক্ষ সাক্ষ্য নাই। বদি, বজ, বাজন প্রভৃতি লক্ষগুলি সংকৃত লক্ষ-ভাতারের রত, আর যেমন, বখন ইত্যাদি লক্ষগুলি বৈয়াকরণিক আপন নিগমের ঠেলার পড়িয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বা বাবু হইতে যাই, যাওয়া, যাইতেছে প্রভৃতি যে পদগুলি হইয়াছে, সেইগুলিতে যে যা বাবু বর্তমান, তাহার সংকৃত মূল স্বীকার করিলে, উচ্চারণও সংকৃত উচ্চারণ, ইহা বসিতে হয়—এই সকল লক্ষ বাকলা নাম লক্ষের আশ করিয়া বেওয়া হইয়াছে বলিষ কি ?

বাহা হউক, বাক্যলার ইহার নাম বাহাই হউক, বাকলা অসমাপিকা ক্রিয়া-নির্মাণে য কিন্তু সংকৃত ব্যাকরণের নির্দিষ্ট আপন উৎপত্তির বাজ স্বীকার করিয়াছে এবং কথ্য ভাবের “ya” আকার বিজুত হইয়া ইয়া হইয়াছে।

প্রাকৃত-বাক্যরূপ অল্পসংখ্যে এই বরবর্ণের অ বর্ণের আকারেই লিখিত হওয়া উচিত, কিন্তু বাক্যগী ওরুমবাশররা, এহকাররা 'ইয়া' রূপে গিয়ার বাবরা করিয়াছেন। প্রাচীন পুঁবিতে ইয়া, ইন্না দুই আকারই আছে। কোন্ রূপ প্রাচীন, তাহা নির্ণয়ের উপায় এখনও হয় নাই, কারণ উপযুক্ত পরিমাণে প্রাচীন সাহিত্য ছাড়া হয় নাই। তেমন প্রাচীন কালে লেখা পুঁবিও বেনী পাওয়া যায় নাই—হইলেও আপার রাঢ় ও বঙ্গের পুঁবি না মিলাইলেও তাক ঠিক করা যাউবে না। সে সুবিধা বকল হইবে, তখন ঐ সকল তর্ক মীমাংসা করিবার চেষ্টা অভিযাযণীয়েয়া করিবে। এখন আমরা দেখিতেছি—

বলা—বইলা—বলিরা

করা—কইয়া—করিয়া

এখন দেখিলেন, অস্ত্র ব আয়াদের বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপ্রাচীন কাল হইতে কথ্য ভাষার লক্ষ্যে কৌশলে পরিবর্তন করিয়া একাকৃতি দিয়া রাঢ়বঙ্গের সাহিত্যকে এক আকার দিতে কতটা আত্মত্যাগ এবং কতটা নিম্ন উৎসাহের গৌরব বজায় রাখিয়াছে।

যে দেশের এক একটা অক্ষরও এই ভাবে আত্মত্যাগের এবং আত্ম-নিধাতনের বহান্ দুটোই দেখাইয়া বঙ্গদেশের উত্তর খণ্ড—রাঢ়ে বঙ্গে এক করিয়া তুলিয়াছেন, সেই দেশে কি না আজ বিধাতার ছুই করুণায় বিচ্ছেদ করিত হইয়াছে। *

অক্ষর—যে নিজে কররহিত, তাহার কাছে আমরা যে ইচ্ছিত পাইলাম, তাহা সাহিত্যসেবীর অল্পসংখ্য করা বর্জ্যবা অর্থাৎ আজ সাহিত্যরচনার রাঢ় বঙ্গের বোঝা ভাষার সাহিত্যে সুপ্রাতিষ্ঠিত রীতির মধ্য দিয়া লক্ষ

* বলা এ এবছ গড়া হয়, তখন রাঢ়ে বঙ্গে রাষ্ট্রীয় ভেদ ছিল, এখন আবার ছিন্ন বন্ধ হইয়াছে। অক্ষ-বন্ধ-কলিদের বন্ধ এখন পূঁবিবহর হইয়া বস্ত্র অঙ্গন হইয়াছে। কলিক আদে বঙ্গের লগে এক অঙ্গন ছিল, এখন একটী বস্ত্র অঙ্গন হইয়াছে। আর এক কথা,—যালবহে বলা এ এবছ গড়া হয়, তখন ইহার অবেক কথা বক্তৃতার বিনয় করিয়া, বিস্তারিত করিয়া বলা হইয়াছিল,—লেখকের সামাজিক যোগ-যোগকালে উত্তর-দক্ষিণের কার্যাবিসরণের বিবরণ-পুঁতিক। ছাপার তফাৎ কর্তৃপক্ষেরা সেই দুপঁছুই রাগিতে লাগে বন। আমরা ভাষার এতিমিলি দিলাম।—আ.মং

ଫ୍ରେମୋଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଧିଲେ, ଠିକ୍ ପଥ ଅବଲବନ କରା ହୁଏବେ । ଏହି ପଥଟି କି
ଓପାରେ ଅବଲବନ କରା ଯାଏବେ, ତବିଧାତେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଇଚ୍ଛା
ଆହେ !

ଶ୍ରୀବ୍ୟୋମକେଶ ସୁତଫୀ ।

ପ୍ରେମ-ବିକାଶ ।

ତଥନୋ ତରୁଣ ବରା, ଟାରି, ନୀଳ, ତାମ୍ରାକୂଳ ;
ଜହାଜ ପାଦପେ, ତୁମେ ତଥନୋ କୁଟିନି କୁଳ,
ଶିଖରୀ କଠେ ପାଣି ତଥନୋ ଉଠିନି ଗାରି ;
ତାଟିନି ମାଗରେ ଗୁରୁ ଚଳେ ଦୀର୍ଘ ପଥ ବାହି' ;
ନବୀନ ବରଣୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ନୋତାତାର ;
ଜୀବନ ଜୀବନ ଗୁରୁ ଆକୂଳତା ନାହିଁ ତା'ର ;
ଅକୂଳେର କୁଳ ହ'ତେ ମନ୍ତ୍ରୀରହିଲେ ଛୁଳେ,
ମାଗ୍ର-ତରୁଣ ନାଆ ବାହା ଆଗିଲ କୁଳେ
ସୁଖ ଆସି ଶିଖ କାମ ଗୁରୁ ଫେନ ବୀରେ ବୀରେ
ତୁମେମରେ ରାଧି ତା'ରେ ମାଗରେ ଚଳିଲ ଫିରେ' ।
ତପନ-କନକ-କରେ ଚାହିଁଲା ସେଲିଲ ଆସି,—
କୁଟିରା ଉଠିଲ କୁଳ, ମାହିରା ଉଠିଲ ପାଣି ;
ଦରାଜ ଆଗିଲ ଶ୍ରୀମ, ମିଶ୍ରେ ସୁଖେର କଥା,
ଆଗିଲ ଜଗତ ମାଧ୍ୟେ ସୁଖେର ଆକୂଳ ବାଧା ।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিবেধ ।

এই “বাদি-মন্দির” মানবদেহে প্রতিদিন কত শত রোগবীজ কত ভাবে প্রবেশ করিতেছে, তাহা ভাবিলে জ্ঞানদ্বারা হইতে হয়। বৃক্ষাদিদির বীজ যেমন আমাদের বাসভগনকে আশ্রয় করিয়া অঙ্কুরিত হয় এবং কালক্রমে শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্বক উহাকে পাতিত করে, ব্যাধিবীজও তেমনি দেহগেহে নানাতাবে প্রবিষ্ট হইয়া বংশবৃদ্ধি করতঃ উহাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। পান্ডিত্যে বীজতত্ত্ব পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়া, কলেরা, যক্ষ্মা প্রভৃতি অনেক রোগেরই বীজাণু আছে। সম্ভবতঃ, হাম ও বসন্তও রোগজীবাণুসমূহ। এই সকল বীজাণু জীব ও উদ্ভিদ ভেদে দুই প্রকার, এবং ইহাদের আকার এত ক্ষুদ্র যে, অতীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন আমরা উহাদিগকে চক্ষুঃকোতে দেখিতে পাই না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যাবির ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু বা উদ্ভিদাণু আছে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে গঠনেরও দিলক্ষণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেহ পুঙ্খগুহ, কেহ গোলাকার, কেহ ক্ষুদ্র সরল রেখাকার এবং কেহ বা ইংরাজী “কমা” চিহ্নের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। জল, বায়ু ও খাদ্যাদির সহিত অসংখ্য রোগবীজাণু অল্পকণ আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের দেহে এমন একটি রোগপ্রতিবেধক শক্তি দিয়াছেন যে, ঐ বীজাণুগণ ঐ শক্তির সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া গতাস্ত হইয়া পড়ে। এই ব্যাধিপ্রতিবেধক শক্তি আমাদের মধ্যে না থাকিলে, আমরা স্নগকালও ইচ্ছিত পারিতাম কি না সন্দেহ। আমাদের রক্তে যে সকল খেত কণিকা (white corpuscles of blood) আছে, তাহারাষ্ট আমাদের রক্ষক। রোগবীজাণুসকল রক্তে প্রবেশ করিলেই খেত কণিকাগুলি উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ফেলে। পাকস্থলীর অন্নরসেও (Gastric juice) অনেক বীজাণু বিনষ্ট হয়। জনাকীর্ণ স্থানে বাস, দূষিতা, কদাচার, অতিরিক্ত পরিভ্রম, দামক জ্বাও নীতাতপসেবন প্রভৃতি যে কোন কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটিলে আমাদের আত্মরক্ষা করিবার শক্তির হ্রাস হইতে থাকে। তখন ঐ সকল দেহ-প্রবিষ্ট বীজাণু বৃদ্ধিবেশে বংশবৃদ্ধি করিয়া আমাদের পীড়িত করে। জীবাণু বা উদ্ভিদাণুগণের বংশবৃদ্ধির প্রণালী অত্যন্ত। সর্বপ্রথমে একটি জীবাণু বিধা বিভক্ত হইয়া দুইটি হয়। ঐ দুইটি আবার বিভক্ত হইয়া চারিটি হইয়া

বাকে। এইরূপে অল্পকালমধ্যে একটি জীবাণু হইতে বহুসংখ্যক জীবের সৃষ্টি হয়। এই সকল জীবাণু বা উদ্ভিজ্জাণু-দেবনিঃসৃত রসই আমাদের শরীরে অনেক সাংঘাতিক রোগ আনিয়ন করে। জীবাণুসংক্রান্ত রোগে শীর্ণিত ব্যক্তির মল, মূত্র ও বমিত পদার্থাদির সহিত রোগজীবাণু নির্গত হইয়া জলে, স্থলে বা বোমপথে ইত্যন্তঃ বিকিরণ হয়। অত্যধিক শীত বা দোস্তঃসেবিত স্থানে ইহারা কিছুকাল থাকিলে নির্যীব হয়। জল হ্রসিদ্ধ করিলে জলাবাস জীবাণুগণের নিষ্ঠুরই বৃহা হইয়া থাকে।

ইংরাজীতে একটি কথা আছে—“Prevention is better than cure” —অর্থাৎ রোগ হইলে তাহার শাস্তি করা অপেক্ষা বাহাতে রোগ না হয়, সেই চেষ্টা করাই সমীচীন। প্রথান প্রণাম যোগের বীজাণুগুলি কি উপায়ে মানবদেহে সংক্রামিত হয় এবং কেমন করিয়াই বা আমরা তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বর্তমান কালে এতদেখে যে সকল ব্যাধি শিবির সংস্থাপিত করিয়া আমাদের সহিত সময়ে জয়লাভ করিতেছে, ম্যালেরিয়া আরই তন্মধ্যে অগ্র-গণ্য। পূর্বকালে এই দেশে এই জনপদধ্বংসকারী ব্যাধি স্থায়িতাবে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। পাশ্চাত্য প্রদেশে দক্ষিণ আমেরিকার আমেজান ও আফ্রিকার অরোজ নদীর উভয় তুলবর্তী ভূখণ্ডে এবং ইটালির ক্যাম্প্যানা নদীর জলাভূমিতে অনেক দিন হইতে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের কথা শুনা যায়। এক সময়ে লতুন নগরেও ইহার প্রভাব কম ছিল না। বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বপ্রথমে বশোহরে আরম্ভ হইয়া ইহা ক্রমশঃ সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়। বশোহর জিলার অন্তর্গত মহম্মদপুর নামক গ্রামে এই রোগ সর্ব প্রথমে প্রকাশ পায়। এখন বঙ্গের সমস্ত জিলাতেই ইহার সমান প্রভাব। ইহার উৎপাতে সুজলা, সুরফলা, শস্যভ্রামলা বঙ্গজননীর সমস্ত সম্ভতিগণ জীর্ণ শীর্ণ ও ককালসার হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর সে পুট দেহ, তুট মন আর নাই। সেই বলবৃদ্ধ পদবিক্ষেপের স্থানে এখন তাহার অতি কষ্টে দেহভার বহন করিয়া ক্লান্তপথে বিচরণ করিতেছে। এই বিষম ব্যাধির আণিজন-ভয়ে ভীত হইয়া লক্ষ্যের বস্তুপ্রদর্শন বাস্তবিকতা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রাণে দেশের অসুখ আরও ভীষণ হইতেছে। ভীষণ অরণ্যানীর মধ্যে এখন তাঁহাদের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাশ্রেণীর শোচনীয় পত্নিগণ দর্শন করিলে অজ্ঞ সন্মরণ করা যায় না। যে ছত্র ব্যাধি বাঙ্গলার

জনগণসকলকে বিধ্বস্ত করিতেছে, তাহার নিদানসম্বন্ধে অনেক অনেক কথাই বলিয়াছেন। পূর্ববর্তী মনীষিগণের মতে জলাভূমিতে লতাভ্রামি পচিয়া যে বিষ-বাম্প উৎপন্ন হয়, তাহাই ম্যালেরিয়ার কারণ। কেহ কেহ বলিতেন, বিগলিত উদ্ভিদ হইতেই এই রোগবীজাণুর জন্ম হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ক্রাসৌ দৈনিকমলের ডাক্তার গ্যাতেলান্ এই রোগের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, এক প্রকার জীবাণুই এই রোগের জনপ্রিয়তা। সেই জীবাণু “এনোফিলিস” (Anopheles) নামক এক জাতীয় মশকের দ্বারা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। মানসন এই অনুমান করেন এবং ডাঃ রস ইহা সপ্রমাণ করেন। সাধারণ মশক হইতে “এনোফিলিস” মশার অনেক পার্থক্য আছে। ইহাদের হলের উত্তর পাখে দুইটি তড়ু এবং পক্ষেপরি ছিট্-ছিট্ যেতরফ চিহ্ন দেখা যায়। এই প্রেয়ীর মশা গৃহভিত্তিতে কখনই সোজা হইয়া বসিতে পারে না। “এনো-ফিলিস” মশক রোগীর দেহে হল বিদ্ধ করিয়া রক্তগ্ৰাসনকালে রোগজীবাণু বীর উদরমধ্যে টানিয়া লয়। রক্ত পচিত হয়; কিন্তু কয়েক দিনস পরে মশকের দেহান্তান্তরে ঐ জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। ক্রমে মশকের লালার সেই রোগবীজাণু আলোর গ্রহণ করে। এই অবস্থায় যদি ঐ মশক কোনও পুত্র দেহীকে মংশন করে, তবে সে নিজ দেহস্থ জীবাণু দত্ত ব্যক্তির রক্তে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। রস এই সকল তথ্য সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছেন (১৮৯৭)। সেই কারণেই যে স্থানে বন-জঙ্গল অধিক এবং জল-নিকাশের উত্তর বন্দোবস্ত নাই তথায়ই এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাই। যে সকল শহরে বন বাগান নাই এবং জনবিস্তারের জন্য উত্তম পরঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা আছে, তথায় ম্যালেরিয়া বিরল। যে “প্রাসাদ-নগর” কলিকাতা এখন রাজশা দেশের সর্বাঙ্গেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান, এক দিন তথায়ও এই প্রকার জ্বরের বড়ই আধিপত্য ছিল। লোক ঐ জ্বরকে তখন “পাকা জ্বর” বলিত। কোন কোন বৎসর বর্ষাকালে এই জ্বরে শুধাকার দুরোপীর অধিবাসিবর্গের তিনভাগ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। যে একভাগ জীবিত থাকিত, তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিরাছে বলিয়া প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে একটি আনন্দ-তোজের অনুষ্ঠান করিত। কলিকাতার তখন বন, জঙ্গল, জলাভূমি, মশক এ সকলে কিছুরই অপ্রাচুর্য ছিল না। “রাতে মশা, দিনে মাহি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি।”

ম্যালেরিয়াসীবাণু মনুষ্যরক্তে মশক কর্তৃক প্রবেশিত হইয়া বংশবৃদ্ধি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নষ্ট করিয়া ফেলে । এই রক্তদোষই ম্যালেরিয়া জ্বরের বিপদের হেতু । নানা, নর্দাখা, খানা, ডোবাগুলি এনোফিলিস মশকের জন্মস্থান । বর্ষাঋতুতে বঙ্গদেশীয়স্থ যে ম্যালেরিয়া জ্বরের আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ, এই সময়ে খানা, ডোবা জলপূর্ণ হওয়ায় মশকরা ডিম পাড়িবার সুবিধা পায় ; ঐ ডিম (Larva) হইতে অসংখ্য মশকের জন্ম হয় । ইহা হইলে জলের পোকা ।

ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে আশ্রয়লাভ করিতে হইলে বাহ্যতে স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয় এবং এনোফিলিস, মশকে দংশন করিতে না পারে তথিথয়ে লক্ষ্য রাখাই প্রদান কর্য্য । ডাক্তার রস বলেন, মশককুল ধ্বংস করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়া দূরীভূত হয় । পূর্বকালে আফ্রিকার এক জনগণে ম্যালেরিয়ার বড়ই আধিপত্য ছিল । অনেক ষেতাজ পুত্রকে কন্যাপক্ষে ঐ স্থানে গিয়া অল্পকালমধ্যেই পক্ষ প্রাপ্ত হইতেন । এই জন্য ঐ স্থানকে লোক ষেত মল্লব্যের গোত্রস্থান বলিত । এক্ষণে তথায় ম্যালেরিয়া নাই বলিলেই হয় । ইহার কারণ অল্পসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, ঐ স্থানে আর মশক নাই । ম্যালেরিয়াযুক্ত প্রদেশে নীতবাস্তবসমাকুল স্থানে অথবা আর্দ্র ভূমিতে শয়ন করা বিবেক নহে । ষাট বা পঁচাত্তরশরি শয়নস্থান নির্দেশ করিবে । এনোফিলিস জাতীয় মশকগণ প্রায়শঃ দিবাতাগে দংশন করে না ; সুতরাং রাত্রিকালে মশারি ব্যবহার ও আশ্রয়লাভ পরিধান করিয়া মশকের দংশন হইতে আশ্রয়লাভ করিতে সচেষ্ট থাকিবে । বাসগৃহগুলি বাহ্যতে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকে এবং উহাদের মধ্যে বাতালোক সমানভাবে প্রবেশ করিতে পারে, তথিথয়ে বস্ত্রবাস হইতে হইবে । বাতালোকবিহীন গৃহে বাস করিলে কখনই স্বাস্থ্য ভাল থাকে না ; বরং তথায় মশকের বাসস্থান হয় । আকিনা ও বাস-ভগনের পার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহে বন-জঙ্গল হইতে দেওয়া অশুচিত । বাড়ীর জল বাহ্যতে সহজেই নিকাশ হয়, তাহার সুব্যবস্থা করিবে । তত্ত্বাসনের মিকটবর্তী স্থানে খানা, ডোবা থাকিলে বর্ষাঋতুতে পূর্বেই উহাদিগকে ভগাট, কড়া কর্তব্য । বাড়ীর সারিবে বাহ্যতে এক বিশু জলও কোন স্থানে জমিতে না পারে তথিথয়ে খর চুষ্টি রাখিতে হইবে । অনেক বলিয়া থাকেন, এই সকল নিয়ম পালন করা বচন্যসম্বাদ্য ; কিন্তু আমি বলি, তাহা নহে । অটোলিকাবাসী ও

কুটীরবাসী সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ গৃহ স্বাস্থ্যোপযোগী করিয়া রাখিতে পারেন। আমরা বাহিরে লম্বাটপটারত বায়ু সাজিয়া বেড়াইয়া থাকি ; কিন্তু ঘরে আসিয়া দেওয়ালের পায়ে ও বাটের পায়ে কফ, কাশ ফেলিতে ক্রটি করি না। আমাদের বাহিরের বৈঠকখানা ঝড়, বেগ প্রভৃতি বহুবিধ আলোকাধারে সজ্জিত ; কিন্তু গ্রাম্যবহের পার্শ্বস্থিত জলনালী ভাত, ফেন ও কবলীপত্রাদিযাত্রা আবদ্ধ।

অবস্থাবৈগুণ্যেহেতু ঝানা ডোবা ভরাট করিতে অসমর্থ হইলে বর্ষাকালে মগো মগো উহাদের জলে কিছু কিছু কেরোসিন তৈল নিক্ষেপ করিলে অতীষ্ট কতক পরিমাণে নিব্ব হইতে পারে। ইহার দ্বারা মশকের ডিমগুলি (Larva) বিনষ্ট হয়। ডাক্তার দ্বারা কৈলাসচন্দ্র বসু বাহাদুর বলেন, বাকসের কাঁচা পাতা জলে ডুবাইয়া রাখিলে মশক-ডিম ধ্বংস হয়। পল্লীবাসিগণ এই অন্যায়সামান্য উপায় ইচ্ছা করিলেই অবলম্বন করিতে পারেন।

পল্লীগ্রামে দেখিতে পাই, গৃহস্থগণ বাসগৃহের সম্মুখেই আঁতাহুড় করিয়া রাখেন ; ঐ স্থানে আবর্জনাাদি নিক্ষেপ ও আবদ্ধক হইলে মলমূত্রত্যাগও করা হয়। কাহার কাহার গৃহপ্রাকণের মগো গোময়গুপ পতিতে থাকে। এই সকল পুতিগছময় স্থানে রাশি রাশি মক্ষিকা প্রাচুর্য্য হয়। গবেষণা-দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, একটি মক্ষিকা ২৫০ শত হইতে ৬৬০০০০ ছয়-বর্গ লক্ষ রোগবীজাণু বহন করিতে পারে। আমাদের দেশের সুদলন্দীরা সর্বদাই বলিয়া থাকেন “আচার বিচারেই লক্ষীর রূপা হয়।” এই আচার-বিচারের কথা যদি তাঁহাদের সকল সময়ে মনে থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনেক দুঃখ দূর হয়। সাধ্যকালে বাস-গৃহে ধূনা গদাভল দিয়া ভুলসী-ভণায় দীপ দেখাইলেই কেবল “আচার বিচার” হয় না। বিষ্ঠা মূত্র ও বাড়ীর আবর্জনাগুলি পরিষ্কৃত করিবার ভয়ে প্রাকণের এক পায়ে জমা করিয়া বাহিরে আচার দেখাইলে কি হইবে? আচারপ্রিয় বঙ্গজননীগণ মিথ্যাচার ত্যাগ করিয়া সদাচার শিক্ষা করিলে বঙ্গবৃহ শান্তিময় হইতে পারে।

(ক্রমঃ :)

শ্রীমুরেশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য।

বাক্সালার বিস্তার ।

সমগ্র ভারতবাসী যদি একই ভাষার ব্যবহার করে, তবে ভারতে জাতি-সংগঠন সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। কবির স্বপ্ন—

“এক জাতি এক ভাষা, এক ধর্ম এক আশা।”

সকলের ধর্ম ও আশা এক হইবার সম্ভাবনা যে নিতান্তই সুদূর-পর্যন্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমগ্র ভারতে এক ভাষার ব্যবহার ও এক লিপির প্রচলন হইলে যে, ভারতে জাতিগঠন-কার্য সহজে সুসম্পন্ন হয়, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কিছু দিন হইতে ভারতে “একলিপি বিস্তার”বিষয়ে চেষ্টা হইতেছে। বাক্সালার ঐশ্বর্য সারদাচরণ মিত্র এ কার্যে অগ্রণী; কিন্তু সে চেষ্টা দেবনাগরী অক্ষর চণনের ক্ষমতা সংপ্রতি সহযোগী ‘ইন্ডিয়ান ওয়াল্ড’ এ বিষয়ে একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি সমগ্র ভারতে বাক্সালার প্রচলনপ্ররাসী। আমরা তাহার যত্নের আলোচনা করিতেছি।

একই ভাষার ও লিপির অভাব যে ভারতে জাতিগঠনের সর্বপ্রধান অন্তরায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ দেশে একই ধর্মের প্রবর্তন বা সম্মিলিত জাতি-গঠন বর্তমানে কবিকল্পনা; সুতরাং অথ যে সকল উপায়ে ভারতে জাতিগঠন-কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, ভারতবাসী যাত্রেই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

একই সরকারের শাসন ও একই বিধি এ পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু জগতের অগ্রান্ত দেশে যে দেশবাৎসল্য বিস্তার ও বিভক্ত প্রজাপুঞ্জকে সম্মিলিত করিয়া এক জাতিতে পরিণত করিয়াছে, একই সরকারের শাসন ও একই বিধি সে দেশবাৎসল্য উৎপন্ন করিতে পারে না।

সার ঘন লিপির পুস্তক-প্রকাশ হইতে লোক যে সকল অবস্থাকে জাতিগঠনের উপাদান বিবেচনা করে, সে সকলের মধ্যে এক ধর্ম ভারতে অসম্ভব। সুদূর-তবিব্যাতে হয় ও ভারতের বিভিন্ন জাতি-সমূহ কোন প্রকার ঋতুধর্ম গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু বর্তমানে তাহার কোন সম্ভাবনাই নাই। এক ধর্ম ও বিভিন্ন বর্ণে বৈবাহিক সম্বন্ধ ভারতে অসম্ভব। সুতরাং আমাদিগকে

অবশিষ্ট উপায়ের সন্ধান করিতে হইবে। লেখক মহাশয় যে কি ক্ষমতায় ভবিষ্যতে ভারতে খৃষ্টধর্ম-বিজ্ঞৃতির সম্ভাবনার কথা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না। এ বিষয়ে তিনি কোন যুক্তিরও অবতারণা করেন নাই।

তবে এ দেশে জাতি-গঠনের এক উপায় আছে। দেশের লোক যদি একই ভাষায় ভাষা প্রকাশ করে—রচনায় ও কথায় একই ভাষার ব্যবহার করে, তবে জাতিগঠনের অনেক অস্ত্রাদি অস্ত্রের দূর হইয়া যায়। এ কার্য্য কষ্টসাধ্য ও সময়সাধ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু অসম্ভব নহে। ভারতের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোন কালে দেশে একই ভাষায় ও একই লিপির ব্যবহার ছিল না। এককালে সংস্কৃত ও এক সময় পালি বিশেষ প্রচলিত ছিল সত্য; কিন্তু কখনই এক ভাষা বা এক লিপি সমগ্র ভারতবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত হয় নাই। তবে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। দেশের বর্তমান অবস্থা জাতিগঠনের পক্ষে যত অসুস্থ, স্বাভাবিক কালে দেশের অবস্থা জাতিগঠনের পক্ষে তত অসুস্থ ছিল না। তখন দেশে পথ স্মৃগম ছিল না—পথের আধিকাংশ ছিল না। তখন ভারতবর্ষ বহু স্বতন্ত্রাঙ্গের সমষ্টি। একাতপত্র্য তখন কথার কথা। কালিদাসের বর্ণনায় দিলীপ “একাতপত্র্য জগতঃ প্রভুঃ” সন্তোষ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র রঘুকেই সিংহাসনে আরোহণের পর দিগ্বিজয়-যাত্রা করিতে হইয়াছিল। যিনি ভারতের একমাত্র নৃপতি, তাঁহাকে আবার দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিতে হয় কেন? সে দিগ্বিজয়ও যুদ্ধসাপেক্ষ হইয়াছিল। আবার বিজিত নৃপতিদের “উৎখাত-প্রতিরোপিত” হইয়া স্ব স্ব রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তখন দেশে বহু বনভূমি—নদীসকল পার হওয়া দুঃসাধ্য। যখন মুসলমান এ দেশে দেখা দেন,—তখনও দেশের দুর্গমতাই বহু দিন বহু স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক-দ্বিগকে স্বাধীনতা-সংরক্ষণে সফলপ্রযত্ন করিয়াছিল। এখন দেশের সে অবস্থা পরিবর্তিত। এখন দেশে বহু রাজপথ গঠিত ও বহু সেতু নির্মিত হইয়াছে। বাণ ও দামিনী দূরত্ব দূর কারণে সমর্থ হইয়াছে। সমগ্র দেশ একই শাসন-পঞ্জির প্রভাবে—একই বিধির বিধানে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহারই মধ্যে রাজত্বাধী ইংরাজীর প্রচলন এত অধিক হইয়াছে যে, তাহারই সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন, প্রদেশবাসিগণের মধ্যে মতের ও ভাবের আদান-প্রদান, আন্দোলন-আলোচনা সম্ভব হইয়াছে। সভ্য-সমিতিতে এখন ইংরাজীই ব্যবহৃত।

কিন্তু ইংরাজী যে কখনও দেশের নিয়ন্তরে জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করিবে, সে সম্ভাবনা অতি অল্প। ইংরাজী ভাষার প্রকৃতি, ব্যাকরণ সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের। অথচ দেশের নিয়ন্তর হইতেই জাতির শক্তি উৎপত্ত হয়। তাই যে ভাষা ভাষারা সহজে শিখিতে পারে, তাহারই প্রচলনের উপায় করিতে হইবে।

ইংরাজীকে বাঙ্গালা দিলে হিন্দুস্থানীর ও বাঙ্গালার কথাই বিচার করিতে হয়। হিন্দুস্থানী যে দক্ষিণ-ভারতে বিদ্যুতলাভ করিতে পারিবে, এমন বোধ হয় না। সে দিকে তামিল, তেলগু, কেরাটী প্রভৃতি বিবিধ ভাষা প্রচলিত। ইহাদিগের মধ্যে তামিলের সাহিত্য-সম্পদ হিন্দুস্থানীর সাহিত্য-সম্পদ অপেক্ষা কোন অংশে দীন নহে; বিশেষ তামিল সাহিত্য বহুদিনের। আর হিন্দুস্থানীতে জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক সাহিত্যের অভাব। কেবল ইহাই নহে—হিন্দুস্থানীর সহিত উর্দু, তিরোথ সর্কসই সঙ্গাক্ষ। শাক্যার ব্যাকরণের নিয়ম অতি সহজে শিখা যায়। বাঙ্গালার লক্ষ্যসত্তার ও ব্যবহার-রীতি সংস্কৃতভাষ্যগত বলিয়া ভারতের প্রায় সর্কসই সহজবোধ্য। আবার ভারতের কোন ভাষাই সাহিত্য-বিষয়ে বাঙ্গালার সমকক্ষ নহে। যথুদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বহু কবি, বঙ্কিমচন্দ্রাদি বহু ঔপন্যাসিক, কানীপ্রসাদাদি বহু সাহিত্যিক বঙ্গসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্য করিয়া সাহিত্যকে সম্পূর্ণ ও সর্কাক্ষমন্দর করিতে যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষুদ্র উন্নতিতে, বাঙ্গালা ভাষার সর্কসবঙ্গাক্ষ-কমতার বিশ্বাসী বিন্ধিত হইয়াছে। কাওয়েল বঙ্কিমচন্দ্রের ‘জুর্গেন-সন্দিনী’ পাঠ করিয়া তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু ঔপন্যাস ইংরাজীতে—‘কপালকুণ্ডলা’ জর্জাণেও অনুদিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ ইংরেপে ও আমেরিকায় অসাধারণ আদর লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী মাতৃভাষার সেবার এমনই আশ্বনিয়োগ করিয়াছে যে, বঙ্গদেশে ইংরাজী মাসিকের সংখ্যা অতি অল্প। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মত সভা ভারতের আর কোন এদেশে সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। বাঙ্গালা ভাষা আজ কেবল ভারতে নহে—সমগ্র সভ্যজগতে সমাদৃত।

এই বিষয়ে সে দিন ‘সিগমা’ ছদ্মনামে একজন লেখক ‘বেঙ্গলী’ পত্রে যে কথা লিখিয়াছেন, তাহাও প্রণয়নযোগ্য। মানজুমে ও হাজারিবাণে অদ্যাগ্যগণও অতি সহজে বাঙ্গালা শিখিয়া লয়। রাজমহল, গাঙ্গুড়, দেওবর

প্রভৃতি স্থানে অর্থাৎ সীমান্তাল পরগণার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে, পূর্ণিমা দিবার ক্রিষণগজ মহাকুমার ও মহানন্দা নদীর উত্তর কুলের লোক বাক্সলাই ব্যবহার করে। ক্রিষণগজে লোক বাক্সলা কথা কায়েতী অক্ষরে লিখিয়া থাকে। আগার বাক্সলার পূর্ব প্রান্তে—কর্ণকুমারী তীরে বাক্সলা কথা একরূপ ত্রস্ত্রী অক্ষরে লিখিত হয়; সে অক্ষরের সহিত বার্ষিক অক্ষরের সাদৃশ্য সম্পদ। আসামে পূর্বে বাক্সলাই ব্যবহৃত হইত। এখন রাজনীতিক কারণে ও বাক্সলার ঔদাত্তহেতু তাহার অল্প ভাষার ব্যবহার হইতেছে সত্য; কিন্তু বাক্সলা অক্ষরের ব্যবহারই রহিয়াছে। নেপালের ও ভারতবর্ষের ভাষার সহিতও বাক্সলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। গুটান বর্ষযাজকগণ সর্বত্র শিক্ষা-বিস্তারে সহায়তা করিয়া থাকেন। তাঁহারা দার্কিলিং প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় ভাষার শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। তাই আশঙ্কা হয়, অল্পকালমধ্যে নেপালীও বর্তমান ভাষার পরিণত হইবে। এ অবস্থায় লেখক বাক্সলার বিস্তারকল্পে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে বলেন,—(১) বাক্সলার প্রান্তে পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে ছাত্রগণ পাঠশালার বাক্সলা লিখে তাহার উপায় করা। (২) বাহারা বাক্সালী নহেন, তাঁহারা বাক্সলার প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিলে পুরস্কার দিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করা। (৩) সূত্র বাক্সলা প্রথম শিক্ষাপুস্তক বিতরণ করা। (৪) বাহারা বাক্সালী নহেন, তাঁহাদিগকে অল্পমূল্যে বাক্সলা পুস্তক, মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র প্রদান করা।

এ বিষয়ে বাক্সালীকেই উদ্বোধনী হইতে হইবে। বর্তমান সময়ে ইউরোপ বাক্সলা শিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাক্সলা সাহিত্যের সৌরভ বিদেশী সাহিত্যিকদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে। এই সময় চেষ্টা করিয়া ভারতের সর্বত্র বাক্সলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অদূর-ভবিষ্যতে বাক্সলা সমগ্র ভারতবাসীর ব্যবহৃত ভাষা হইয়া উঠিতে পারিবে। তাহাতে আমাদের জাতির যে উপকার সংসাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, বাক্সলার সাহিত্যিক ও রাজনীতিক সভাসমিতি-সমূহ—সমস্ত বাক্সালী এ বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন। •

ফরানী বিপ্লবের ইতিহাস ।

—:—:—

(ত্রয়োদশ অধ্যায় ।)

করাবাস ।

বাংলাপক্ষ সমিতির নির্দিষ্ট কাল অতীত হইয়াছে । তৎপরিবর্তে নব-সংগঠিত জাতীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে । অভিনব সমিতিগৃহে জেকবিন, গিরন্দিষ্ট ও প্লেন সম্প্রদায়ভুক্ত রাজনীতিক পুরুষগণ সভা নির্বাচিত হইয়াছেন । নীতিপার্থক্যানিবন্ধন গিরন্দিষ্ট ও জেকবিনগণের মধ্যে নিরন্তর বিবাদ চলিতেছে । গিরন্দিষ্টগণ পার্শ্ববলিসম্পন্ন জেকবিনগণের নিকট রাজনীতিক সংগ্রামে পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইতেছেন । প্লেনগণ প্রথমতঃ গিরন্দিষ্টগণের পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া পরিশেষে নির্ধাতনভয়ে জেকবিনগণের আত্মগত্যা স্বীকার করিয়াছেন । সুতরাং রাজনীতিক রঙ্গভূমিতে জেকবিনগণেরই একাধিপত্য ।

ক্রমে ক্রমে গিরন্দিষ্ট নেতৃগণের রাজনীতিক শক্তি অন্তহিত হইলে জেকবিনগণ রাজপরিবারবর্গের প্রতি রোষকষায়িত-মোহে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন । টুইলারি প্রাসাদ বিদ্রোহীদের হস্তগত হইলে দুরদৃষ্ট রাজপরিবারবর্গ টেম্পল ভবনে অবরুদ্ধ হইয়াছেন । টেম্পল ভবন প্যারিস মহানগরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত । উহার চারিদিকে অত্যাচ্ছন্ন প্রাচীর । প্রাচীরাত্যন্তরে পরস্পর সংলগ্ন দুইটি কারাগৃহ—একটি “বহনাগার” ও অপরটি “ক্ষুদ্রাগার” নামে অভিহিত । “ক্ষুদ্রাগারের” নিম্নভাগে তিনটি প্রকোষ্ঠ । রাজপরিবারবর্গ বন্দিদশাপন্ন হইয়া প্রথমতঃ “ক্ষুদ্রাগারে” প্রেরিত হইলে, প্রথম প্রকোষ্ঠটি পুস্তকাগার, দ্বিতীয়টি অভ্যর্থনাগৃহ এবং তৃতীয়টি প্রহরিগৃহরূপে নির্দিষ্ট হইল । যিভলহু স্তরহং গৃহে রাজার, রাজীর ও যুবরাজের এবং পার্শ্ব প্রকোষ্ঠে রাজভগিনীর এবং রাজকুমারীর শয়নস্থান নির্দিষ্ট হইল । দিবাভাগে রাজপরিবারবর্গ তৃত্যলহু স্তরহং গৃহে অবস্থিত করেন । পার্শ্ব ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে ক্রারি এবং হিউ নামক বিপ্লব ভৃত্যদ্বয়ের বিশ্রামের স্থান ।

ফরানীরাজ সিংহাসনচ্যুত, লালিত এবং পরিশেষে কারারুদ্ধ হইয়াছেন । শানবজ্ঞের দ্রুত আসন্নপ্রাপ্ত হইয়া তিনি সংসারের সর্বানিভূত দশা প্রাপ্ত

হইয়াছেন কিন্তু ভাষাপি তাঁহার চিত্তের প্রকৃষ্টতা বিন্দুমাত্র অন্তর্হিত হয় নাই । সর্বদা স্বজনগণের সহিত এক স্থানে অবস্থিত করিয়া, কৃত্ত ভবিষ্যত বিশ্বভিত্তিতে সমর্পণ পূর্বক তিনি অধ্যয়ন ও পুস্ত্রের অধ্যাপনা কায়ে নিযুক্ত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন । রাজী ও রাজকুমারী প্রকৃষ্টচিত্তে পরিচরিত্যর দ্বায় নিরন্তর তাঁহার শুভ্রতা ও পরিচর্যা করিতেছেন । বেলা ৯ ঘটিকার সময় রাজপরিবারবর্গ রাজ্যের একোষ্ঠে আহারাদি সমাপন পূর্বক ১ ঘটিকাকালে সম্মিলিত উদ্যানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ভ্রমণ করেন । সন্ধ্যা সমাগমে রাজা পরিবারবর্গলীপরিবৃত হইয়া ইতিহাসাদি গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন । ইংলণ্ডের প্রথম চালসের বিধানময় পরিণাম ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তিনি খ্রীঃ পরিণামের নিমিত্ত চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছেন ।

কিয়দ্বিধ পরে মিউনিসিপালিটির কর্মচারিগণ রাজপরিবারবর্গের প্রতি অশেষবিধ নির্যাতন আরম্ভ করিল । তাহার সর্বদা তাঁহাদের কার্যকলাপ পরিদর্শন এবং কারাগৃহের সর্বত্র গগনগমন পূর্বক ঘোর অশান্তি উৎপাদিত করিল । কারাগৃহের নিম্নভাগে মিউনিসিপালিটির কতৃপক্ষীয়গণের সভা বসিতে লাগিল । মসী, লেখনী, কাগজ প্রভৃতি পত্র লিখিবার সর্বপ্রকার উপদান, এমন কি, ছুরী, কাঁচি, খুঁচ প্রভৃতি জুহু জুহু বস্ত্রসমূহ পর্যন্ত রাজপরিবারবর্গের নিকট হইতে বলপূর্বক গৃহীত হইল । অনন্তর ২২শে সেপ্টেম্বর (১৭৯২ খৃঃ) মিউনিসিপালিটির নির্যাতন চরম সীমায় উপনীত হইল ! রাজা ও রাজপুত্র পরিবারবর্গ হইতে বিভিন্ন হইয়া “ব্রহ্মদাগরে” প্রেরিত হইলেন । রাজী, রাজকুমারী ও রাজভগিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন । কিন্তু সে রোদন অরণ্যে রোদন যাত্র—জেকবিনগণের পাবাণ-ভবর তাহাতে প্রবীভূত হইবার নহে । কিয়দ্বিধ পরে রাজা ও রাজপুত্র পরিবারবর্গের সহিত একত্রে ভোজন করিবার অহুমতি পাইলেন । বলা বাহুল্য যে, তাহাতে রাজপরিবারবর্গ কৃতার্থ হইলেন । কিন্তু ভোজনকালে ভোজন করিবেন কি ? অশ্রুপাত করিতে করিতেই তাঁহাদের ভোজনের নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল ।

অনন্তর রাজতন্ত্রের অস্তোষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত বৃশংস জেকবিনগণ অপরিমিত উত্তম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন । পারিঃ সের রাজনীতিক সভাসমূহ এবং সংঘাতীত সংবাদপত্র কারাবাসী ফরাসী-

রাজের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিল। প্রতিদিন সমিতিগৃহে তৎপ্রসঙ্গে বহুলখ্যক আবেদনপত্র গৃহীত হইতে লাগিল। লোকবিনগণ সমিতিগৃহে ফরাসীরাজের বিরুদ্ধে অশেষবিধ অভিযোগ উত্থাপিত করিলেন। তখন সমিতি অনন্তোপায় হইয়া কারাবাসী ভূপতিকে সভাগণসমক্ষে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

এক দিবস ফরাসীরাজ পুত্রের অধ্যাপনাকার্য্যে নিযুক্ত। অকস্মৎ জাতীয় সমিতির কর্মচারিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল, “রাজপুত্রকে তাঁহার জননীর নিকট প্রেরণের নিমিত্ত সমিতি আদেশ করিয়াছেন।” রাজা সজল-নয়নে পুত্রকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে বিদায় প্রদান করিলেন। অনন্তর বেলা ১ ঘটিকাকালে প্যারিস মিউনিসিপালিটির অধ্যক্ষ রাজসমীপে আসিয়া জাতীয় সমিতির প্রাণকৃত্ত আদেশ পাঠ করিলেন। তদুত্তরে রাজা বলিলেন, “এ কয় ঘণ্টা পুত্র আমার নিকটে থাকিলেই ভাল হইত। বাহা হউক, চলুন, আমি আপনাদিগের সহিত সমিতি-গৃহে গমন করিতেছি। আমার প্রতি সমিতির আদেশ প্রচার করিবার অধিকার নাই, তবে বল-প্রয়োগ করিবার শক্তি আছে।” এই বলিয়া তিনি অধ্যক্ষের সমতিব্যা-হারে সমিতির গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তদ্ব্যতীত অবগত হইয়া পরি-বারবর্গ হাহাকার রবে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। রাজার আসন্নকাল সমাগত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিতে কাহারও বিলম্ব হইল না। রাজভগিনী রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—“রাজী ও আমি পরিণামের নিমিত্ত প্রস্তুত হইরাছি। রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি সান্তিপদ্য অহুগ্রাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। সিংহাসনে আরুঢ় হইয়া এ যাবৎ তাহাদের কল্যাণের নিমিত্ত অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। প্রজাগণের প্রতি সেই অকৃত্রিম অহুগ্রাগ প্রদর্শনই সঙ্গীনাশের মূল। ফরাসী জাতির প্রতি এরূপ প্রতারণা কে করিল? হে ভগবন্! এ শব্দে রাজাকে শক্তিমান কর।” অনন্তর তিনি বিবস্ত্র ভূতা ক্লারিকে বলিলেন,—“ক্লারি! যে কয় দিবস অগ্রজ জীবিত থাকেন, তুমি সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিও। বর্ত্তমানে তুমি ভিন্ন আমাদের আত্মীয় কেহই নাই।”

বর্ত্তমান জাতীয় সমিতির সভাপতি গিরদিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত মহাহুতব-বারি। বাহির রাজপরিবারবর্গের প্রতি অকৃত্রিম অহুগ্রাগ। কিং তিনি কি করিবেন? সমিতি-গৃহে গিরদিত্তগণের সংখ্যা অধিক হইলেও তাঁহার

ক্ষেত্রবিশেষের পাশবশাক্তর মায়ায় মুক্ত হইয়া কর্তব্যসম্পাদনে পরাভূত হইয়াছেন। তথাপি সভাপতিশ্রবর সমিতির মর্যাদাংকাকল্পে সভাগণকে সন্বেদন করিয়া বলিলেন :—

“ফরাসী জাতির প্রতিনিধিগণ, আপনারা অত্র একটি জাতীয় অধিকার পরিচালন করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন। অত্রকার কার্যকলাপের নিমিত্ত আপনারা সমগ্র ফরাসী জাতির নিকট দায়ী। সমগ্র হুগোপ আপনাদের কার্যাবশ্যীর প্রতি চাহিয়া আছে। ইতিহাস আপনাদের ক্রিয়াকলাপ অমর অকরে লিপিবদ্ধ করিবে। পুত্র-পৌত্রাদিগণ এবং তাহাদের সম্ভান-সন্ততি আপনাদের কার্য তীব্রভাবে সমালোচনা করিবে। সেই জ্ঞত বলি, আপনারা উচ্চাসনের মর্যাদা-সংরক্ষণ-পূরক কার্য করিতে ক্রটি করিবেন না। স্বরণ করিয়া দেখুন, তেরিনিছ নগর হইতে রাজপরিবারবর্গ দ্রুত হইয়া তদানীন্তন সমিতি-গৃহে আনীত হইলে, সভাগণ নীরবে কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাজকুলের বিচারকার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে বীর ও প্রশান্ত ভাবে কার্য করা কর্তব্য।”

অনন্তর কাগাবাসী ফরাসীরাজ সমিতি-গৃহে আনীত হইলে সভাপতি মহোদয় তাঁহাকে সন্বেদন করিয়া বলিলেন :—

“দুই, ফরাসীজাতি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছে; অভিযোগের বিবরণ এইকণ পঠিত হইবে। আপনি আসন-গ্রহণ-পূরক ভ্রমণ করুন।”

রাজা আসন গ্রহণ করিলে সমিতির জনৈক কর্তব্যস্বী অভিযোগের সবি-তার বিবরণ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্বোধে দুইটির মর্মে নিরে প্রদত্ত হইল।—

(১) ফরাসী দেশের নবপ্রতিষ্ঠিত শাসনসমিতির ধ্বংসসাধন পূরক বদৃচ্ছ শাসনের প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজা সপরিবারে তেরিনিছ নগরে পলায়ন করিয়াছিলেন।

(২) বিগত ১০ই আগষ্ট তিনি (রাজসৈন্তের সাহায্যে) ফরাসী জাতির শোণিতপাত করিয়াছিলেন।

অভিযোগের বিবরণ পঠিত হইলে রাজা উত্তর করিলেন, “তেরিনিছ গমনপ্রসঙ্গে আমি তদানীন্তন জাতীয় সমিতিসমক্ষে অভিযুক্ত হইয়াছিলাম, সমিতি আমার অপরাধবীনতা অবধারণ পূরক আমাকে অব্যাহতি

দান করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎপ্রসঙ্গে পুনর্বার অভিযোগ দ্বার ৩
 যুক্তির বহির্ভূত।" দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে তিনি বলিলেন, "ফরাসী
 জাতির শোণিতপাত আমি করি নাই।" অস্ত্রাস্ত্র অভিযোগসম্বন্ধেও
 তিনি স্বীয় মর্যাদাসম্বন্ধে পূর্বক এরূপ সরল ভাবে উত্তর করিলেন
 যে, বহুসংখ্যক সন্ত্যের ছন্দর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। লোকবিনগণের
 সর্ব্ব চেষ্টা। বিকল হইবার উপক্রম দৃষ্টে ঐহারা বৈখ্যাবলম্বনে অসমর্থ
 হইয়া সেই দিবস রজনীযোগেই রাজাকে পার্শ্বব বন্ধন হইতে মুক্তি
 প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পিতৃন্দ্রিষ্টে সত্যগণ তাহাতে অসম্মত
 হইয়া বিচারপদ্ধতি অনুসরণ পূর্ব্বক রাজাকে ব্যবহারশাস্ত্রজ ব্যক্তিগণের
 সাহায্য প্রদান করিয়া তদ্বিক্রমে অভিযোগ প্রবণ করা কর্তব্য, এই মর্মে
 মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। এইরূপে হতভাগ্য ভূপতি কয়েক দিবসের
 মিমিত্ত নির্যাতন হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পুনর্বার টেম্পলভবনে প্রেরিত
 হইলেন।

(ক্রমশঃ)

ঐহুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ।

বাসনা ।

(৮কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরাজী কবিতা হইতে)

আমি যদি হইতাম আভা গোলাপের

লাবণ্য এনেছে যাহা কপোলে তোমারি ;—

কি ঈলিত ভাগ্য আহা হইত আমার

কি সুখ হইত যম, অগ্নি স্নানকারি ।

আমি যদি হইতাম হাসিটির মত

ভাসে যা' প্রবালরক্ত ওঠেতো তোমার ;

মৃদল মধুর বাহে কিরণসম্পাত

জাগায় কবির হৃদে আনন্দ অপার ।

আমি যদি হইতাম শলয়-বাতাশ
 চুমিতাম তব মুখ বেশিতাম বিরি' ;
 পড়িত যখন তব বিরহের শাস
 চুরী করি লইতাম মাদুরী তাহারি ।
 আমি যদি হইতাম পবিত্র স্ত্রীতা,
 বিরাজিত যাহা তব বক্ষ-পীনতার ;
 আনিতাম অন্য হৃদে যোর উন্নততা,
 রহিতাম নিরাপদে তোমার ছায়ার ।
 আমি যদি হইতাম চন্দের কিরণ,
 তব দৃষ্টি যোর প্রতি নিতে আকর্ষণ ;
 আমি যদি হইতাম প্রেমেবর নপন,
 তব হৃদে প্রীতি-চিন্তা দিতে আগাইয়া ।
 না, না, না ; চাহি না আমি হইতে এ সব,
 চাহি না হইতে জড় চেতনা-বিহীন ;
 গাহিব কেমনে তবে যশোগীতি তব,
 কীর্তিব চরিত্র তব পুত্র অমলিন ।
 চাহি আমি হইবারে বর্গের কিরণ,
 বরি জ্যোতির্ধর বেহ কীর্তিব ভুবনে ;
 পবিত্র চরিত্র তব—সুধমা সুন্দর,
 অবর অক্ষতপূর্ণ স্বরগের গানে ।

সঙ্গীত-মাহাত্ম্য ও সঙ্গীত আলোচনার উপকারিতা ।

(২)

গোপাললাল ও বরজুর পরে তানসেন জয়গ্রহণ করেন । তিনি সনাতন ধর্ম্ম লইয়া জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিষ্ঠাবান্ ও সংশ্লিষ্ট হিন্দু ছিলেন । হসেনী নাস্তী জনৈক মুসলমান-রমণীর সঙ্গীত-প্রভাবে তানসেন এতদূর মোহিত হইয়া পড়েন যে, মোহবশে আভিজাত্যভিমাণে জলাঞ্জলি দিয়া অবশেষে উক্ত হোসেনীকে বিবাহ করেন । কথিত আছে, এক সময় তানসেন দীপকরাগের পূর্ব বিকাশ করিতে গিয়া রাগের তেজঃপ্রভায় ভস্মীভূত হইয়াছিলেন । তাহার কস্তার পিতার আসন্ন বিপদবার্তা জ্ঞাত হইয়া মল্লারাগপ্রভাবে বৃষ্টি আনিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার পুর্বেই তানসেনের নখর দেহ ভষ্মে পরিণত হইয়াছিল । শুনা যায়, উপরোক্ত সুগায়িকা হসেনী গোয়ালিরের মহারাজ মানসিংহের প্রিয়তমা মহিষীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন । এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, বর্ষশ্রমপূরণ মহারাজ মানসিংহের পত্নী নিষ্ঠাবতী হিন্দুরমণী হইয়াও ভগিনীস্নেহনির্জিন্মেণে সঙ্গীতপ্রিয়া যবনী হসেনীকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে কোনরূপ কুষ্ঠা বোধ করেন নাই । পরম ভক্ত রামপ্রসাদ সঙ্গীত-প্রবাহের মধ্য দিয়া জগন্মাতার উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, ইহা সকলেই অবগত আছেন । কবির, নানক, ভুলসীদাস প্রভৃতি সাধকরা সাধন-সঙ্গীত-দ্বারা আরাধ্য দেবতার গুণকীর্তন ও উপাসনা করিয়া জ্ঞাতব্য পরম পদ লাভ করিয়া গিয়াছেন । পুণাত্মি ভারতবর্ষেই বহু সাধক সঙ্গীত-প্রভাবে মোক্ষ লাভ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । বর্গীর রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালদ্বারা অনুদিত ‘কাশীখণ্ড’ হইতে যে কয়েক ছত্র নিয়ে উদ্ধৃত হইল, তাহাতে সঙ্গীতসম্বন্ধে আগ্রহমানকালপ্রচলিত লোকবিশ্বাস কিন্তুপ ছিল, তাহারও পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

“গানের মহিমা সীমা কে বলিতে পারে,

শিখ বিনা নাগবেত্তা নাহিক সংসারে ।

গানবিদ্যা-প্রভাবে নারদ মুনিবর

ঐকুণ্ঠে সম্মান পান—তুই যথেষ্ট ।

ভুৎসু নারদ এই দুই মুনিবর
 হরিহরস্বক গান করে নিরন্তর।
 গান বাদ্য ফলে মোক্ষ—না হয় অন্যথা
 অথবা বসতি করে শিব বিষ্ণু যথা।

উপগোক্ত বর্ণনায় ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সঙ্গীত-প্রভাবে মোক্ষ লাভ হইতে পারে; ইহা লেখকের মনগড়া কথা নহে, ভারতেরই অধি-মজ্জাগত বিশ্বাস। অমর জগতে মোক্ষ অপেক্ষা বাহ্যবীৰ্য্য সামগ্রী আর কি হইতে পারে? প্রকৃতই দেখা যায়, বহু মনীষী সঙ্গীতকে শান্তি-সুখের আকর ভাষিয়া ইহাতেই সমাধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। অতএব বলিতে হয়, লবণের স্নিগ্ধ কিরণপ্রসারণের জায় শান্তিপ্রদ, কল্পনাভীত অমরাবতী-বাগমুখসন্তোষের ন্যায় আনন্দদায়ক, যোগীজনের ঈশ্বিত সাধনার অমৃত-ময় ফলভোগের ন্যায় বাহ্যিক ফলরূপ সঙ্গীতসেবা কেবল প্রত্যেক ভারত-সন্তানেরই কর্তব্য কেন, প্রত্যেক মহুধোরই একান্ত কর্তব্য।

ইংলণ্ড, ইটালী, ফ্রান্স, আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীতের যথেষ্ট সমাদর। প্রত্যেক দেশের বালকবালিকারা পৰ্য্যাপ্ত বিশেষরূপে সঙ্গীতপ্রিয় ও সঙ্গীত প্রবণে সদাই ইচ্ছুক। কবি শোপ বলিয়া গিয়া ছেন,—What can a boy learn sooner than a song? সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণ রাজা, মহারাজ, ভূম্যধিকারী, জমীদার প্রভৃতি মহা বনশালী ব্যক্তিগণ হইতেও সমাদর লাভ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সঙ্গীতবেত্তাদিগের সুবিনিম্বিত অমৃতবর মধুর তানে ভাসমান হইবার জন্য সদাই লালায়িত হইতেন।

সেক্সপিয়ার বলেন, তাহার জন্মের সঙ্গীত-রস নাই, তাহার জন্মের মারকীর কালিমায় পূর্ণ, তাহাকে একেবারেই বিশ্বাস করিতে মাই। সকলে এতদূর ব্যক্তিকে নরাধম বলেন। কিন্তু আমরা তাহাকে পশুরও অধম বলি; কারণ, পশুসঙ্গীতও সঙ্গীতের জুযুগ্ম প্রভাব অমৃতত্ব করিতে সমর্থ; আর জীব-প্রের্ত হইয়া যে মহুধা তাহার রস-গ্রহণে অক্ষম, তাহাকে পশু অপেক্ষা নিকটই না বলিয়া আর কি বলিব?

যদিও আমাদের পুরাতন ইতিহাস বিক্ষিপ্ত ও লুপ্তপ্রায়, তথাপি যাহা কিছু বর্তমান আছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে চারণ

কবিরা পুরাতন কীর্তিগাথা গাহিয়া ভারতের পৌরব সর্বসমক্ষে ঘোষিত করিতেন । ভারতীয় রাজত্ববর্ষ ও এমন কি, মুসলমান সম্রাটরাও, নিজ নিজ সভার শোভাবর্ধনের ও চিত্তবিদোহনের নিমিত্ত অন্ততঃ দুই একটি গায়ক ও বাদক অতি যত্ন সহকারে ও সমাদরে আশ্রয়ে রাখিতেন । পৌরাণিক যুগেও সঙ্গীতশাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল । কিন্তু কুরুক্ষেত্রের হুড়ের পর অপরাপর কলাবিদ্যার সহিত সঙ্গীতেরও অধঃপতন হয় । সেই জন্যই প্রাচীন গীতানি অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । যেমন মহারাষ্ট্রাধিপাণ্ডুর বিক্রমাদিত্যের সময় সংকৃত সাহিত্যের পুনরুত্থার হইয়াছিল, সেইরূপ সম্রাট আকবর সাহের রাজশাসনকালে স্বর্ণজয়ী সঙ্গীতওরূপণ বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন ও কতক সফলকামও হইয়াছেন ।

আমাদিগের জনয়িত্রী ভারতভূমি সঙ্গীতের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং আবহমান কাল হইতে চিরচরিত্ত প্রথাভূসারে সঙ্গীতপ্রভার ও প্রতিভার অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন । কিন্তু আজ সঙ্গীতের আর সে মান নাই, আলোচনা নাই, প্রতিষ্ঠা নাই, সমাদর নাই ; এমন কি, যে করুণ মাত্র অবশিষ্ট সঙ্গীতসেবক আছে, কেহই আর তাঁহাদিগের সহিত প্ৰকৃত সৎসাহিত্যিক প্রকাশ করেন না, তাঁহাদিগের মর্যাদা রাখেন না বা তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন না ।

কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের সঙ্গীতসমাজের ও মহাবিদ্যালয়াদির কথা যখনই আমার মনে উদ্ভিত হয়, যন তখনই যেন এক অনির্ক-চনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠে ।

ভগবানের নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করি, যেন ছুত্র সঙ্গীতসমাজ ও বিদ্যালয়গুলি অচিরে বিশাল বিটপিধূপে পরিণত হয় । -

ত্রিনেপালচন্দ্র রায় ।

ਸੰਖੇਪ ।

विनिष ।

ইংরাজসমাজে বৈরথ বৃদ্ধি ।

ইই ইতিহাস কোম্পানীর পুরাতন কাগজপত্র (Records) পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৎকালপ্রচলিত অনেক গ্রন্থ একত্রে একত্রবারে লোণ পাইয়াছে। এই পুস্ত্র গ্রন্থ সকলের মধ্যে বৈরথ সুদ্ধ অন্যতম। তখন হুরোগীয়াদিগের—বিশেষ হুরোগীয়া সৈনিকদিগের মধ্যে মনের বিষয়ে কোনও গ্রন্থ উপাধিত হইলে বৈরথ সুদ্ধভাষাই তাহার মীমাংসা হইত। যদিও গ্রন্থবস্ত: কানী ও কার্ণাণন্য বৈরথ সুদ্ধে অগ্রণী ছিলেন এবং ইংরাজ জাতির নিকট উহা দৃশ্য বলিয়া উপহসিত হইত, তথাপি পত্ন পত্নীতে ইংলেতে উহার অত্যন্ত প্রভুত্ব সেবা দিয়াছিল। ভারতে যে সকল বৈরথ সুদ্ধ হইয়াছিল, বহু উজ্জদহ কর্তৃক তাহা সে সকলে বোগদান করায় সেগুলি বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। পুরাতন কাগজ-পত্রে এরূপ বহু ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় ও জানা যায় যে, যখন উহা নিবারণের চেষ্টা করা করা হয়, তখন চতুর্দিক হইতে—বিশেষত: সেনাবিভাগ হইতে বোর প্রতিবাদ উদ্ভিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংলেতে এই কন্যা প্রচারোদের নিমিত্ত এক সমিতি সংস্থাপিত হয়। ই সমিতি মহামানী ডিক্টোয়ারায় নিকটে এক আবেদন প্রেরণ করিয়া তাঁহার সম্মতি প্রাপ্যতার উহার লোণের চেষ্টা অনুমত করেন। তাঁহাদিগের চেষ্টাতেই ভারতে সেনাবলের আপত্তি সংঘেত এই আধার লোণ হয়।

কোম্পানীর পুরাতন কাগজ বাতীত গত শতাব্দীর পুরাতন সংবাদপত্র পাঠ্য করিলেও বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বিবরণ জানা যায়। নিম্নলিখিত ঘটনা 'কোমপ সংবাদপত্র' হইতে গৃহীত হইয়াছে। সরকারের কলিকাতা গেজেটে মেজর ব্রাউনের নামে প্রাদিকর করা বাহির হস্তপ্রাপ্ত তিনি তৎকালীন অস্বাস্থ্য শর্তের সার জন ম্যাক্‌ডারমস্টকে তৎসম্বন্ধে দাখী বলিয়া বৈরধ হুজে আস্থান করেন। কোম্পানীর যে সকল কাগজ পত্রে এই বিবরণের উল্লেখ আছে তাহাতে লিখিত দেখা যায় যে, এইরূপ ভাবে সামান্য কর্তৃত্বারমিণের দ্বারা সাদৃ জন ম্যাক্‌ডারমসন বা তৎসুল্য উচ্চপদস্থ কর্তৃত্বারমিণের বৈরধ হুজে আছুত হস্তপ্রাপ্ত অতীব অপ্রায়। উহাতে কোম্পানীর স্বার্থহানি ঘটিতে পারে। তদ্বাতীত বহন উচ্চপদস্থ কর্তৃত্বারমণের বেজ্ঞার বা অনবধানসূত অপ্রায় ব্যবহারে প্রতীকারের নিশ্চিত আদালত রহিয়া রহিয়াছে তখন এরূপ আস্থান গ্রাহ্য হইতে পারে না।

উন্নততম পদস্থ কর্তৃত্বাধিগণের দ্বৈরথ মুক্তের মধ্যে ওদ্বায়েণ বেষ্টিতঃ সঃ স্রাঃ সঃ সঃ
মুদ্রিতঃ প্রদানঃ ।

১৯৮০ চুটিালের ১২ই আগস্ট তারিখে হেপ্টিংস কালিসের বিরুদ্ধে একটি মামলা লিপিবদ্ধ করার ঠান্ডার সহিত সর্জন। কলহের জন্ত প্রস্তুত কালিস হেপ্টিংসকে বৈরত দুখে আত্মনপত্ত প্রেরণ করেন ও উহা গৃহীত হয়।

সত্তাটি এইরূপ—তিনি (ক্রালিস) বিশ্বাসের অধোপা। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া হইয়া আমি তাঁহার কথাই বা সত্যতার বিশ্বাস করি না। * * * তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র সত্যের ও সত্যের লেখন, উহা হইতে আমি তাঁহার রাজকাৰ্য্যসম্বন্ধীয় চরিত্র বিচার করিতেছি।

১৭ই তারিখে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ক্রালিস গুলীতে গুরুতর ভাবে আহত হইয়া ইংলণ্ডে আত্মাবর্ত্তন করেন ও ভাষার আরোপ্য লাভ করিয়া হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে লেখনী ধারণ করেন।

তৎকালীন সেনানিবাসগুলি বৈরথ যুদ্ধের অত্যন্ত অল্পকূল ছিল। সন্ধ্যাপানে উন্নত হইয়া বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া কোনও কথা বলিলে এবং অনেক সময়ে অতি সাধারণ কারণেও বৈরথ যুদ্ধ সংঘটিত হইত। সাধারণতঃ পিতল ও তরবারিধারা যুদ্ধকাণ্ড। সন্ধ্যা হইত। তখন কোনও কর্ত্তব্যের বৈরথ যুদ্ধকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিলেও কোনও যুদ্ধে আহ্বানপত্র অত্যাধিকার করা অপেক্ষা পদত্যাগও প্রেরণের বলিয়া মনে করিতেন। সেনাবিক্রমে বিশেষতঃ এমন অবস্থায় কোনও কল্পিত অপমানের নিমিত্ত বা উদ্ভ্রণ কোনও কারণে অন্ততঃ একবারও বৈরথ যুদ্ধে আহ্বানপত্র প্রাপ্ত করেন নাই, একজন কর্ত্তব্যের একজনকে হিলেন না। একজন যুদ্ধে প্রায়ই এক পক্ষ নিহত হইতেন। সেনাকলে অনেক স্থলে গুলিট্যা বা সর্দিগর্ভি সহসা মৃত্যুর কারণ বলিয়া উল্লেখিত দেখা যায়, সে সকলের অধিকাংশেরই প্রকৃত কারণ বৈরথ যুদ্ধে তেলোরের গত পতাকার বিবরণে কতিপয় সৈনিকের কাপুরুষাভিত কাব্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। খীং মল সর্ব্ব জনজির কাণ্ডের হুল নানা অনেক দুবা সৈনিক পুরুষ অস্ত্র হলে পরিবর্ত্তিত করেন। তিনি সেই মলের ‘মেনের’ অত্যধিক বার খীং বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী বলিয়া নির্ধার্য্য করিতে অসম্মত হওয়ার ‘মেনে’ যোগদান না করিবার অস্বাভি প্রার্থনা করেন। ইহাতে সেই মলের কর্ত্তব্যবিবর্ণ আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিয়া অত্যন্ত জুড় হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন যে, ‘মেনে’ যোগদান না করার অর্থই তাঁহাদিগকে অপমান করা। তাঁহারা প্রতিপোষককে আপনাদিগের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া কে যুদ্ধ করিবে স্থির করেন ও তাঁহাকে এক আহ্বান-পত্র প্রেরণ করেন। হতভাগ্য কাণ্ডের বাধ্য হইয়া সেই পত্র গ্রহণ করেন ও বলেন যে, তিনি গুলী ছুড়িবেন না। কিন্তু তাঁহার এই কথা সত্ত্বেও তাঁহার প্রতিবন্ধী তাহাকে গুলী করিয়া নিহত করে। তিনি গুলী ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু পত্র কাণ্ডের হুল মৃত্যুযুগে পতিত হইয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার বহুবর্ণ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠেন ও এই সময়ে আশ্রয়লাভে বিচলিত হয়। বসন্ত বিচারে জুরীদিগকে উৎকোচ-দ্বারা বশীভূত করার অপরাধবিবর্ণ মুক্তিলাভ করে, তাহাপি বিচারক শ্রীষ্টী তাহাদিগকে কাপুরুষ ও ঘোবী বলিয়া দ্বার প্রকাশ করেন।

কাণ্ডটি কেনইহা অপর এক ব্যক্তিকে বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান-পত্র প্রেরণাপ্রাণে ২-০-০ টাকা অর্থদণ্ড ও ২ মাস কারাবন্ড প্রাপ্ত করে। ১৮০৪ খ্রষ্টাব্দে ২৬ সংখ্যক পদাতিক মলের বেতনদাতা হেনরী ইয়ট্টইন, লেকড্যান্ট জন ইয়ট্টকে গুলারিট সীমান্তে এইরূপ যুদ্ধে

হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত হইবে। কিন্তু আঘাতকৃত দুইজনের আশানুযায়ী হইয়া ক্ষত হইতে অবরোধবোচন আশানুযায়ী কারণ বলিয়া বিবেচিত হওয়ার ও অন্ত্যস্ত কারণ থাকার তিনি মুক্তিলাভ করেন। তৎপরে বৎসরে অর্থাৎ ১৮-৯ খ্রষ্টাব্দে দুই জন সৈনিক দুইজন কোর্টে বন্দুক লইয়া বৈরথ মুক্ত করা ও উহার সাহায্য করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। বোম্বাই আদালতেও দুই ব্যক্তি বৈরথ মুক্ত হত্যাগরাধে অভিযুক্ত হয়। তাহারিা কিন্তু বিচারে মুক্তিলাভ করে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যায় যে, তৎকালে বৈরথ মুক্তের বিশেষ আদর্শাব ছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৮৪৩ খ্রষ্টাব্দে স্থাপিত সমিতির অস্তিত্ব চেষ্টার ফলে উৎসাহপ্রাপ্ত বৈরথ মুক্তের উদ্দেশ্য হয়। ১৮২৭ খ্রষ্টাব্দেও একবার সেনা-বিভাগে বৈরথ মুক্তের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার উহার প্রমাণের নিমিত্ত চেষ্টা করা হইয়াছিল। কেহ কাহাকেও এইরূপ মুক্ত আশ্রয়-পত্র প্রেরণ করিলে প্রেরণকারী খাঁর পদ হইতে বিতাড়িত হইবে, এই আদেশ প্রকাশ করা হয়। আরও উহাতে উল্লেখ করা হয় যে, কেহ আশ্রয়-পত্র প্রত্যাখ্যান করিলে তাহাকে কোনও প্রকার অপমান বা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। পরে জিল অ্যালাবট কর্তৃক উল্লিখিত আদেশগুলি বিবিধ হয়। তৎকালে তিনি বন্দবাসী।

লেকটেন্যান্ট জেনারেল হট্টের স্বত্বিকথায় প্রকাশ, কলিকাতার কেরার ভারতে শেষ বৈরথ মুক্ত হইয়াছিল। দুই জন তরুণবয়স্ক কর্তৃপক্ষী বন্দুকা করিয়া পরস্পরকে বৈরথমুক্ত নিমন্ত্রণ করে। তাহারের দুইটি পিতল ছিল, কিন্তু একটির অধিক টোটা ছিল না। তাই তাহারা মুক্তি করিয়া কে টোটা গাইবে, স্থির করে। তাহার পর তাহারা গোরাবারিকের দ্বায়ে বাইরা দুর্বার পরস্পরের সম্মুখীন হয়। একজনের হাতে শুল্ল পিতল—একজনের পিতলে একটি টোটা। বাহার পিতলে টোটা ছিল, সে পত্রকে মাঝিতে অসিদ্ধক হইলেও বৈরথ গুলী পরস্পর গলে দিচ্ছিল। শুধু জেতা বিজিতকে লইয়া বাইরা চিকিৎসককে সংবাদ দেয়। উভয়ের বিচার হয়। কিন্তু বাগারটা এমনই হাত্তাক্ষীক বলিয়া বোধ হয় যে, কাহাকেও বিশেষ দণ্ড দেওয়া হয় নাই।

ସ୍ମୃତି ।

ସେ ଦିବେର କଥା ଆସେ ବୁକେ ମାଧା
ତବନ ଶ୍ରବଣେ ବେଳା,

ଏମାନ୍ତ ହୃଦେ ଶ୍ରବଣେ ଦାସୀ
ତବନେ ଶ୍ରବଣେ ନି ଶେଷ ।

ହୁଁନାମି ବୁକେତେ ଯାହି
ହୁଁନାମି ସଜଳ ଯାହି ;
ସକଳ ମାନସି ହୁଁନାମି ବିଚାର
ଅବସ-ପରମ ଯାହି ।

ସେ ଦିବେର କଥା ଯେ ବୁକେ ମାଧା
ସଦାନି ଆମି ଧାକି ।

ଯାହି ଆମି ମଧି, ହୁଁନାମି ଯାହି
ଆସାର ଆମିବ କିରେ ।”

ହୁଁନାମି ହୁଁନାମି, ଦେବିତ୍ତ ଚାହିଁ
ତଳିଆ ମେଢେ ସେ ଧୀରେ ।

ଆମି ହୁଁନାମି ଶ୍ରବଣେ
କଥା କାହିଁ ହୁଁନାମି ଶ୍ରବଣେ ;
ମଧ୍ୟେ ହୁଁନାମି ମଧ୍ୟେ ଆମି ହୁଁନାମି
ମେଢେ-କାବ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ।

“ତବେ ଯାହି ଆମି ମଧି, ହୁଁନାମି ଯାହି”
ମେଢେ ସେ ଆସାର କାବେ ।

ତବେ, ସେ ଦିବେର ମଧ୍ୟେ ଆସାର ମେଢେ—
ତବେ ଧୀରେ ନି କେଶ,
ମିଠାବ ତବେ ଶ୍ରବଣେ ନି ମିଠାବ
ମଧ୍ୟେ ନି ତବେ ବେଶ,—

ତାମି କଥା-ମଧ୍ୟେ-ଧୀରେ
କେଶେ ଆସାର ଧୀରେ—
“ବାଳା ହୁଁନାମି ତବେ କାବେର ବେଶ
ହୁଁନାମି-ମଧ୍ୟେ ତାରେ ।”

ତବେ, ମଧ୍ୟେ ଆସାର ଏବେ ଆମିବ
—“ଆସାର ଆମିବ କିରେ ।”

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଗୀତାଚର୍ଯ୍ୟ ।

সর্বমত্যন্ত গহিতম্ ।

(১)

পশ্চিমের এক সহরে আমার বস্ত্রবাড়ী ; আমি যে স্থানে থাকি, সে স্থান হইতে রেলপথে ২০ ঘণ্টার পথ । বস্ত্রের অবস্থা আমাদের ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ তিনি একজন বেশ সজ্জিতাঙ্গী ব্যক্তি এবং তাঁহার বাড়ীতে ব্যস্ত মাসে তের পার্শ্ব হইয়া থাকে । ৮পূজার সময়ে আমি জামাইব্যবস্থাপে বস্ত্রশালয়ে পদার্পণ করিয়া থাকি । সুহিনীকে বিদায় দিবার সময়ে তিনি ছলছল-নয়নে আমাকে বার বার অহুরোধ করিয়াছিলেন, যেন ৮পূজার সময়ে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই ; কারণ, তিনি নাকি আমাকে অস্ত্রের সহিত ভালবাসেন এবং আমাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না । সত্য বা মিথ্যা, সজ্জ বা অসজ্জ, বাস্তবিক বা অস্বাভাবিক যাহাই হউক, আমি তাঁহার অহুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সরলভাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিয়াছিলাম । এই স্থলে আভাস দিতে ইচ্ছা করি যে, গল্প ভালই লম্বিবে, কেন না মাগিকা ‘বুঝতী,’ স্থান ‘বস্ত্রবাড়ী’ এবং সময় ‘পূজা আসিতেছে’ । বৈধব্য-চাতি ঘটিলে পাঠক ইহার রসাবাদনে বঞ্চিত হইবেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি ।

ছুটি হইতে সবে মাত্র সাত দিন বাকী । ইহারই মধ্যে দলে দলে কত লোক পূজার হাট-বাজার করা আরম্ভ করিয়াছে । প্রবাসী কেরানী, উকীল, মোক্তার সকলেই আপন আপন কাণ্ড সারিতে ব্যস্ত । পথে ভিক্ষুকের আমদানী অধিক । আমিও দিন গণিতেছি—রাম, ছই, তিন,—আজ, কাল, পরশু । এমন সবরে সুহিনীর পত্র পাইলাম । ভাড়া ভাড়া অক্ষরের ঝাঁক ঝাঁক সারিতে পত্রের চারিটি পৃষ্ঠায় আর তিলবারণের স্থান নাই । প্রেম-পত্র ? হাঁ, সেটা কতকটা ভাড়াই বটে ।

বাহিরের খোঁস বা কক্ষকে আবরণ উন্মোচিত করিয়া যে পত্র পাইলাম, তাহা লইয়াই কথা । ভূমিকার বিরহবিষয়ক একটি অপ্রশস্ত রচনা । ইহা প্রব বৈ, লেখিকা মেঘদূত অথবা শকুন্তলা পড়েন নাই, তথাপি লেখায় যথেষ্ট আবেগ ছিল ! ভাবার দোষ যতই বাহুক, এক শব্দ বা ততোহ-ধিক বার বলিতে পারি যে, ভাবসম্পদে তাহা অতুলনীয়,— ঠিক যেন নব্য কাব্যগণের কবিতার স্বরূপ ।

(২)

সেই পত্রখানির কথা বলিতেছিলাম । তাহার উপরে ছিল—

“নিশিরে কি ছুটে ছল বিনা বরিষণে ।

চিঠিতে কি ভুলে মন বিনা দরশনে ?”

এবং ভিতরে অনেক কথাই ছিল । সকল কথা ভাবিয়া বলা কি ভাল ?
—বিশেষতঃ ঘরের কথা ? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে,

চাকরি করি ছ’পণ কড়ি,

ভূমি চাও তাহ ঢাকাই শাড়ী,

তোমার জন্তে করে চুরি

জেলখানাতে কি ক’রব বাড়ী ।

ঐক এইটি অথবা এই ভাবের একটি ছড়া লিখিয়া সেই পত্রের উত্তর দিলে তাহা নিরপেক্ষতার পরিচায়ক হইলেও উপেক্ষা কিছু কড়া গোছের হইত এবং আমার এই প্রেমময় জীবন-ভরীকে চিরবিচ্ছেদসাগরে ভাসাইয়া দেওয়া হইত । আবেগভরে পত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া ফেলিয়াছি, তবে আর কেন । কথাটা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াই বলি । সে—আমাব সে—আবদারের সুরে যে সব ভিনিসের ফরমাইস করিয়াছে, তাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে দুকর । আর কি ! না, সে আর কিছুই চাহে না ; চাহে—আর কেবল আমাকে ।

পত্র পাইয়া ভাবিতে বসিলাম—“তাই ত” । এই ‘তাই ত’রূপ দুচ্ছত্ত মন্বন করিয়া ননী বাহির করা বড় সহজ কথা নহে । উত্তর বড় সহজ—‘হী’ কি ‘না’, কিন্তু এই ‘হী’ বা ‘না’ আসে কেমন করিয়া ? যদি বলি, ‘হী’ তৎক্ষণাৎ পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই আমাকে অনুন্ন দুই শত টাকা সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবিত করিতে হইবে, আর যদি বলি, ‘না’,—‘না’ কি বলা চলে ?

কোন একটি বিষয়ের স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যতই বিলম্ব হউক, সময় এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে না । স্বস্তরবাড়ী যাওয়া যায় কি না, এ সম্বন্ধে একটা পাকা উত্তর স্থির করিতে না পারিলেও সময়চক্রের আবর্ত্তনে একটা দিন আসিল,—তাহার পরদিন হইতেই দশ দিনের ছুটি ।

বৈকালে অফিস হইতে আসিয়া ধ্যানে বসিলাম । অনিতে পাওয়া যায়, পূর্বে ঋষিরা ধ্যানবলে অসাধ্য সাধন করিতেন, আর আমি একটা মীমাংসা

করিতে পারিব না ? আমি যদি নহি ? তবে তুমি আমার ভগবৎ-প্রেম-সম্বন্ধে কবিতাটি নিচ্ছই পড় নাহি । তাহাতে আমি প্রকৃতিতে ভগবানের স্বরূপ এবং ভগবানে প্রকৃতির অস্তিত্ব স্পষ্টমনস্তরূপে দেখাইয়াছি । তুমি আমার গুণের স্বীকার না-ই করিলে, কিন্তু ইহা তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে যে, ধানের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে ।

চক্ষু যুক্তিত করিয়া চিত্তা করিতে বলিলাম । কিছুক্ষণ পরে সত্যের স্তর জ্যোতিঃ আমার অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইল ! ধ্যানশেষে চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, সম্মুখে সংবাদপত্রের এক ক্রোড়পত্র পড়িয়া আছে । তাহাতে তিন টাকার এক লাট বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন । সে লাটে ছিল—১দফা আগলের মত মকল স্বর্ণের দড়াহার, ১দফা সূন্দর ককা-দেওয়া ব্যাগানী শাড়ী, ১দফা বড়ি । আরও তাহাতে এমন কতকগুলি জিনিস ছিল, যাহাতে আমার ভেমন প্রয়োজন ছিল না, অথচ সেগুলি পাইলেও মন্দ হয় না, যথা—ঘড়ি, চেন, লকেট ইত্যাদি । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া এবং বিজ্ঞাপনদাতার উদ্দেশে আশীর্বাদবর্ষণান্তে পূর্বোক্ত পত্রের উত্তর দিলাম—ঈশ্ব বাইতেছি । তাহাতে আর কি লিখিলাম, বলিব না এবং তাহা শুনাইবার কোন প্রয়োজনও দেখি না ।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে বিগুণ উৎসাহে টেশনে গিয়া শিয়ালদহের টিকিট কিনিয়া বলিলাম । দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিল । তাহাতে চড়িয়া শেখ রাজিতে শিয়ালদহে নাখিলাম ।



(৩)

শিয়ালদহে ট্রামে চাপিয়া বড়বাজারে নাখিলাম । তখন প্রাতঃকাল,—রৌদ্র উঠিয়াছে । সযত্নরক্ষিত বিজ্ঞাপনখানির টিকানাটি খুঁজ করিয়া লইলাম । এখনও তাহা আমার মনে আছে । ক্রমাগত লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া এ গলি গে গলি ঘুরয়া ফিরিয়া শেষে উদ্দিষ্ট বাড়ী পাইলাম । সে একটি বড় বাড়ীর একটি-বারসক্স একটা কুঠরী যাত্র । দেখিলাম, তথায় এক ব্যক্তি আপন মনে তামাক টানিয়া বাইতেছেন । লোকটির চেহারাখানি নিতান্ত মন্দ নহে, তাহার উপর তাহার কণ্ঠদেশে মোটা কাঠের মালা এবং বক্ষে ও কপালে রাধাকৃষ্ণ নামের অম্পট ছাপ । লোকটিকে দেখিয়াই ভক্তি হইল ; মনে হইল, আমার মত দুঃখ ব্যক্তির দুঃখ নিবারণের জন্যই এই মধ্যপুরুষের আবির্ভাব । তাহার পর দোকানের আসবাবপত্রের দিকে দৃষ্টি-

নিষ্কেপ করিলাম । ঘরের মধ্যে ছিল—আমি, কি পাকুড় কাঠের জীর্ণ একটা আলমারি, তাহার মধ্যে কতকগুলি ছাপান বিজ্ঞাপন, একটি আঠার ভাত, একখানি ছুরি, একখানি কাঁচি ইত্যাদি । আলমারির বাহিরে যেকের উপর ছিন্ন একখানি মাদুর, মাদুরের পাখে কলিকা-কাড়া গুল, কয়েকখানি টাকা এবং উল্লম্ব কতক ভাষ্যাক । সম্মুখে হইল—তবে কি ঠিকানা ভুল হই-
রাছে ? অন্নকণ ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, পেইন কোম্পানীর দোকানটা কোথায় ?” পূর্বোক্ত ব্যক্তি আমার দিকে উৎসে-
হপূর্ণ দৃষ্টি নিষ্কেপ করিয়া বলিলেন, “এই যে মহাশয়, এই দোকান ।
আমুন ।”

চিন্তিতভাবে দোকানে উঠিয়া বলিলাম, “তিন টাকার লাট বিক্রয়ের
বিজ্ঞাপন আপনাবাই দিয়াছিলেন ?”

দোকানদার এক নিম্নালে বলিলেন, “আজ্ঞা হাঁ, আমুন, বসুন, ভাষ্যাক
বাউন ।”

আমি ধীরভাবে বলিলাম, “আমি এক গ্রন্থ লাট কিনিব ।”

দোকানদার বলিলেন, “উত্তম, বসুন ; শুধায় হইতে লইয়া
আনি ।”

দোকানদার চলিয়া গেলেন এবং অন্নকণ পরে নিজের বা পরের শুধায়
হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটি কাগজের বাক্স আমার সম্মুখে রাখিলেন ।
দেখিলাম, বিজ্ঞাপনে লিখিত সকল জিনিস তাহাতে আছে । বাঃ ! স্মরণ
দড়াহার ; শাড়ী, বড়ি সকলই স্মরণ, তবে বড়িটা চলিতেছে না । জিজ্ঞাসা
করিয়া জানিলাম, তাহার নাম “টয়-ওয়াচ”—নুতন আমদানী—চালাইয়া
দিলেই চলে ! না হয় বড়িটা মন্দই হইল, তাহাতেই বা কি ?—গৃহিনীর হায় ত
পাইয়াছি ।

দোকানদারকে নগদ তিন টাকা দিয়া টেনন অভিমুখে যাত্রা করিলাম ।
হাওড়া টেননে টিকিট করা কি স্বকুমারি । বাবা হউক, অতি কষ্টে টিকিট
সংগ্রহ করিয়া যাত্রি ২৪০ টার ট্রেনে উঠিলাম । ট্রেন ছুটিল । তখন বাহিরে
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না,—আকাশে মেঘ ছিল ।

দিনে এক হিন্দু আশ্রমে ভাত খাইয়াছিলাম, যাত্রিতে অল্পটুকু কিছুই
ছুটিল না, কেবল ‘পান সিগারেট’ । মাথা ভার হইয়াছিল, কিছুকণ বসিয়া
কিম্বাইয়া বেঞ্চে শুইয়া পড়িলাম ।

(৪)

শেষ রাত্রিতে নামিতে হইবে,—যথেষ্ট সময় ; ঘুমাইলে মন্দ হইত না, কিন্তু ঘুম কি আইসে ? কে জানে, কোন জুয়াচোর আমার সেই জিনিসগুলির প্রতি লোভন পুষ্ট রাখিয়াছে কি না ! সুদীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া বেকের উপর কখন এ পাশে, কখন ওপাশে,—ঘুরিয়া ফিরিয়া কত কথা ভাবিতে লাগিলাম । গল্পকাব্যে তখনকার মনের ভাব ব্যক্ত করা অতি কঠিন এবং সে বিষয়ে চেষ্টা করাটাও বোধ হয়, বৃজিবিরুদ্ধ ।

একে একে একটা, দুইটা, তিনটা বাজিয়া গেল ; আর পনর মিনিট যাত্র অবশিষ্ট । ভাড়াভাড়ি উঠিয়া বলিয়া বেশভূষার মন দিলাম । দিনে তেলজল মা পাইয়া মাথার চুলগুলি মাঝা জুলিয়া ধাঁড়াইয়াছিল । আগুন, চিক্নী আর ওখন কোথায় পাইব ? দুই হাতের অঙ্গুলির সাহায্যে চুলগুলিকে এ দিকে ও দিকে সরাইয়া যথাসম্ভব মাথার উপর একটা পথ প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম । তাহার পর পকেটে রক্ষিত টেকিং জোড়াটি বাহির করিয়া পায়ের দিলাম ; জুতা পরিলাম । সূক্ষিত জামাটির চারিদিকে হাত দিয়া টানিয়া লমান করিয়া চারদিকখানি পাগড়ীর আকাশে মাথার লুকাইলাম । ক্রমে ট্রেনের গতি মন্দীকৃত হইতে লাগিল,—অধূরে ঠৈলন । ধাঁড়াইয়া গ্যাসের আলোকে চোরাখানি—বড়দূর দৃষ্টি চলে—ভাল করিয়া দেখিলাম । তাহার পর বাম-হাতে ছত্র ও বাম বগলে গৃহিনীর সেই জিনিসগুলি ও তোয়ালে বীণা-আমার একখানি বোলাই-করা কাপড় লুপ্তভাবে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলির দ্বারা পোকজোড়াটির দৌর্ভবয়ক্তি করিতেছি, এমন সময়ে ট্রেন থামিল । আমি নামিলাম ।

প্ল্যাটফর্মের বাহিরে ওভারব্রিজের নিম্নে অনেক বোড়ার গাড়ী ছিল । ভাড়াভাড়ি একখানি গাড়ীতে চড়িয়া বলিয়া কোচম্যানকে গন্তব্য স্থানের নাম করিলাম । সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছুটিল এবং দশ মিনিটের মধ্যেই আমার স্বতন্ত্রবাড়ীর সম্মুখে আসিয়া ধাঁড়াইল । গাড়ীর শব্দ পাইয়া স্বগত মধ্যমের কঠিন কৃত্য বলিল, “কে ?” কিন্তু আমি হাসিমুখে “কি রে অটল ! ভাল আছিস্ ত ?” বলার সে “আজ্ঞে” বলিয়া আমাকে ভাল রকমের একটি প্রণাম করিয়া বাড়ীর মধ্যে আমার আগমনের সংবাদ দিতে ছুটিল । পকেট হইতে পরমা বাহির করিয়া গাড়ীর ভাড়া মিটাইয়া দিতে না দিতেই সোরা-গোল উঠিল—“জামাই বাবু ! জামাই বাবু !” তখন আমার আদর কত !

সেই সকল আবার অভ্যর্থনার কথা আমার বতই ভাগ লাগুক, বাহিন'ত্রে তাহা আর বলিতে ইচ্ছা করি না ।

ভাহার পর সেই শেখরাক্রিতে জলযোগান্তে শয়ন করিতে গেলাম । গৃহিণী বাতের পার্শ্বে ঠাড়াইয়া ছিলেন, কোন কথা বলিলেন না । বোধ হইল, ভাহার ইচ্ছা, আমিই প্রথমে কথাটা বলি । যাহা হউক, আমিই প্রথমে কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম ; কেন না, এখন আমার বহুদিন অবদর্শনজনিত সঞ্চিত আবেগের উৎসের মুখ উদঘাটিত ।

“ওগো ! এই বাক্সটা রেখে দাও ত, তোমার কাপড়-চোপড় আছে”— বলিয়া হস্তপ্রদর্শন করিলাম ।

ভিনি যেন এতক্ষণ অঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন এবং আমার কথার ভাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এই ভাবে ঈষৎ হাসির সহিত বাক্সটি লইয়া ব্যগ্র-ভাবে খুলিয়া একে একে জিনিসগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং রায় লিখবার সময়ে অল্পকূল বিচারকণের জগৎ উত্তরণক যেনম সোৎসুক-নয়নে বিচারকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, আমিও তেমনিই তাহা গৃহিণীর দিকে চাহিয়া রহিলাম । উপমায় গৃহিণীকে একটু বড় করা হইল, কিন্তু তাহাকে কি ?

মস্তব্যপ্রকাশে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উদ্‌গ্ৰীবতাবে বিজ্ঞানা করিলাম, “কি ?—জিনিস সব পসন্দ হইল ?”

গৃহিণী বলিলেন, “হ্যাঁ, কাপড়খানার স্ত্রীতো কেমন জড়জড় ঠেক্ছে, তবে হারগাছটার গড়ন ত বেশ ! কত দাম ?”

আমি বলিলাম, “দাম বাহাই হউক, তোমার পসন্দ হইয়াছে কি না, তাহাই বলি ?”

গৃহিণী বলিলেন, “দেখ দেখি ! ভূমি আনিয়াছ, তা' আবার কখনও খরচাপ হয় ?”

বুলিলাম, হারগাছটা গৃহিণীর মনোমত হইয়াছে । আনন্দের উচ্ছ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম, “কেয়াবাৎ !”

গৃহিণী বলিলেন, “কি বলিলে ?”

আমি বলিলাম, “কিছুই না ।”

তখন পূর্নদিক্ পরিভার হইয়াছে ।

পূজার কয় দিন বেশ কাটিয়া গেল। বিজয়ার দিন ভোজনান্তে নিজার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে আমার এক ভালিকা আসিয়া বলিল, “জামাই বাবু! এমন ষাটি সেনোর হার পাইলেন কোথায়?”

এর শুনিয়া আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, তথাপি প্রকৃতিহুভাবে বলিলাম, “কেন?”

ভালিকা হাসিয়া উঠিল। শুনিলাম, বাহিরেও হাসির বৃহৎ তরঙ্গ ছুটিয়াছে। তাহার পর গৃহিনী যে বচনসুধা আমার কাণে চালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মিষ্টতা অন্তরে উপভোগ্য নহে। গৃহিনী বাতীত প্রায় সকলেরই অশেষবিধ অনুপ্রোধ উপেক্ষা করিয়া পরদিন কর্মস্থলে চলিয়া আসিয়াছি।

তাহার পর—তাহার পর এখন ভাবিতেছি—“সর্বমত্যস্ত গহিতম্।”

ঐকালীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

— — —

ক্ষুদ্র কবিতার জন্য কবির কৈফিয়ত।

(নিকোলাস মার্টিনের ফরাসী কবিতার অনূদিতকৃত
ইংরাজী অনুবাদ হইতে)

কেন কবি এত ক্ষুদ্র ভব গীতি? তুমি ভালবাস সুবর্ণ-বস্তিত
—এ প্রশ্ন তোমার উচিত না হয়, মুহূর্তা-খচিত শোভন হার,
যতঃ সুখও কেন টুটে প্রীতি আমি ভালবাসি দেখিতে সতত
এত শীঘ্র, কেন গোলাপ শুকায়। বিলু বিলু ক্ষুদ্র নিশিরবার।
জ্যোতিষ্ক-খচিত আকাশ-মণ্ডল
তর বাসি যনে মহিমা দেখি।
যে প্রিয়তর দুইটি উজল
অক্ষ-সুগল চকিত আঁবি।

— — —

কিশোরীচাঁদ মিত্র ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

জন্ম ও বংশপরিচয় । প্যারীচাঁদ মিত্র ।

১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে মে নিমন্তলাবাট গ্রীট্‌হ্‌ নৈত্রিক ভবনে কিশোরীচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন ।

কিশোরীচাঁদের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন । ইহা-
দ্বিগের আদি নিবাস হুগলী জিলার পানিসেহালা গ্রামে । গঙ্গাধর জ্যেষ্ঠপতি
রামচন্দ্রলাল সরকারের আশ্রয়দাতা, হাটখোলার বিখ্যাত বনী মদনমোহন দত্তের
এক কন্যাকে বিবাহ করেন এবং কলিকাতার বাবসায়বাগিচায় প্রেরিত
হয়েন । ইনি রামচন্দ্রলাল সরকারের কারবারের একজন অঙ্গীকার ছিলেন ।
ইনি একজন সাধু ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন । নিমন্তলা গ্রীটে এখনও ইহার
প্রতিষ্ঠিত শিখমন্দির দৃষ্ট হয় ।

গঙ্গাধরের তিন পুত্র—রামনারায়ণ, নিমাইচরণ ও নন্দলাল ।

জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা বিলম্বণ অর্থ
উপার্জন করেন । তিনি কোম্পানীর কাগজ, হুগলী প্রকৃতির ব্যবসায় আপ-
নার অবস্থার বিশেষ উন্নতিসাধন করেন এবং একটি জমিদারী ক্রয় করেন ।
তিনি রামমোহন রায়েবর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ধর্ম্মপুস্তকের ও ধর্ম্ম-
সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন । ইনিই রাধামোহন সেনের সাহায্যে 'সঙ্গীত-
তরঙ্গ' নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন । এই পুস্তকখানি
সে কালের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট সবিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
রামনারায়ণের পাঁচ পুত্র—যমুহরন, ভ্রামচাঁদ, নবীনচাঁদ, প্যারীচাঁদ ও
কিশোরীচাঁদ । ভ্রামচাঁদ বোড়প বর্ষ বয়সেই গতান্ব হইলেন । যমুহরন ও
নবীনচাঁদ পিতার তত্ত্বাবধানে জমিদারীসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন । প্যারী-
চাঁদ ও কিশোরীচাঁদ সাহিত্যসেবা ও দেশসেবাবাদ্য ঔহাদিগের নাম বঙ্গ-
দেশে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন ।

কিশোরীচাঁদের শৈশবের বিশেষ বিবরণ কিছু অবগত হওয়া যায় না ।
কিন্তু প্রকাশ আছে যে, তিনি জনকজননীকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন । তিনি
সঙ্গীতনিষ্ঠ সন্তান বলিয়া পিতামাতারও অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন ।
কিশোরীচাঁদের জননী আনন্দদাসী এত দিকে যেমন খুশম না ছিলেন তত দিকে

সেইরূপ কোমলপ্রাণা ও বর্ষপরাণা, রমনী ছিলেন। যদিও ভাষাবিশেষ সময়ে ক্রীড়াকার প্রচলন ছিল না, তথাপি আনন্দময়ী বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষিতা ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, ‘আধ্যাত্মিকা’র জুদিকার লিখিয়াছেন, যখন তিনি পাঠশালায় প্রথম শিক্ষাগ্রহণ করেন, তখন ভাষার পিতামহী, স্বাভাৱীকরণী ও পিতৃব্যপটীগণকে বাঙ্গালা পুস্তকাদি পাঠ করিতে দেখিয়াছেন।

কোট ভ্রাতাদিগের প্রতিও কিশোরীচাঁদের অসীম অমুরাগ ছিল। বিশেষতঃ প্যারীচাঁদকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; প্যারীচাঁদেরও কনিষ্ঠের প্রতি অসাধারণ স্নেহ ছিল। প্যারীচাঁদ নিজে একজন কর্মব্রত মহাপুরুষ ছিলেন এবং তিনি বালক কিশোরীচাঁদের জ্বরে যে প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা কখনও মুছিয়া যায় নাই। জীবনে দুই ভ্রাতা দুইটি বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,—কিন্তু ভাষাদের উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য এক ছিল। অজ্ঞানতার অন্ধকার হইতে দেশবাসিগণকে জ্ঞানের আলোকে লইয়া বাইবার জন্য, কুসংস্কারের উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য, কুৎসিত আচার হইতে সমাজকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত, দেশের রাজনীতিক অবস্থাকে উন্নত করিবার জন্য—এক কথা, দেশের শিক্ষা, নীতি, বর্ষ, সমাজ ও রাজনীতিগতীয় সর্বপ্রকার উন্নতিসাধনের জন্য ভাষারা উভয়েই জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সাধনা তিন প্রকারের হইলেও উভয়ের মন্ত্র এক। এই দেশহিতব্রত-মন্ত্রে কিশোরীচাঁদ প্যারীচাঁদ কর্তৃক দীক্ষিত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদই ভাষার জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভাষার জীবনে প্যারীচাঁদের প্রভাব অসাধারণ। কিশোরীচাঁদের চরিত্র, কৃতি ও শিক্ষাবিধরে প্যারীচাঁদের কিরূপ প্রভাব ছিল, বুঝিতে হইলে প্যারীচাঁদের জীবন-সংঘট কিছু জানা প্রয়োজন। আখ্যায় অতি সংক্ষেপে ভাষার জীবনের কথা নিরে লিপিবদ্ধ করিলাম।

১২২১ বঙ্গাব্দে ৮ই ভাদ্রাব দিবসে (২২ শে জুলাই, ১৮১৪ খ্রঃ অব্দে) প্যারীচাঁদ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে একজন গুরুমহাশয় কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় এবং পরে একজন মুন্সীকর্তৃক পারসিক ভাষায় দিক্ষিত করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইনি হিন্দুকালেজে একাদশ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করেন। প্রথম প্রথম উচ্চারণদোষ ও গ্রাম্যভাব জন্য তিনি সহপাঠীদের নিকট হাতাস্পদ হইয়াছিলেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা,

প্রোগ্রাম অব্যবসায় ও আন্তর্য্য মেধা শিক্ষক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। সুপ্রিয় কোর্টের বিচারপতি নাননীর ভ্রাতৃ জন পিটার গ্রান্ট একবার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। প্যাট্রীচাদ তাঁহার সহপাঠী বিগবর মিত্র ও অন্যান্য প্রতীভাশালী ছাত্রগণকে পরাক্রান্ত করিয়া উদ্ধা লাভ করেন। যখন তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন, তখন তিনি ১৬ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। ছাত্রজীবনে এই বৃত্তিলাভ তখন অত্যন্ত সম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। প্যাট্রীচাদ গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু গণিতাধ্যাপক ডাক্তার টাইটলার তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। প্যাট্রীচাদ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন। এই কারণে ডাক্তার টাইটলার তাঁহাকে “দার্শনিক” বলিয়া সন্ধানন করিতেন। কবিতা আছে, একদা ভ্রাতৃ জন গ্রান্ট কলেজ পরিদর্শনকালে কোনও ছাত্র দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উক্ত ডাক্তার প্যাট্রীচাদকে নির্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন, “এই যে আমাদের দার্শনিক মহাশয়।” *

২. প্যাট্রীচাদের পটভূমায় হিন্দু কলেজ এক মহাপুরুষের প্রভাবে এক নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই মহাপুরুষ আর কেহই নহেন—জানবীর মহাশয় হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিমোরিও। কলেজের তৎকালীন ছাত্রগণের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। এই অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান লইয়া যখন হিন্দু কলেজের সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন, তখন সত্য সত্যই ছাত্রগণের হৃদয়ে এক নবভাব সঞ্চারিত হয়। তিনি ছাত্রগণের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে যে অমূল্যস্বপ্নের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার সহিত সার্ব সত্যের অনুশীলন করিতে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই। দেশপ্রাণবাগ্মী রামমোহন, ধর্মপ্রাণ সত্যনিষ্ঠ রামভদ্র, কর্মব্রত সুপণ্ডিত রামপ্রসাদ, ব্রহ্মনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ, পরহিতব্রত পুণ্যলোক শিবচন্দ্র, জানবীর কৃষ্ণমোহন,

আর্য্যাবর্ত



আদর্শচরিত্র প্যারীচাঁদ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি এই মহাপুরুষের সংসর্গে আশ্রয়লাভিলেন, তাঁহাদের জীবন ও কার্য সমালোচনা করিলে উক্ত ব্যক্তির বাথার্থ উপলব্ধি হইবে। কিশোরীচাঁদ তাঁহার “হিন্দুকলেজের ইতিহাস” নামক বিখ্যাত সম্বন্ধে এই মহাত্মার শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে বাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ—“শিক্ষকরূপে তিনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত শিক্ষকদিগের অগ্বেক্ষা এ বিষয়ে তাঁহার কর্তব্যজ্ঞান প্রবল ছিল। তিনি মনে করিতেন যে, কেবল কবী নহে, পরন্তু বিষয় শিক্ষান তাঁহার কর্তব্য ; কেবল মন্ডিতের নহে, পরন্তু জন্মের বিকাশসাধন তাঁহার কর্তব্য। এই বিশ্বাসে কার্য করিয়া তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের জ্ঞানচক্ষু উদ্বীণিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভাবিতে শিখাইতেন ; এ দেশবাসীরা যে প্রাচীন গৌড়ানীর মূখ্যে বদ্ধ ছিলেন, সে মূখ্যল ছিন্ন করিতে শিখাইতেন। মনস্তত্ত্ব ও নীতিদর্শনে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল ; তিনি ছাত্রদিগকে সেই সব বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ডিরোজিও তাঁহাদিগকে লজ, ব্রীড, ইয়র্ট ও ব্রাউণের মত বুঝাইতেন। তিনি তাঁহার অধ্যাপনার পর্যবেক্ষণ-শক্তির ও তর্ককৌশলের যে মৌলিকতা দেখাইতেন, তাহা সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের অগ্রগম্য বলায়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু তিনি কেবল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াই নিরন্তর হইতেন না ; পণ্ডিত বগৃহে, তর্কমতের ও অত্যন্ত স্থানে ছাত্রদিগকে আপনার জ্ঞানসম্পৎ-সম্ভার দিয়া পুষ্কিত হইতেন।”

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইনি ছাত্রগণের চিত্ত ও চরিত্র বিকাশের জন্য একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারীচাঁদ ডিরোজিওর অত্যন্ত ছাত্রগণের সহিত এই সভায় আগ্রহের সহিত জ্ঞানানুশীলন করিতে লাগিলেন এবং শিক্ষার চিত্রবদ্ধ ডেভিড হেরার ও ডিরোজিও তাঁহাদের সভ্যজ্ঞানের পথপ্রদর্শক হইলেন। এই সভায় হিন্দুধর্মের বিতর্ক বক্তৃতা হয়, এই অভিযোগে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ডিরোজিওকে কর্তৃত্ব করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহা শুনিয়া ডিরোজিও স্বয়ং পদত্যাগ করেন (২৪শে এপ্রিল, ১৮৩১)। কিন্তু তাঁহার পদত্যাগে প্রিয়তম ছাত্রগণের সহিত তাঁহার স্নেহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল না। পুরাতন ছাত্রগণ তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন এবং নূতন ছাত্রগণ পুরাতন

ছাত্রগণের নিকট হইতে তাঁহারই অভিনব যন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন ।

১৮৩৫ খৃঃ অব্দে প্যারীচাঁদের শিক্ষা সমাপ্ত হয় । তাঁহার কিয়দিন পরে তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান এবং পরে লাইব্রেরিয়ান ও লেক্টরারীর পদে নিযুক্ত হইলেন । এই সময় তিনি জ্ঞান-দুর্লভতার অ'র্ধেক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন । যদিও অধিকাংশ সময় তিনি পুস্তকাদি পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি লাইব্রেরীর কার্যে তাঁহার বিশেষ-স্বাচ্ছন্দ্য অমনোযোগ ছিল না । পক্ষান্তরে তাঁহার যন্ত্রে ও পরিশ্রমে লাইব্রেরীর এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি লেক্টরারী ও লাইব্রেরী-স্থানের পদ ত্যাগ করিলে কিউরেটোরগণ তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং পরে প্যারীচাঁদ উক্ত লাইব্রেরীর একজন কিউরেটর নিযুক্ত হইলেন এবং মৃত্যুকাল পয্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ।

যখন তিনি পাবলিক লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে কালাচাঁদ শেঠ ও তারচাঁদ চক্রবর্তীর সহিত মিলিত হইয়া তিনি অধিবর্ণিণী প্রভৃত হইলেন এবং বিলক্ষণ লাভ করেন । বাবসারে তাঁহার আভাবিক সাধুতা ইংরাজ বণিকুলপ্রদায়ের আন্তরিক প্রজ্ঞা আকৃষ্ট করিয়া-ছিল । তিনি গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেল কোং, পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইন্ডেন্টমেন্ট কোং, বেঙ্গল টি কোং, ইষ্ট ইন্ডিয়া টি কোং, ডরং টি কোং প্রভৃতি অনেক কোম্পানির ডিরেক্টর মনোনীত হইলেন । প্যারীচাঁদ অত্যন্ত সরলস্বভাব ছিলেন এবং সকলকেই বিশ্বাস করিতেন । তাঁহার এই অবস্থা বিশ্বাসই তাঁহার সম্পত্তির কালবরূপ হইল । বিদেশীয় এজেন্টগণের প্রতারণায় অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রভূত সম্পত্তি বিনষ্ট হইল । কিন্তু “প্যারীচাঁদ মিত্র অর্থশালী হইয়াও বৈরূপ ছিলেন, অর্থশূন্য অবস্থাতেও শুভ্র ছিলেন । তাঁহার দান সমাহিত চিত্তের প্রসন্নতা কখনও নষ্ট হয় নাই ; তাঁহার মীতি ও চরিত্র সাময়িক আলোক ও ছায়ার সহিত সম্পূর্ণ নিরিপ্ন থাকিয়া বীর পূণ্য কর্তব্য-পালনে পুষ্টিলাভ করিয়াছিল ।”^{*} তারচাঁদ চক্রবর্তীর মৃত্যুর পরে তিনি স্বাধীনভাবে বাবসার আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে আপনার দুই পুত্রকে অশৈবায় করিয়া লইলেন । কিন্তু বাণিধ্যে তাঁহার পূর্বসৌভাগ্য আর কিরিত্য আইসে নাই ।

* বীণেশ্বর সেন—‘অধীণ’ ৪র্থ বর্ষ ।

লর্ড ডাংলহোদার শাসনকালে এতদ্ব্যতীত পুলিশের নানারূপ কলঙ্ক প্রকাশিত হয় এবং তাহার জন্য যে অসুস্থকানসভা গঠিত হয়, তাহাতে প্যারীচাঁদ এরূপ নিষ্ঠুর ও স্বাধীন ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, সন্দেহই তাহার ব্যবহারে চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

তৎকালে দেশোন্নতিবিদগণেরা যে সকল সভার সৃষ্টি হয়, তাহার সকল-গুলিতেই প্যারীচাঁদ আন্তরিকতার সহিত যোগদান করেন এবং বিবিধ দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন। বিখ্যাত জর্জ টনসনের উপদেশে গোরাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখ যে কতিপয় “নব্যবঙ্গ” (Young Bengal) ১৮৪০ খৃঃ অব্দে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটী নামক প্রথম রাজনীতিক সভা এ দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহারিণের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইনিই উহার প্রথম সম্পাদক। পরে ১৮৫০ খৃঃ অব্দে এই সভা Landholders Association এর (জমীদার সভার) সহিত মিলিত হইয়া British Indian Association নাম ধারণ করে। প্যারীচাঁদ এই সভারও কাৰ্যনির্বাহক-সমিতির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি বেঙ্গল সোসাইটী নামক সাহিত্য-সভার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। জুল বুক সোসাইটী, ভার্গ্যাকুনার পিটারেচার কমিটীরও তিনি সদস্য ছিলেন এবং এ দেশে শিক্ষা-বিভাগের জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষেইতলি কুমারী মেরী কার্পেণ্ডারের প্রভাবে বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-সভা প্রতিষ্ঠিত হইলেই ইনিই উহার প্রথম সম্পাদক নিৰ্ব্বাচিত হইলেন। এতদ্ব্যতীত হেয়ার আইজ কন্ট কমিটী ও এগ্রি হটিকালচার সোসাইটী প্রভৃতিতে তিনি সদস্য ছিলেন। সার সিলিও বুদ্ধনের সময়ে বেঙ্গলভিডুগারে যে কৃষিপ্রদর্শনী হইয়াছিল, প্যারীচাঁদ তাহার একজন বিচারক মনোনীত হইয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ বিধবিধানগণের একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে লেঃ গভর্নর স্যার উইলিয়ম রে তাহাকে বাঙ্গালা বাবুজাপক-সভার সভাপদে মনোনীত করেন। তিনি দুই বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং পত্রক্ষেপনিবারণব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ করিতে সাহায্য করেন। পরে পত্রদিগের প্রতি ক্রেশনিবারণে সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার প্রথম সম্পাদক নিৰ্ব্বাচিত হইলেন এবং উত্তর-কালে উহার সরকারী সভাপতি-পদে বৃত্ত হইলেন। ত্রান কলিকাতা কার্ণেলসন ও ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটীর একজন প্রধান সভ্য ছিলেন।

১৮৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংকিং ও জমিদারি পিস্ সন্থানও প্রাপ্ত

হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরালস্য জীবন সর্বদাই দেশহিতকর কার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার কার্য নীরবে ও বিনা আড়ম্বরে সম্পাদিত হইত যশো-
লাভের জন্য তিনি কখনও চেষ্টা করেন নাই; যশঃ তাহাকে খুঁজিয়া
বেড়াইত। এইবার আমরা সংক্ষেপে প্যারীচাঁদের সাহিত্যসেবার বিষয় কিছু
বলিব। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিকচক্রক মল্লিক কর্তৃক
'জ্ঞানাবেষণ' নামক একখানি বিভাবৌ সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়।
প্যারীচাঁদ ইহাতেই প্রথম প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৪২
খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রায়গোপাল ঘোষ 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামক একখানি
বিভাবৌ সাময়িক পত্রের প্রবর্তন করেন এবং বহু প্যারীচাঁদের হস্তে ইহার
সম্পাদকীয় ভার অর্পিত করেন। এই পত্র প্রথমে মাসিক, পরে সপ্তাহীক মাস
হইতে পাক্ষিক এবং সপ্তাহীক (১৮৪২) হইতে সাম্প্রদায়িক পত্ররূপে প্রকাশিত
হয়। ইহা নবাবকদিগের মুখপত্র ছিল। এই পত্রিকাপাঠে জানা যায়
যে, বিখ্যাত লর্ড টমলসন এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য
করিতেন। তাহাপি এই পত্রিকার কর্তৃকর্তারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রায়
সহস্র টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশ
করিয়া এই পত্র বন্ধ করিয়া দিলেন।

যৌবনে প্যারীচাঁদ বাজালা অপেক্ষা ইংরাজী সাহিত্যেরই অধিক সেবা
করিয়াছিলেন। ইতিহাস ও রাজনীতিই ইহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল।
১৮৩৮ খৃঃ অব্দে Society for the Acquisition of General Knowledge
(সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা) স্থাপিত হইল। তিনি ইহাতে হিন্দু রাজবংশকালে
হিন্দুস্থান নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহা ঐ সভার কার্যবিবরণীতে
প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার বাহন
সংস্থায় তিনি "জীবন ও প্রজা" বিষয়ক যে চিত্তাশীল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন,
তাহা লর্ড আলবিয়াল কর্তৃক পালিগ্রামেটের লর্ড-সভার উল্লিখিত হইয়া
আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তিনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকার আরও
অনেকগুলি চিত্তাশীল ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পাঠকগণের
অবগতির নিমিত্ত নিম্নে সে সকলের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল।—

No. XLIV The Court Amlahs in Lower Bengal.

No. L. Marriage of Hindoo Widows.

No. CIX. Development of Female Mind in India.



ডিরোজিও !

No. CXXVII. Psychology of the Aryyas.

No. CXXXI. Commerce in Ancient India.

No. CXXXV. Social Life of the Aryyas.

No. CXL. The Hindu Bengal.

No. CXLIII. Notes On Early Commerce in Bengal.

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের সহধর্মিণী বাম্যাকালী (খড়দহনিবাসী বিখ্যাত তান্ত্রিক ও প্রাণকৃত্তক বিশ্বাসের কর্তা) পরলোক গমন করিলে তাঁহার মন বর্ধের দিকে সম্বন্ধিত আকৃষ্ট হয়। তিনি বাম্যাকালী হইতে হিন্দুধর্মে আস্থাবান ছিলেন ; পরে ইংরাজী শিক্ষার সহিত একেশ্বরবাদী হইয়া উঠেন। কিন্তু এই সময় হইতে তিনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসবান হইলেন এবং প্রেততত্ত্ব-ঈশ্বরনেই সময় অতিবাহিত করেন। Banner of Light, Spiritualist এবং অন্ত্য ইংরাজী ও আমেরিকান পত্রিকায় তিনি প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখেন এবং তাহার কতকগুলি Spiritual Stray Leaves ও Stray Thoughts on Spiritualism নামক পুস্তকসমূহে পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে যখন কর্ণেল অলকট্ ও মাদাম ব্রাডফোর্ড এ দেশে আগমন করিয়া বিষমকিষ্ট সত্য প্রতীতি করেন, তখন প্যারীচাঁদ তাঁহাদিগকে বিলম্ব সাহায্য করেন এবং প্রদানতঃ ইহা এই উদ্যোগে ও পুরিশ্রমে বকবশে ঐ সত্যের একটি শাখা হার্পিত হয়। ইনিই ঐ সত্যের সভাপতি ছিলেন। *

উপরোক্ত ইংরাজী গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ইংরাজী ভাষায় আরও তিনখানি উত্তম চরিত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ডেভিড হেন্সল, দেওয়ান রামকমল সেন ও কোব্দস ওয়াদি গ্রাণ্টের জীবনচরিত সে কালের বহু আভব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং আশাদিগের নিকট অমূল্য বলিয়া মনে হয়।

আমরা এ পর্যন্ত প্যারীচাঁদের বাঙ্গালা সাহিত্যসেবাসম্বন্ধে কিছু বলি নাই। যখন এ দেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের অবস্থা নিত্য নোচনীয় এবং প্যারীচাঁদের সমসাময়িক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে নিত্য অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন, তখন যে কর্তব্যপ্রেরণায় উৎকৃষ্ট হইয়া প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা ভাষা সংস্কারের অস্ত্র এবং ত্রীণিকা বিস্তারের অস্ত্র তাঁহার প্রীতিভাষা

* শেষ বয়সে তিনি যোগসাধনও আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এই জন্য বহু সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। যোগ হয়, তিনি সাধনার পথে বহু বহু অগ্রসর হইয়াছিলেন।

লেখনী দ্বারা করিয়াছিলেন, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইবে। বাকালী সাহিত্যের ইতিহাসে যাহার স্থাননির্দেশকালে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই “বাকালী গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক”কে “অতি উচ্চ” আসন প্রদান করিয়াছেন, “কলিকাতা রিভিউয়ের” ইংরাজ সমালোচক যাহার ‘আলালের ঘরের দুলাল’ের হাস্যরস ইংলণ্ডের গোল্ড স্মিথ ও ফিল্ডিংসের হাস্যরসের তুল্য মনে করিয়াছিলেন এবং অপর কয়েক জন বিজ্ঞ সমালোচক যাহাকে মলিয়ায় এবং ডিকেন্সের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন, ‘কপালকুণ্ডলার’ অস্থবাদক সিভিলিয়ান মিঃ ফিলিপ্‌স যাহার আলালকে শতমুখে প্রশংসা করিয়াছেন, চিত্রশ্রবীর মহাত্মা কাওয়েল যাহার আলালের শুণে মুগ্ধ হইয়া সমগ্র পুস্তকখানি লম্বালাপ করিবার সজ্জ করিয়াছিলেন, যাহার রহস্য-শক্তি-সম্বন্ধে ‘আলালের ঘরের দুলাল’ের ইংরাজী অস্থবাদক মিঃ ব্রিঃ ডি অন্ডয়েল বলিয়াছেন, “পাকাত্য দেশে থাক’রেকে সংঘত পরিহাস-রসিকদিগের মধ্যে প্রেত বলিয়া যে সম্মান প্রদত্ত হয়, এ দেশে প্যাগী-টাদের সেই সম্মান প্রাপ্য,” সেই প্যাগীটাদের বাকালী প্রবাদিগের সমালোচনা করিবার দৃষ্টতা আমাদের নাই ; প্রশংসা করিবার প্রয়োজনও নাই। এই পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে তাঁহার কর্মবহুল জীবনের পরিচয় প্রদান করিবার মানস করিয়াছি। তাঁহার পুস্তকাদির বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে প্রদান করা সম্ভব নহে। সুতরাং তাঁহার রচিত পুস্তকাদির তালিকা মাত্র এই স্থানে সরিষিষ্ট হইল।

প্যাগীটাদের সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফল ‘মাসিক পত্রিকা।’ ১২৬১ বঙ্গাব্দের (ইংরাজী ১৬ই আগষ্ট, ১৮৪৪) ১লা ভাণ্ড ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। রচনাধার শিকদার মহাশয়ের সহিত একযোগে তিনি এই পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ত্রীশিকা-বিস্তার। সুতরাং অতি সহজ ও প্রাক্কল ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নীতিগত গল্প ও প্রবাদাদি ইহাতে প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যার উপরে লিখা থাকিত—

“এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ ত্রীলোকের জন্য ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আবাদিগের সচরাচর কথাব্যক্তি হয়, ওহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু ভাষাদিগের নিমিত্ত এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।”

এই পত্রিকাতেই 'রামায়ণিকা', 'মদ ষাওয়া বড় দার' ও 'আলালের ঘরের দুলালের' কিয়দংশ সৰ্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হয়। ইহাই বাঙ্গালার সৰ্ব্বপ্রথম উপন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হাস্যরস ও স্বাভাবিকতার জন্য ইহা উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়াছিল। এই পুস্তকখানি অনেক কাল হইতে বাঙ্গালী ভাষায় পরীক্ষার্থী ইংরাজ লিভ্রেলিয়ন ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের পাঠ্য পুস্তক বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। মিষ্টার বীমস তাঁহার Modern Aryan Languages of India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামধারী লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালার সর্বোৎকৃষ্ট উপক্ৰান্ত রচিত করিয়াছেন। তাঁহার অসুকরণকারী অনেক ; উপন্যাসিক হিসাবে তাঁহার আসন অতি উচ্চে অবস্থিত। ব্যঙ্গাদির হিসাবে তাহা অনেক উৎকৃষ্ট হান্তরসবহুল ইংরাজী উপন্যাসের জুলা।”

তিনি ইহার পর 'মদ ষাওয়া বড় দার, জাত থাকার কি উপায়,' কুদিপাঠ,' 'রামায়ণিকা,' 'গীতাঙ্গুর,' 'যৎকিঞ্চিৎ,' 'অভেদী,' 'এতদেশীয় জীলোকদিগের পূর্বাবস্থা,' 'ডেভিড্ হেয়ারের জীবনচরিত,' 'আধ্যাত্মিকা' নামক পুস্তকগুলি প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার কোনও পুস্তকই বৃহৎ নহে, সকলগুলিই অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত ; সকলগুলিই মৌলিক, শিক্ষাপ্রদ এবং জাতীয় ভাবপূর্ণ।

১২২১ বঙ্গাব্দে ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রিন্ট করা যোগেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদের সমস্ত বাঙ্গালী গ্রন্থগুলি একত্রে 'সুপ্রসঙ্গোদ্ধার' নামে প্রকাশ করেন। ইহার ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বসর্বাঙ্গী বলিয়াছিলেন, “তিনিই (প্যারীচাঁদ) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে ; তাহার জন্য ইরোজী বা সংস্কৃতের নিকট ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালী দেশ উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালী দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।”

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে নভেম্বর উদরী রোগে প্যারীচাঁদের মৃত্যু হয়। দেশের সুখপত্র 'হিন্দুপেট্রি' সেই সময়ে এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—
 "ইহার বিদ্যোগে আমাদের দেশ একজন প্রধান সাহিত্যসেবী, একজন কর্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ, একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, একজন অমিতীয় পরিহাস-রসিক, একজন দেশপ্রাণ মহাত্মা ও একজন তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান উপাসক হারাইল।" ইহার এক বর্ষও অমূলক বা অতিরিক্ত নহে।

প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার বহুপণ একটি প্রকাশ্য সত্য আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের গভীর শোক প্রকাশ করেন। রেভারেন্ড কক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ জে সি মারে, বাবু বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভারেন্ড কে এস ব্যাকভোম্যান্ড, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মিঃ রবার্ট টার্নবুল, ডাক্তার ডি বি শিখ, মিঃ এটচ এম রত্নমল্লী, বাবু যতুলাল মল্লিক, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু শিবচন্দ্র দেব, বাবু রামতত্ত্ব লাহিড়ী, মিঃ সি, এইচ, এ ডল এবং মিঃ হাজী হুর মহম্মদ জাকেরিয়া এই সভায় বক্তৃতাাদি করেন। প্যারীচাঁদের চরিত্রসম্বন্ধে দুই চারিজন ইংরাজ বক্তার মত 'হিন্দুপেট্রি' হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। তাঁহার দেশহিতৈষণা ও সততা সৰ্ব্বদে চোখের অর কমানের তদানীন্তন সভাপতি স্কেটলওয়েল বলেন কোম্পানির মিষ্টার মারে বলেন,—

ভারতবর্ষ দুই জন নিখাত লোকের শোকে কাতর।—কেশবচন্দ্র ও প্যারীচাঁদ। কেশবচন্দ্র সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট নিঃশব্দ ব্যক্ত করিতেন; প্যারীচাঁদ দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের অস্ত্র কাণ করিতেন। প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যের ডিকেন্স। তিনি পরিচয়কালে নিঃসঙ্কোচে বলিতেন যে, তিনি প্যারীচাঁদের অপেক্ষা সাধু ব্যক্তি আর দেখেন নাই। এই সাধুতা ও ভারতবাসীদিগের হিতচেষ্টার অস্ত্রই তিনি অরণীয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী মিঃ টার্নবুল বলেন—“তিনি সর্বদাই পরের কথা ভাবিতেন—তিনি সুখ প্রাণীদিগের সুখসম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না। এই সহরের পথে যে বহু পশুপানীয় জলাধার দুই হয়, সে সব তাঁহার কীর্তি। জীবিত কালে তিনি সকলের ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার নাম লোক অরণ্য রাখিবে; তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে।”

তাঁহার চরিত্রের সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে ডাক্তার শিখ বলেন, He had known

the deceased for about 20 years and could concur with those gentlemen who had spoken in bearing testimony to the beauty of his character. তাঁহার সরলতাসম্বন্ধে যেভাবেও ভুল বলেন, Next June would make 30 years from the happy day when he first took the hand of Peary Chand Mittra and from that moment he found that he had a brother man by his side. The highest development of human character was simplicity, and that Babu Peary Chand Mittra possessed in an eminent degree.

এই সত্য কর্তৃক নিযুক্ত স্বস্তি-সমিতির প্রবর্তে টাউনহলে প্যারীচাঁদের একটি বর্ষরম্য উদ্ভাসার্ছ এবং বৈটকাফ্‌হলে একখানি উত্তম তৈলচিত্র প্রদীপিত হইরাছিল। সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরেও ইহার একখানি তৈলচিত্র প্রদীপিত হইরাছে।

যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব প্যারীচাঁদের জীবনের প্রধান প্রধান কার্যগুলি বিবৃত হইল। তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন-কথা বলিতে গেলে বালা! দেশের অর্ধশতাব্দীর উন্নতির ইতিহাস বলিতে হয়; কারণ, এই ইতিহাসের প্রতি অব্যাহতই তাঁহার নাম আছে। দেশের সকল মঙ্গলকাঙ্ক্ষা তিনি আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। প্যারীচাঁদের সম্পূর্ণ জীবন-কথা না বলিলেও পাঠকসমূহ বোধ হয়, উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে এই মহাপুরুষের অদ্বুত সাধনা ও অল্পময় চরিত্রের আভাস পাইবেন। চরিত্রের নির্মলতার, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার, আন্তরিক বেশভাজিতে, সার্বভৌমিক সম্বন্ধতার তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। তিনি ভাবুক ছিলেন—তিনি বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন; তিনি অসংযম্য বিবেকবুদ্ধিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং বাহ্য সত্য ও কল্যাণকর বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা আদর্শ সাহসিকতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তিনি চিন্তাশীল ছিলেন; কিন্তু অতিগভীর বা সমাজবেষ্টা ছিলেন না। পক্ষান্তরে তিনি লোকসমাজে মিশিতে ভালবাসিতেন। তিনি অত্যন্ত কোড়কপ্রিয় ছিলেন। তিনি বহুবর্গকে সরস মুগ্ধিষ্ট কথোপকথনে হাসাইতেন ও নিজে হাসিতেন। তাঁহার বিস্তৃত আয়োজনপ্রিয়তা ও উচ্চ হস্ত তাঁহার অন্তঃকরণের শিশুসুলভ সরলতা প্রকাশ করিত।

শৈশব হইতে এই মহাপুরুষের সংসর্গে থাকিয়া কিশোরীচাঁদ বিব্রাভ্রম শিক্ষা করেন। ইঁহারই চরিত্রপ্রভাবে পরদুঃখকাতর কিশোরীচাঁদ—দেশ-প্রাণ কিশোরীচাঁদ—সমাজসংস্কারক কিশোরীচাঁদ—কর্মবীর কিশোরীচাঁদ গঠিত হয়। কিন্তু কিশোরীচাঁদ তাঁহার অগ্রজ অপেক্ষা আরও সাহসী—আগ্রও নির্ভীক ছিলেন। প্যারীচাঁদ বীয়ে বীয়ে শত্রু হইতে আদর্শ লইয়া, লোকা-চারদূষিত, কুসংস্কারসমাজের সমাজকে উন্নতিমাগে লইয়া বাইতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, বিবেকানিষ্ট কিশোরীচাঁদ লোকাচার তুচ্ছ করিয়া অপূর্ব সাহস ও অসাধারণ নির্ভীকতার সহিত বঙ্গবর্ত্তিতে কুসংস্কারাবদ্ধ সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অভিনব আদর্শ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। লোকের মতামতের প্রতি ভ্রক্ষেপ নাই, কর্মের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি নাই, সেই কর্মময়ের চরণে কর্মফল নিবেদন করিয়া তিনি বিবেকের আদেশ অগ্র-পালন করিতেন। কিন্তু এ স্থলে কিশোরীচাঁদের চরিত্রবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এই কর্মব্রত মহাপুরুষের চরিত্রচিত্র তাঁহার কার্যাবলীর আলো-চনা করিলে বন্দুকের সঙ্গুণে প্রতিভাত হইবে।

শ্রীমদ্বনাথ ঘোষ ।

প্রাচীন ভারতে অর্থনীতি ।

১। কৃষিকা ।

মনোবিজ্ঞান ও দর্শন ব্যতীত অল্প কোন ক্ষেত্রেই প্রাচীন ভারতবাসিনগণ পারদর্শিতা প্রদর্শিত করেন নাই, অথবা অর্থোৎপাদন বা মনুস্মের আর্থিক উন্নতিকামনায় সময়োপযুক্ত করে নাই, এতদপূর্ব জনজ্ঞতি ও মত আবহমান কাল প্রচলিত হইয়া আদিতেছে । কিন্তু এ যে কেবল এক পক্ষেই কথা, সংস্কৃত সাহিত্যোপাধি করিলে তাহার তুহি তুহি প্রমাণ পাওয়া যায় । বস্তুতঃ, প্রাচীন ভারতীয়গণের গ্রন্থে অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ক অনেক উল্লেখ আছে । বর্তমান কালে অর্থনীতিবিষয়ক পুস্তকে সে সকল বিষয়ের আলোচনা দৃষ্ট হয় । আমরা এই প্রবন্ধে তাহারই কয়েকটির আলোচনা করিব ।

২। কৃষি ও তৎসংক্রান্ত কথা ।

অধুনা ভারতবর্ষ যেতদপ কৃষিপ্রধান স্থান বলিয়া কৃষিকে বিশেষরূপে আদর করা হয়, অতি পুরাকালেও সেইরূপ করা হইত । তখন কৃষিবৃত্তির সহিত পশুপালনেরও ঘনিষ্ঠতা ছিল । মনু বলিয়াছেন (নবম অধ্যায়, ৩২৬) “বৈজ্ঞ কৃতোপবীত হইয়া, দারগ্রহণ করিয়া, কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন এবং পশুদিগকেও রক্ষণ করিবেন ।” এই অধ্যায়েরই পরবর্তী শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রজাপতি পশুকৃষ্টি করিয়া বৈজ্ঞকেই উহার ভার্য্যার্পণ করেন । আবার বলিয়াছেন যে, বৈজ্ঞরা যেন কখনও মনে না করেন যে, পশুপালন নীচ কৰ্ম্ম ।*

যৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের সময়েও কৃষিকে বিশেষ প্রভাৱ দৃষ্টিতে দেখা হইত । কোটিল্য বার্তা বা পত্তচারণ (ও বাবসার) কে চারি শাস্ত্রের অন্ততম শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত করিতেন ।†

চাণক্যের সময়ে শূদ্রও সম্ভবতঃ কৃষিকার্য্যে অবলম্বন করিত (১) ।

চাণক্যের সময়ে রাজকৰ্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে গীতাধক্ষক নামক এক কৰ্ম্মচারী

* বৈদিকযুগে, সাময়গী যুগে ও মহাভারতীয় যুগের অর্থনীতিগ্ৰন্থে অন্তান্ত এবং ‘আর্য্যাবর্তে’ প্রচলিত হইবে ।

† সংস্কৃতাদিত ‘অর্থশাস্ত্র’ হইয়া । আর্থিকী, জরী (ভিন বেয়), বার্তা এবং মত-নীতিই চারি শাস্ত্র বলিয়া কথিত হয় । (অর্থশাস্ত্র, ১০ পৃষ্ঠা) ।

(১) ‘অর্থশাস্ত্র’—প্রথম কল্প, দ্বিতীয় খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা হইয়া ।

ধাকিভেন। তিনি কুবিত্ত্ব এবং শুষ্ক, বৃষ্ণ ও আবহুর্ধ্বেনজ হইতেন। এই আবহুর্ধ্বেন বায়ুবিজ্ঞানে (Meteorology) পটু হওয়া প্রয়োজন হইত। বারি-পতন নির্ণয় করিয়া বীজ বপন করা হইত (২)।

বৌদ্ধ জাতকে আমরা কয়েক স্থলে কুবিকার্যের ও ইহার আবশ্যকতার উল্লেখ পাই। জাতক (৩, ২৯৩) পাঠে আমরা তৎকালীন ক্ষেত্রের পরিচাণও জানিতে পারি (৩)।

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এবং বৌদ্ধ যুগে, পশ্বাদি গ্রামস্থ সাধারণ চারণ-ভূমিতে বিচরণ করিত। অবশ্য প্রত্যেক গৃহস্থের স্ব স্ব পুত্র থাকিত; কিন্তু পুত্র সন্তান প্রত্যেক গ্রামে সকল গ্রামবাসীর জন্য এক সাধারণ চারণ-ভূমি থাকিত। চারণা বিপদ ও চতুশ্লব জন্য তালিকাভুক্ত করিতে আদেশ বিবিধ করিয়াছিলেন এবং তিনি এক জনপদের একটি পুত্রচারণস্থান থাকিবে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং পুত্রচারণের জন্য নির্ধারিত বর্ণেরও উল্লেখ করিয়াছেন (৪) এবং পুত্রচারণের জন্য রাজাকে অকর্ষিত ভূমির ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিয়াছেন (৫)।

(২) ‘অর্থপাত্র’—এখন কল, বিত্তায় ৪৩, ১০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই সম্বন্ধে ১৯১১ সনের Royal Meteorological Societyর যুগ্মত্রে আমি এক প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করি যে, অতি প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে এই শাস্ত্রের বখোঁজ আলোচনা হইত।

(৩) অধ্যাপক রীজ ডেভিডস এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, ‘The Brahmin is frequently met with as a cultivator in the Jatakas, both as the holder of large estates and as a peasant proprietor, without apparently labouring under any social stigma, for pursuing a calling by which he lost his Brahminhood; but in the code of Manu we find that should a Brahmin be obliged by distress to subsist by the acts of a Vaisya, he must avoid with care the business of tillage which gives pain to sentient creature’ অর্থাৎ ‘জাতক পাঠে আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ ভূমিকরূপে কার্য করিতেছেন। বস্তুতঃ জাতকে বৃষ্টি হয় যে, ব্রাহ্মণ ভূমিকার্য অবলম্বন করিলে গাছকে আতিশ্রান্ত হইতে হইত না। কিন্তু বস্তুতে বৃষ্টি হয় যে, দুর্ভিক্ষপ্রভ ব্রাহ্মণ ভূমিকর্ষণ ব্যতীত অন্য সকল কর্ম করিতে পারিতেন।’ বহু দশম অব্যায় ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য। বহু বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ও কায়ব উভয়ে হিংসাবহুল ভূমিকার্য পরিচাল্য করিবেন (১০-১৩)। কারণ, যদিও কেহ কেহ ভূমি-স্বীকৃতির অংশটা কতিয়া থাকেন, তথাপি ইহা সজ্ঞান-নিষিদ্ধ। কারণ, এতদুপলক্ষে ভূমিহিত বহু প্রাণীর আগমনের সম্ভাবনা। (১০-১৪)।

(৪) ‘অর্থপাত্র’ এখন কল, বিত্তায় ৪৩, পত্রাংশে অব্যায় ১০৩ পৃষ্ঠা। (৫) ঐ, ঐ, ঐ, বিত্তায় অব্যায় ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভারতবর্ষে যে কৃষিকে প্রভুত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত পাশ্চাত্য পর্যটকগণও সে বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রশংসা রাখিয়াছেন। মেগস্থেনিস (৭) বলিয়াছেন “জানিগণের পরেই ভূমি-কর্মকগণ; এবং ইহাৱাই অত্যন্ত জাতীয় অধিবাসী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক। ইহাদিগকে হুজার্ব কোন অন্ন প্রদান করিতে হয় না; অথবা, ইহাদিগকে কোন প্রকার সামগ্রিক কার্যও করিতে হয় না; কিন্তু ইহারা ভূমিকর্মণ করে এবং রাজাকে এবং স্বাধীন নগর-তালিকে করপ্রদান করে। অণ্ডারিস্রোহ উপস্থিত হইলে, কৃষকগণকে উৎ-পীড়ন করিতে অথবা তাহাদিগের ভূমি নষ্ট করিতে সৈন্তগণের কোন অধিকার নাই; সেই ক্ষণ সৈন্তগণ যখন পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া একে অপরকে হত্যা করে। তখন কৃষকগণকে অনুরে, আপনাপন কার্যে যথা, ভূমিকর্মণ, শস্ত সংগ্রহ, বৃক্ষের লাগা কঠন অথবা শস্তকঠনে, নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়।”

দায়দরস নামক গ্রীসীয় গ্রন্থকার (৮) বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে রাজাই সকল ভূমির অধীশ্বর এবং কৃষকগণ রাজাকে উৎপাদিত ব্রব্যের এক চতুর্থাংশ দান করে। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন যে, রাজকীয় ভূমিতে উৎপাদিত শস্তের এক চতুর্থাংশ রাজা গ্রহণ করেন—কেবল তিন চতুর্থাংশ কৃষক গ্রহণ করে। (৯) চাণক্য বলিয়াছেন যে, রাজা উৎপাদিত শস্তের বষ্ঠাংশ গ্রহণ করিবেন (১০)।

রাজাই যে সকল ভূমির অধীশ্বর ছিলেন, তাহা দায়দরস ব্যতীত মেগস্থে-বিসও উল্লেখ করিয়াছেন। মেগস্থেনিস বলিয়াছেন, “সমগ্র ভারতবর্ষে রাজার সম্পত্তি বলিয়া কৃষকগণ রাজাকে কর প্রদান করে এবং ভূমিতে জনসাধারণের কোন রূপ স্বত্ব জন্মিতে পারে না”। মেগস্থেনিস আরও বলিয়াছেন যে, ভার-তীয় ক্ষেত্রে প্রচুর শস্ত জন্মে। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে শস্ত ও ফল বৎসরে দুইবার করিয়া জন্মে। ভৌগোলিক ইয়াটসবিনিসও বলিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ শীত ও গ্রীষ্ম বৎসরে দুই বার করিয়া বীজ বপন করে (১১)।

(৭) বৎসপাদিত ‘সমসাময়িক ভারত’, দ্বিতীয় খণ্ড ত্রৈলোচী। ১১৪ পৃষ্ঠা।

(৮) ‘সমসাময়িক ভারত’, প্রথম খণ্ড। ৬৪ পৃষ্ঠা ত্রৈলোচী।

(৯) ‘সমসাময়িক ভারত’, দ্বিতীয় খণ্ড। ৪৮ পৃষ্ঠা। “কর ব্যতীত তাহারা রাজকোষে ক্ষেত্রে উৎপাদিত ব্রব্যের এক চতুর্থাংশ প্রদান করে।”

(১০) ‘অর্থশাস্ত্র’ ২, ১৫ ত্রৈলোচী। যত্ন সহজে রাজার অংশের অন্ত ১১১৭২—১৩২ ত্রৈলোচী। এবং বৌদ্ধযুগে একের দ্বয়, একের আট, একের দশ, বা একের বার অংশ অংশিত ছিল।

(১১) ‘সমসাময়িক ভারত’ প্রথম খণ্ড ত্রৈলোচী।

৩। শ্রম ও শ্রমিক—সমবায় কর্ম্য ।

মহু বলিয়াছেন যে, “রাজকার্যে নিয়োজিত দাসী এবং ভূত্যাগণের পদ ও কার্যের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতাপ্রকরণ তাহাদিগের দৈনিক বৃত্তি অবধারণ করা রাজার কণ্ঠবা।” আবার বলিয়াছেন, “অপকৃষ্ট দাসদাসীর দৈনিক বেতন এক পণ কড়ি, ছয় মাস অন্তর এক ঘোড়া বস, এবং মাসিক চারি আটা বা এক স্রোণ অর্থাৎ প্রায় দুই মন ধান্য; উৎকৃষ্ট হতোব ইহার ছয়গুণ প্রাপ্য।” (১২) চাণক্যের সময়ে বেতন অনেক সময় কুলপজ্ঞগণ নির্দ্ধারিত করিতেন। বৌদ্ধ যুগের প্রারম্ভে ও মধ্যকালে অনেক সময় বেতনের পরিবর্তে ভ্রব্যাদি বা পত্র প্রদান করা হইত। কোন কোন সময়, বেতনও প্রদত্ত হইল। কৌটিল্যের সময়ে ক্রীতদাস ছিল। কিন্তু, অর্থাৎ ক্রীতদাস হইতে পারিতেন না। এই সময়ে ক্রীতদাসকে উত্তমরূপে ব্যবহার করা হইত। প্রভুর কথের অপচর না করিয়া, দাস ষোপজ্ঞিত অর্থ ভোগ করিতে পারিত। পরন্তু, দাস উত্তরাধিকারহুত্রে প্রাপ্ত পিতার সন্মতিও ভোগ করিতে পারিত।

রোমেব ইতিহাসের Manumissionএর মায়, ক্রীতদাসও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইত। মূল্য পরিশোধ করিলেই দাসত্ব হইতে উদ্ধার পাওয়া বাইত। উপযুক্ত মূল্য গ্রহণে ক্রীতদাসকে মুক্তি না দিলে দাদন পণ দত্ত হইত।

পূর্বকালে “সমবায়” কথাটি ছিল কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে “সজ্জহতা”, “সভায় সমুখাতারো” প্রভৃতি কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত শব্দটিকে কোন কোন ইংরাজী অমুবাদক guilds of workmen বা workmen employed by companies বলিয়া অমুবাদ করিয়াছেন; ‘শেষোক্তটিকে “Those who carry on any co-operative work” বলিয়াছেন। জাতকে অনেক স্থলে আমরা শ্রমী (শ্রমীর) উল্লেখ দেখিতে পাই। প্রধান প্রধান শিল্পকল সভাপতির অধীনে শ্রমীবদ্ধ হইত। জাতকে অষ্টাদশ প্রকার শ্রমীর কথা পাওয়া যায়। এই সকল শ্রমী রাজকার্য্যপরিদর্শনার্থ আহুত হইতেন। অষ্টাদশ প্রকার শ্রমীর উল্লেখ থাকিলেও পিতৃত বর্ণনা পাওয়া যায় না। আমরা মূত্রধার, লৌহকার, চর্ম্মকার, চৈত্রকর এবং বিভিন্ন প্রকারের শিল্পক ব্যক্তির কথা দেখিতে পাই।

এতদ্ব্যতীত নাবিক শ্রেণী, মালাকার শ্রেণী, বণিক শ্রেণীরও উল্লেখ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক রীজ ভেতিভস্ মহাশয়ের বিদূষী পত্নী মহোদয়। বিশেষ গবেষণাক্রমে দেখিতে পাইয়াছেন যে, কানীরাঙ্কোই কোবাথাক ও শ্রেণীর অধাক—এই দুই পদ সর্বপ্রথমে একজনের উপর অর্পিত হয়। ইংতপূর্বে আর কোনও ব্যক্তি এই দুই পদ একত্রে ভোগ করেন নাই।

অধ্যাপক ভাণ্ডারকার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, এই সময়ে শ্রেণী ছিল। ভূস্বায়, ভূস্বয়িক্রেতা, শত্ৰুবিজেতা, তৈলকার ইহারা সকলেই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিত। এই সকল শ্রেণীর প্রধান ব্যক্তি “শেঠ” নামে অভিহিত হইতেন। ভাণ্ডার ভাণ্ডারকারের মতে কোবাথাক বরং “মহাশেঠী” নামে আখ্যাত হইতেন এবং তিনিই সকল শ্রেণীর আধিপত্য করিতেন। শ্রেণীমধ্যে বিবাদ হইলে শেঠী বিবাদনিষ্পত্তি করিতেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে বিবাদ হইলে কোবাথাক বা মহাশেঠী বিচার করিতেন। ভাণ্ডার ভাণ্ডারকারের মতে এই শ্রেণী বা সজ্জ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এবং তিনি দৃঢ়রূপে বলেন যে, এই সকল শ্রেণী বা সজ্জই পরে গ্রাম্য সমিতিতে পরিণত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকার বুদ্ধদেবের সহিত অজাতশত্রুর কথোপকথন উল্লেখযোগ্য। যথারাজ্য ভাগ্যভাগ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন “হে বুদ্ধ! জ্ঞাননি যে শ্রেণীপ্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতে যোগদান করিলে কি ফললাভ হয়! অজাত শ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ হস্তিপালক, অশ্বারোহী সৈন্য, সারী সৈন্য নরপ্রকার বোদ্ধা, ক্রীতদাস, পাচক, ক্ষৌরিকার, পরিচারক, বোধক, মালাকার রক্ষক, ভূস্বায়, হিসাবরক্ষক প্রকৃতি) নিজ নিজ ব্যবসারে ব্রত থাকিয়া আপনাদের পরিবার পরিপোষণ করে; তাহারা এই পৃথিবীতে সুখে থাকিতে পারে এবং পরিবারবর্গকেও স্বচ্ছন্দ প্রদান করে। আপনায় অহুমোদিত সন্ধ্যাগ গ্রহণ করিলে এই পৃথিবীতে কি ফল লাভ হয়, তাহা আপনি বলুন।”

অজাত অজাতশত্রু উপরে যে ভালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ নহে। যথারাজ্য, যে সকল ব্যক্তি তাহার সুখোৎপাদন করিত, তাহাদেরই নামোল্লেখ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব প্রত্যুত্তরে এই সকল ব্যক্তি ব্যতীত কৃষক ও কয়প্রকারের কথা, এবং এইসকল ব্যক্তির সহিত ও যে তাহার বান্ধ

সম্পূর্ণ ভাষাও রাজাকে স্বগণ করা ইয়া দেন। অবশ্য আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, রাজার এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। আমরা উপরে বলিয়াছি যে, অষ্টাদশটি শ্রেণী ছিল এ কবার উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু অষ্টাদশটিরই নাম পাওয়া যায় না। রাজা যে সকলের উল্লেখ করিয়াছেন তন্মাতীত নির-লিখিত নিম্নলিখণের উল্লেখ পাওয়া যায় :—

১। সূত্রধর—ইহারা জাহাজও প্রস্তুত করিত।

২। স্বর্ণকার প্রভৃতি।

৩। প্রস্তরশিল্পী।

৪। তন্তুকার—ইহারা সাধারণ বস্ত্রাদি বাতীত হৃদয়বস্ত্র এবং কখন ইত্যাদি বয়ন করিত।

৫। চৰ্ম্মশিল্পী—ইহারা চৰ্ম্মপাছুকাদি প্রস্তুত করিত।

৬। কুস্তকার।

৭। হস্তিদন্তশিল্পী।

৮। বস্ত্র-রঞ্জক ,

৯। মণিকার।

১০। মৎস্যাজীবী।

১১। ক্ষৌরকার।

১২। ব্যাধ।

১৩। মাংস-বিক্রেতা ;

১৪। পাচক ও মোদক।

১৫। মালাকার ও পুষ্পবিক্রেতা।

১৬। নাবিক।

১৭। করণ্ড প্রস্তুতকারক।

১৮। চিত্রকর।

ইরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বিবেচনা করেন যে, উপরের তালিকাত্ত্বক সকল জাতিই যে শ্রেণীবদ্ধ ছিল তাহা নহে। তবে অনেকগুলিই যে শ্রেণীবদ্ধ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোন হেতুই নাই ; এবং এই সকল শ্রেণী ইরোপের মধ্যযুগের শ্রেণী বা Guildsএর স্তায় ছিল। (১)

(১) It is doubtful with regard to two or three in this

মুদ্রা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে ঠিক কোন সময়ে যে প্রথম মুদ্রার উৎপত্তি হয়, সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। তবে মৌর্যযুগে যে মুদ্রা ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবং কোটিগুণ্য রাজকর্ণচাক্ষুর মধ্যে “মুদ্রাপরীক্ষক” বলিয়া একজন কর্ণচাক্ষুর উল্লেখ করিয়াছেন। তখনকার প্রচলিত মুদ্রার একটি নির্ভর্যিত ওজন ছিল—ওজন কম হইলে কারিকরের দণ্ড হইত।

জাতকে বিনিময়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বিগণ স্রবর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা ব্যবহারে নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ যুগে যে মুদ্রা বহুল ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল তাহার সূত্রি সূত্রি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক জাতক-পাঠেই এই ব্যরণা বহুল হয়। অবশ্য ছই এক স্থলে বিনিময়েরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বনমধ্যে আহাৰ্য্য সংগ্রহে অনুবিধা ভোগ করাতো, কোন ব্যক্তি স্রবর্ণের অলঙ্কারের পরিবর্তে আহাৰ্য্য ক্রয় করিয়াছিল।

তবে মুদ্রার কি আকার ছিল সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ওজাইই বা কতটুকুই ছিল তাহাও ঠিক অগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কংকালীন মুদ্রা চতুর্ভুজাকারে প্রস্তুত হইত এবং তৎপরে উহার উপরে কোন “ছাপ” দেওয়া হইত। বিনয়পিটকে তাম্রমুদ্রার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। বিনয় পিটকে এতদ্ভাষীত স্রবর্ণ, তাম্র, পিত্তল এমন কি কাঠ ও অলঙ্কার মুদ্রারও উল্লেখ আছে। অর্থাৎ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে কোনটির উপরে “ছাপ” দিলেই উহাকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা যাইত।

বৌদ্ধযুগের কয়েকটি দ্রব্যের মূল্যের কথা উল্লেখ করিয়াই আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। দারাবাহিকরূপে ও বিস্তৃত ভাবে আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া শীঘ্রই কয়েকটি প্রবন্ধ ‘আর্য্যাবর্তে’ প্রকাশ করিব।

list whether they were organised in guilds. But it is certain that they were among the most important branches of handicraft apart from agriculture; and most of them had no doubt, their guilds not unlike the mediaeval guilds in Europe." Mr. Rhys Davids,

এক জোড়া জুতা বা চটীর মূল্য—১০০ হইতে ৫০০ কাহাপণ (কাহাপণ চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা ওজনে ১৩৬ গ্রেণ ছিল) । বুদ্ধদেবকে এক জোড়া পাখুরা উপহার প্রদান করা হয়—উহার মূল্য ছিল এক সহস্র কাহাপণ । গর্ভত আট কাহাপণ মূল্যে বিক্রীত হইত—অথচ অথ সহস্র কাহাপণ না হইলে পাওয়া যাইত না । ২০,০০০ কাহাপণে একখানি রথ এবং জনৈক রাজার হস্তীয় অলঙ্কার ২০,০০০,০০ কাহাপণে ক্রীত হইয়াছিল । বারানসীর রাজার আহাৰ্য্য পাত্রের মূল্য ছিল লক্ষ কাহাপণ । পরামর্শিক মহাশয় কৌরকার্য্যে ৮ কাহাপণ আশ্রয় করিতেন । উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ সৈন্য বৎসরে এক লক্ষ কাহাপণ যেতন স্বত্বপ পাইতেন । চিকিৎসক রোগীর রোগ প্রভীকার করিয়া বোড়স সহস্র কাহাপণে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন । এতাব্যতীত হই জন ক্রীতদাস ও অথ ও শকট লাভ করিয়াছিলেন ।

শ্রীবোধিসত্ত্বনাথ সমাধার ।

আত্মা ।

(হইটম্যান হইতে)

“যরিলে থাকে না আর” লিখিতে এ কথা—

কাঁপে যোর হাতখানি, বড় বাজে বাধা ।

যদি কেউ বেঁচে থাকে—আছে বুতেরাই ;

মিথ্যা আঁমি, নামে ; এই আছি, এই নাই ।

শ্রীযতজুহার চট্টোপাধ্যায় ।

সমালোচনা।

—১ঃ—

সাগর-সঙ্গীত। *

সমুদ্রের রূপ অনন্ত—গতি অনন্ত—ভাগ অনন্ত। তাই চিত্রবিনয়ী সমুদ্র কবির—ভাবুকের—সাধকের চিত্র বিমোহিত করিয়াছে। ইহার বিশাল তরঙ্গবিক্ষোভ, প্রবল বেগ, দূরত্ব কোলাহল; আবার ইহার বিচিত্র উদ্ভাসীল্য মধুর নীলিমা, অনন্ত আকোষকর্ষণপ্রক্ষেপ, পরিবর্তনশীল ছায়ালোক—প্রকৃতিতে আর কোথাও নাই। এত মাধুরী—এত কঠোরতা—সৃষ্টিদেয়ের এমন বিশ্বদ-কর মিলন আর কুত্রাপি দুই হয় না। প্রতীচো বহু কবি সাগরের সম্বন্ধে কবিতা লিখিয়াছেন। সেই সকল কবিতার সংগ্রহই একখানি বিশাল গ্রন্থ। কবি বায়রণের সমুদ্র-সত্যাপন ইংরাজী ভাষায় পাঠকের নিকট সুপরিচিত। ৪০ বৎসর পূর্বে ঐগুরু অক্ষরশ্রেণী সরকারের “শিকানবিশ” অবস্থায় কৃত এই কবিতার অল্পখণ্ড প্রকাশিত হয়—

“সুনীল সতীর সিঁধে কল্লোলিয়া চল,
লক্ষ পোত বক্ষে তব বুঝা ভাসি যায় !
ধরাধাম ধ্বংস করে মানবের বল,
নয়নপরিমার সীমা সাগর-বেলায়।
না থাকে অচড় করু তব নীল কার ;
তব কীর্তি তব আঁকে ; মানব যখন
সহসা সাগরগর্ভে তুষ্টিবিন্দু প্রায়
হাবুডু বুধে ডোবে, কে বল তখন
সে যেহ বহন করে ? কে করে দহন ?
কেবা হরিবোল বলে ? কে করে ক্রন্দন ?”

বায়রণ সমুদ্রকে অনন্তের মূর্তি—অদৃশ্যের আসন বলিয়াছেন। স্টেগবারি, ক্যাথেল, সেনেডোল, পলক, টেনিসন, সুইনবার্ণ, কিপলিং কত কবি কত ছন্দে সমুদ্রের গান গাহিয়াছেন। তবুও সমুদ্র চিরনূতন।

* সাগর-সঙ্গীত—ঐতিহ্যবাহন দাস প্রণীত। কলিকাতা ২০১, কর্তৃত্বগালিদ প্রিট
হইতে ঐতিহ্যবাহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

সমুদ্রসঞ্চীর কবিতার অন্ত নাই। কিন্তু সমুদ্রসঞ্চীর সঞ্চারসম—সৰ্ব-শ্রেষ্ঠ কবিতা সমুদ্র-সলিলে প্রেমাধিকার চৈতন্তের দেহভাগ। তিনি সমুদ্রের অনন্ত রূপে বিবরণের স্বরূপ দেখিয়া—সমুদ্রে আপনার ঈশ্বিতকে প্রত্যক্ষ করিয়া—সাগরের নীলোখিলীলার নীলচলবানী নীলমণিকে লক্ষ্য করিয়া শিখু-সলিলে আত্মভাগ করিয়াছিলেন। তিনি অনন্ত প্রেমের অবতার—অনন্ত-ময়ের সন্ধানে অনন্ত সমুদ্রে দেহভাগই তাঁহার উপযুক্ত পরিণতি। তাই বলিরাছি, সমুদ্রসঞ্চীর সৰ্বশ্রেষ্ঠ কবিতা সমুদ্রসলিলে চৈতন্তের দেহ-ভাগ।

বাঙ্গালার কবি বিজ্ঞেন্দ্রলাল “সমুদ্রের প্রতি” ঈর্ষক কবিতার প্রথমে ব্যঙ্গবিদ্রোপে যে কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন বিষয়গুণে গাঙীর্ষ্যে তাহার পরি-ণতি হইয়াছিল—

“ব্যাপ্তিসম, কালসম, স্থানের বীজবহু মত,
এক হাতে নাপ তব, এক হাতে গঠনে নিরত ;
যুগে যুগে বহে যাও গভীর কম্বলি নিরবধি ;
স্তায়সম নিঃসঙ্কোচ নিজ কার্য সাধিছ, জলবি ।
তুমি গরী ; তুমি অন্ধ ; তুমি বীৰ্য্যমত ; তুমি ভীম ;
কিন্তু তুমি শান্ত ; প্রেমী ; তুমি নিষ্ঠ ; নির্মল ; অদীম ;
অগাধ, অস্থির প্রেমে আসো তুমি বন্ধে ধরমীর,
বিপুল উজ্জ্বলসে, মত্ত বেগে, দৈত্যসম তুমি বীর ।
চাহ বন্ধে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আগ্নেয় ;
বুঝ না সে ক্ষণদেহা অত প্রেম সহিবে কেমনে ?
কিছু তুমি বুঝি কোন বোগিবর, ঘুরে একমনে।
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে ; কোন যথাযোগ্য করিছ সাধনা ;
ধর তব বিপাল ছদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘনমালা ছায়ারাশি যোগিচিন্তে বোঝ আশাসম ;
কহু তুমি ধ্যানরত, মুগ্ধিত নরন, স্থির, প্রেত !
সমুচিত যুগে তব মেঘমন্ডে যেদগান কহু ।
দাও অকাতরে নিজ পুণ্যরাশি যাহা বাস্পাকারে
প্রার্থনায়, উঠি নীলাকাশে, পুনঃ পড়ে শতবারে

আর্য্যবৰ্ত্ত ।



শ্ৰীচিহ্নবৰ্জ্জন দাস ।

BIJOYA PRESS, CALCUTTA.

দেবতার বরসম, প্রাণি' নদনদীহৃদছদি,
জাগাইয়া বসুন্ধার শতশুলভাঙ্গব, বাদ্রিধি ।
তুমি করু বহুভাষী ; তুমি করু শাস্ত, মৌন, হ্রিঃ ;
অতল ; অপরিমেয় ; দিবা ; সৌম্য ; উদার ; গম্ভীর ।"

রবীন্দ্রনাথের "সমুজ্জের প্রতি" কবিতাও বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কার—

"যে আদি জন্মনি, সিদ্ধ, বসুন্ধরা সন্তান তোমার,
একমাত্র কন্যা তব কোলে । তাই তজ্জা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বন্ধ জুড়ি' সদা শঙ্কা, সদা আশা,
সদা আন্দোলন ; তাই উঠে বেদমন্ত্রসম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অধরে, মহেশ্বরমন্দিরপানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মঙ্গল-গানে
জ্বলিত করিয়া দিশিদিশি ; তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চূষন কর আলিঙ্গনে সর্প অঙ্গ বিরে'
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাখর অকলে তোমার
সবন্ধে বেষ্টিয়া ধরি' সত্ত্বর্ণে দেহধানি তার
শুকোদল শুকোদলে । • •

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবতাবা ? জান কি তোমার দ্ব্যত্ম
শীড়ার শীড়িত আজি কিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উচ্ছ্বাস,
নাহি জানে কি যে চার, নাহি জানে কিসে বুচে ভ্রবা,
আপনার মনোমাকে আগনি সে হারিয়েছে দিশা
বিকাশের বরীচিকাঙ্গলে । অতল গম্ভীর তব
অন্তর হইতে কহ শাস্ত্রনাগ বাক্য অভিনব
আবাড়ের অলদমজের বত ; নিভ হাড়পাখি
চিস্তান্তর ভালে তার ভালে ভালে বারবার হানি'
সর্গাঙ্গে সহস্রবার ঘিয়া তারে স্নেহময় চুষা,
বল তারে, 'শান্তি । শান্তি ।' বল তারে, 'সুখা সুখা সুখা' ।"

আজ চিত্তরঞ্জন ‘সাগর-সঙ্গীত’ উপহার লইয়া বঙ্গবাণীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন । ‘সাগর-সঙ্গীত’ পাইয়া কত পুণ্যতন কথা মনে পড়িল ! প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ পূর্বের কথা ; চিত্তরঞ্জনের গীতি-কবিতাগুলি ‘মালাক’ প্রকাশিত হইয়াছিল । সেই সব কবিতায় যে চরিত্র কবিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, তাহার প্রত্যয়ন হয় নাই । এই সুদীর্ঘকাল বাদ্ধানী পাঠক কবির বঙ্গবাণীসেবার পরিচয় বা প্রমাণ পায় নাই । তাই এই অন্তর্কিত সঙ্গীত-কবিতা আবারও এত আনন্দ । কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে একটু দুঃখের কথা আছে । ‘সাগর-সঙ্গীতে’ যে উদাত্ত স্বর স্নানিতে পাইয়াছি, ‘মালাকের’ কবিতায় তাহা ছিল না সত্য ; কিন্তু সে সব কবিতায় যে সৌরভ, যে সহানুভূতি, যে কোমলতা ছিল, তাহাতে মনে হয়, তেমন কবিতা আরও পাইলে আমরা আনন্দিত হইতাম ।

“আমি তো সঁপিনি ক্ষুদি আপনি পড়েছে তুলে
নিশীথের সুঘোরে তোমারি চরণ-মূলে ।
সরণেরে দেব বলে পরাণ হুঁজিছ হার ।
ভুবন ভরিয়া দেখি, সে প্রাণ তোমারি পায় ।”

এই ক্ষুদ্র কবিতাটি তাবে ও বাবুর্জো, লঘুতারও সম্পূর্ণতায় হারিয়েনের কবিতাই স্বরণ করায় ।

‘মালাকের’ কবিতাগুলিও ওষধের কবিতার মত কবিতাও ছিল—

“দিন গেল, আন সাকী । প্রমত্ত যদিও
ভরিয়া সুবর্ণ-পাত্র । করিলে চূষন—
স্নানস্থখী দিবসের আলোক সুখীরা
আরক্ত চকল হয়ে, ভরিবে জীবন ।”

এই সব কবিতা—আর সর্বোপরি পুস্তকের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা ত্রিবিধ-রোগগ্রস্ত সমাজে দিব্য বিদ্যোত উপস্থিত করিয়াছিল ; চিত্তরঞ্জমকে সে লজ্জা নিমিত্ত হইতে হইয়াছিল । এই সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতার বিষয় ‘গারবিলাসিনী’ । দেবতার নৈবেদ্য কুহুরকে দিয়া—প্রাণহীন প্রেমে অভিনয় করিয়া—লজ্জাহীন নিঃসঙ্কোচে দেহপণ্য বিক্রয় করার যাতনা এমন তাবে বঙ্গসাহিত্যে আর কোথাও বর্ণিত দেখি নাই—

“বাহ্য আছে সব লও তুলে।
 রেখে যেয়ো রক্ত আলা,
 তুলে নিও পুশমালা;
 রক্তনী প্রত্যন্তে বেও তুলে
 অন্ধ নিলি শেষ হলে সব যেয়ো তুলে।
 আবার সকলি লও তুলে।”

“তুমি যেয়ো এলে উবারাষ্ট্র।
 পুণ্য দেবে শুভ হালে
 পশিও পবিত্র বাসে;
 রক্তনীর কলঙ্কের বাষ্ট্র—
 তুলে যেয়ো রক্তনীর কলঙ্ককাহিনী।—
 তধু আনি র'ব কলঙ্কিনী।”

আদি

“এ বরার কলঙ্ক তুলিয়া
 পরেছি পুশিত শিরে।”

“নাহি প্রাণ-মধু বেধে মোর
 নাহি পুষ নাহি লজ্জা
 জীবন বিলাসলজ্জা
 কাজল নয়নে গুম তার।”

এইরূপ করুণাবিহীন উক্তি কেবল তলটোয়ারের রচনার দেখিয়াছি—
 “Ah! Sir, if you could only imagine what it is to be obliged
 to caress indifferently an old merchant, a lawyer, a monk,
 gondolier, an abbe; to be exposed to abuse and insults;
 to be often reduced to borrowing a petticoat, only to go and
 have it raised by a disagreeable man; to be robbed by one
 of what one has earned from another; to be subjected to
 the extortions of the officers of justice; and to have in
 prospect only a frightful old age, hospital, and a dunghill;

and you would conclude that I am one of the most unhappy creatures in the world."

‘মালকের’ সাগরসঙ্গীত কবিতার আর ‘সাগর-সঙ্গীতের’ কবিতার আলোচনা করিলে উভয় পুস্তকের ভাবে প্রভেদ বুঝা যাইবে। ‘মালকে’ কবি লিখিয়াছিলেন,—

“চন্দ্রমা-চুড়িত শোভা সুনীল আকাশে,
তালে তালে নাচিতেছে সাগরের জল ;
অর্ধ বায়ু বহে’ যায় আর মনে আসে
সেই আঁধি, সেই হাসি, সেই অশ্রুজল ।”

‘সাগর-সঙ্গীতে’ কবির মনে অল্প ভাব জাগিয়াছে—সে অনন্তের আহ্বান—

“ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি এ গানে ।
আমি শুধু চেয়ে আছি প্রভাতের পানে ।

গীতভরা স্বর্ণলোকে হুটে পুষ্পদল,
তোমার চরণ বেড়ি করে টলমল ।
তোমার সঙ্গীত আজি বিহকের প্রায়,
রাখি সে সোনার স্বপ্ন তার সর্ব গায়
উড়িয়া বেড়ায় যোর হৃদয়-আকাশে,
প্রেমের তরঙ্গে আর বসন্ত-বাতাসে ।
কোথায় রাখিব আজ এ স্রবের ভার,
কায়ে দিব আজ যোর অশ্রু উপহার !

সকল স্রবের রাশি পুষ্প হয়ে হুটে,
সব হৃৎকণ্ড আজ বোর গীত হয়ে উঠে ।”

এ যে তোমারই গান—

“তরঙ্গে তরঙ্গে আজ যেই গীত বাজে,
সোনার স্বপ্নভরা প্রভাতের মাঝে
সেই গীতে ভরি গেছে হৃদয় আমার,
গগনে পবনে বহে সেই গীতধার ।

জানি না কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানি না গানের সুর, তান লর মান,
আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়াস্তর্য আমার পরাণ !
সাদ্ধা পাই তারি আমি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলোয়াকে সঁাকের আঁধারে।

তোমারি এ গীত প্রাণে সারা দিনমান,—
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিবাণ।
আমি যত তুমি বস্ত্রী।—বাক্যও আমায়ে
দিবস রজনী তারি আলোকে আঁধারে।”

হে বন্ধ, হে সখা, হে প্রাণারাম, তুমি আমাকে বাচাল করিয়াছ—
“I do but sing because I must.”

তুমি বহরঙ্গী। তোমার এ কি রূপ ?—

“আজি মেঘপূর্ণ দিন ধূসর আঁধার !
তরঙ্গ তরঙ্গপরে কাঁপাড়ে পড়িছে
অশান্ত বেদনাতরে হুলিছে হুলিছে
কাঁপিছে গজ্জিছে ঘেন মহা হাহাকার।”

তুমি আজ “উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত, অধীর।” কিন্তু—

“হে রক্ত বরণ দেব। জটী জটায়র।
প্রলয়-ত্রিশূল তব সংহর। সংহর !
জীবনের ছেড়ে দাও ঐতিহ্যে মরিতে,
আপন হৃদয়-কুঞ্জে আপনারি গীতে।

রাখ রথ ! শান্ত হও। ওগো রণশ্রান্ত !
হে ঘোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্রান্ত !”

হে প্রেমিক, তুমি কিরিয়াছ ? আমি যে আপনি তোমাকে বরা দিয়াছি।
আজ তুমি শান্ত—তুমি সুন্দর—হে আমার চিত্তচোর—

“কি শান্ত সুন্দর চোখে, অর্পণ আমার !
চাষিছ আমার পানে এ বোহ আঁধারে।

কথা মোর, তোমা মোর, সজীৱ আবার,
তবু হয়ে গেছে এই সজ্জার মাঝারে ।”

সত্য, আমি তোমার ভুলিয়া ছিলাম । কিন্তু—

“যেমনি ডাকিলে তুমি গভীর গর্জনে,
অনন্ত রাগিনীভরা ধ্বনিতে তোমার,
ছন্দ-মছন্দ করা বিপুল তর্জনে,
ভেসে গেল অন্তরের এপার ওপার !
ডাকিল সে খেলাঘর প্রদীপ নিবিল,
আবারে তোমার বকে ডুবাইয়া দিল ।”

আজ বিশ্ব শান্তির—“মহাশান্তি নীরবতা ।” আজ
“মাদ্রাহীন ছায়াভরা বৃন্দ এ অন্ধকারে,
আপনার বাকে তাই ডুবাইছ আপনারে ।

• • •

সাবন তখনে আজি কুহুম উঠেছে ছুটি
সকল গগন ভরে’ ! তোমার নয়ন দুটি
ভক্তিরসে চুসু চুসু ; বিগলিত করণার ।
তোমার স্তন্যদল নেচে নেচে বহে যায় ।
গগন ভরিয়া গেছে সাবন গভীর বোলে,
চরাচর ছেয়ে আছে যত্ন কীর্তনরোলে ।
হরিবোল ! হরিবোল ! করতাল বাজে বেন,
ছন্দে বাজেনি কত গভীর বৃন্দ হেন ।
মুক্তবাহু প্রভাতের আনন্দকীর্তন তারে,
নাচিছে পাগল হয়ে অন্তরের চারিধারে ।”

আমিও এই শান্তির পিপাসী—গতায়তপ্রাপ্ত—কাতর—

“এপার ওপার করি পারি না ত আর !
আজ মোরে লগে বাও অপারে তোমার ।

• • •

খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের বাকে,
খুঁজেছি বেখানে তব গীতধ্বনি বাজে !

তোমার অপূর্ণ ওই আলো অন্ধকারে,
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে।
হে যোর আজন্ম সখা। কাতারী আমার।
আজ যোরে ল'য়ে যাও অপারে তোমার।”

‘মালকের’ সম্বন্ধে ‘সাগর-সঙ্গীতে’ আকুল—চকল বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে।

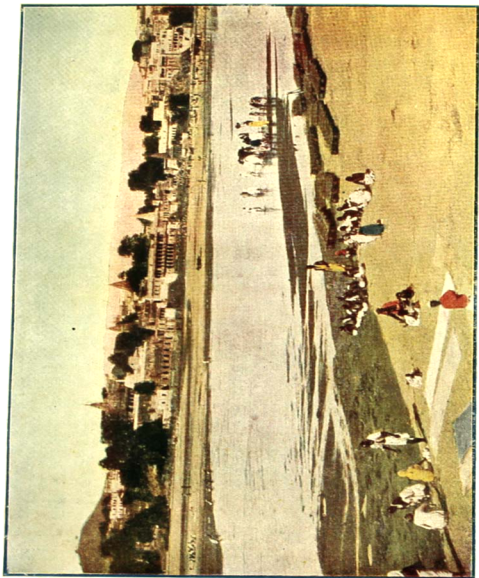
আমরা পাঠকে ‘সাগর-সঙ্গীতে’র কবিতার সৌন্দর্য্য দেখাইলাম। কিন্তু পুস্তকের সম্ভার কথা—বহিঃসৌন্দর্য্যের কথা না বলিলে সমালোচনা অসম্পূর্ণ গ্রহিয়া যাইবে। এমন ছাপা, এমন ছবি, এমন বাঁধা বাঁজালা পুস্তকে আর নাই। পত্র পত্র সমুদ্রের ও আকাশের চিত্র অঙ্কিত—তাহার উপর কবিতা, সেও চিত্র—তবে বর্ণে নহে, কথায়। যথো যথো সাগরের ও আকাশের ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র। বাঁজালায় এরূপ সম্ভালাভ আর কোন পুস্তকের ভাগ্যে ঘটে নাই। পুস্তকের মলাট হইতে পত্রনিদর্শক পর্য্যন্ত সাগরের সৌন্দর্য্যে অন্ধর। ‘সাগর-সঙ্গীত’ বঙ্গ-সাহিত্যে অপূর্ণ বস্তু।

জন্মভূমি ।

—:~:—

যে মাভঃ ! জনমভূমি ! বেহকাঙ্ক্ষি লয়ে
 পরিগ্রাহ কি সুন্দর বেশ,
 জগতের মাঝে শুধু একমাত্র হেরি
 এই স্বর্ণ—স্বপনের দেশ ।
 জামল অকল তব দিগেছ লুটায়
 এই দীন সম্মানের তরে,
 করুণায় নিছ নদী হ্রদে তোমার
 ব'য়ে যায় কি আনন্দতরে !
 তোমার ক্রোড়েতে কত লতা উপবন
 কত তরু বিপাল ছায়ার,
 ভগ্ন হ্রদের মাঝে মধুর সমীরে
 কত প্রেম লাভি দিয়ে যায় ।
 আশায় আশায় যেন থাকি চিরদিন
 ওই তব ঐশ্বর্য চুমি,
 জনম জনম বেন লভি ওই কোল
 হে আমার চিরপুণ্যভূমি !

ঐনুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ।



চির-মিলন ।

—••—

নিজাঘে তোমারে বাসি কেমনে ছাড়িব আমি
হাথে যে গো পুড়ে হ'ব ছাই,
শীতল চরণ বিনা কেমনে বাঁচিবে দীনা
ভুবনে শরণ আর নাই ।
পাখাখানি হাতে ক'রে বসিয়া শিয়র প'রে
যদি নাহি কর গো ব্যঞ্জন,
শীতল আঙ্গুল দিয়ে নাহি ধাও বুলাইয়ে
অন্ধ হবে বিনিম্র নরম ।
বরিষার দিনে প্রিয় জদিপরে বরশীঘ
রক্তশীত অন্তরেত পুরে,
হৃদ্যোগ-ভামনী নিশি, ঝাঁপিবে যে দশদিশ
কেমনে তোমারে রাখি' দূরে ।
স্বহৃদ্যানি নিরঞ্জন শুনি মেঘ-গরজন
আতকে যে শিহরিবে কার,
কাহারে ঝাঁকড়ি ধরি' ঝাঁপারে শরনপরি
অন্তর লভিব বল হার ?
শরতের দিনে প্রভু ছাড়িতে কি পারি কত
জ্যোৎস্নার ভানিবে ঘরাতল,
তব কোলে রাখি শির পিরে সেই সুধানীর
শুনিব পাখীর কলকল ।
উৎসব-বীণারী বাজে গেছে গেছে হিড়ামাকে
সবে চুমে প্রিয়ের বয়ান,
জনগণ কোলাহলে মায়ের দেউলতলে ;
যোর কি গো হবে' বলিমান ?

যেমন্তের দিনে ঐধু হে মোর জীবন-যধু
 তোমারে ছাড়িব কোন্‌ দূখে ?
 শ্যামে ভরে যাবে ধরা রাসে বিশ্ব বসন্তরা
 মোরি শ্যাম রহিবে না বুকে ?
 শেফালি পড়িবে অরি আমি বা কাহারে ধরি' ?
 তারি' সাথে পড়িবে যে করে',
 এ নারীজীবন মম শুকাবে নৌহার মম
 তুমি যদি নাহি রাখ ধরে' ।
 হে মাধব, শ্রীতের দিনে বাঁচিব কি তোমা বিনে
 কে দিবে যে তাপ আর আলো ?
 হে মোর অরুণ নব করুণা-কিরণ তব
 যুগে চোখে যদি নাহি ঢালো,—
 তালে গন্তে ঘনবাস উক তব বাহুপাশ
 তত্ত্ব চুয়া অধরপাতায়,
 ফুলার সজাপছাড়া পাখী হবে' প্রাণহারী
 দেখিবে পালক উড়ে যায় ।
 বসন্ত-বাসরে সখে অশোক বহুলে বকে
 বরনী হাসিয়া হবে সারা,
 তুমি যদি কাছে রহি ব্যাকুল কামনা সহি
 আমাদের না কর আমিহারা,—
 তা হ'লে দেখায়ে দিও এ মিনতি পারে প্রিয়
 দীঘির পতীর কালো জল,
 কোকিল মরিবে কেন আমাদের পাঠারো খেন
 পত্রপুটে কবীর গরল ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

ময়নাগড়।

অতীত হিন্দু-পরিবার শীলাভূমি গৌরব-গর্জোচ্ছল প্রাচীন তাম্রলিপি (তমলুক) নগরীর নাম ইতিহাস-পাঠকগণের অপরিচিত নহে। উহার পশ্চিমে সুবুর অতীত মহিমার সাক্ষিবস্তু প্রাচীন ময়নাগড় অদ্যাপি সুবর্ণ-রেখা নদীতীরে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর ইহার সে পূর্ব-গৌরব, সে প্রবল প্রভাব ও প্রতিপত্তি নাই, কেবল একটা লুপ্ত মহিমার মরণোদ্বৃত্ত ভাষাতিঃ সমগ্র স্থানটিতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; এই প্রাচীন গড় ও তৎসংলগ্নিত স্থানের সহিত অতীত ইতিহাসের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি ও তৎ-প্রোতভাবে বিভাঙিত রহিয়াছে!

ময়না রাজবংশের অধিকারকালে এই স্থানটি গড়বাটিকা ও মানা দেব-মন্দিরে সুষোভিত হইয়া অপূর্ণ সুখা বারণ করিয়াছিল। অতীত সে সৌন্দর্য্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিলেও অতুক্তি হয় না। ময়নাগড়ের অভ্যন্তরস্থ প্রদেশের বহির্ভাগে চারিদিকে একটি পরিখা বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা বিশালতায় একটি হ্রদের সদৃশ। এই পরিখা-বেষ্টিত ভূমিভাগ অর্ধাৎ অভ্যন্তরগের পরিমাণ ৫৩২৫০০ বর্গফুট। উক্ত পরিখার বহির্ভাগে আর একটি বহির্দুর্গ আছে, তাহার বহির্দিকে চতুঃপার্শ্বে যে একটি পরিখা রহিয়াছে, তাহার আভ্যন্তরিক পার্শ্ব প্রতি দিকে ১৪০০ ফুট দীর্ঘ। এই দ্বিতীয় পরিখাকে সীমা করিলে অভ্যন্তরস্থ গড়ের পরিমাণ ৩০৭ বর্গ বিঘা হয়। পূর্বে গ্রীষ্মকালে এই দুই পরিখাতে ২০ ফুটের নূন জল থাকিত না। বাহিরের পরিখার পশ্চিমে ও অষ্টিকোণে আভ্যন্তরিক পরিখার প্রবেশের দ্বার আছে। অভ্যন্তরগের চতুর্দিকে প্রথম পরিখার পার্শ্বদেশ দিয়া একত্রণ পার্কিত্য বাঁশের কাড় একপ নীচুভাবে সন্নিবিষ্ট যে, উহার মধ্য দিয়া কোন অস্ত্র প্রবেশ করিতে পারে না। কথিত আছে, মহারাষ্ট্রের সেনাগণ অনেক বার প্রথম পরিখা উত্তীর্ণ হইতে ঘাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিখার মধ্যবর্তী বহির্দুর্গ সৈন্যাদিগের অবস্থানভূমি ছিল। এই স্থান এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। উড়িষ্যার কমিশনারের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, পূর্বে উত্তর পরিখাই গভীর জলে ও হুজীয়ে পরিপূর্ণ থাকায় সপ্তরণে গড় অবরোধ করা পক্ষের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

পৃথিবী দশম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ইতিহাসে আদ্যময় ময়নাগড়ের

বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহার পূর্বের ইতিহাস অতীতের অন্ধকারময় গর্ভে বিলীন বলিয়া মনে হয়। ষষ্ঠপালের রাজত্বের প্রথমভাগে কর্ণসেন সেনভূম ও গোপভূম প্রভৃতি স্থানের অধিপতি ছিলেন। সোম বোমের পুত্র ইছাই বোম কর্ণসেনের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে হুঁড়ে পরাজিত করিলে তিনি উপায়ান্তর না পাইয়া ষষ্ঠপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহার স্রাণিক। রাজাবতীর সহিত পরিণয়-স্বত্রে আবদ্ধ হইলেন। ষষ্ঠপালও ইছাই বোমের সহিত হুঁড়ে পরাস্ত হইলেন। তখন ইছাই বোম বাণীন-ভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কর্ণসেন কর্ণপাল কর্তৃক ময়নাগড়ে প্রেরিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ১০০০ খ্রষ্টাব্দে কর্ণসেন ইছাইলা সংবরণ করিলে তৎপুত্র লাউসেন ময়নারাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন এবং পিতৃশ্রদ্ধা ইছাই বোমকে হুঁড়ে নিহত করিয়া তাঁহার রাজত্ব ধ্বংস করিলেন।* বনরামকৃত শ্রীধর্মমঙ্গল পাঠে জানা যায় যে, কামরূপের অধিপতি কপূরধবলকে দমন করিবার জন্য ষষ্ঠপালের পুত্র লাউসেনকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়াছিলেন এবং পরিণেবে তাঁহার সহায়তায় কৃতকার্য্যও হইয়াছিল। List of Ancient Monuments in Bengal নামক গ্রন্থে ময়নাগড় ও রাজা লাউসেন-সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল,—

“It appears from the family records the fort was originally constructed by one of the semi-mythical heroes of this district Raja Lawsen at the time when the district was under the dominion of Gaur Rajas.”

অতাপি ময়নাগড়ে যে ষষ্ঠপালের পরিদৃষ্ট হয়, তাহা লাউসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গঙ্গপতিবংশীয় চুড়ঙ্গদেব উৎকলে সাম্রাজ্য-বিস্তার করেন, তৎকালে রাজা কালিদাস সামন্ত নামে একজন বিখ্যাত বিজয়ী বীর তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি সব্বলের † অন্তর্গত বালিনীতাগড়ে বাকিয়া রাজা শাসন ও উৎকল-সম্রাটের এতদকালের সেনাপতিত্ব করিতেন। ‡ এই বালিনীতাগড় যে কোন্‌ স্থানে কত বৎসর পূর্বে

* বাছালাল পুরাণতঃ ।

† উহা এখনে ‘সব্বল এদেশ’ নামে অভিহিত হইত, পরে মঙ্গলদান অধিকারে সব্বল পরম্পরা নামে অভিহিত হয় ।

‡ তৎকালের ইতিহাস ।

কোন্ ভূপতি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না। রাজা কালিদাসের অবন্তন পুরুষগণ “গড়জাত রাজা” নামে পরিচিত। তাঁহার বালিসীতাগড়ে থাকিয়া সবল প্রদেশ শাসন করিতেন।

অজ্ঞান, অরোহণ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ নামে একজন বিখ্যাত ভূপাল ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ময়নাগড়বংশের প্রতিষ্ঠাতা। * এই গোবর্দ্ধনানন্দ হইতে এই বংশ “বাহুবলীন্দ্র” উপাধিতে ভূষিত ও বিখ্যাত হয়। ইহাকর্তৃক ময়নাগড় অধিকারসম্বন্ধে মতবৈধ পরিদৃষ্ট হয়। ‘ভমসুকের ইতিহাস’-প্রণেতা বলেন, “গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র যখন বালিসীতাগড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন উৎকল-সম্রাট্ট দেবরাজ, তাম্রলিপ্ত-রাজের ক্ষমতা শেষ করিয়া বালিসীতাগড়ের রাজ্য নিকট কর চাহিয়া পাঠান। রাজা কর দিতে অস্বীকার করায় উৎকলসম্রাট্টের সৈন্তগণ কর্তৃক বালিসীতাগড় অক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ হুত হইয়া উৎকলেশ্বর-সমীপে নীত হইলেন, এবং সন্ধীত-বিজ্ঞায় ও রণপৈপুণ্যে তাঁহাকে ভুট্ট করিলেন। তাহার ফলে রাজা সিংহাসন.....ও বাহুবলীন্দ্র উপাধি লাভ করিলেন। যে সময়ে রাজা গোবর্দ্ধন এইরূপে সম্মানিত হন, তৎকালে ঐশ্বর হই নামক অপর একজন বীরপুরুষ লাউসেনের গড়ে আধিপত্য করিতেছিলেন। ঐশ্বর হইকে পরাজিত করিয়া গোবর্দ্ধন ময়নাগড় অধিকার করিলেন।† ঐযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, “হুত ও সন্ধীত-বিজ্ঞায় বিশেষ পারদর্শিতাযেহু তাঁহার বীরত্ব-দর্শনে ঐতিহ্যে যেদিনীপুত্রের তখনকার বাবীন মহারাষ্ট্র সর্দার মহারাজ দেও-রাজা বাহাজুর ইহাকে রাজা ও বাহুবলীন্দ্র উপাধি এবং ময়না (ময়নাচৌকর) পরগণা পারিতোষিক দিয়া সম্মানিত করিয়া যান।”‡ List of Ancient Monuments in Bengal নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, “At the time of Marhatta ascendancy, the descendant of Lawsen was ousted, owing to default of payment of the usual tributes and the possession was made over to Bahubalindra, the founder of

* The List of Ancient Monuments in Bengal.

† ভমসুকের ইতিহাস।

‡ দিব্যকোষ।

the Mayana Raja." ময়নাগড় হস্তগত হইলে গোবর্দ্ধন প্রাচীন গড় তাকিয়া ফেলিয়া নতুন করিয়া গড়নিৰ্ম্মাণ করিলেন; পরিখাদি গভীর ও বিশাল করিয়া ফেলিলেন। 'বিষকোষে' প্রকাশ—রাজা গোবর্দ্ধনের পুত্র পরমানন্দ কর্তৃক ময়নাগড় নিৰ্ম্মিত হয়। রাজা গোবর্দ্ধন এই প্রসিদ্ধ গড় নিৰ্ম্মাণের পর বালিনীভাগড় পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক এই গড়ে রাজধানী স্থাপিত করেন, রাজা এই ময়নাগড়ে পৌৰী পূর্ণিমায় অভিবিক্ত হইলেন। এই অভিবিক্ত উপলক্ষে ত্র্যবিড়ম্বেশ হইতে কতিপয় সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনীত হইলেন। তদবধি প্রত্যেক পৌৰী পূর্ণিমায় অভিবিক্তক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

ময়নাগড়ের তিন কোণ দক্ষিণে রাজা গোবর্দ্ধন আর একটি দুর্গনিৰ্ম্মাণ করেন। উহা তিলদাঙ্গলচকের গড় নামে প্রসিদ্ধ। এই গড়ে বহু দেব-দেবীর মন্দির বিস্তৃমান রহিয়াছে। তদুপাে তিলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রদান। বালিনীয়া, ময়না ও তিলদা দুর্গত্রয়ের অভিব্যক্ত পার্শ্বভাষাঙ্গণ হইতে মহা-রাষ্ট্রীয় সৈন্ত পৰ্য্যন্ত প্রতিক্রম হইয়াছে। তিলদা, জলচকের নিকটে আট নয় মাইল বিস্তৃত যে একটি নিম্নভূমি দৃষ্টিগোচর হয়, উহা এক সময়ে লাগরের খাড়ি ছিল বলিয়া বোধ হয়, কালক্রমে পলিমাটিতে তদ্রূপ হইয়া আসিয়াছে। * এখনও উক্ত নিম্নভূমির নিকটবর্তী হান-সমূহের স্মৃতিকা গভীর করিয়া খনন করিলে, ঐ স্থান যে পূৰ্ব্বকালে সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল, তাহার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। স্মৃত্তরায় তিলদা, জলচক প্রভৃতি স্থানসমূহ যে একসময়ে সাগরতীরবর্তী বন্দর ছিল, ইহা সহজেই অনুমেয়। †

গোবর্দ্ধনানন্দের স্মৃত্তর পর যথাক্রমে পরমানন্দ, মাধবানন্দ, গোহৃদা-নন্দ, কৃপানন্দ, জগদানন্দ, ব্রজানন্দ, আনন্দানন্দ, দ্বাধাত্মানন্দ বাহ-বলীক্স ময়নার রাজগড় অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রাজা কৃপানন্দের পুত্র জগদানন্দ হইতেই ময়না-রাজবংশের গৌরবের ভ্রাস হইতে থাকে এবং রাজা ব্রজানন্দের সময়ে ময়নারাজ্য কোম্পানীর বন্দোবস্তের অধীনে

* "The depression was perhaps a creek of the sea, which must have silted up in course of time." The List of Ancient Mounments in Bengal.

† "তিলদা, জলচক একসময়ে অতি প্রবাহ বাদিনা-বন্দর ছিল।" তদনুসারে ইতিহাস।

আইলে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাক্রাম বাহুবল্লভের ময়নাগড় ও তৎসম্বন্ধ সম্পত্তির আর মাত্র বিংশ হাজার টাকা ছিল। তাঁহার তিন কুমারই “ছত্র-পতি-রাজ” নামে অভিহিত। তন্মিত্তে পাই, ই’বাদের পূর্ব-পুরুষগণের কোনও এক ব্যক্তি ভাষ্যলিপির রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ঐগ্রামপুত্র প্রভৃতি নগরখানি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন।

চির-সার্থী ।

—○—

বিবলের অবসানে কর্ণপ্রাপ্ত প্রাণ
 বিরলে যখন লুটে ভূমির লব্যায়,
 নত হুখে ভয় ছবি শান্তি লভিবারে
 কাতরে কাহার পানে অনিষিধে চায় ।
 তখন জাগিয়া উঠে কা’র মূৰখানি
 ভরি’ উঠে আঁধি দুটি কা’র করুণায়
 কা’র পানে ঢেয়ে আমি ভুলি সে বেদনা
 কে দেয় সাধনা যোগে নীরব ভাষায় ?
 প্রত্যতে যখন আমি মেলিয়া নগ্ন
 চেয়ে দেখি তা’র পানে প্রথম আলোকে,
 কি সৌম্য ব্রহ্মি তা’র প্রশান্ত নগ্ন
 ভরি’ যায় ছবি মোর নবীন পুলকে,
 নিরন্ত দেখার পথ প্রবর্তার সন্ম
 নীরবে যুঁছিয়া বয় পরাণের ব্যথা
 হুখেতে সাধনা দেয় হৃৎকের আনন্দ
 সে আমার জীবনের আরাধ্য দেবতা।
 ঐশ্বরী লাভণ্যময়ী বহু ।

প্রত্যর্পণ ।

—•—

(৪)

নীহারের বিবাহ । দেওয়ানজী পাত্র স্থির করিয়া দিয়াছেন । তাঁহার একটি শ্রালক বিপরীক—একটু বয়স হইলেও ভয়লজ্ঞান ; ঘরে ছ'পরশ আছে—নিষাপড়াও তার ভাল রকম জানা শুনা আছে ; তাহার প্রমাণ—কোন “সাহেব”কে সে একবার বাজালা পড়াইয়াছিল । শ্রালকটি সৎশেজাত । তাহার সৎগুণের বাখ্যা দেওয়ানজী এই কয়দিনে চুরাইতে পারিতেছেন না । কমলা যাহা একবার “না” বলেন, তাহা আর “হাঁ” হইতে পারে না, জানিয়া দেওয়ান আর নাতিটির কথা অধিক বলিতে সাহস পায়েন নাই ; অগত্যা মুহিব্বীর জেদে তাঁহার ভবঘুরে ও সকল রকম নেশায় পরিপকু অতি স্নেহের সর্বকনিষ্ঠ জাভাটির—যিনি বহুদিন নিরুদ্দিষ্ট থাকিয়া সম্প্রতি তাঁহার ক্ষেত্রে ভর করিয়াছেন, সেই শ্রালকটির—একটা উপায় করিয়া দিতে কৃত-সকল হইয়াছেন । কমলা এত শুধা জানিত না—সে হাতের নিকটে আর অন্য পাত্র না পাইয়া অগত্যা এই পাত্রেই বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছে । এই মাসের মধ্যেই সে যে নীহারের বিবাহ দিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, এ পাত্র ছাড়িয়া দিলে তাহার সে জেদও রক্ষা হয় না । নীহারের বিবাহ দিয়া লাঠা চুকাইয়া সে একটা কার্য্য করিবে, মনে মনে স্থির করিতেছিল । অরুণ কলিকাতায় কানাই বাবুর কাছে যাইতেছি, এই কথা সকলকে বলিয়া সেই যে চলিয়া গিয়াছে, আজ দশ বাঘো দিন হইল, আর তাহার কোন সংবাদ নাই । সে জীবনে যাহাকে কখনও দেখে নাই, সে ননদকে পত্র লিখিতেও কমলার লজ্জা করিতেছিল—তাহা ছাড়া কি বলিয়াই বা পত্র লিখিবে ! তাহার চেয়ে একবার দেখা করিতে গেলেই অত্যন্ত আত্মীয়তা প্রকাশ পাইবে এবং অরুণও যদি সেখানে থাকে—কমলা এর বেশী আর কিছু ভাবিতে পারিতেছিল না । অভিমানে—বেদনার তাহার হৃদয় কুলিয়া কুলিয়া উঠিতেছিল । অরুণের এমন ব্যবহার সে জীবনে যে কখনও পায় নাই ।

যাক্ সে কথা । এখন বিবাহটা এক রকমে চুকিয়া গেলেই বাচা যায় । দেওয়ানজী কলিকাতা হইতে শত্ৰুক্রীত ছই হাজার টাকা র গহনাগুলি ওজন করিয়া নীল কাগজে মুড়িয়া এবং একটা রত্নিন্ বস্তির মধ্যে তিন হাজার টাকা

গনিয়া পুত্রিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া কর্ণাস্তরে গেলে কমলা নীহারের পায়ে ধরিয়া দিবার জন্য আদেশ দিতে যাইতেছে, এমন সময়ে এক জন দাসী আসিয়া বলিল, “বাবু এসেছেন।” কমলা বেন প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। দাসী আবার বলিল, “বাবু আপনাকে ডাকছেন, মা।” কমলা অশ্রু কবা সব নিমেষে তুলিয়া গেল; বলিল “কই ? কোথায় ?”

অরুণ আসিয়া বাবের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, “একটা কথা শুনে এখনি আবার আমার আসতে হ’ল।”

কমলা অরুণের পানে চাহিতে পারিতেছিল না; তাহার পা ছুইটা লুপ্টই থু থু করিয়া কাঁপিতেছিল। সে একটু একটু করিয়া বামীর নিকটস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছিল। অরুণ বলিল, “তিনিগাম, দেওয়ানজীর শালায় সঙ্গে তুমি নাকি নীহারের বিয়ে দিচ্ছ ?”

সহসা একটা প্রস্তরে আঘাত হইয়া বেন কমলার গতিশক্তি ধামিয়া গেল। সংযত ভাবে মুখ তুলিয়া সে বলিল, “তাই এসেছ ?”

“হ্যাঁ।”

“তুমি কি বল ? বিয়ে দেব না ?”

“ও রকম পায়ে দিও না।”

“কেন, পায়ে ত মন্দ নয়—দোজবরে এইমাত্র দোষ তেমনই ক’নেরও বয়স হ’য়েছে।”

“তুমি তা’ হ’লে সব কথা জান না। বর আব্দুসসাদ, নেশাবোর, গঙ্গমুখ চালচুগোহীন—এক কথায় অতি অপাত্র।”

“বেশ ! তুমি পায়ে এনে দাও—কালকেই কিন্তু বিয়ে হওয়া চাই।”

“এর মধ্যে আমি পায়ে কোথায় পা’ব ?”

“তবে মিছে বাধাও দিও না।”

“ভবু তোমার সঙ্গ ভাঙবে না ?”

“না।”

“তুমি কি জ্ঞান—কি কারণে যে এমন হিংস্র জন্তুর মত প্রকৃতি ধরেছ, তা’ আমি বুঝি—কিন্তু তা’ উদ্ধারণ কর্ত্তেও আমার ধ্যায় কর্ত্তরোধ হ’বে—আমি তা বলতে চাই না; কিন্তু সেই কারণেই তোমার এ অস্ত্রাঘাত—এ পাপে নিজেও জড়িত মনে করছি। রাগ ও ভেদের বশে তুমি যদি এত বড়

অভ্যায় কাণ্ড কর্তৃক লোকঃ স্মৃতঃ আমাকেও এর বেশী হতে হ'লে । তাই বলছি, এখনও বাণী স্থির কর ।”

“আমার বাণী খুব স্থির আছে । তুমিই তা'র ভাবনার অস্থির হয়ে উঠেছ, স্থির হয়ে শোন, বিস্ত্র জন্তর সঙ্গে মাস্তুরের কোন সন্দেহ নেই । যাত্রা মাস্তুর, তা'রা যেন সে জন্তকে কোন উপদেশ দিতে না আসে ।”

“এখনও বলছি শোন, আমি শীগ্গিরই একটি ভাল পাত্র নিয়ে আসব ; এ বিয়ে দিও না । নইলে শেষে তোমারই আবার ঐ নীহারকে নিয়ে চিরদিন ভুগতে হ'বে, বলে রাখছি ।”

“কিসের জন্য আমি নীহারকে নিয়ে চিরদিন জল্ব পুড়ব ? কাগই আমি জন্মের মত আমার সঙ্গে তা'র সখকঙ্কন করে দিতে চাই । এই আমার শেষ কথা । আমি এর বেশী আর তাকে আমার ঘরে রাখতে পারব না ।”

“বেশ, তবে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও ?”

“কোথায় দেব ? কোন্‌ ছোলায় ?”

“তা'র কি দূর সম্পর্কেরও কেউ কোথাও নেই ?”

“না ।”

“তবে আমার দিদির কাছেই পাঠিয়ে দাও । কানাই বাবুও তা'র হ'লে সচেষ্ট হয়ে পাত্র খুঁজবেন ।”

“আমি অত পারব না । বার গরজ থাকে, সে নিয়ে যাক ।”

“বেশ ; আনিই নিয়ে যাচ্ছি ।”

“এখনই এখনই—এই দণ্ডে নিয়ে যাও ।”

“তবু মত বদলা'বে না ? ছ'দিন সময় দেবে না ?”

“আমার ঘরে আর তা'র এক দিনের জন্যও স্থান নেই ।”

“কেন ? কিসে সে এত অপরাধী তোমার কাছে ?”

“অপরাধ । শত্রু । সে আমার ছোট থেকে আনিয়ে আসছে, সে আমার এখনই চিরদিনের শত্রু ; অথচ আমি চিরদিন তা'র ভাগুর চেঁচা করে এসেছি । সে আমার সর্পস্বের হস্তারক—আমার স্বামীকে সে আমার কাছ থেকে ভেদ করে নেয়, এর চেয়ে শত্রু আর কে হ'তে পারে ?”

“যথেষ্ট যথেষ্ট, কমলা, আর না, স্বামীর উপর তোমার এমনই প্রভা—এমনই বিশ্বাস—থাক সে কথা—তবু আমি দম্ব না । তোমার এত লেদ

আমি রাখছি না—কই, নীহার কোথায় ?” অরুণ কিপ্রপদে নীহারের কক্ষের দিকে চলিয়া গেল ।

কিছুক্ষণ পরে একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, “বাবু নীহারকে লইয়া চলিয়া গেলেন ।” কমলা এতক্ষণ বজ্রাহতার মত ছিল, এইবার উদ্ভতকণ কণিনীর মত সজ্জন করিয়া উঠিল,—“এত দূর ? বটে ? তবে আমারও আজ থেকে সব শেষ !”

দুই মাস তাহার এতোক দিন, প্রহর, ঘণ্টা, যথার্থীতি গোবাইয়া লইয়া কাটিয়া গেল । কমলা একটিমাত্র সংবাদের ক্ষত মিন রাত উৎকণ্ঠা ভোগ করিলেও সে সংবাদ পাওয়ার বাহ্যতঃ কোন উপায় করে নাই ! সে সংবাদ আর কিছুই না—কেবল নীহারের বিবাহ হইল কি না ? অরুণের এম্, এ, পরীক্ষার সময় উজ্জীর্ণ হইয়া গেল, তথাপি কোন সংবাদ পাওয়া যায় না । যথলা একদিন দেওয়ান অরুণের লিখিত দুইখানা কাগজ আনিয়া দিলেন—একটি একখানা হাওনোট, দুই বৎসরের মধ্যে শোধ করিবার অঙ্গীকারে অরুণচন্দ্র রায় জমিদার ঐযত্ন কমলা দেবার নিকটে যথার্থীতি সূদে পাঁচ হাজার টাকা কর্ত্ত করিতেছেন ! অন্য খানায় দেওয়ানের উপর আদেশ যে, তিনি যেন আবলম্বে পাঁচ হাজার টাকা কানাই বাবুর ঠিকানায় প্রেরণ করেন । দেওয়ান কমলার মুখে দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি বল, মা ? টাকা ত পাঠাতে হ'বে ? নইলে খরীয় কর্ত্তা বাবুর উইলের জোরে উনি আদালত থেকে এ টাকা বার করিয়ে নিতে পারবেন ।”

“বেশ ত, তাই হ'ক্ । আমিও সেই প্রকমই চাই । স্ববর্দ্ধার, আমার ষ্টেট থেকে যেন এক পয়সাও না দেওয়া হয় ।”

কিন্তু কয়েক দিন পরেই দেওয়ান রানমুখে আসিয়া জানাইলেন, জাবাই বাবু আসিয়া নিজে খাতাখানায় চুকিয়া জোর করিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন । কমলা একেবারে বাকুদের মত জলিয়া উঠিল ; “অকর্ম্মণ্য সব । কেউ বাধা দিতে পারুলেন না । আমার একটা খবর দিতেও কা'রও সাহস হ'ল না ? কেন আমার বাড়িতে যা'র খুদী সে এমন করে চুকতে পায় ? যারোয়ানরা কি জন্য আছে ?” দেওয়ান ভীত মুখে বলিলেন, “মা ! তারা কি তা'দের মনিষকে বারণ করতে পারে ? আর আমরাই বা কোন্ সাহসে— ?”

“কে মনিব ? আমি ছাড়া তা’দের আর কেউ মনিব নেই । ডাকুন, আপ-
নার দুর্ভাগ্য সিং পাঁড়েনের আর খাতাখানার ভীড়দের । আমি নিজে তা’দের
হুকুম দেব, আমার বাড়ীতে তা’রা যেন আর চুকতে না পার । আমি ছাড়া
তা’দের অন্য কেউ মনিব নয় । এ যদি তা’রা না মানতে পারে—এই যুদ্ধে
তা’রা চলে যাক্, আমি নূতন লোক ভর্তি করব । আপনি এ কথা যদি মনে
না রাখতে পারেন—পেম্বন নিয়ে কাশীয়াস করুন গে ।”

দেওয়ান ভয়ে ভরসার আত্মতা আত্মতা করিয়া বলিলেন, “তা’ তোমার
হুকুম পেলে কেন তা’রা পারবে না ? আর আমার ত তোমারি চাকর,
যা ! জানাই বাবু—”

“চুপ করুন ; বাজে কথা আর নয় । এখনই সকলকে ডাকিয়ে ভাল
করে এ কথা জানানু ।”

তখনই জমিদার-বাড়ীর কীচাণুকীচ পঞ্চাঙ্গ খানিগ, অরুণের ঐ বাড়ীতে
প্রবেশ নিবেধ । এখন হইতে তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই । ভবিষ্যতে
যে তাহাকে এ বাড়ীতে চুকিতে দিবে, তাহাকে তখনই যথোচিত দত্ত দিয়া
জমিদার-বাড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে । ষায়েখানদিগের উপরে
এ হুকুম অতি কঠিনভাবে জারী হইল । কর্তার আদেশের লোক ঘনবরণ
ও লচ্‌মন সিং কপালে হাত দিয়া উচ্চারণ করিল,—“বক্ত !” কেন না,
এতদিনের ভালরূটির উপায় এইবার এ স্থান হইতে উঠিয়াছে বলিয়াই
তাহাদের স্থির বিশ্বাস জন্মিল । নূতন লোক রামদীন পাঁড়ে ও ভক্ত তেওয়ারী
যৌবন প্রকাশের সম্ভাবনা পাইয়া ঘন ঘন গোঁফে তা দিতে লাগিল ।
বিষয় হস্ত ও করণরস জমিদার-বাড়ীতে অন্তঃসলিলা কস্তুর
ব্যায় যত নীরবে বহিতে লাগিল । অত্রদিনের লোকের বিশ্বাস, হস্ত
ও বিক্রম এবং প্রাচীনগণের একটা নীরব “হার !” শব্দের মধ্যে
কমলা নূতন উদ্ভবে পুরা জমিদারই সাজিয়া তাহার বিশ্বাস-সম্পত্তির
নূতন ব্যবস্থা করিতে লাগিল । তাহাকে এত দিন এ সব দেখিতে হয়
নাই, তাই তাহার ষ্টেটে এত বিস্ময় ! নিত্য নূতন নিয়ম সংস্কারের
আলার কর্ণচারণের অন্তর হইতে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিতে লাগিল ।
কিন্তু কাহারও কোন উচ্চবাচ্য করিবার সাধ্য হইল না । দেওয়ানজী
বেচারা বড়ই ক্ষোভে পড়িয়াছিলেন । তিনি ভালক বা নাতি ছুইটির একটির
ধারাও সেই পাঁচ হাজার টাকা ঘরে লইয়া যাইতে না পারিয়া অরুণের উপর

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। বিশেষ সেই নীল কাগজে মোড়া গহনাগুলি—
তাহার চাকুচিকারি অর্থনও যে দেওয়ানের বৃকে ছুরীর মতই বিগিতে
থাকে! তাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এক দিন কমলার নিকটে অঙ্গুরের এই
অকৃতজ্ঞ ব্যবহারের ঘণাচিহ্ন নিশ্চয় করিয়া এই অন্যায়ের প্রচুর প্রতিবাদ
করিয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন, “একটা উপায় করলে হয় না, যা?” কমলা
এতক্ষণ সহিষ্ণু তাহে চুপ করিয়া ছিল; পরের মুখে এ সব আলোচনা ও
লহাহুত্বভূত শুনিতে ভাল না বাসিলেও সহ্য না করিয়া উপায় নাই। এইবার
দেওয়ানকে এসকলার আশিবার আদেশ দিতে গিয়াও সে তাহার প্রেরে মূখ
তুলিয়া নিজের অনিচ্ছায়ও উত্তর দিল, “কি উপায় আছে আর?”

“মেয়েটাকে লাঠিয়াল দিয়ে এই বেলা কানাই বাবুর বাড়ী বেঁকে
কেড়ে আনলে হয় না?”

কমলা ক্রমশঃ ক্রুদ্ধ করিয়া বলিল, “কি দয়াকার?”

“কানাই বাবু এমনই ভোর করে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে
কোন একটা অবাধ্য পাত্রের হাতে বেঁবেন হয় তা?”

“যা’কে ইচ্ছা দিক।”

দেওয়ান অল্পটুকু বরো উচ্চারণ করিলেন, “পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা।
তবু তবু কলে যা’বে।”

কমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, “পাঁচ হাজার টাকার কথা কি বলছেন—
সেটার বিয়ে হ’য়ে গিয়েছে, যদি কেউ আমায় এ বিষয় এনে দিতে পারে,
তা’কে আমি আরও পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দি।”

বেচারি দেওয়ান হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। ইহার উপরে আর কথা চলে
না, তবে—তবে সে সুবাদটা আনিয়া দিবার জন্য কি একবার চেষ্টা
দেখিবেন! তিনি মনে মনে এই কথা ভাবিলেন, কিন্তু কমলার অসুচীকৃত
লগাট ও বদান্ধকারবর মূখ দেখিয়া এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করিতে সাহস
পাইলেন না।

এম, এ পরীক্ষা দেওয়ান পরে পাত্র স্থির ও টাকার বোগাড় করিয়া
অরুণ সানন্দে আনিয়া তাহার দ্বিধিকে জানাইল যে, আগামী সপ্তাহেই
মেয়েটির বিবাহের দিন স্থির করা হইয়াছে।

বিধি বলিলেন, “যা হয় শীঘ্র কর, ভাই। পরের এত বড় আইবুড় বেয়ে
বন্দী দিন ঘরে রাখা ভাল দেখায় না। খৌও ত কোন খৌজ-খবর নেয়

না। শুধান থেকে কি বিয়ে হতে পারত না। কি জানি, তোমাংদের
কি ব্যাপার—তাও বুঝি না।”

এ কথার উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ অস্তিত্ব কথার পর অরুণ নীহারের
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। নীহারকে এই স্থানে রাখিয়া সে নিজে যেসে
খাতিত এবং দুই একদিনের বেশী তাহার সহিত সাক্ষাৎও করে নাই।

নীহারের সঙ্গে সাক্ষাতে কিত্ত তাহার শীতল ভাবমূর্ত্তির আশার উৎস্রয় মন
একেবারে বিসৃম্বল হইয়া গেল। নীহার ত প্রথমে কবাই করিল না;
বহু চেষ্টায় শেষে গভীর ক্রন্দনের মধ্যে এমন অবোধ্য ভাবে তাহার নিকটে
ঘোড়হাত করিয়া একটা দুর্খোধ্যা তিকা জানাইল যে, অরুণ তাহার অর্ধই
আবিস্কার করিতে পারিল না—“আমার মত অল্প কোন চেষ্টা আর করবেন
না, আমার এমনই ভাবে এই স্থানে চিরদিন থাকতে দিন।”—বহু বৃক্তি-ভর্যের
ধারাও অরুণ তাহার সে ভিক্ষাপূর্ণ মিনতি ও ক্রন্দন নিবৃত্ত করিতে পারিল
না। তাহার এক কথা—“আমি এঁদের দাসীস্বত্তি করে থাকুব। চাকরাশীর দর-
কার সকলেরই আছে। আপনি না হয় চলে যান—আমিই আমার জায়গা করে
নেব ক্রমে।” এ কথার অসারতা অরুণ নিখোঁধ নীহারকে কিছুতেই বুঝাইতে
না পারিয়া অগত্যা সে দিন বিরক্তিতে চলিয়া গেল। কিত্ত বিবাহের দিন
বত নিকট হইতে লাগিল, নীহার ততই একেবারে লম্বা এবং করিল।
তাহার শীর্ণ দুর্বল শরীর একেবারে যেন বহাদুরের রোগীর বেহের আকার
ধারণ করিল। তাহার কোন পীড়া হইয়াছে ভাবিয়া গৃহস্থ সকলে উদ্ভিগ্ন
এবং একটু যেন বিরক্তও হইল; কিন্তু অরুণ বুঝিল যে, নির্জারিত বিষয়ে
অনিচ্ছাই তাহার এ অবস্থার মূল। পাছে লোক জানাজানি হইয়া সকলের
বিষয় ও বিরক্তি উৎপাদিত করে, এই ভয়ে অরুণ তাহার বিরক্তি ও ক্রুদ্ধতাব
যথাসাধ্য গোপন করিয়া দুই বেলা আসিয়া নীহারকে বৃক্তি ও অশ্রুনের
ধারা বুঝাইয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কমলার সহিত বিষাদ
করিয়া এইরূপে সে যে কি বিব্রাটই তাকে তুলিয়া লইয়াছে, এখন তাহার
দারিদ্র্য সে মর্মে মর্মে অজ্ঞতব করিতে লাগিল। নিজেদের বাহা হইবার
হইয়াছে, এখন এ বিপদ হইতে সে উদ্ধার পাইলে বাচে। নীহারের উপরে
তাহার চিরদিনের সে মেহতাব কটিন হইয়া পীড়াইতেছিল। নীহারের
প্রকৃতিবিরোধী একদল উচ্চতাব সে আর কখনও দেখে নাই, তাহার ভয়
হইতেছিল, লোম করিয়া বিবাহ দিতে গেলে পাছে নীহার কোন কলে-

ভাতীই বা করিয়া বসে। অশুভ হইয়াছে বলিয়া অরুণ বিবাহের দিন আর এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিল।

অরুণের দিদির এইবার তয়ানক রাগ হইল। গোড়াগুড়িই তাঁহার কেমন সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার অরুণের ব্যাপার দেখিয়া সন্দেহটা এইবার হির বিবাহে পরিণত হইল। তবে আগাগোড়া না জানিলে যেমন সকলেই এ ক্ষেত্রে একটা বিকৃত সিদ্ধান্তই অতি সহজে করিয়া বসে, অরুণের দিদিও সেইরূপ ভুল করিলেন। তিনি ভাবিলেন, “এ বিবাহ বেওয়া অছিল্য মাত্র—গাড়ী আইবুড় মেয়েটা দেখছি অরুণকে ‘গছে’ বসেছে। বৌটা তা’ সইতে না পারায়—তাই এইখানে এনে লোক দেখানো একটা বিয়ের খুন্সো ফুলছে মাত্র। যেহেতু তাতে একেবারে “বরাণসী” নিলেন—আর ছেলে-অমনই দিন পেছিরে দিয়ে ছুই বেলা তা’র সঙ্গে কিসের যে এত খোসামুদি স্তর করলেন। বেরকম গতিক দেখছি, অরুণটা দেখে বিয়েই দেব না বলে বসবে না কি? আমারও ত এ ভাবি কলঙ্কের কথা হল। বৌটাই বা মনে করছে কি যে, ঠাকুরকিও বুদ্ধি এর মধ্যে আছেন।” যদিও বনিকন্যা ভ্রাতৃবধূকে তিনি কখনও দেখেন নাই (অরুণকেই স্বতন্ত্রগৃহে আসার পর এ পর্যন্ত আর দেখা ঘটে নাই বলিয়া কানাই বাবু পরিচয় না দেওয়া পর্যন্ত শৈশবদৃষ্ট শিশু ভ্রাতাটিকে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। ভ্রাতার চরিত্রসম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই তাঁহাকে এতটা ভুল করাইল।) তথাপি এখন সেই ভ্রাতৃবধূর উপর সর্বাঙ্গভূতিতে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল! তিনি তাঁহার নন্দ্যার কর্তব্যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট আশাতও বোধ করিলেন। সেই দিন তিনি কয়লাকে একখানি পত্র লিখিলেন, তাহার সাথ মধ্য এই যে, জুনি এখনও ছেলেমানুষ; অগভীর কিছুই জান না। এ রকম ব্যাপার তো সর্গদ্রুই গ্রাম বটিয়া থাকে; তাই বলিয়া কি এইরূপে স্বামীকে ছাড়িয়া দিতে হয়? পুরুষ ত বাধন কাটিতেই সক্ষম। উৎসুক; ইহা তাহাদের জাতীয় স্বভাব, যেহেতু মানুষের সর্গদ্রু তাহাদের পায়ে শিকল দিয়া ঘরে আটকাইয়া রাখা উচিত। ছাড়িয়া দিলেই বিপদ। পরের উপর রাগ করিয়া এমন করিয়া নিজের সর্গদ্রুনাশ কি করিতে আছে। এই বেলা স্বামীকে ও মেয়েটাকে নিজের কোটে লইয়া গিয়া মেয়েটার একটা বিবাহ দিয়া ফেল, নহিলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে। আমি আর বেশী দিন যে তাইয়ের অন্তরোধে অবতরু খেড়ে আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখিতে পারিব, তাহা বোধ হইতেছে না।

ভূমি এই বেলা স্তব্ধ হও । কমলার আগুন ধরিতে যেটুকু বাকী ছিল, এই পাত্র সেটুকু পূরণ করিল । কমলা দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া কি করিবে তাবিধা পাইতেছিল না ।

সে দিন অরুণেরও দৈর্ঘ্য রক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিল—ভীতকণ্ঠে সে নীহারকে বলিয়া ফেলিল,—“এমন জান্লে কি তোমার জন্ত এত কাণ্ড করি ! এখন দেখছি, কমলার ব্যবস্থাই তোমার পক্ষে ঠিক হইছিল,—বাধা দিবে আমি অস্তায় করেছি । যা’র জববে এতটুকু ক্রতজ্ঞতা নেই—এমন বাস্তবিক বুদ্ধি-টুকুও নেই যাতে—”অরুণের রোষণক্‌ড বাক্য অর্ধপথে সহসা বাধা প্রাপ্ত হইল । সে দেখিল, নীহার ছুটিয়া আসিয়া তাহার পাণের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়াছে,—তাহার যন্ত্রণাশূন্যক গোঁফানির যথো এই কয়েকটি কথা অরুণের কানে পেল—“বলো না—ভূমি ও কথা বলো না—একটু দয়া কর—আমায় যের ফেল !”

অরুণের হত বুদ্ধি যখন আবার ফিরিয়া আসিল—সে দেখিল, তখনও নীহার তাহার পদতলে মুছিতার মত পড়িয়া আছে । পা সরাইয়া লইয়া অরুণ বাহিরে চলিয়া আসিল । তাহার অন্ধকার মনের যথো এত দিনে প্রতীপ আলিয়া উঠিয়াছে । কিন্তু সে অগ্নির দাহিকানাক্ত আত্ম কিসে সে নিবাইবে ?

পরদিন প্রভাতে আসিয়া অরুণ গভীরকণ্ঠে নীহারকে ডাকিল, “উঠে এস !”

তাহার আগমনে নীহার কোণে মুখ লুকাইয়া বলিয়া ছিল,—দুইবার আহ্বানের পর মুখ জুলিয়া প্রায় করিল, “কোথায় ?”

“কমলের কাছে !”

নীহারের সর্বাঙ্গ যেন প্রস্তরীভূত হইয়া পড়িল—কোন শব্দ বা একটু অঙ্গ-সঞ্চালনের ক্ষমতাও তাহার রহিল না ।

“এখনও অব্যাহতা ? কমলার কাছে আমি যে অপরাধ করেছি, তা’র এই-ই প্রায়শ্চিত্ত ! এ না কর্ত্তে পারলে এ জীবনে তা’র কাছে আর আমার মুখ দেখানই হ’বে না । তোমার ভয় নেই ; তোমার কোন কষ্ট পেতে হ’বে না । আমার নির্কুণ্ঠিতাই যে তা’কে এমন কষ্টের মধ্যে ভুলেছিল, তা আজ আমি বুঝিতে পারছি । তোমার উপর বোধোচিত কর্ত্তব্যই সে কর্বে, তা’র হাত দিইই তোমায় আমি পাত্রা কর্বে । উঠে এস ।”

নীহার শুধাশি, নড়িল না ।

“তুমি কি মনে স্থির সঙ্কল্প করছ যে, চির জীবনে তা’র কাছে আমার আর যুব দেখাতে দেবে না ? যে তোমার ভালর অস্ত্র এত করেছে—আজীবন তোমার বড় ভাইয়ের তুল্য স্নেহ করে এসেছে—সেবে বুদ্ধির তুলে এত হয়েছে তা’র চিরজীবনের মত সন্ধান না করে তুমি ক্ষান্ত হবে না ? এই তোমার পণ ? তুমি কি যেয়ে যাছ ?”

বাড় মুষ্টি চেলিয়া দিলে তাহা যেমন তাবে অগ্রসর হইতে থাকে তেমনই করিয়া নীহার বাইরা অরুণের নির্দিষ্ট শকটে আরোহণ করিল। অরুণও দিগিকে প্রণাম করিয়া “বাড়ী যাইতেছি” জানাইয়া কোচবাল্লো উঠিল। দ্বিদি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন “হুঁহুহুহুহু হায়ে বাঁচলাম। অরুণ ত বুঝ ভাল ছেলেই জানুতাম ; ডাইনী মায়া দিগে ছুঁড়ি যেন ওকে ঘিরেছিল ! গেল তা’ একটা প্রণামও করুলে না। না করুক, অরুণ এখন বৌয়ের কাছে পৌছুলে বাঁচি।”

স্বারবানদিগের নিষেধ বাক্যের অপমানও সহ করিয়া অরুণ কমলার নিকটে সংবাদ পাঠাইল। সে সংবাদের উত্তরে যে আদেশ আসিল, তাহাতে স্বারবানরা গোট বন্ধ করিতে বাধ্য হইল। অমীহার কমলা দেবীর সঙ্গে অরুণের কোন সম্পর্কই নাই।

একান্ত দিবালোকে—অসংখ্য পরিচিত চোখের দৃষ্টির সম্মুখে নিশ্চেষ্টে অস্ত্রপ্রায় স্তম্ভবর্গের নিকটে আর ত দাঁড়াইয়া থাকা চলে না—পাছে কেহ কোন কথা কহিয়া বসে !

অরুণ গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া গাড়োয়ানকে গাড়ী হাঁকাইতে বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। গাড়োয়ান হাঁকিল “কোথায় যাইতে ছইবে ? টেনে ?” অরুণ দূরত্ব একটা গ্রামের নাম করিলে গাড়ী ছুটিয়া চলিল।

জোনের পর জোন এইরূপ নীরবে অতিবাহিত করিয়া অরুণ সহসা নীহারকে প্রায় করিল, “তোমার যদি কোথাও আত্মীয়স্থান থাকে—এই বেলা বগ ; আমি পৌঁছে দিতে পারুব।”

নীহার বাড় নাড়িয়া জানাইল—তাহার কোথাও কেহ নাই।

“কোথাও কেউ নেই ? সর্বত্র সমান ?”

নীহার বাড় নাড়িল—“হী।”

“তবে এইখানেই নেমে যাও। গাড়োয়ান গাড়ী থামাও।”

গাড়ী থামিল।

“নাথ ।”

নীহার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল—অজানা স্থান, অদূরে গ্রাম—মাঠের মধ্যে টানা রাস্তা—পার্শ্বে একটা পুকুরিণী । আড়ষ্ট হইয়া নীহার পূর্ব্ববৎ বলিয়া রহিল দেখিয়া অরুণ কষ্টে কষ্টে বলিল, “তোমার মতলবটা কি ?”

“কোথায় যা'ব ?” উচ্ছ্বসিত প্রোদনে নীহারের কঠোরোধ হইল ।

অরুণ পূর্ব্বের মত কষ্টিন বরে বলিল “যেখানে ইচ্ছা । তোমার সঙ্গ আর আমি সহ করতে পারছি না ।”

নীহার এইবার বীরে বীরে শকট হইতে নামিয়া পাড়াইল । অরুণ শকট হইতে এক ভাড়া নোট বাহির করিয়া তাহার হস্তে দিতে গেল, “কর্ত্তার তোমায় দেওয়া টাকা । কোন ভাল লোকের আশ্রয় নিয়ে এরই সাহায্যে তোমার জীবনটা এক রকমে কাটাতে পারবে । নাও । টাকা নেবে না ? এখনও তোমার অবস্থাভা ?”

অরুণের সম্মুখ হইতে গাড়ীর পশ্চাতের দিকে বীরে বীরে অপসৃত হইতে হইতে নীহার আঁত কষ্টে উচ্চারণ করিল, “টাকার দরকার হ'বে না ।”

শকটের অস্ত্র দিকের কপাট খুলিয়া ফেলিয়া অরুণ সরোবে নোটের ভাড়াটা রাস্তার ছড়িয়া ফেলিয়া নীহারকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, “নাও না নাও তোমার ইচ্ছা । আমার কর্ত্তব্য আমি করে গেলাম ।” তাহার পর সে গাড়োয়ানকে বলিল, “গাড়ী হাঁকাও ।”

বিস্মিত গাড়োয়ান বলিল, “বাবু তঁকে এমন আরপায় কেন নামিয়ে দিলেন ? সামনে গৃহর ! আর ও রকম বয়সের মেয়েরা আঁত ধর্ম্মের কথা ভাবেন না—এমনই করে তঁকে রাস্তার নামিয়ে দিলেন,—বড় লোক—ভদ্র লোক আপনারা পারেন—আমরা চাষা—আমরা এ পারি না, তা' যতই বা হোক ।”

“গাড়ী চালাও না ।”

গাড়োয়ান বোচরা অনিচ্ছুক ভাবে বীরে বীরে গাড়ী হাঁকাইল । কিছু দূর গিয়া সহসা অরুণ গবাক দিয়া যুগ বাহির করিয়া দেখিল—নীহারকে দেখা যাইতেছে না ! মুহূর্ত্তে অরুণ চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পশ্চাৎ দিকে ছুটিয়া চলিল ; নিকটে গিয়া দেখিল, মুর্ছিতার মত নীহার পুকুরিণীর ধারে পড়িয়া আছে । অরুণ নিঃশব্দে পুকুরিণী

হইতে অঙ্গলি করিয়া জল তুলিয়া তাহার চোখে মুখে দিতে লাগিল এবং ব্যাপার দেখিয়া ভীত হতবুদ্ধি গাড়োয়ান গাড়ী নিকটে আনিতে ছাত্ত বয়িয়া নীহারকে গাড়ীতে তুলিল । সে গাড়ী ফিরাইয়া টেননে লইয়া বাইতে আবেশ দিলে গাড়োয়ান তাহার ভাড়ার চতুর্গুণ দাবীতে অরুণকে সম্মত করাইয়া শেবে বলিল, “বাবু নোটের ভাড়াটা কি ফেলে যাবেন ? শুটাও তুলে নিব । আপনাদের মত বাবু গাড়ী ভাড়া করলে মানারকম হাজামে পড়ে কি বে কপালে না ঘটতে পারে ভাত ভেবে পাচ্ছি না ! এখন আপনাদের আমার গাড়ী থেকে উত্তরাতে পারলে বাচি । আজ কার মুখ দেখেই যে উঠে-ছিলাম ।” অগত্যা অরুণ তাবয়্য চিত্তিয়া নোটগুলোও তুলিয়া লইল ।

কয়েক দিন পরে দেওয়ানজী একটি পাঁচ হাজার টাকার ইন্সিওর করা রেজেষ্ট্রী খাম এবং একখানা পত্র আনিয়া কমলার হাতে দিলেন । পত্র অরুণের—সে লিখিয়াছে—

“৮কতীর দেওয়া পণবস্ত্র এ পাঁচ হাজার টাকা আর নীহারের বিবাহের জন্য প্রয়োজন হইল না । আমিই তাহাকে বিবাহ করিয়াছি । সে কারণে কেবল পাঠাইলাম ।”

(৬)

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে । অরুণ এখন প্রফেসরি করে । নীহারের একটি কন্যা হইয়াছে । তিন বৎসরের কন্যা লীলাই অরুণের একমাত্র প্রবতারা ; আর দ্বিতীয় আলমারীস্থ পুস্তকগুলি । কলেজ হইতে অধ্যাপনা-কাৰ্য্য সারিয়া গৃহে আসিয়া অরুণ সেই যে তাহাদের মধ্যে নিমর হইয়া পড়ে নিভ্রান্তরে চক্ষু বুলিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের ছাড়ে না ? কেবল লীলাই মাঝে মাঝে তাহাকে যা' একটু অস্তমনা করে ।

নীহার মধ্যে কিছুদিন পশ্চিমের হওয়ার এবং নবজীবনের প্রফুল্লতার নব স্বাদ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল ; কিন্তু এখন আবার বাল্যের কীর্ণতা তাহাকে অবিক-তর ভাবে অবিকার করিয়াছে । শুধু তাহাই নহে ; যাতার রোগ—সেই বন্দা—তাহাতে ক্রমে লুপ্ত হইয়াছে । সেই লুপ্ত অরুণ যথারীতি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছে ; কিন্তু তাহাতে কোন স্থায়ী উপকার বুঝা যায় নাই, রোগটা চাপা ভাবে আছে এইমাত্র ।

নীহার আর সহ করিতে পারে না । তাহার কীর্ণ গাভু এ বিষকে অহরহঃ আর কীর্ণ করিতে পারে না । সে এখন বেশ সুস্থিয়াছে, ঘটনাপ্রসঙ্গা-

যটাইরা ভাগ্য তাহাকে বাহা দিয়াছে, তাহা তাহার ভোগ্য নহে । তাহা সম্পূর্ণ পরম্ব । এত যত্ননা এত কষ্টের পরে জীবনসমুদ্র মতিয়া তাহার ভাগ্যে বাহা উঠিল, তাহা বিব,—মুখ্য নহে ! তাই তাহার দুর্ভাগ্য দেখাওণ ক্রমশঃ তাদিয়া পড়িতেছিল ।

সহসা এক দিন সে অরুণকে প্রায় করিল, “যদি আমি মরে যাই ?”

অরুণ পুতক হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, “আবার কি আর হচ্ছে ? কানি, বুকে ব্যথা কবে নি কি একটু ?”

“তা’ জানি না ! কিন্তু আমি যদি মরি—নীলাকে কে দেখবে ?”

নীলা তখন বারান্দায় গাড়ী চাপিয়া বেড়াইতেছিল ; কয়েক মুহূর্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অরুণ সনিধাসে বলিল, “কি জানি !”

স্বামীকে পুনর্বার পুতকে মন দিতে দেখিয়া নীহার মুহূর্তে বলিল, “ল্যাথ—আমার মনে হয়, আমি আর বেশী দিন বাঁচব না !”

“শরীর কি আবার বেশী খারাপ বোধ করছ ?” অরুণ হস্তস্থ পুতক এই-বার নামাইয়া রাখিল ; পতীর মুখের পানে ক্রমে চাহিয়া বলিল, “চল, কলকাতায় গিয়ে ভোগার চিকিৎসা করাই গে ।”

নীহার সনিধাসে বলিল, “কলকাতায় গেলে ত নীলার কোন উপায় হ’বে না ; আমার অস্ত্র এক জায়গায় যেতে ইচ্ছে হয় এক একবার ।”

অরুণ বুলিল ; ক্রমে গন্তীর মুখে পুতক তুলিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, “সাহস হয় ?”

“একা হ’লে হ’ত না । নীলার জন্ত হয় ।”

বহুকণ আর কেহ কথা কহিল না—সেবে অরুণ বলিল, “ও সব চিন্তা ছেড়ে দাও । চল কলকাতায় তোমায় নিয়ে যাই ; নইলে এখানে সার্বতে পারবে না দেখছি”

কলকাতায় গিয়া নীহারের রীতিমত চিকিৎসা করাষ্টাও পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ইহার মধ্যে একটা নূতন বাতিকও নীহারের মনে সর্বদা বেলা করিতেছে ; কেবল অরুণের বিরক্তির ভয়েই যে সে কথা সে মুটিতে পারিতেছে না তাহা অরুণ বেশ বুঝিতে পারিতেছিল । যে দিন ডাক্তার নীহারের জীবনের আশা নাই জানাইল, সে দিন নীহারও বেশ তাহা বুঝিতে পারিয়া একেবারে অধৈর্য হইয়া উঠিতে লাগিল । অতি কষ্টে তাহাকে শান্ত করিয়া অরুণকে টাকার অস্ত্র এবং অস্ত্র কোন গুরুতর

প্রয়োজনে একবার এলাহাবাদ যাইতে হইয়াছিল। দিন দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া অরুণ দেখিল, ভৃত্য ও লীলাকে লইয়া রুমা নীহার কোথায় চলিয়া গিয়াছে; দালীর কাছে বলিয়া গিয়াছে, বাপের বাড়ী বড় ভগিনীর কাছে যাইতেছি! অরুণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিয়া সেই রাত্রিতেই আবার এলাহাবাদ চলিয়া গেল। উদ্মনাত্তাবেই কর দিন কাটিগ,—অরুণ কিংকর্তব্য-বিশুদ্ধ ভালে যখন কি করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না, এমন সময়ে একখানা টেলিগ্রাম তাহার হস্তে পৌঁছিল! “মা ষাচেন না, শীঘ্র এসো—লীলা।” অরুণের হস্ত বহিতে টেলিগ্রামের কাগজখানা পড়িয়া গেল—“নীহার যাবার সময়ও এ কি বাদ সাধছে? এ কি অলঙ্ঘ্য নিয়তিক্রমে তোমার সঙ্গে আমি জড়িত? আর তুমি? তোমারও এ কি নিয়তি? মরুবার সময়ও কি একটু শান্তিতে মরুতে পারিলে না? তুমিও বড় হতভাগ্য!”

এক দিন যে প্রধান কারণ স্রষ্টা হইয়া তাহাকে সে গৃহ হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল, সেই আবার পাঁচ বৎসর পরে কর্তৃমৃত্যুর মত তাহাকে সেই গৃহে টানিয়া আনিল। অরুণ কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া উৎসুক কর্তৃচারিত্বশ্রমের সহিত বাক্যালাপ মাত্র না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে গিয়া রুমার কক্ষে প্রবেশ করিল; দেখিল বিজ্ঞানার সঙ্গে মিশিয়া নীহার শয্যার পড়িয়া আছে। ব্যাধিক্রমে মুখে শান্তির—ভৃগুর মুখচ্ছায়া! অরুণকে দেখিয়া সে মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—“এসো!”

পার্শ্বে বসিয়া উভয় মুখে অরুণ বলিল, “কেমন আজ নীহার?”

“খুব ভাল আছি—বড় শান্তিতে আছি। তুমি যে আসবে—আমার এ সময়ে, ভাগ করে থাক্বে না—তাও জানতাম! আজ আমার আর কোন দুঃখ নেই।”

“কেন এলে, নীহার? এখানে এ সময়ে কেন এলে?”

মনস্তাপের হাসি হাসিয়া নীহার বলিল, “কেন এলাম? না এলে কি আমার মরারও উপায় ছিল? তুমি এক দিম প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য এখানে আমার নিবে এসেছিলে; কিন্তু তখন বিধির বিপাকে তা হয় নি, আমার ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন—এখানে আমি আবার ছোট বেগার মত স্থান পেয়েছি—হু-পেয়েছি—অন্তর পেয়েছি! লীলার ভাবনাও আজ আর আমার নেই! এখানে না এলে কি আমার মরে হু-হতো?”

অরুণ বৃষ্টি, নীহারের আর বড় বেশী সময় নাই। সে সজল নয়নে একবার জিজ্ঞাসা করিল, “লীলা কই ?”

“তা’র বড় মা’র কাছে।”

অরুণ নীরবে তখন নীহারের পরিচর্যা করিতে লাগিল। কথা কহিতে কহিতে নীহার এক একবার বেন শুভ্রাঙ্কর হইয়া পড়িতেছিল। অরুণ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া শীতল মৃদুস্বাসের লগাটে হাত বুলাইতেছিল আর পার্থক্য কক্ষ হইতে একটা চির-ঈর্ষ্যাপূর্ণ ছন্দয় বৃষ্টি নীহারের মৃত্যু দেখিয়া এই মৃত্যুকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থিত সুখ বোধে ভূষিত করনে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। জীবনের সর্বসার্থকতার বিনিময়ে সে যদি এমনই করিয়া মরিতে পাইত, তাহা হইলে সে আজ আর অস্ত্র কিছু চাহিত না।

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। নীহার চোখ মেলিয়া ডাকিল, “দিদি! কমল দিদি!”

কমলা নিঃশব্দে আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল,—“বোন।”

কৌণ হাদি হাদিয়া নীহার বীরে বীরে বলিতে লাগিল, “দিদি তোমার ঘন এক দিন আমি কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম—আজ আবার ফিরিয়ে দিতে এসেছি! তোমারি সব—আমি কেবল দুঃখের অভিধি যাত্র। দিদি, জোর করে কি কেউ কারুর বিধিগত সম্পদ কেড়ে নিতে পারে? পারে না, এক দিনের অস্ত্রও পারে না। তোমাদের দয়ায় ক্রমশঃ প্রভুর পেয়ে আমি কুকুরের মত মাথার উঠেছিলাম বটে—কিন্তু তার পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। তোমার ঘন আমার নেবার সাধ্য কি? তোমরা বা’ তাই আছ—মাক্‌খানে আমি দুঃখের মত উঠে আবার তেমনই মিলিয়ে যেতে চাই। এই নাও, দিদি, তোমার জিনিস এবং আমারও যথাসর্বস্ব—লীলা, সব তোমার দিয়ে সেলাম। আজ আমার ছোট বোনের মত বিদায় দাও, দিদি, আমি তোমার ছেলেবেলার সেই নীহার বলে মনে কর।” আবেগে নীহার বুদ্ধিতার মত হইল। কমলা বীরে বীরে তাহার লগাটে হস্তার্ণণ করিল। তখন শুভ্রাঙ্কর সজা পাইয়া সে অস্ত্র কটে বলিল, “আমি আজ বড় সুখী। তোমার জিনিস তোমার দিয়ে”—

নীহার আর বেশী! কথা কহিতে পারিল না—কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া

বীরে বীরে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার বিবর্ণ লগাটুখন করিয়া অরুণ অক্ষরদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “অমাত্যেরে তুমি স্বামী হইও।”

সৎকারাদি হইয়া গেল। প্রভাতে নীলা কাঁধিতে কাঁধিতে আসিয়া কমলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল “বড় মা! মা কই?” কমলা নিঃশব্দে তাহাকে কেবল বুকে ভুলিয়া লইল—কোন উত্তর দিতে পারিল না। বালিকা ক্রমে নিশ্চব্দ হইয়া থাকিয়া আবার প্রেরণ করিল—“বাবা?” সেবারেও কোন উত্তর না পাইয়া বালিকা আবার কাঁদিয়া উঠিলে কমলার ইন্ধিতে একজন অরুণের সন্মানে সমস্ত বাড়ী খুলিয়া আসিয়া সংবাদ দিল “তাঁকে দেখিতে পাওয়া গেল না। হরি বললে, ভোরে তিনি বেরিয়ে টেবনের দিকে গেছেন; বোধ হয় এলাহাবাদেই চলে গেছেন।”

যা নাই—বাবা চলিয়া গিয়াছেন—সুত্র বালিকা একেবারে যেন শুদ্ধ হইয়া গেল। যোগন কি কোন একটা কথা—কিছুই যেন আর তাহার মুখে কুটিতে পারিতেছে না! তাহার অসহায় ভীত মুখচ্ছবি কমলাকে একান্ত ব্যথিত করিয়া ভুলিতেছিল; সে সর্বদাই তাহাকে ফোড়ে লইয়া নামাশ্রকার খেলনা দিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পিতার অহুগতা বালিকা যে মাতা অপেক্ষাও পিতার মস্ত কাতর হইয়াছে তাহা কমলা বুঝিতে পারিতেছিল। কিন্তু উপায় নাই—কোন উপায় নাই! তাহাকে আসিতে বলার অধিকার যে কমলা সেই নিদারুণ দিনে করেক. মুহূর্ত্তস্থায়ী উত্তেজনায় প্রভাবে চির জীবনের যত দ্বারাইয়াছে! যাহা সে দ্বারাইয়াছে তাহা আজ তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে। কেবল এক একবার তাহার মনে হইতেছিল, নীহারকে ত খেঁজায় সে কিছুই দেয় নাই—কিন্তু সে অবশীলাক্রমে তাহার সমস্ত তাহাকে হানিমুখে দিয়া গেল! আর সেই নিষ্ঠুরের চেয়ে নিষ্ঠুর—পাষণ অপেক্ষাও পাষণ—তাহাকে কি কমলা কিছুই দেয় নাই? সেই আকৌমার যৌবনের যত দ্বার অস্ত্রায়—মান অভিমান—রাগ ঈর্ষ্যা—প্রণয় কলহের যথো,—এই দীর্ঘ পাঁচ বর্ষ-ব্যাপী অবিভ্রান্ত তুবানলের আলার মধ্যে কমলা এ কাহার উদ্দেশে জীবনের সর্বোত্তম সার সর্বস্বটুকু নিবেদন করিয়া আসিতেছে? বাল্যের সেই সরল অভিমান—যৌবনের সেই অতৃপ্ত পিপাসার ক্ষোভ—বিরহের এই অল্পভাপময় অশ্রু—এ কোন্ পাষণের উদ্দেশে চির দিনই এক শ্রোতে একটানা ভাবে বহিতেছে—করিতেছে। পাষণ সে, পাষণ হইতেও

হৃদয়দীন! তাই সে কেবল মাহুকের অপরাধ দেখিতে—খুঁজিতে জানে—
তা' ছাড়া তাহার আর কিছু বুঝিবার লাগ্য নাই ।

আবার—আবার সেই অভিমান । কমলা আবার অন্তরে বাহিরে শিহ-
রিয়া উঠিল । এই যে লীলাকেও কোলে করিয়া বুকে টাপিয়া বরিয়া
তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছে—এ কাহার করুণার ? যদি সে লীলাকেও
লইয়া বাইত ? এ অশুভহৃৎ পাইবার মত যুগও কি কমলা রাখিয়াছে ?
কমলা কি ইহারও যোগ্য ?

না—না আবার জন্ত নয়—ওগো আমার তুমি এই বাহ্য দয়া দেখাইয়াছ
আমার পক্ষে এই ঢের । কেবল তোমার লীলার জন্ত বলিতেছি—মাহু-
পিতৃহারা সে বেশ কিছুতে পাত্র হয় না ! একবার শুধু তাহার জন্ত তুমি
এস । আমার কথা কহিও না—আমার কাছে আসিও না—কেবল আর
একবার এস ।

এক মাস পরে অরুণ আবার বঙ্গদেশে অতিথুখে যাত্রা করিল ; আবার
সে একখানা টেলিগ্রাম পাইয়াছে, “বাবা, এসো আমার বড় অসুখ ।
লীলা ।” সংসারের শেষ পঞ্চদশটুকুও বুঝি এইবার ছিন্ন হয় । “এই আমার
উলগ্নক !” ভাবিতে ভাবিতে অরুণ পথ অতিবাহিত করিল ।

লীলার ক্ষীণ রূপ দেহ বকে তুলিয়া লইয়া অরুণ বলিল “লীলা—লীলা—
আমি এসেছি, মা—তোমার চতাল বাপ এসেছে ।”

ছই হাতে পিতার কণ্ঠ জড়াইয়া বরিয়া লীলা বলিল, “আর চলে যা'বে
মা ?”

“না ।”

“আমার কাছে থাকবে ?”

“একটু ভাল হও, তোমার এগাহাবাসে নিরে যাব ।”

“সেখানে কা'র কাছে থাকব ? সেখানে যে বড় মা নেই !”

অরুণ অনেক নীরব থাকিয়া বালিকার পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ প্রার্থে বলিল,
“আমার কাছে থাকবে । তাই ত তুমি আসে থাকতে, লীলা । এখন কি
আর তা' পারবে না ?”

লীলা ভাবিয়া বলিল, “না, আমি বড় মা'র কাছে থাকব ।”

অরুণ লীলার পুতুল ইত্যাদি টানিয়া আনিয়া এ প্রসঙ্গকে চাপা দিয়া অজ

কথা পাড়িল; কিছুক্ষণ পরে লীলা বলিল “আমার কিদে পেয়েছে ।”

অরুণ ইতস্ততঃ চাহিতেই দেখিল, পার্শ্বের দ্বার খুলিয়া কমলা নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছে। অরুণ একটা পুতুলের প্রতি মনঃসংযোগ করিল। কমলা নীরবে লীলাকে পথ্য সেবন করাইবার পর বালিকা হাসিমুখে ছুই একটা কথা কহিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। চুপ করিয়া থাকা আর ভাল দেখায় না বুঝিয়া অরুণ বৃদ্ধবরে বলিল, “লীলা কত দিন এমন ভাবে শয্যাগত হয়েছে ?”

কমলার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইল—কত দিন—কত কাল পরে। বহু কষ্টে সে তাবৎ বলিত করিয়া সে বলিল, “দিন পাঁচ ছয়—বেশী দিন নয় ।”

“ভাক্সার কি বগে ?”

“বলে, ভয় নেই—মন ভাল হলেই সেয়ে যাবে ।”

অরুণ যেন আপন মনে বলিল, “সাবুবে কি আর ?”

কমলা একটু নুব তুলিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “এখন সাবুবে। কোন দিন এমন নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমায়ে না। সেই হচ্ছে ওর প্রধান অনুরোধ ।”

অরুণ ভেমনই নীরবে বসিয়া রহিল। আবার কণিক ইতস্ততঃ করিয়া কমলা বহু কষ্টে বলিল, “একটু জরুলে হ’ত ; অনেকটা পথ আসা ।”—অরুণ নীরবে কক্ষ হইতে নিভৃত হইয়া বারান্দার উচ্চ রেলিংএ ললাট রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ সফটপার অবস্থায় যেন তাহার হাঁফ ধরিতেছিল—সে বাহিরের মুক্ত বাতাসে নিখাস ফেলিয়া ঝাটিল। গৃহমধ্য হইতে কমলা নীরবে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে লীলার ক্ষীণ আহ্বানে আবার অরুণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। লীলা বলিল, “বাবা তুমি আবার কাছে বসুবে ?”

অরুণ পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

“না—বড় মা কেমন আশে আশে মিটি মিটি বাতাস করে ! তুমি শুধু গরুর কর ; বড় মা বাতাস করুক ।” তাহার হাতখানি হাতে তুলিয়া লইয়া অরুণ আদর করিতে লাগিল। আশ্রমে বালিকা আবার নীরবে ঘুমাইয়া পড়িল।

কতকাল পরে উভয়ে এত কাছে ! বহু—বহু—কাল ! বুকের মধ্যে কত দুখে—কত অপমানের—অভিমানের শেল ওতপ্রোতঃ ভাবে ছানিত-ছিল। আর উভয়ে কাঁঠপুতলিকার স্তায় নীরবে বসিয়া রহিয়াছে। নিখাস

যেন বহু হইয়া আসিতেছে, বন্ধের অতি দ্রুত স্পন্দন এক একবার যেন ধামিয়া যাইতেছে। বড় কষ্টকর অবস্থা !

কমলা উঠিল, বীণে বীণে অরুণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অরুণ নিঃশব্দ—বাসনান ! সহসা কমলা বলিয়া পড়িয়া জোড় হাতে আর্জ্ঞ কণ্ঠে ঈদ্রিয়া উঠিল,—“বল, অল্পমতি দাও—একবার পা ছুঁই ?”

অরুণ দেখে মনে চমকিয়া উঠিয়া এককণে কমলার পানে চাহিল। এই কি সেই কমলা ? এ যে এক জন্মের মধ্যেই নূতন জন্ম গ্রহণ ! এই নীনা মলিনা তিথ্যগ্রীণীর মত প্রার্থনাজলীযকী কি সেই রাজরাজেশ্বরী কমলা ?

“তবে কি এখনও ছুঁতে পা'ব না ? এখনও কি প্রারশ্চিত হই নি ? আরও কি বাকি আছে কিছু ? বল বল একদা !”

“কমলা !” অরুণের মুখের কথা মুখে রহিল ; উন্মাদিনীর মত কমলা গিয়া তাহার জ্ঞান দুইটা জড়াইয়া ধরিয় তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল। বহু চেষ্টায়ও অরুণ পা ছাড়াইয়া লইতে পারিল না।

কতকণ পরে কমলা মুখ তুলিল। অরুণ নিঃশব্দে নেত্রে সে মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহাতে যেন কত জন্মের সঞ্চিত ক্রীতি প্রজ্জ্বা বিখাস একত্রিত হইয়া সে মুখে এক অপূর্ণ স্ত্রী দান করিয়াছে ! সেই অসম্পূর্ণ নয়ন হইতে যেন জন্মজন্মান্তরের ব্যর্থ বাসনা—বেদনার অভিমান নীরবে গলিয়া বহিরা পড়িতেছে ! অরুণ ক্রুদ্ধকণ্ঠে আবার ডাকিল “কমলা !” কমলা আবার সজোরে বামীর জাগ্রত মধ্যে মুখ লুকাইল।

“উঠ, কমলা ! আর আমার পাপের বোঝা বাড়াইও না। তোমার কথা চাইবার মুখ আছে, আমার তা'ও নেই।”

“হাঁ আমার তা' অবিকার আছে, বল—স্বীকার কর আমার এ জায়গা আমি ছুঁতে পারি ; তুমিও আমার এখান থেকে ভাড়িয়ে দিতে পার না। স্বীকার করছ ত ?”

“কমলা, কি বলছো ? কোথায় তোমার স্থান ছিল তা' কি তুমি জানতে না ? কিন্তু তা তুমি এক দিন বুঝি চাও নি তাই চেনো নি।”

“চির দিনই চেয়েছি, পেয়েছি, জেনেছি, আবার তুচ্ছ অভিমানে তা' তুলে গেছি ! মূর্খ আমি—অজ্ঞান আমি—অসহুর্জ আমি। বল, কথা করেছ।”

“উঠ কমলা উঠ—আর না। আর পারি না !”

“পারছ না আমার গছ কহুতে ? পারে জায়গা দিতে পারছ না ?”

“না—না । ও জায়গা ত তোমার নয় । আমারও ত তোমার মাঝার উপরে এ স্থান নয় । হু’কমেনেই দোষ করেছি, তুল করেছি ; তবু আমারদের চির দিনের স্থানই পেতে চাই—দিতে চাই । লও তাই—পারে নয়, তোমার স্থান তুমি লও—আর আমার স্থান আমার দাও ।” অরুণ সজোরে কমলাকে বকে টানিয়া লইল ।

ঐশ্বরী নিরুপমা দেবী ।

পূজা-শেষে ।

—০—

তোমার হৃদয়-কুঞ্জে জীবন আমার
ফুটেছিল প্রেমময়ি, ফুলের মতন,
তোমারি সৌগত-মধু-শোভা স্নহুমার
যেন কোন্‌ তপোবলে করি আহরণ !

নিয়ন্ত একেলা বসি বিজনে নীরবে
গেঁথেছিহু কি আনন্দে চাক্র হার তার,
পাশরি আপন সব এ নিষ্ঠুর ভবে
অর্পিতে অঞ্জলি শুধু ওই রাগা পায় !

তুমি নিলে পূজা দেবী, বাসিয়া কোতুকে
এ জীবন-ফুল-মালা পরিলে গলায়,—
সার্বক জনম মোর, উজ্জ্বাসিয়া স্মৃথে
নুকনুহা ভালবাসা তব পানে যায় ।

কাঁদিছে পূজারি আজ—শূন্য দেবালয়—
ছিন্ন—শূন্য উপহার লুটে ধূলিময় ।

ঐকীর্ষ্যে কুমার দত্ত ।

গয়া—ভ্রমণ ।

—:—

বহুদিন হইতেই আমার গয়ায় যাইবার বাসনা চলিত। কিন্তু আমার যত ব্যক্তিগত বাসনা যে সহজে সফল হইবে এতদূর আশা করাই অসম্ভব। যাহা হউক, হাল আমলের শিকার ফল সম্বন্ধে আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিতর প্রবেশ করিয়া সময় সময় একটা গোল পাকাইলেও আমার বাল্যকালের প্রত্যেক একটি বিশ্বয়কর ঘটনা এবং আমার বৈয়াক্ষণিক জননীরা আদেশ আমাকে গয়ায় যে যাইবার জন্য অনেক সময়েই অত্যন্ত ব্যাকুল করিত। কিন্তু ঘটনাচক্রে ও অদৃষ্টদোষে যাওয়া সফল হইল না। তাহার পর আমার একটি কন্যার বৃত্তান্তে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি। তখন বাংলা যে ঘটনা দেখিয়াছিলেন,—সেইটিই স্মৃতিপথে বার বার উদ্ভূত হইয়া মনটাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আর ব্যক্তিতে পারিলাম না। গত আশ্বিন মাসে মহাপূজার নবমীর দিনে বিবাদভরা বুক ও যৎকিঞ্চিৎ পাথের লইয়া কলিকাতার বাসা হইতে মুক্তিক্ষেত্র গয়ায় যাইবার জন্য বাহির হইলাম।

ভাবিয়াছিলেন, পূজার নবমীর দিন রেলের ভীড় অধিক হইবে না। যাহা ভাবিয়াছিলেন দেখিলাম তাহার বিপরীত। গাড়ীতে বিষম ভীড়। তাবড়া হইতে গয়ার ইন্টার ক্লাসের ভাড়া ৫১/৫, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৩১/৫। পূজার সময় রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ ৭৫/০ আনার যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। আমি কন্সট্যান্ট টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেলাম। তখনও বোম্বাই বেল ছাড়িতে ঘটনাবলি অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু তথাপি ইন্টার ক্লাসের গাড়ী যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। যাহারা প্রথমে আসিয়া বসিয়াছে, তাহারা অনেকটা সুবিধাও করিয়া লইয়াছে। আমি অতি কষ্টে একখানি গাড়ীতে উঠিয়া সমান্য একটু স্থানে আসনপত্রগ্রহণ করিলাম। আনার পাথেই একজন পশ্চিম দেশীয় মুসলমান তাঁহার শিশু বংশধানি গলাসঙ্গল বিস্তৃত করিয়া “না বসা না শোয়া” অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে বিনীত ভাবেই বলিলাম, “মহাশয়, আপনি যদি একটু সোজা হইয়া বসেন তাহা হইলে বিশেষ উপকৃত হই।” লোকটি একটু চড়া হুত্রে উর্দ্ধ ভাবায় আমার কণ্ঠস্বর যে উত্তর করিলেন তাহাতেই বুঝিলাম যে, সে ক্ষেত্রে বিনয়ে কোনও সুবিধা হইবে না। তখন আর তথ্য ব্যাখ্যা না করিয়া

লোকটির নেকের উপর বিস্তৃত চাদরখানি সরাইয়া দিয়া ও তাঁহাকে যৎকিঞ্চিৎ তৈলিয়া দিয়া বেকের উপর যোগাঙ্গনে বসিলাম । তিনি আমার দিকে আরক্ত নয়নে চাহিয়া রহিলেন । আমি একটু সাবধানে থাকিয়া যেন সে দিকে দৃঢ়পাতই করিলাম না । কিছুকণ পরে উহার দিকে একটু আরক্ত লোচনে চাহিলাম । তিনি তৎক্ষণাৎ শাস্তবৃষ্টি পরিণেন । আমি মনে মনে একটু হাসিলাম, তাবিলাম সংগারে সর্বত্রই “জোর যার, মুহুর্ত তা’র ।”

এদিকে গাড়ীতে ক্রমশঃই লোক উঠিতেছিল । গাড়ী ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্বে কয়েকজন বাবু বরণের হিন্দুস্থানী ঐ গাড়ীতে উঠিলেন । তদ্রূপে যিনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ তিনি আবার আমার পাশেই সামান্য একটু স্থান পাইয়া বসিলেন । উপবেশন কালে ইহার অঙ্গে আমার অঙ্গ লাগিয়াছিল, তাহাতেই বুঝিলাম লোকটি বিলক্ষণ বলবান । হিন্দুস্থানী কয়েকজন কান্ধিতে যাইবেন । আশাপাশে বুঝিলাম, ইনি কান্ধির একজন গুপ্তা । ফলে এক-দিকে গঠনক বিরাটকায় মুগ্ধমান আর এক পাশে একজন বলিষ্ঠ কান্ধী গুপ্তা এই উভয়ের মধ্যে আমি দুইটি প্রবল পরাক্রান্ত সাত্রা-অ্যের মধ্যস্থিত দুর্বল Buffer State-এর মত শোভা পাইতে লাগিলাম । আমার মেদপুষ্ট কালোকালো দেহবস্তুখানির ভড়ং বেশ আছে, তবে তাহাতে বল কিছুই নাই । উভয় পাশে অর্ধস্থিত এক-জনের অজুলিতাড়নেই স্থানচ্যুত হইতে পারি, এ আশঙ্কা যে এক-বারেই আমাকে আকুল করে নাই একথা আমি হলপান্ বলিতে পারি না ।

অতি মুহূর্তকালনের মত গা নাড়া দিয়া ট্রেনখানি চলিতে আরম্ভ করিল । প্রাটফর্মে দণ্ডায়মানা দগ্ধিতবিরোগবিমুক্তা যেতাকী শনি-বদনার দল ক্রমাল উড়িয়া মাথা নাড়িয়া প্রাণেশপ্রিয়জনকে বিদায় দিতে লাগিলেন । মেঘে ঢাকা মলিন স্যোৎস্না মাথা বগর উপর দিয়া গভীর নাড়ে ট্রেন ছুটিল ; লোকের আবহ ভাবটা কাটিয়া দিয়া গন্তব্য স্থানের চিত্তাই মনকে জুড়িয়া বলিল । বিশেষতঃ আমার মত বাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থানে যাইতেছে, তাহাদের মনে ঐরূপ চিন্তার উদয়ই স্বাভাবিক । পরম্পরের কথাবার্তার ও আশাপাশে ভানিতে পারিলাম যে, ঐ গাড়ীখানিতে আর বাহারা উঠিয়াছেন, তাহাদের সকলেই

বারাণসী বা আরও দূরদেশে যাইবেন। আমার দলে ভিড়িবার কেহই ঐ গাড়ীতে ছিলেন না।

গাড়ীতে তীর্থগামী বারাণসীর কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইতে লাগিল। ইহার পূর্বে আমি দুইবার বারাণসীতে গিয়াছিলাম বলিয়া আমিও বারাণসী সম্বন্ধে একজন authority হইয়া পড়িলাম। বুকিলাম, পূজার ছুটিতে লোক আনন্দ সূটিতে আনন্দ-কাননেই যায়,—পিছু-লোকের উদ্ভারকল্পে গরায় অদিক লোক যায় না। দুই একজন গরায় গিয়াছিলেন,—তাঁহারা এক দিনে কার্য সাধিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। স্তম্ভগ্রাং গয়া সম্বন্ধে সহস্রাব্রাহ্মণের নিকট হইতে আমি বিশেষ কোনও তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ কান্দী যাওয়া আনকাল সভ্যতার একটা অঙ্গ হইয়াছে। গয়া যে সেরূপ হইবে, তাহার আশাও নাই। কারণ যে দুই একজন গরায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা এক-বাক্যে বলিলেন “গয়া অত্যন্ত nasty” “অত্যন্ত dirty.”

যাঁহারা বলিবার সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন বা বাজে স্থান লইয়া ছিলেন তাঁহারা নাসিকাধ্বনি করিয়া নিত্রা যাইতে লাগিলেন। ট্রেণ-খানি বর্জন্যে পৌঁছিলে অনেকে মিহিদানা ও সীতাতোণের লোভে সতর্ক করিতে পারিলেন না। বাহা হউক, ট্রেণ যথানিয়মে চলিতে আরম্ভ করিল। ট্রেণখানি সীতারামপুর জংসনে উপনীত হইলে দুইজন কাবুলী আমাদের গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করিল। আমার পার্শ্বস্থ হিন্দুস্থানিটি লক্ষ্য প্রদান পূর্বক গাড়ীর দরজাটি ধরিলেন। উভয়ে পুষ্পভাষ্য হইল। ফলে কাবুলী পরাজয় মানিয়া যেতাম গার্ডের নরণ লইল। গার্ড আসিয়া দুইজন কাবুলী ও একজন বাঙ্গালী নারীকে ঐ গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন।

কাবুলীর সহিত বাঙ্গালিনীকে দেখিয়া অনেকের মনে কৌতূহল জন্মিল। কান্দীর সেই হিন্দুস্থানিটি সপ্রতিভভাবে সেই মহিলাকে বাঙ্গালীর নিজাঙ্গা করিলেন, “তুমি ইহাদের সহিত সূটিলে কি প্রকারে?” এই প্রশ্নে কাবুলী দুইজন ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। একজন বলিল, “আমি উহাকে নিকা করিয়াছি।” হিন্দুস্থানিটি আবার ব্যঙ্গ করিয়া নিজাঙ্গা করিল “তোমরা দুইজনেই উহাকে নিকা করিয়াছ নাকি?” ক্রোধে হিন্দুস্থানিটির মূর, তাব ও ভাব্য-ভ্রমতার সীমা লঙ্ঘন করিল।

কাবুলী দুইজন শেষে নিত্যন্ত নরম হইয়া পড়িল এবং ধানবাদের ট্রেণ পৌঁছিলে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল ।

রাত্রিশেষে বিলম্বণ শীত অসহ্য হইতে লাগিল । ট্রেণখানি তখন পার্শ্বতা প্রদেয় ভেদ করিয়া চলিয়াছে । রজনীতে ঐ অকলের স্রুত দুস্তাবলী নয়নগোচর হইল না । গয়ায় ট্রেণখানি পৌঁছবার কিছুক্ষণ পূর্বেই পূর্বগগনে উষার রক্তিমচ্ছটা দেখা দিল ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখাড়-গুলিও দেখা যাইতে লাগিল । একজন সহযাত্রী আমার সহিত সম-ভাষতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—“মহাশয়, আপনার বড় কষ্ট হইয়াছে,—সমস্ত রাত্রি ঠায় বসিয়া আছেন।” আমি বলিলাম, “মহাশয়, এইটুকু কষ্টকে কষ্টজ্ঞান করিলে কি চলে ? রেল হইবার পূর্বে লোক কত কষ্ট করিয়া গয়ায় আসিত তাহুন দেখি । বিশেষতঃ মহাত্মারতে সহিষ্ণুতার উদাহরণে আছে—‘গয়াস্বরের স্মার সহিষ্ণু।’ যে স্থানে সেই গয়াস্বরের মন্দির সেই স্থানে আমি যাইতেছি, আমার এইটুকু কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করিলে চলিবে কেন ?” বাকের উপর হইতে জনৈক লোক ভাঙ্গা স্মৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মহাত্মারতের সময় গয়া হইয়াছিল নাকি ?”

প্রাতে ট্রেণ গয়ায় পৌঁছিল । ঠেঁপনে গয়াস্বরদিগের লোক বাকে । আমি নামিয়াই পাণ্ডার নাম করিলাম । অমনই একজন লোক আসিয়া আমাকে গাড়ী করিয়া লইয়া চলিল । তাহে বুঝিলাম, এ স্থানে গয়াস্বরের লোকেরা যাত্রী ভাড়াইবার অল্প বিলম্বণ চেষ্টা করে । ঠেঁপন হইতে বাহির হইলেই সমুখে রামনিসা পাখাড় দৃষ্টিগোচর হয় । ইহা গয়ার উত্তরে অবস্থিত । অনিতে পাওয়া যায় যে, ভগবান রামচন্দ্রের জ্ঞাতা স্তরত এই পর্বতে আরোহণ করিয়া পিতার পিণ্ডদান করিয়াছিলেন । নৈমিষাশ্রম এই পর্বত বিস্তৃত ছিল । বায়ুপুরণমতে এই স্থানেই বতল সূর্য্যের আশ্রয় ছিল । এই পাখাড়ের উপর দুইটি মন্দির আছে, একটিতে মহাদেব ও অপরটিতে রামচন্দ্র, সীতামেবী লক্ষণ প্রভৃতির প্রতিমূর্তি বিস্তারিত । স্তরত ঐ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা । বায়ুপুরণ বলিতেছেন :—

রামে বনং গন্তে শৈলমাগত্য স্তরতঃ স্থিতঃ ।

পিতৃপিতৃদিকং কৃত্বা রামং সংস্থাপ্য তত্র চ ।

রামং সীতামং লক্ষণক সূর্য্যম্ স্থাপিতবান্ প্রভু ।

ভরতভ্রাত্রমে পুণো নিতাং পুণ্যভৈমবৃত্তম্ ।

মতদন্ত পদং তত্র দৃষ্টতে সৰ্ব্ব মাহবৈঃ ॥

(১০৮১২৪-২৫)

“রাম বনগমন করিলে ভরত এই শৈলে (প্রত্যঙ্গ পৰ্ব্বতে) আরোহণ করিয়া পিতৃপিতৃগণি প্রদান করতঃ রামের প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন ; রাম, সীতা এবং লক্ষ্মণের বিগ্রহ স্থাপনান্তর মূনিদিগকেও তথায় স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং বয়ং এ স্থানে (কিছু দিন) বাস করিয়াছিলেন । সাবুজনসেবিত এই ভরতভ্রাত্রম পুণ্যময় । এই স্থানে মতঙ্গ মূন্নির আগ্রমপদ দৃষ্ট হয় ।” এই ভীর্ষের নাম রামভীর্ষ, পৰ্ব্বতের নাম প্রত্যঙ্গ পৰ্ব্বত । উত্তর কালে ঐ পৰ্ব্বত রামশিলা নামে পরিচিত হইয়াছে । এ স্থানে পিতৃগণের পিতৃ দিতে হয় । এই পাহাড়ে উষ্ণিবার আতি স্নানস্নেহ সোপানশ্রেণী বর্তমান । টিকারীর মহারাজ রণবীর সিংহ বহু অৰ্ঘ্য বায় করিয়া উহা নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন । বাণগুলি অশুভ ও প্রাণন্ত সেই জন্য ইহাতে উষ্ণিতে কোন কষ্ট হয় না । পৰ্ব্বতটি উচ্চে ৩৭২ ফিট । সৰ্ব্বলাকল্যে ইহাতে তিন শত বাণের অধিক নাই ।

বিহারের গাড়ী উৎকট বিকট শব্দ করিতে করিতে চলিল । রামশিলার দিকে দন্তদৃষ্টি হইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, রামচন্দ্র উত্তর কোণল হইতে দন্তকারণ্য হইয়া লঙ্কার গিয়াছিলেন । এ পথে তিনি আসিবেন কেন ? রামারণে রাম যে পথ বহিরা দণ্ডক বনে গমন করিয়াছিলেন,—সে পথ বহিরা গরায় আসা যায় না । রামারণে বা অকৃত রামারণে রাম বা ভরত গরায় আসিয়াছিলেন,—একপ কবা কোথাও বলা হয় নাই । তবে রামারণে গরায় উল্লেখ আছে—

ভ্রাত্রে বীমতা তত স্রতিগীতা বনবিনী ।

গয়েন বজ্রমানেন গয়েষেব পিতৃনু প্রতি ॥

পুন্নাহো নরকাতৃ বশ্যং পিতরং ভ্রাত্রেতে স্তুতঃ ।

তশ্চাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৃনু য পাতি সৰ্ব্বতঃ ॥

এইব্যা বহবঃ পুত্র্য গুণবক্তো বহুশ্রুতঃ ।

ভেবাং টেব সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ ॥

রামারণ, (অবোধ্য) কাত ১০৭১১—১৩)

ইহার অর্থ এইরূপ ; “ভাই হে । স্তনিতে পাওয়া যায় যে, গয়া অকলে গর নামক একজন বীমান বনবী বাজিক পিতৃগণের স্রীতির লজ্জা এই স্রতি গান

করিয়াছিলেন যে, যেহেতু পুত্র পিতৃগণকে পুত্র নামক নরক ছইতে ত্রাণ করে ; এবং ইষ্ট পুত্র কার্যাব্যাপ্তি পিতাকে সন্তুষ্টঃ প্রদা করে, সেই অল্প আয়তনের নাম ছইয়াছে পুত্র । বহু পুত্রের মধ্যে একজন যে কেবল গরায় বাইবে সেই অল্প দোকান গণনা 'ও' বিধান বহু পুত্রের কামনা করে ।" ভরত যখন চিত্রকূট পৰ্ব্বত ছইতে রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিলেন,—তখনই রাম ভরতকে ঐ কথাগুলি বলিয়াছিলেন ।

ইহার পর রাম আরও বলিয়াছিলেন,—

এবং রাজর্ষয়ঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রভীতাঃ রত্নমন্ডন

তন্মধ্যে ত্রাহি নরশ্রেষ্ঠ পিতরং নরকং প্রভো ।

"হে প্রভু রত্নমন্ডন । রাজর্ষিগণ সকলেই এই কথা জানিতেন, অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ পিতাকে নরক ছইতে ত্রাণ কর ।" রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া কি ভরত এ অঙ্গে আসিয়া পিতার পিতৃদান করিয়া গিয়াছিলেন ? ভরত যে গরায় আসিয়াছিলেন, রামায়ণে কোথাও এ কথা উল্লেখ নাই ; বাহু-পুরাণে আছে । তীর্থে আসিয়া তীর্থলব্ধে সন্মেলনক কোন চিত্রা মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে ; স্মরণ্য আমি অল্প বিষয়ে মন দিতে চেষ্টা করিলাম ।

টেশনের সান্নিধ্যে একটি প্রকাণ্ড বর্ষশালা আছে । শুনিলাম, ঐ বর্ষ-শালার চারি পাঁচ শত লোক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে । চাঁদ চৌরায় বাইতে গবে আর একটি বিরাট বর্ষশালা দেখিলাম । ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত বর্ষশালাটি শিউপ্রদার স্তনসূনওয়ালা নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন । বর্ষ-শালা দুইটিই অতি সুন্দর । আমি চাঁদ চৌরায় বাইব, স্মরণ্য অম্বিনীকুমারদয়বাহিত রথ অবিস্রান্ত গতিতে চলিল । টেশন ছইতে নব্বয়ের গাড়ী ভাড়া আট আনা ছইতে দশ আনা ; একাভাড়া বোব ছয় পাঁচ আনা । আমি যে দিন গরায় উপস্থিত ছইয়াছিলাম, সে দিন বিকট্য দলমী । অনেক বাড়ীতে মহামায়ার প্রতীমা দেখিলাম । অধিকাংশ প্রতীমাই মীলবরনী কালীমূর্তি । সম্মুখে চাউল প্রভৃতি উপকরণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাত্রে শুপাকারে সজ্জিত । আমাদের হুগীপ্রতীমা ছইতে এই সকল প্রতীমা সম্পূর্ণ বতর । উহা ঠিক আমাদের দেশের কালীমূর্তির বতর নহে । পুকার ব্যাপারও সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অনুমান ছইল । পুকার ঢোলকের ন্যায় এক একার ঢোলের শব্দ শিরঃপীড়া জন্মে

দেখিয়া তনিয়া মনে হইল, এই অকালে শক্তিপূর্ণা নূতন আমদানী হইয়াছে ।

যথাসময়ে বাসার উপনীত হইলাম । তখনও ৭টা বাজে নাই । বাসাটি বেশ হইয়াছিল । আমার বাসা গরানী মহাশয়দিগেরই একটি বাড়িতে । এ স্থানে ঠাহারা পিতৃদাদাদি পিতৃ কার্য করিতে আইসেন, ঠাহারা গরানীদিগের বাড়িতেই বাসা পায়েন । আমি বড়চুড়া ছাড়িয়া হকা লইয়া ভাষাকু সেবনে বসিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম,—এই সেই গরানী,—যে স্থানে আগমন করা এক সময় অতি পুণ্যজনক বলিয়া লোক মনে করিত । আজকাল রেল গাড়ীর প্রভাবে এক রাত্রিতেই গরার আসা যায় । কিন্তু তাই বলিয়া আজকাল যে অধিক লোক গরায় আসিতেছে,—এরূপ মনে করা যায় না । তখন দুর্গম বিষমকূল পথ বহিয়া গরায় আসিতে হইত বলিয়া লোক গরায় আসিতে পারিত না,—এখন পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে বলিয়া লোক আইসে না ।

বাসায় বসিয়া তাত্রকূট সেবন করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলাম, এই সেই গরানী যে স্থানে গর নামক অশুর বস করিয়াছিলেন । ইনি প্রথম নৈঋত ছিলেন । আবার এই স্থানেই সাধ্বী বর্ষত্রতা দ্বন্দ্বের তপস্যা করিয়া শিলাষ পাইয়াছিলেন সত্য,—কিন্তু ঠাহারই তপস্যাের ফলে আজ সংসারের বত পাণ্ডী ভাঙি এই স্থানে পিতৃ পাইয়া উদ্ধার হইতেছে । এ স্থানে যেন কাম্যের শাসন পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তিত । স্বধাতিই হউক আর বিধাতিই হউক, সকলেই এই স্থানে প্রদত্ত পিতৃের প্রভাবে অমর লোকে গমন করিয়া থাকেন । যে আশ্বাবাভী কোথাও কোনরূপে নিষ্ঠার পায় না, সেও বর্ষত্রতার বামপদে প্রেতশিলার পিতৃদান করিলে উদ্ধার পাইয়া থাকে । কালে অকালে, রোগে, শোকে, আশ্বাবাতে অপদাতে, উল্লাসে বিবাদে যে কোনও অবস্থাতে মৃত ব্যক্তি এই স্থানেই পিতৃ পাইলে মরকণ্ডোগ হইতে নিষ্ঠার পায় । সমস্তই বর্ষত্রতার বর্ষকালে । যে সাধ্বী আপনার পুত্রীকৃত পুণ্যের ফলে সকলকে সমভাবে মুক্তি বিলাইতেছেন,—ঠাহার চরিত্রের পবিত্রতা আমাদের বারবারও অজীত ।

বর্ষত্রতা কে ? কেনই বা তিনি সাধ্বীদিগের শিরোমণি হইয়াও

পাশাপাশি হইয়াছিলেন ? বায়ুপুরাণের ১০৭ অধ্যায়ে এই ধর্মত্ৰতার কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। ধর্মত্ৰতা ধর্মের উন্নয়নে বিশ্বকর্পার গর্ভে জন্মিরাছিলেন। রূপলাবণ্যে ও গুণবাহুল্যে ধর্মত্ৰতার সন্মুখি কন্যা পৃথিবীতে আর জন্মে নাই। ইনি বয়স্ক হইলে ইহার জনক ধর্ম ইহারই অমূল্য বর অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু কোথায়ও ইহার যোগ্য পাত্র পাইলেন না। তখন ধর্ম কন্যা ধর্মত্ৰতাকে বলিলেন,—“তুমি যেন বাইরা তপস্তা কর, তাহা হইলে তোমার যোগ্য বর পাওয়া যাইবে।” পিতার আদেশে কন্যা তপস্করণে নিযুক্ত হইলেন। কঠোর তপস্তার ধর্মত্ৰতার বহুকাল কাটিয়া গেল। এই সময় এক দিন ত্ৰক্ষার মানসপুত্র মহর্ষি যত্রিচি ধর্মত্ৰতার আশ্রমে উপনীত হইলেন, এবং ধর্মত্ৰতাকে রূপযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জন্য এই কঠোর তপস্তা করিতেছ।” ধর্মত্ৰতা যত্রিচির কথার উত্তর প্রদান করিলে মহর্ষি তাহাকে বলিলেন,—“আমি ধর্মত্ৰতা পত্নীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। তুমিই আমার যোগ্য পত্নী। অতএব তুমি আমাকে বিবাহ কর।” ধর্মত্ৰতা উত্তর করিলেন,—“আপনি আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন।” মহর্ষি যত্রিচি তাহাই করিলেন। উত্তরের বিবাহ যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া গেল। ধর্মত্ৰতাও পতিত্ৰতাদিগের নিরোষিণি হইয়া মহর্ষি যত্রিচির সহিত দাম্পত্য-সুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। কালে ধর্মত্ৰতার গর্ভে বহু পুত্র জন্মিল।

একদা মহর্ষি যত্রিচি অত্যন্ত শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘৃষে আগমন করিলেন এবং আব্রাহ্মণ্ডে শয়ন করিয়া ধর্মত্ৰতাকে বলিলেন,—“প্রিয়ে! আমার পক্ষে বেদনা বোধ হইতেছে,—আমার চরণসেবা কর।” পতিত্ৰতা ধর্মত্ৰতা হৃষ্টচিত্তে পতির চরণসেবার আন্তরিক্যেণ করিলেন। ক্লান্ত যত্রিচি ঐক্কেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ত্ৰক্ষা আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ধর্মত্ৰতা স্বস্তরকে আসিতে দেখিয়া যেন যেন হ্রিৎ করিলেন, ইনি আমার গুরুর গুরু ; অতএব এখন আমার ইহাকেই সেবা করা কর্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্মত্ৰতা ত্ৰক্ষার সেবা করিতে লাগিলেন। ত্ৰক্ষা পতিত্ৰতার সেবার পরিভূট হইয়া ভোজনান্তে শয়ন করিলেন। এদিকে মহাতপা যত্রিচির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখা হইতে উঠিয়াই নিকটেই ধর্মত্ৰতাকে দেখিতে পাইলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পত্নীকে এই অভিলাপ

দিলেন,—“পতির আদেশ অবহেলা করিয়া তুমি অকৃত্রিম গমন করিয়াছ ; অতএব এই পাপে তুমি দণ্ড হইয়া শিলা হও । অতিনপ্তা ধর্ম্মত্রতাও কুশিলা হইয়া মরীচিকে কহিলেন,—“আপনি নিত্ৰিত হইলে আপনাতাই ক্রমক ব্রহ্মা আমাদের আশ্রমে আসিয়াছেন । এইরূপ বুলে আশার পক্ষে তাঁহার পূজা করা কণ্ডবা । আমি ধর্ম্ম বুদ্ধিতে আমার কর্তব্য পাশন করি-
য়াছি । আশার কোনও দোষ নাই । আপনি যেমন না জানিয়া না শুনিয়া বিনা অপরাধে আমাকে অতিনপ্তা করিলেন, তেমনই আমিও আপনাকে এই শাপ দিতেছি যে, আপনি মহাদেব কর্তৃক অতিনপ্ত হইবেন ।” পতিব্রতা ধর্ম্মত্রতার বাণী শ্রবণ করিয়া মরীচি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । পতিকে ব্যাকুল দেখিয়া ধর্ম্মত্রতার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । তখন তাঁহার্য্য ক্রতপদে ব্রহ্মার নিকট যাইলেন । ব্রহ্মা তখন নিত্ৰিত । তখন অনন্যোপায় ধর্ম্মত্রতা ও মরীচি শাপ বার্ষ করিবার জন্য উগ্র ভগ্নতা আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের ভগ্নতার দেবগণ সমুদ্র হইলেন । তাঁহারা কেশবকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মত্রতার নিকট উপস্থিত । এদিকে ব্রহ্মাও জাগিয়া উঠিলেন । তখন বিষ্ণু ধর্ম্মত্রতাকে বর দিতে চাহিলেন । ধর্ম্মত্রতা কহিলেন,—“বামি-
ক্রদন্ত শাপ অপনোদিত হউক আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন ।” বিষ্ণু বলিলেন, “তাঁহা অসম্ভব । সে শাপের অপনোদন করিবার সাধ্য কাহারও নাই । অতএব যাছাতে ধর্ম্মের রক্ষা হয়, যাছাতে বেদোক্ত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, তুমি সেই বর প্রার্থনা কর ।” তখন ধর্ম্মত্রতা কহিলেন,—
“আপনি আমাকে এই বর দিন যেন আমি শিলা হইয়াও সর্গপ্রধান মুক্তিপ্রদ ভীর্ষ হই । আমার এই শৈলদেহে যেন সমস্ত দেবতা অবস্থিতি করেন । এ স্থানে ব্রাহ্ম করিলে লোকের যেন মুক্তি হয় ।” দেবতার্য্য সকলে এক বাক্যে ধর্ম্মত্রতাকে ঐ বর প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, “ভবিষ্যতে যখন তুমি গয়ানুরের মস্তকে নিচ্চল হইয়া অবস্থিতি করিবে, তখন হইতে আমরাও তোমার উপর চরণ দিয়া নিচ্চল থাকিব ।”

দেবগণ চলিয়া গেলেন । পতিশাপে ধর্ম্মত্রতা শিলা হইলেন । লোক সেই মুক্তিদায়িনী শিলাস্পর্শে বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল । উহা তখন শিলা ভীর্ষ বা শৈলভীর্ষ নামে বিখ্যাত হয় । তখন গয়ানুর জন্মে নাই । সকল পাপী তাপী শিলাস্পর্শে উদ্ধার পাইতে লাগিল দেখিয়া যম ব্রহ্মার শরণ লইলেন । ব্রহ্মা বলিলেন, “তুমি শিলা লইয়া আপনাত গৃহে রক্ষা কর ।”

যম তাহাই করিলেন। পৃথিবীতে শিলা-তীর্থ বা শৈলতীর্থ লুপ্ত হইল। তাহার পর গয়াস্বরের মন্ডকে এই শুদ্ধ শিলা রক্ষিত হয়। তদবধি এই তীর্থ গয়া তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে।

শ্রীশ্রদ্ধ ভক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বায়ুপুস্তক-বর্ণিত গয়াস্বরের কাহিনীর একটি রূপক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, গয়াস্বর বৌদ্ধধর্ম; বৌদ্ধধর্ম যোদ্ধা প্রাণীর পথ সহজ করিয়াছিল, সেই জন্য হিন্দুগণ ইহার দমন করেন। ব্রাহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধ-ধর্মকে পদানত করিয়াছে, গয়াস্বরের উপাখ্যানে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। এইরূপ রূপক ব্যাখ্যা করা সম্ভব কি না আমি তাহার আলোচনা করিব না। কোন কোন হিন্দু এইরূপ রূপক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহেন। যাহা ঘটুক, যদি গয়াস্বরের উপাখ্যান রূপক বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে ধর্মতত্ত্বের উপাখ্যানও রূপক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। গয়াস্বরের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্বে ধর্মতত্ত্ব শিলা হইয়াছিলেন,—বায়ুপুস্তক ইহাই বলিতেছেন। ঐ শিলাস্মরণে লোক বৈকুণ্ঠে গমন করিত।* তখন ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে যম ঐ শিলা বগ্নে আনয়ন করেন। বহুকাল ঐ শিলা ঘমালয়ে ছিল। পরে উহা গয়াস্বরের মন্ডকে স্থাপিত হইয়াছিল। ভক্তার মিত্র মহাশয়ের ব্যাখ্যায় সহিত সামঞ্জস্য করিয়া ইহার রূপক ব্যাখ্যা করা অসম্ভব নহে। নামগুলির মৌলিক অর্থ বহিয়া এই রূপক ব্যাখ্যা পড়িয়াছে। এই রূপক ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে ইহাও বলিতে হয়, বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের (গয়াস্বরের) পূর্বে এ স্থানে শিলাতীর্থ নামক একটি যুক্তিপ্রবর্তক তীর্থ ছিল; পরে সেই তীর্থ ঘমালয়ে যায় অর্থাৎ লুপ্ত হয়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে সেই শিলাতীর্থ লুপ্ত হইয়াছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম কর্তৃক নিষ্কীর্ণ হইলে বৌদ্ধধর্মের মন্ডোকপরি এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বেশ্বরের বিষয় এই যে মিত্র মহাশয় এই উপাখ্যানটির আলোচনা করেন নাই। একটি পাদটীকায় দুই ছত্রে ইহার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন।

• শিলা দ্বিতীয়া পৃথিব্যাং সা দেবরূপাতিপাবনী ।

বিভিক্রাখ্যং শিলাতীর্থং ত্রিধু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।

শুভা সংস্পর্শনোন্মোক্তাঃ সর্বে হরিপুংঃ বয়ঃ ।

শুভে লোকজগে জাতে শূভা বনপুত্রী হতুং ॥ বায়ুপুস্তক।

পৌরাণিক উপাখ্যানের এক্ষপ রূপক ব্যাখ্যা করা উচিত কি না,—তাহা বলা কঠিন। রূপক ব্যাখ্যা করিতে হইলে অনেকটা অনুমানের ও কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ খটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমি সকল ক্ষেত্রে এক্ষপ ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নহি। অনেক বলেন যে, বৌদ্ধ যুগের পর এই স্থানে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বৌদ্ধবর্ষ আবির্ভূত হইবার পূর্বেও এই স্থানে একটি মূর্তিপ্রদ তীর্থ ছিল। এ স্থান অতি প্রাচীন। ইহার সান্নিধ্যেই ভীম হিড়ম্বকে হত্যা করিয়া হিড়িম্বীকে বিবাহ করেন। বজ্রাবের সান্নিধ্যেই ভাড়কা রাজপীর স্থান ছিল। সুতরাং স্থানটি আধুনিক নহে। আর বৌদ্ধ বিপ্লবের পর হিন্দুরা একটা অতীর্থে তীর্থ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহাও মনে হয় না।

মনে এইরূপ নানা চিন্তার উদয় হইতেছে এমন সময় একটা লোক এই স্থানে পরমা ও পাই পরমা বেড়িতে আসিল। ইহার এক আনার ব্যাগটি পাই দেয় না! কম দিয়া থাকে। লোকটা আনার দশটি পাই দিতে চাহিল বলিয়া আমার পাই বরাদ্দ করা হইল না। বেলা হইয়াছে বেধিয়া আমি কল্পিতে মন করিতে বাইবার উত্তোপ করিলাম।

(ক্রমশঃ)।

ঐশ্বিনীকৃষ্ণ মৃণোপাখ্যায় ।

পাপ ।

(লংফেলো হইতে)

পদে পদে মাহুয়েরা করে ফেলে পাপ,
পাখণ্ডেরা তাই লয়ে থাকে নিশিদিন,
মহৎ পাপের তথ্য করে অহুতাপ,
এক! তবু ভয়বান্ পাপলেন হীন।

ঐবসন্তকুমার চট্টোপাখ্যায় ।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ।

—:—

(২) টাইফয়েড্‌ জ্বর ও কলেরা।

টাইফয়েড্‌ জ্বরে আমাদের ভাষায় আভিজ্ঞান জ্বর বলা যাইতে পারে। জনগণের মধ্যে এই রোগের আভিজ্ঞান অধিক। ১৫ হইতে ৩৫ বৎসরের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের ইহার দ্বারা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। পত্নী দ্বারা দ্বিগুণিত হইয়াছে যে, এক প্রকার জলবাহন জীবাণু এই রোগের নিদান। সাধারণতঃ হৃৎ ও জলের সহিত এই জীবাণু মানব-দেহে প্রবিষ্ট হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের নিদান-কালে, বিল্যেতের কোন একটি বিশিষ্ট গো-শালায় হৃৎ পান করিয়া ৫০০ মত লোক এককালীন এই রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। অবিকৃত জলেই টাইফয়েড্‌ জীবাণু (Typhoid Bacilli) অবস্থিত করে। আমাদের এই নদী-মাতৃক বঙ্গদেশে যে সকল বন্যভোয়া বা রুক্ষগতি মজা নদী আছে, তাহাদের জলে এই সকল জীবাণু সহজে বংশবৃদ্ধি করিয়া বসতি করিতে পারে। কিন্তু বন্যভোয়া পুণ্যভোয়া ভাগিরথীর জলের এমন একটি শক্তি আছে যে, উহার মধ্যে কোন জীবাণুই অধিককাল জীবিত থাকিতে পারে না। অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে, বৎসরাবধি গঙ্গোদক তুলিয়া রাখিলেও তদ্বাধ্য কীট জন্মে না। গঙ্গার ঐক্লপ মহামায়া অরণ করিয়াই বৃষ্টি বয়ঃ শব্দর শব্দগাঢ়া বলিয়াছিলেন—“তব তট নিকটে বস্ত্র নিবাসঃ, যলু বৈবৃদ্ধে তন্ত্র নিবাসঃ”। সুনিয়তি দ্বিতীয়র আকবর শাহ হরিবার হইতে গঙ্গোদক আনাইয়া পান করিতেন। কলিকাতা-বাহিনী ও তদ্বিকটবর্তী ১৮৫০ জোশ মধ্যে গঙ্গার উপস্থিত যে হৃৎশা হইয়াছে। এবং যে পরিমাণে কলরায়ের ও সেপ্টিক ট্যাঙ্কের ময়লা তাহাতে ফেলা হয় তাহাতে তাহার আবিল ও আবর্জনার ময়লা নির্ভয়ে পান করিতে কিছু শক্তি হয়।

টাইফয়েড্‌ জীবাণু খাদ্য বা পানীয়ের সহিত মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইয়া বংশবৃদ্ধি করতঃ মনুষ্যের শ্রীহা, বক্তৃৎ, অস্ত্র, মুত্রস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রে ব্যাপ্ত হয়। রোগীর লালা মুত্র ও পুরীষের সহিত জীবাণুভাল আবার নির্গত হইতে থাকে। বীজতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ বলেন, এক হুচাএবিন্দু মুত্রে সহস্র সহস্র এই জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর মলমূত্রে যক্ষিকা বসিয়া ঐ যক্ষিকা আবার

বাস্তব্বে স্বাভাবিক কারণে খাদ্যদ্রব্য ও গৃহীতা উভয়েরই এই রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। টাইফয়েড রোগী নিরানন্দ হইলেও তাহাদের শরীরে দীর্ঘকাল এই রোগ-জীবাণু জীবিত থাকে। তখন তাহারা আশ্রয়দাতার বিশেষ কোন অনিষ্ট করে না বটে; কিন্তু এই সকল ব্যক্তি যে কোন স্থানে গিয়া পানভোজন ও মলমূত্রত্যাগ করিলেই তৎস্থানে রোগবিস্তার হইতে পারে। পশুদিগের মধ্যেও টাইফয়েড জ্বর হইয়া থাকে। একদা জর্জাণী দেশে টাইফয়েড রোগগ্রস্ত গো-বৎসের মাংস ভক্ষণ করিয়া অনেকগুলি লোক এই রোগাক্রান্ত হয়।

জলবাহন জীবাণুগুলির মধ্যে কলেরা বা ওলাউঠা রোগের জীবাণু অকৃত্রিম। তবে টাইফয়েডের বীজ যেমন এক প্রকার জীবাণু এই সাংখ্যাতিক রোগের বীজ তেমনই এক প্রকার উদ্ভিজ্জাণু। এই উদ্ভিজ্জাণুগুলির আকার দেখিতে ইংরাজি কমাৰ ন্যায় বলিয়া ডাক্তাররা ইহাকে কমা বেসিলাস্ (Comma bacillus) আখ্যা দিয়াছেন। ওলাউঠা রোগীর মল ও বমিত পদার্থে এই উদ্ভিজ্জাণু যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা চক্ষুচক্ৰে এই সকল উদ্ভিজ্জাণু দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখি, এক বিশৃঙ্খল সত্ত্ব সহস্র সহস্র কমা বেসিলাস্ পুঙ্খ পরিচালন করিয়া বেড়াইতেছে তখন বিশ্বদর্শিনের চিত্তে বলিতে ইচ্ছা হয়, দত্ত বীজ তবুবিদ্‌ মদ্যস্বপ্ন। দত্ত বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান! অনেক দিন হইতে এই কালাত্তক ব্যাধি এতদেশে আবিপত্য করিতেছেন। তবে ম্যালেরিয়া জ্বরের ভ্রায় ইনি সর্বদাই নহুচ্চ-সমাজে বাস করেন না। মানব-জাতি যখন যখন ইহার প্রেমালিঙ্গন লাভ করিলে এত দিনে মুক্তি সৃষ্টি লোপ পাইবে। বৎসরের মধ্যে দুই দশ দিনের জন্য ইনি বাজালার যে জনপদগুলিতে পরিভ্রমণ করেন, তাহাতেই অনেক সংসার জ্বরকার হইয়া যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভকালে ইনি একবার রাক্ষসী মূর্তিতে লড় হেষ্টিংশের সেনাদলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার শুভাগমনে সম্রাট-কালযথো ৭৬৪ জন সৈন্য ও তাহাদের ৮০০০ সঙ্গী চিরতরে মর্ত্যদাম পরিত্যাগ করে। বাজলা দেশের মধ্যে যথোহই ইহার প্রথম গালা ক্ষেত্র। এক্ষণে সমগ্র বঙ্গে কোন কোন বৎসর লক্ষাধিক নরনারী এই সাংখ্যাতিক রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

ওলাউঠা রোগের “কমা বেসিলাস্” টাইফয়েড জীবাণুর ভ্রায় সাধারণতঃ

জল ও হৃৎকের সহিত মানব-দেহে প্রবিষ্ট হয়। যন্ত্রের পাকস্থলী মুহুর্থাৎ থাকিলে এই উদ্ভিজ্জাণু অনেক সময়ে বিনষ্ট হইয়া যায়। পাকস্থলীর অগ্নরসের (Gastric juice) প্রভাব ইহারা সহ্য করিতে পারে না। যে কোন কারণে যন্ত্রের বাহ্যস্থানি বটিলে এই উদ্ভিজ্জাণু দেহান্তরে বংশবৃদ্ধি করিয়া রোগ আনয়ন করে। ওলাউঠা, রোগীর মলমূত্র বস্ত্রাদি যে পুঙ্করিণীতে ধৌত করা হয়। সেই পুঙ্করিণীর জল ব্যবহার করিয়া এক এক সময়ে এক একটি পল্লী জনশূন্য হইয়া যায়। অনেক সময়ে এতদেবীর গোপনন্দনরা যেখানে সেখানে ছুড় পাত্র ধৌত করিয়া বা ছুড়ে যে কোন স্থানের জল মিশ্রিত করিয়া এই সকল রোগ-বীজাণু সংগ্রহ করে এবং ষরিদ্ধারগণের মধ্যে রোগবিস্তারের হেতুভূত হইয়া থাকে। রোগবীজ-সম্বলিত জলে হস্ত মুখ প্রক্ষলিত করিলে অথবা উহাতে বাসন মাঞ্জিলে জলবাসী জীবাণুগণ আমাদের দেহে প্রবিষ্ট হইবার সুযোগ পায়। এই সকল রোগ-জীবাণু বহির্জগতে ও ভূমধ্যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে। কোন একটি মজা নদীর সারিধো এক সমাধিক্ষেত্র ছিল। ঐ স্থানে অনেক সময়ে ওলাউঠা রোগীর মৃত-দেহও কবর দেওয়া হয়। কালক্রমে ঐ ক্ষুণ্ণ নদীগর্ভে পতিত হইলে জল দূষিত হইয়া পড়ে। নদীর শুৎক্লবর্তী জনগণ ঐ জল ব্যবহার করিয়া ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। গভীর কবরে মৃতদেহ শীঘ্র নষ্ট হয় না। বাহ্যবিধিমাতে এই জন্ত হিম্মুর দাহ-প্রথা প্রচলিত। আর্ঘ্য মনীষিগণ অনেক ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া এই সকল সুনিয়ম করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজদিগের মধ্যে এখন অনেকেই দাহ প্রচার পক্ষ-পাতী। মৃতদেহ দাহ করিলে আশ্রয় ও আশ্রিত উভয়ই সুগণ্ড ভীত হইয়া যায়। সংক্রমক রোগে মৃত্যু হইলে যদি কবর দিতে হয়, তবে চুপের ঘাণা শব-দেহ আশ্রিত করিয়া কবর দেওয়াই সুব্যবস্থা।

টাইফয়েড ও ওলাউঠা রোগ হইতে আশ্রয় করা করিতে হইলে সকল প্রকার খাব্যের বিশেষতঃ পানীয় জলের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ রাখাই প্রধান আবশ্যক। আমাদের দেশবাসিগণের এতদ্বিষয়ে জ্ঞান এত সক্ষীর্ণ যে তাহারা যে জল পান করে, সেই জলেই আবার রোগীর মলমূত্রসিক্ত পখা-বসনাদি ধৌত করিতে ভীত হয় না। তাহারা এই বিশৃঙ্খলা জল পান করিয়া স্বাভাবিক প্রাণত্যাগ করিবে, তথ্যচ পানীয় জল দূষিত করিতে গচ্চাংগদ নহে। আমাদের শাস্ত্রকর্তারা জলের প্রয়োজনীয়তা সম্যক

উপলব্ধি করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন, “আপোনারাণঃ বয়ঃ!” বিষ্ণু শাস্ত্রে বলকে দেবতা জ্ঞানে অর্জনা করিবার কথা বহুস্থানে লিখিত আছে। মহাত্মারতে উক্ত আছে—“উত্তে নৃত্রপুণীশেতু নাপ্নু কুর্ধ্যাৎ কদাচন”— অর্থাৎ জলে কদাচ নৃত্র পুণীষ ত্যাগ করিবে না। আমরা এই সকল কথা এখন বাতুলের উক্ত মনে করিয়া মান্য করি না। ইংরাজ কবি পোপ যথার্থ বলিয়াছেন,—

“We think our fathers fools, so wise we grow ;
Our wiser sons, no doubt, will think us so.”

আমাদের দেশের অনেক ধর্ম্মপরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অবগাহনকালে পরি-
ত্যক্ত কাশ হস্তভালুতে নিকিষ্ট করিয়া পরে সেই হস্ত জলে ধোত করিয়া
কেলেন। ব্যবহারাজীব যেমন আইনের কুটতর্কের দ্বারা অপরাধীকে নির্দোষ
প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইলেন, এই সকল ধর্ম্মময় পুরুষ তেমনই শাস্ত্রাভ্যাসন
এতদ্বায়ে পালন করিয়াও অসার তর্কের দ্বারা আপনাদিগকে নিষ্পাপ
প্রতিপন্ন করেন। উদ্বেষ্টবিহীন হইয়া কর্ম্ম করিলে কোন কলোদয় হয় না।
শাস্ত্রে বলকে কেন দেবতা বলা হইয়াছে তাহার সম্ভাসত্য যে দিন দেশবাসী
ভাল করিয়া বুঝিবে সেই দিন হইতে চিত্তকণ্ঠের হিঁসাধ নিকাশের তালিকার
আসামীর সংখ্যারও অনেক হ্রাস হইয়া পড়িবে।

সংক্রামক রোগের প্রোত্খ্যাবকালে যথাসম্ভব স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন
করিয়া শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে সচেষ্ট থাকিবেন। দৃষ্টিভ্রা, তন্দ্রাচা-
ক্রবা আহার, যাত্রি জাগরণ, শীতাতপ সেবন, ভয়, অত্যধিক পরিশ্রম প্রভৃতি
স্বাস্থ্যবানিকর কারণগুলি সর্ব্বথা পরিহার্য্য। এই সময়ে মনোম্বরে অধিক
ক্লম থাকিতে নাই। পাকস্থলী ষাণ্ডাপূর্ণ থাকিলে অন্ন-রস নিঃসরণ হইতে
থাকে; স্তব্রাৎ, তৎকালে অল্পসংখ্যক রোগ জীবগণ উদরস্থ হইলেও ঐ
অন্ন রসের প্রভাবে তাহারা গতাস্থ হইয়া পড়ে; যে কোন বাড়ীতে
টাইফয়েড বা ওলাউঠা রোগ দেখা দিলে বাহ্যতে রোগবিস্তার না হয়;
তৎপক্ষে গৃহস্থ যত্নবান্ হইবেন। রোগীর পরিচর্যা কারিগণ স্বীতিমত হস্ত
প্রক্ষালন না করিয়া পানাহার গ্রহণ অথবা খদ্যাদি প্রস্তুত করিবেন না।
রোগীর মল ও বমিত পদার্থাদির দ্বারা কলুষিত লব্যাযবস্ত্রাদি দ্রব্য অথবা পত্রীর
বহু দূরে যে স্থানে পুত্ৰিস্রী, কুপ, নদী বা অপর পয়ঃপ্রণালী নাই এমন স্থলে
প্রোথিত করিতে হইবে। বাড়ী ঘর দ্বার সদাসর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন

রাখিবেন। ভরকারি খোসা, বাছ, মাংস বা ফেন ইত্যাদি পচিতে দিবেন না। পানীর জল ও হৃৎ উত্তমরূপে স্নিগ্ধ না করিয়া কখনই ব্যবহার করিবেন না। হস্ত মুখ প্রক্ষালনের জন্য যে জল আবশ্যক হয়, তাহাও স্নিগ্ধ হওয়া উচিত। তোজন পাত্রাদি সংকুত করিয়া পুনরায় হুঁটুল জলে ধৌত করিয়া লইবেন। অনেকে এই সকল রোগীর পরিচর্যা করিতে লজ্জা বোধ করেন। রোগী স্পর্শ করিলেই টাইফয়েড বা ওলাউঠা হয় না। তোজা পানীরেব সহিত রোগ-বীজাণু উদগ্ৰহ না হইলে ভয়ের কোনই কারণ নাই। উক্ত প্রকারে তোজা ও পানীর রক্ষিত হইলে, উক্তরূপে পান-তোজন পাত্র পরিষ্কৃত রাখিলে এবং উক্তরূপে হস্ত মুখাদি স্পর্শকৃত রাখিলে যথেষ্টভাবে ঐ রোগবহের বহিত পদার্থ ও পুরীষ বাঁটাঘ ও কোনই বিপদ নাই।

এাষে এই সকল সংক্রামক রোগ প্রাক্তুত হইলে বাহাতেই রোগ-বীজাণু নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে ভবিষ্যে গ্রামবাসিনগ বিশেষ মনোযোগী হইবেন। যে সকল খাদ্য দ্রব্য আহার না রাখিয়া আহার করা চলে এমন বাহিরের খাদ্য সামগ্রী বাড়ীতে আনিবেন না। অনেক সময় ভাখুলের সহিত রোগ বীজাণু গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ভাখুল বিক্রেতা ভাখুলে যে জল ব্যবহার করে তদ্বারাই রোগ-বীজ বাড়ীতে সংক্রমিত হয়। সমস্ত খাদ্য-সামগ্রী স্নিগ্ধ করিয়া উক্ত অবস্থায় আহার করিবেন। খাদ্য দ্রব্যে মক্ষিকার বা মূলিকণার সংস্পর্শ না হয় ভবিষ্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কলিকাতার কোন এক সরকারী চিকিৎসাগরে কয়েকজন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হয়। কোথা হইতে কি ভাবে এই বীজ হাসপাতালে প্রবেশ করিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে গিয়া তত্রতা প্রাধিঃনামা চিকিৎসকগণ দেখিলেন, এক ভৃত্যের হতে ওলাউঠার উত্তিজাণু সংগ্ৰহ ছিল। অনেক সময় এইরূপ অলক্ষিত ভাবে রোগ-বীজ দেশান্তর হইতে রোগমুগ্ধ দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। এক সময়ে বিহারের পাটনা সহরে ওলাউঠা রোগের অভ্যন্ত প্রাক্তুর্ভাব হইয়াছিল। দানাপুরের সেনা-নিবাসে পাটনার কোন দ্রব্য বা নরনারী প্রবেশ করিতে না পারে ভংপক্ষে উক্তপদস্থ কর্তৃচািরিগণ এক নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলেন। এক দিন মলিন বসনাবৃত কঠিন দরিদ্র ব্যক্তি ঐ স্থানে ভিক্ষা করিতে আসিলে সেনানিবাসের দাররক্ষী তাহার গলদেশে হস্ত প্রদান করিয়া তাড়াইয়া দিল।

এই ঘটনার পরদিনই সেই রক্ষী সৈন্যের ওলাউঠা রোগ ছইয়াছিল । সম্ভবতঃ ভিক্ষুকের মলিন বসনে কোথা হইতে কি প্রকারে রোগ-বীজাণু লিপ্ত হয় । পরে ঐ বীজ সৈনিকের হস্তে লাগিয়াই এই অনর্ধ ঘটাইয়াছে ।

রোগের প্রারম্ভিককালে নিজের রক্ষিত পুষ্করিণীর বা কূপের জল বাতীত বাহিরের জল ব্যবহার করিবে না । অবশুৎ জলে বাসন মাজিয়া তাহাতে বায়ুপ্রবাহ রক্ষা করিলেও অনেক সময় অলক্ষিত ভাবে রোগ-বীজ উদগত হয় । পুষ্করিণীর বা কূপের জলের পবিত্রতাসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে ঐ জল রীতিমত লিঙ্গ করিয়া ব্যবহার করিতে বাধ্য নাই । আমরা ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ পুষ্করিণী বা কূপ সংশোধিত করিয়া লইতে পারি । অবশ্য এই উপায়ে জল-শোধন করা কিছু ব্যয়সাধ্য । একটি পরিভার পায়ে পারম্যাঙ্গনেট অব্ পটাস্ (Permanganate of Potash) তুলিয়া পুষ্করিণী বা কূপের জলে ঢালিয়া দিতে হইবে । বতস্কণ জলের রং অল্প বেগুনিয়া বর্ণ না হয় ততক্ষণ অল্প অল্প তুলিয়া ঢালিয়া দিবে ; জলের রং অল্প বেগুনিয়া বর্ণ হইলে আর দিবার প্রয়োজন নাই । এইরূপে শোধন করার পর দুই তিন দিন ঐ জল ব্যবহার না করিলেই ভাল হয় । যদি নিত্যন্ত আবশ্যক হয় তবে ১২ ঘণ্টা পরে ব্যবহার করিতে পারেন । ইহাতে জল বিবাদ হয় না । পারম্যাঙ্গনেট অব্ পটাস্ ডাক্তারখানায় পাওয়া যায় । ইহা রক্তবর্ণ দানাবিশিষ্ট পদার্থ । সাধারণতঃ প্রত্যেক কূপ শোধন করিতে এই দ্রব্য অর্দ্ধ ছটাক হইতে এক ছটাক পর্য্যন্ত লাগিতে পারে ।

গোয়ালার দ্রুত অথবা অপরিচিত জল পান করিতে হইলে রীতিমত না ছুটাইয়া কখনই ব্যবহার করিবে না । অনেকে মনে করেন, জল নির্মল, স্বচ্ছ ও স্বাদ হইলেই নিরাপদে পান করা যায় । এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রম বিজ্ঞপ্ত । টাইফয়েড, কলেরা, অতিসার, আমাশয় প্রভৃতি রোগের বীজাণু জলের সহিত অল্প মিশ্রিত থাকিলে উহার বর্ণের বা স্বাদের কোন ব্যতিক্রম হয় না । আমরা এক্ষণে হতজ্ঞান হইয়াছি যে, প্রত্যহ বোড়শো-পচারে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইতে পারি ; কিন্তু পানীয় জলটুকু ছুটাইয়া লইতে পারি না ! ইহার কলও ফলিতেছে । আমাদের অগ্রে দস্তে না দেওয়া সজিত ঘন চিকিৎসকরা লইতেছে এবং প্রাণগুলি কলেরা, অতিসার ও টাইফয়েডের উদরপূর্ণ করিতেছে । যদি এই সকল ব্যাধির প্রাণ

হইতে আশ্রয় করা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে পানীয় জল ও ছুই গ্রীষ্মকাল সুস্থিত করিয়া পান কর। জল ঈষৎকরিলে জনবাসী জীবগণের মৃত্যু হয় না, ইহা সর্বদা মনে রাখিবে, সম্প্রতি পণ্ডিত হাককিনের ওলাউঠা নিবারক টীকা লইয়া যেসকল পরীক্ষা চলিতেছে তাহা যদি সফল হয় তবে আমরা শীঘ্রই দেশ হইতে ওলাউঠাভীতি দূর করিতে সমর্থ হইব। উক্ত মহাশয় ওলাউঠা-বিষ ক্ষীণ করিয়া লইয়া উদ্ভবের দক্ষিণ পার্শ্বে অবতীর্ণক (হাইপোডামিক) রূপে প্রয়োগ করেন। প্রথম বিষ প্রয়োগের পর দেহের উত্তাপ কিছু বৃদ্ধি হয়, শিরঃস্রাব এবং বিহ্বল হানে অল্প বেদনা ও ক্ষীতি দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ দিবসে বিষের অপেক্ষাকৃত উগ্রতর প্রবণতায় আরও প্রবীর্ণ করান হয়। এ সময়েও শরীরের তাপাধিক্য ও স্থানীয় বেদনা প্রকাশ পায়; কিন্তু ক্ষীতি দৃষ্ট হয় না। ঐ বেদনা তিন দিবসের অধিক থাকে না। উদ্ভবময় বা কোন প্রকার পরিপাক-বিকার উপস্থিত না হইয়া অনেকে ২৮ ঘণ্টার মধ্যেই অসুস্থতাবস্থা তিরোহিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে পুঙ্কলিয়া ও মুলকিন্ “স্থল-নিবাসে” ২৩৮ জন প্রযজীবীকে এই টীকা দেওয়া হয়। পূর্ব পূর্ব বৎসরাপেক্ষা এই বৎসর তথায় ওলাউঠা রোগের প্রাদুর্ভাব অল্পই দৃষ্ট হইয়াছিল। এক সময়ে কতিপয় পরীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ডাক্তার পাউয়েল্ অসুস্থতান করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, টীকা হয় নাই এমন ৬৫৪ জনের মধ্যে ১২৮ জন ওলাউঠা রোগে পীড়িত হয় ও ১২৪ জন ভবনোন্মাদ সাধ করে। অপর পক্ষে টীকা গ্রহণকারী ৫৭৭ জনের মধ্যে কেবলমাত্র ২৭ জন রোগাক্রান্ত ও ১৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। উক্ত সন্দেহের পীড়া ও মৃত্যুর হার সমান হইলে টীকাধারিগণের মধ্যে ২৭ জনের পরিবর্তে ১০১ জনের মৃত্যু হইত। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, টীকাধারী অপেক্ষা টীকাবর্জিত জনসাধারণের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর হার প্রায় অষ্টগুণ অধিক। ওলাউঠার টীকা প্রচলিত হইলে রুশিয় হাককিনের নাম জনবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কোন কোন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক বলেন, যে সকল লোক তাত্রবৎ নাড়াচাড়া করে বা তাত্র বনিতে কার্য করে তাহাদের প্রায় ওলাউঠা হয় না। তাহাদের মতে শরীরে পূর্ণ হইতে তাত্র ধারণ করিলে এই ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই কথাটুকু কোন বৈজ্ঞানিক

কারণ নাই বটে ; তবে হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে ইহার সুমীমাংসা হইতে পারে। সূর্য্যাদি গ্রহগণ বিরুদ্ধ হইলেই আমাদের শরীরে রোগ প্রবিষ্ট হয়। কোন্ গ্রহ হইতে কোন্ ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তাহাও শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। রবি ক্ষয়কাল, শিৱঃসীড়া, সর্দি-গর্দি, ওলাউঠা, চক্ষু ও মুখরোগ কাণ্ডক গ্রহ। এই দুই গ্রহ দুই থাকিলে মল্লবার ঐ সকল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—“সূর্য্যাদি দোষশাস্ত্রো বীৰ্য্যাদি-ভুজেন তাত্র শম্যে চ। বিক্রম কাকন মুক্তা রজত ত্রিপুরোহরাক পট্টানি।” অতএব দেখা যাইতেছে, বাহুমূলে তাত্র ধারণ করিলে সেই যানবের প্রতি সূর্য্যগ্রহ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কাষে কাষেই উপযুক্ত গ্রহজ ব্যাধি-ভুলিও আর হইতে পারে না। তাত্রই সূর্য্যের প্রিয় সামগ্রী। এই জন্য সূর্য্য-পূজায় তাত্র-প্রতিমা ও তাত্রালঙ্কার আবশ্যক হয়। পূজান্তে গ্রহ-বিগ্রকে যে সকল সামগ্রী দান করিবার বিধি আছে তন্মধ্যে ও “মৃত হেমতাত্রম্” পদের উল্লেখ দেখা যায়। অনেক গ্রহশাস্ত্রের কথার বিশ্বাস না করিতে পারেন। এখনকার দিনে কেহ এ সকল কথা বলিলেও লোক তাহাকে বাতুলালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। তবে ইহা জানিয়া রাখিবেন আখ্যা রচিন্ণ যে সকল বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তন্মধ্যে কোন গুঢ় সত্য নিন্দ্যই নিহিত আছে। অনেক স্থানে তাঁহারা প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া এক একটি বিষয়ের এক একটি বাহ্য কারণ দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ লোক বিভ্রান্তালোকে তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থাগুলির রহস্ত কিছু কিছু অহতভব করিতেছে। আগুপদেশ গ্রহণ করিলে জীবের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল নাই।

ঐশ্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ।

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

—:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শিক্ষা।

দৈনন্দিন কিশোরীচাঁদ একটি পাঠশালায় গ্রামনারায়ণ সরকার নামক জটনৈক গুরুমহাশয়ের নিকট মাতৃভাষা শিক্ষা করেন। সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষায় দারিদ্র্য স্বাক্ষর করিবার উপায় নাই। সুতরাং কিশোরীচাঁদের সমসাময়িক ছাত্রগণ যে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কিশোরীচাঁদ যদিও তাঁহার ভ্রাতা প্যারীচাঁদের দ্বারা বাঙ্গালা পুস্তকাদি রচনাভ্যাস আশাদিগের সাহিত্য-ভাণ্ডার তাঁহার উচ্চ ভাব ও নিঃশব্দ নীতিমূলক বসনাক্ত সমৃদ্ধ করেন নাই, তথাপি তাঁহার যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থাবলী হইতে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সময়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের নিকট ইংরাজীই সম্বন্ধি সমাদর ছিল। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের তৃতীয় বার্ষিক স্মৃতিসভায় কিশোরীচাঁদ বার্ষিক বলিয়াছিলেন—“There is a large number of our educated friends who can relish nothing that is Bengali, their taste seems to be diametrically opposed to all that is written in their own tongue. The most elevated thoughts and the most sublime sentiments when embodied in it become flat, stale and unprofitable.”

অর্থাৎ, আমাদের শিক্ষিত বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য নিতান্ত অনাদৃত; যাহা কিছু মাতৃ ভাষায় লিখিত হয় তাহা বেন তাঁহাদিগের ক্রটিত সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চতম কল্পনা, পতীততম ভাব সকল বাঙ্গালা ভাষায় সজ্জিত হইলেই বেন প্রাণহীন ভাবহীন ও উদ্বেগবিহীন হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তৎকালীন রীতামুসারে একজন মূল্য কৰ্ত্তৃক কিশোরীচাঁদ পারসিক ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন। এই ভাষায় কিশোরীচাঁদ তাত্ত্বিক ব্যাপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে

ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা। সকলেরই উপলব্ধি হয়। বিশেষতঃ ভীক্ষুবৃদ্ধি গ্রামনারায়ণ হিন্দুকলেজে প্যারীচাঁদের শিক্ষার উন্নাত দেখিয়া কিশোরীচাঁদকে উক্ত ইংরাজী শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বালাকাল হইতেই প্যারীচাঁদের শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষমতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি যখন হিন্দুকলেজের উচ্চ শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন বীর বাটীতে “হিন্দু দাতব্য বিদ্যালয়” নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যালয়ে প্রাতঃকালে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিবচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, রামকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অবৈতনিক ছাত্রা শিক্ষক এবং প্যারীচাঁদ ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষার চিরবন্ধু ডেভিড্‌ হেয়ার, মহাপ্রাণ ডিগোবিও ও হিন্দুকলেজের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ডিগ আনসেলম প্রভৃতি মহোদয়গণ উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও পারিতোষিক বিতরণ করিতেন; কিশোরীচাঁদ এই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন এবং ডেভিড্‌ হেয়ার প্রভৃতি মহাপুরুষগণের সহিত পরিচিত হইলেন;

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে হেয়ারের আগ্রহে গ্রামনারায়ণ কিশোরীচাঁদকে হেয়ার স্কুলে প্রেরণ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কিশোরীচাঁদ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিলেন এবং বৎসর বৎসর পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা ডেভিড্‌ হেয়ার প্রত্যেক বালকের চরিত্র ও শিক্ষাবিষয়ে ভীক্ষু বৃষ্টি রাখিতেন। পরিশ্রমী, ভীক্ষুবৃদ্ধি, সূচরিত্র ও মেধাবী কিশোরীচাঁদ একাধাৰিত ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; এবং হেয়ারের নিত্য প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিলেন। হেয়ারের উপদেশে তিনি যৎপরোনাস্তি উপকৃত হইলেন। কিশোরীচাঁদ যত দিন জীবিত ছিলেন ডেভিড্‌ হেয়ারের এই উপকার বিস্মৃত হন নাই। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার পিতা ডেভিড্‌ হেয়ারের মৃত্যু হইলে তাঁহারই প্রবর্ত্তে ও চেষ্টায় হেয়ার সাংস্কৃতিক স্থাপত্য প্রবর্ত্তিত হয় এবং কিশোরীচাঁদ এই সকল সভায় প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়া হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিতেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম—

“এতদ্ব্যপেক্ষাগণকে কুসংস্কার ও অজ্ঞতার নিগড় হইতে মুক্ত করাই ডেভিড্‌ হেয়ারের জীবনের ব্রত ছিল। এই ব্রত উদ্ধৃৎপনের নিমিত্ত তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি, সময়, অর্থ ও জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এত-

আর্য্যাবর্ত



শিবচন্দ্র দেব ।

দেববাসিগণের মনোবৃত্তি যে উচ্চ ও বিকাশলাভে সমর্থ তাঁহার এই ব্যর্থতা ছিল এবং তাঁহার এই অতিমত আত্ম আত্মাধিপতির নিকট উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বাস্তবরূপে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদিগের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি বিধানই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। ইহায়া স্বয়ং লক্ষ্য করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে আত্মাধিপতির স্বজাতীয়গণের প্রতি তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেমের প্ৰভাৱতা উপলব্ধি করা হুতর। কি বলা কি নির্ধন সকল ছাত্রের প্রতি তাঁহার ভালবাসা সমভাবে লক্ষিত হইত। আত্মাধিপতির কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ লোকহিতৈষীর অন্তর্গত জাতি বা বর্ণবিষয়ক পার্থক্যাহুসারে প্রদর্শিত হয়। কিন্তু ডেভিড্ হেরার প্রত্যেক মন্তব্যকেই প্রীতির বৃষ্টিতে দেখিতেন; কারণ সমগ্র মানবজাতিই তাঁহার প্রেমের বিষয় ছিল। দেশের পার্থক্য, জাতির পার্থক্য, সামাজিক বা বিজাতীয় অংগার পার্থক্য তাঁহার সহ্যভূতির বৃত্তি বা সঙ্কোচ উৎপাদিত করিতে পারিত না। তিনি জাতি বা সামাজিক অবস্থাবিধি পক্ষপাতবিশেষ বহু উচ্চে অবস্থিত ছিলেন। যাহুব যে চাপকান বা শাল, পাত্তী বা গাড়ী অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিষয়ের অধিকারী তাহা তিনি জানিতেন। তিনি কৃষ্ণকায় লোককেও ব্রাহ্মণ বহু দেখিতেন। এই ব্রাহ্মণতাব্যবহারের অভাবের ঔচিত্য অকাটা বৃত্তিভাৱা প্রমাণিত হইলেও এখনও সাধারণের দ্বারা স্বীকৃত বা অনুভূত হয় নাই এবং ইংলণ্ড-বাসীদিগের মনে এই ভাব প্রবলিত করাইবার নিমিত্ত এখনও প্রবানমন্ত্রিগণের যত্নভার প্রয়োজন অনুভূত হয়। লোকহিতৈষী ডেভিড্ হেরার, ভারতবর্ষে এই লোকহিতৈষণ্যরূপেও একটি নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। তাঁহার সময় হইতেই ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের উপর দ্বিগুণ নূতন ভাবব্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, ইহার দ্বারা অন্ধকার হইতে আলোক উদ্ভূত হইবে এবং হিন্দু ও ইউরোপীয়গণের মধ্যে ইচ্ছা, আশা এবং আকাঙ্ক্ষার একতা সংঘটিত হইবে। এতদেব-বাসিগণের উন্নতিসম্বন্ধীয় বিষয়ে তাঁহার যত্ন অসীম আগ্রহ ছিল, তাঁহার তৎসামান্যেও সেইরূপ বলবতী ছিল। প্রত্যেক দেশবাসীকে তাঁহার অবস্থা উন্নত করিবার এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভ করিবার অক্ষুণ্ণ প্রয়োজন প্রদান করাই তাঁহার বাঞ্ছনীয় ছিল। যে স্বার্থপরতা নীচাশয়তা ও ঈর্ষ্যা আত্ম দেশবাসিগণকে তাঁহাদিগের কায়সল্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কেবল নীচ কার্যে নিযুক্ত করিতে প্রয়াস পায়, তাহার মধ্যে

অবস্থিত হইয়াও তাঁহাদিগের উন্নতিবিধয়ে ডেভিড্‌হেরারের আগ্রহ ও তাঁহাদিগের জ্ঞানসম্পন্ন অধিকার স্বীকারের কথা স্বরণ করিলে মনে আনন্দের উদয় হয় ।

"হিন্দু প্রাতি প্রাগাঢ় আগ্রহপূর্ণ প্রেম যেন তাঁহার প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে নিভড়িত ছিল । তাঁহার পরোপকারেচ্ছা গভীর ছিল ; কিন্তু অসংগত ছিল না এবং তাঁহার মনের এই বিশেষত্ব তাঁহার সমস্ত জীবনে ও চরিত্রে লক্ষিত হয় । তাঁহার প্রেমময় আনন হইতে যেন ইহা বিক্ষুব্ধিত হইত । কি বাবুর বৈঠকখানায়, কি রাজার নৃত্যশালায়, কি দরিদ্র পরাম্ভোজী বালকের অগ্রশত গৃহে, কি রাজকুমারের রোগ-শয্যার পার্শ্বে সর্বত্রই ইহা লক্ষিত হইত । দেশবাসিগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে পরিশ্রমকালে ইহা বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হইত । অজ্ঞতার বিষময় ফলে আমাদের দেশের জীবনী-শক্তি অপচিৎ হইতেছে দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছিলেন । ভারতবর্ষের প্রাতি ইংলণ্ডের কি কর্তব্য তিনিই তাহা সর্বপ্রথমে জ্ঞদয়নয় করিয়াছিলেন । আপনাদিগের অভিজ্ঞতাকালে ইহা দেখিয়া থাকিবেন যে, কোনও কোনও বিশেষ ব্যক্তির দৃষ্টি দেশের কোনও কোনও বিশেষ ব্যাধির প্রতি আকৃষ্ট হয় । এই প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের সমাজের কল্যাণসাধনে বিশেষভাবে সাহায্য করে ; কারণ এই সকল বিশেষ ব্যাধির প্রতীকারফলে এই সকল বিশেষ ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিকতর উৎসাহের সহিত চেষ্টা পায়েন । ইহার প্রভাবে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি সজ্ঞান-নিবারণে এবং অপর কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি দাসত্ব-বিমোচনে প্রয়াস পায়েন । আমি যে মহাত্মার বিষয় বলিতেছি, তিনি দেশবাসিগণকে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে হীনাবস্থায় পতিত দেখিয়া ব্যাধিত হইয়াছিলেন । মানসিক ও নৈতিক অন্ধকাররূপ মহাব্যাধির প্রতিই তাঁহার জ্ঞদয় ও মন আকৃষ্ট হইয়াছিল । এই অন্ধকার দূরীকরণ,—শিক্ষার কল্যাণকর প্রভাববিস্তার, তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল । এই সংকল্প-সাধনার্থ তিনি হিন্দুকলেজ, স্কুল সোসাইটির স্কুল এবং অল্প কয়েকটা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিবিধান করেন । এতদ্বশে শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্ব প্রথম উদ্যোগী ছিলেন এবং তাঁহার নাম যে 'শিক্ষার জন্মদাতা' এবং 'দেশবাসিগণের উন্নতির জন্য সর্ব প্রথম উদ্যোগী' বলিয়া ভবিষ্যৎশতাব্দীর লোকের নিকট সম্মানের সহিত স্মরণীয় হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই ।"

হেয়ার স্কুল তৎকালে “স্কুল সোসাইটিজ্ স্কুল” নামে অভিহিত হইত। স্কুল সোসাইটি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার প্রথমে হোয়ারের স্কুল প্রকৃতি অনেক স্কুল ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। ডেভিড হোয়ারের স্কুল তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই স্কুলের সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ছাত্রগণ উক্ত সোসাইটির বায়ে হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইতেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থী ধনী ছাত্রগণ এই সকল ছাত্রকে বিভ্রণ করিয়া “বড়ে” নামে অভিহিত করিতেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আশ্চর্য্যে লিখিয়াছেন “কেন ‘বড়ে’ বলিত তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল হইতে তাহাদিগকে বড়ের মতন কলেজে চালিয়া দিতেন, এই জন্য কিম্বা বালকগ্ৰা দরিদ্র বলিয়া তাহারা কলেজের বড়মাতৃব ছাত্রদিগের কল্পনামুসারে বড়ি ভাতে দিয়া ভাত খাইয়া তাহাদিগের বড়মাতৃব সমাধায়ী অপেক্ষা সকল সকল কলেজে আগিতে সমর্থ হইত, এই বলিয়া তাহারা উক্ত বড়মাতৃব ছাত্রদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের নিকট অগৌরব কিন্তু প্রকৃতরূপে গৌরববৃদ্ধক এই উপাধি লাভ করিয়াছিল কি না তাহা বলিতে পারি না।” ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে সমাজবিজ্ঞান সভায় (Bengal Social Science Association.) পঠিত “বাল্যায় শিক্ষাবিস্তার” নামক প্রবন্ধে এই সকল ছাত্রগণের সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ দাখা লিখিয়াছেন তাহার ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

“এই সকল ছাত্র তাহাদিগের কলেজের সহপাঠীদিগকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া বিশেষ স্তুতিভি অর্জন করিতেন। তাহারা ই সমস্ত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন এবং যে সকল ছাত্র বেতন দিয়া পড়িতেন তাহাদিগের অপেক্ষা ইহারা ই কলেজের গৌরববর্দ্ধন করিতেন। ইহার কারণ, ইহাদিগের অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য, নিম্ন বিভাগে অর্জিত পরিশ্রমের অভ্যাগ, পারিতোষিক বৃত্তি প্রকৃতির উদ্দীপক প্রেরণ। ইহারা সুপরিচালিত উচ্চ বিভাগের নির্ভীকিত বালক। ইহারা তাহাদিগের স্কুলে অন্যান্য সহপাঠীগণকে প্রতিযোগিতায় অতিক্রম করিয়াছেন এবং ইহাদিগের জ্ঞানার্জনে অতুল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। অপরপক্ষে হিন্দুকলেজের যে সকল ছাত্র অগি হইতে তথায় বেতন দিয়া পড়িতেন তাহারা বিলাসের জোড়ে চিরলাগিত। সুতরাং ইহারা বিভাগজন্য ঐশ্বর্য্য ও বশোলাভের একমাত্র উপায় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন—সেই সকল পরিশ্রমী ‘বড়ের’ (হোয়ারের

ছাত্রগণের) নিকট বিলাসী ও আমোদপ্রিয় বালকগণ যে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইবেন ইহাতে আর আশঙ্কা কি ?”

প্রতিভাবান ছাত্র কিশোরীচাঁদ হেয়ারের মূল হইতে হিন্দু কলেজে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই গবর্ণমেন্ট একটি নূতন শিক্ষা পদ্ধতির অন্বেষণ করিয়া এতদ্ব্যেতে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রণেতার অপূর্ণ সুযোগ প্রদান করেন। পূর্বে কোট অব ডাইরেটরসের আদেশদ্বারা যে দশ সহস্র পাউণ্ড শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত তাহার অধিকাংশই দেশীয় সাহিত্য-চর্চা ও সাহিত্য-প্রচারজন্য নির্ধারিত ছিল। এতদ্ব্যেত Board of Education কিছু পূর্বে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। কয়েক জন সদস্য সংকত, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন এবং অপর সদস্যগণ পশ্চাত্য ভাষার প্রচারার্থী ছিলেন। প্রাচ্যভাষা-প্রচারার্থীরাই প্রথমে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড বেকলে অপর পক্ষে যোগদান করিলেন তখন পশ্চাত্য ভাষা-প্রচারার্থীরাই জয়ী হইলেন। বেকলে তাহার ২২২ ফেক্সারি (১৮৩৫) তারিখের সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্যে লিখিলেন, “যে কোন উৎকৃষ্ট ইউরোপীয় পুস্তকালয়ের একটি বাত্র আলমারী সমগ্র সংকত ও আরবী সাহিত্যের সমতুল্য।” তিনি এই সুদীর্ঘ মন্তব্যের উপসংহারে আরও বলিলেন, “ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্টের বিধিবারা লক্ষ্যাবদ্ধ নহি, আমরা প্রকৃত বা অপ্রকৃত কোনও প্রতিজ্ঞাবারা বদ্ধ নহি, আমরা আমাদের বনভাণ্ডার বেজপে ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি; বাহা জানা আবশ্যক তাহারই শিক্ষা দিবার জন্য আমাদের ইহার ব্যবহার করা কর্তব্য; সংকত অথবা আরবী ভাষা অপেক্ষা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অধিক; দেশবাসিগণ ইংরাজী শিক্ষা করিতে সম্মুখক; ধর্ম অথবা ব্যবহার শাস্ত্রের ভাষা বলিয়া সংকত অথবা আরবী ভাষা প্রচার করিবার বিশেষ কারণ বিদ্যমান নাই; এতদ্ব্যেত লোকদিগকে ইংরাজীতে সুপাণ্ডিত করা সম্ভব; এই উদ্দেশ্যে আমাদের সকল চেষ্টা প্রযুক্ত করা উচিত।”

বড়লাট লর্ড উটলিয়ার বৈশিষ্ট্য ইহাতে এই মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করেন—

১। সপার্বদ গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর শিক্ষা-সমিতির সম্পাদক কর্তৃক প্রেরিত বিগত ২১শে ও ২২শে জানুয়ারি তারিখের পত্রের এবং ভৎসর্গিষ্ট কাগজপত্রাদি বনোবোনের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

আর্য্যাবর্ত



২। বড় লাট বাহাদুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতবাসি-
গণের মধ্যে যুরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচার করিলেই ব্রিটিশ গবর্ণ-
মেন্টের মত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এবং তিনি বিবেচনা করেন যে,
শিক্ষার জন্য যে অর্থ নির্দিষ্ট আছে তাহা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োগ করাই
প্রেরণকর ।

৩। কিন্তু সপার্বদ বড় লাট বাহাদুরের এমন অভিপ্রায় নহে যে, যত দিন
দেশবাসিগণ দেশীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সমুৎসুক থাকিবে তত
দিনের মধ্যে দেশীয় পাঠশালা বা উচ্চ বিদ্যালয়সমূহ তুণিয়া দেওয়া হইবে।
অতএব সপার্বদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, শিক্ষাসমিতির
তত্ত্বাবধানে যে সকল বিদ্যালয় বর্তমানে পরিচালিত হইতেছে সে সকলের
ছাত্র ও শিক্ষকগণ পুঙ্খের ন্যায় বৃত্তি পাইবেন। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রগণের
সাধারণ্যার্থে যে বৃত্তি প্রদানের প্রথা বর্তমানে প্রচলিত আছে সপার্বদ বড় লাট
বাহাদুর সে প্রথার সমর্থন করিতে অক্ষম। তাঁহার বিশ্বাস যে, যে প্রথায়
অধুনা শিক্ষা প্রদত্ত হয়, সেই প্রথা প্রাকৃতিক নিয়মামুসারে অনাবিধ
অধিকতর আবশ্যক প্রথার দ্বারা অধিকারভ্রষ্ট হইবে এবং উক্ত বৃত্তি প্রদানের
একমাত্র ফল এই হইবে যে, সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অধ্যয়নে
অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদান করা হইবে। অতএব তিনি আদেশ দিতেছেন যে,
অতঃপর যে সকল ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন তাঁহারা কোনও
প্রকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন না এবং যখন কোনও প্রাচ্যবিদ্যার অধ্যাপক
তাঁহার কর্তৃক হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন, শিক্ষাসমিতি গবর্ণমেন্টকে তাঁহার
বিদ্যালয়ের অবস্থা ও ছাত্র-সংখ্যার একটি বিবরণ পাঠাইবেন, এবং গবর্ণ-
মেন্ট তাঁহার স্থলে নূতন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে
বিচার করিবেন।

৪। সপার্বদ গবর্ণর জেনারেলের গোচরে আসিয়াছে যে, শিক্ষাসমিতি
প্রাচ্য সাহিত্যাদি বিষয়ক পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রচারে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া-
ছেন। সপার্বদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, অতঃপর উক্ত
কার্যে আর অর্থ ব্যয় করা হইবে না।

৫। সপার্বদ বড় লাট বাহাদুর আদেশ দিতেছেন যে, এই সকল সংহার
সাধিত হইলে যে অর্থ উৎসৃত হইবে, শিক্ষাসমিতি সেই সমস্ত অর্থ অতঃপর
দেশবাসিগণের মধ্যে ইংরাজী ভাষার সহায়তার ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান

প্রচারার্থ প্রয়োগ করিবেন এবং বড়লাট বাহারর সম্মতিকে এতদর্থে অতি দীর্ঘ একটি শিক্ষাপত্রবিষয়ক প্রস্তাব প্রেরণ করিতে অহুয়োব করিতেছেন।”

যখন এই অবধারণ অহুসারে কার্য আরম্ভ হইল, যখন প্রতীচা জানের অক্ষর ভাঙার এতদেবীয় ছাত্রগণের সম্মুখে উন্মুক্ত করা হইল। ঠিক সেই সময়ে অহুপন উৎসাহ ও অকৃত্র জ্ঞানাকাজ্ঞা লইয়া কিশোরীচাঁদ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন।

যেয়ার হুলে তাঁহার যে অসামান্য অব্যবসায়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রতিভা লক্ষিত হইয়াছিল হিন্দু কলেজে কাণ্ডেন রিচার্ডসন নীতই তাহা দেখিতে পাইলেন। কিশোরীচাঁদ ডি, এল্, রিচার্ডসনের একজন প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অস্ত্রান্ত খাতনামা ইংরাজ লেখকগণের গ্রন্থাবলী কিশোরীচাঁদ রিচার্ডসনের তত্ত্বাবধানে পাঠ করিতে লাগিলেন। রিচার্ডসন একজন সুপণ্ডিত, সুলেখক, সুকবি ও সমালোচক ছিলেন। তাঁহার আত্মশিক্ষিত অসাধারণ ছিল। বহুদূরী সমালোচক লর্ড মেকলে তাঁহার সেক্সপিয়র আত্মশিক্ষিত স্ত্রিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি ভারতবর্ষের সকল কথা বিস্তৃত হইতে পারি; কিন্তু আপনাব সেক্সপিয়র পাঠ কখন ভুলিতে পারিব না।” কিশোরীচাঁদ ইঁহার নিকট কেবল তাহা শিক্ষা করিলেন না; ইংরাজী আত্মশিক্ষিত ও সক্ষম করিলেন। এই উচ্চারণের বিস্তৃততা গভীর জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত হইয়া উত্তরকালে কিশোরীচাঁদের বক্তৃতাগুলিকে প্রোতামাত্রেরই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিত।

অধিকাংশ সাহিত্যসেবীর দ্বারা কিশোরীচাঁদ পণ্ডিত শাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার সহপাঠীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় বহুদূর অধিকার করিতেস এবং প্রতি বৎসর কলেজের পারিতোষিক ও ছাত্রবৃত্তিগুলি অধিকৃত করিতেস। তাঁহার বার্ষিক পরীক্ষার লিখিত একটি রচনা বিসপ উইলসন কর্তৃক পূর্ণমুঠে হোসে পারিতোষিক বিতরণকালে পঠিত হয় এবং বাঙ্গালার তদানীন্তন চীফ জুডিস স্তার এডওয়ার্ড রায়েন এই বালকের অকৃত্র প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

কিশোরীচাঁদের সতীর্থ ও সমসাময়িক ছাত্রগণের মধ্যে প্যারীচরণ সন্ন্যাস, রাজনারায়ণ বসু, আমলকৃষ্ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জুদেব সুখোপাধ্যায়, ঐরাম চট্টোপাধ্যায় (৮ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।)

জগদীশনাথ রায়, বোম্বেপ্রদেশ বোম্ব, রাজেন্দ্র দত্ত, তোলানাথ চন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র-
বোহন ঠাকুর ও গৌরদাস বসাকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

কিশোরীচাঁদ বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বহুবৎসল, পরহৃৎখ্যাতর ও
উচ্চমনা ছিলেন । ঋত হওয়া পিরাছে যে, বীর পরিশ্রমার্জিত ছাত্রশ্রুতি
হইতে তিনি অনেক দরিদ্র জ্ঞানপিপাসু সহপাঠীর বিয়োগের বেতন
দিতে সাহায্য করিতেন । হিন্দু কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পাঠকালে তিনি
সিমুলিয়া দাতব্য বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে দরিদ্র বালকগণকে শিক্ষা দিতেন ।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই মার্চ তারিখে তারিহীচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামগোপাল
বোম্ব, রামতল্লা নাহিড়ী, তারিচাঁদ চক্রবর্তী ও রাজকৃষ্ণ দে মহোদয়দিগের
প্রভাবে সংকুল কলেজে একটি সভার অধিবেশন হয় । ইহাতে এতদেক্ষিত
যুবকবৃন্দের মানসিক উন্নতির জন্য “সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা”
(Society for the Acquisition of General Knowledge) নামক
একটি সভা প্রতিষ্ঠা করা স্থিরীকৃত হয় এবং ঐ বৎসর ১৬ই মে তারিখে উক্ত
সভা কার্য আরম্ভ করেন । প্রতি মাসে একটি অধিবেশন হইত এবং স্থবীরত্ব
বিবিধ বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা করিতেন । মহাত্মা ডেভিড
হেয়ার উক্ত সভার সভাপতি হইলেন । জ্ঞানপিপাসু কিশোরীচাঁদ উক্ত সভার
প্রারম্ভ হইতেই উহাতে যোগদান করেন এবং উক্ত সভার দ্বিতীয় বার্ষিকী
কার্য্য বিবরণী হইতে দৃষ্ট হয় যে, তিনি উক্ত সভার মানসিক অধিবেশনে ১৮৪০
ও ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে “সত্য” ও “শিক্ষিত দেশবাসিগণের বর্তমান অবস্থা ও
ভবিষ্যৎ আশা” শীর্ষক দুইটি বনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন । উক্ত কার্য্য-
বিবরণীর ভূমিকায় লিখিত আছে যে, উক্ত প্রবন্ধের লেখকের বিশেষ বুদ্ধি-
মত্তার পরিচায়ক ।

অগ্রহায়ণ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কিশোরীচাঁদ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হিন্দু কলেজ
পরিচায়াগ করেন । আজিকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়
পূর্ণ যুগের শিক্ষিত পূর্ণপুরুষদিগের প্রতি ন্যাসক্য কৃত্রিম করিতে পারেন
কিন্তু হায়, সে শিক্ষার ও আজিকার শিক্ষার কত প্রভেদ । ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে
স্থপাতিত লালবিহারী দে ওৎসম্পাদিত ‘বেঙ্গল ম্যাগাজিন’ নামক মাসিক
পত্রিকায় “কিশোরীচাঁদ মিত্র” শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ে গণিত্যছিলেন—

“ হামনারায়ণ বাবু তাঁহার আত্মজিতে বলেন যে, যে বৎসর তিনি এখন জন্মিতে
উদিত হইলেন সেই বৎসর কিশোরীচাঁদ হিন্দুকলেজ পরিচায়াগ করেন ।

“আমাদের সাহিত্যানেবকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি চলিয়া গেলেন। বারু কিশোরীচাঁদ মিত্র যে সম্প্রদায়ের শিক্ত বাঙ্গালী ছিলেন—তাহাদিগের সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পূর্বে যুগের ব্যক্তিগণ—নানা বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাহ্যেটগণ অপেক্ষা অধিকতর উন্নতচেতা, অধিকতর পবিত্র রুচি-সম্পন্ন, ইংরাজী সাহিত্যের ভাবে অধিকতর প্রভাবাপন্ন এবং সাহিত্যানেবায় অধিকতর যত্নশীল ছিলেন। ইহা বিশ্বের বিষয় যে, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের সম্মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক আমাদের কালজের শিক্ত ছাত্রগণ নিকৃষ্টতর প্রণয় লিখিয়া থাকেন। এই ফল আমাদের আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির দোষেই উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য ছোট ছোট বালকগণের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ভিতর ব্যাকরণের শুদ্ধ কঠোর ন্যূন, শব্দের মীথস খাত ও প্রভার, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজারে প্রচলিত অর্থপুত্তকে লিখিত গ্রন্থের মর্ম (যাহা হইতে গ্রন্থকারে সমস্ত ভাব উন্মিলা গিয়াছে) এবং সরল ভাবের অনুদিত বা সংকুচিত প্রাচীন গ্রন্থ অনুপ্রাণিত করিয়া দেওয়া। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় পূর্বে যুগের ব্যক্তিগণ ইংরাজী সাহিত্য উপভোগ করিতেন, বর্তমান কালের যুবকগণ পরীক্ষাস্থলে যাহা প্রয়োজনীয় তথ্যভীত অন্ত কিছুই পাঠ করেন না। সুতরাং একগুণে জ্ঞান লাভের ক্ষমতা যে জ্ঞান আধীন হয় এ ইহাতে আর বিশ্বের কারণ কি?”

অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উক্ত মন্তব্য বোধ হয় আশ্রিত সমর্থন করিবেন। পূর্বোক্ত লিখিত “বদে শিক্ষা বিভার” বিষয়ক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ যথার্থই বলিয়াছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি “বুড়ি যত নির্দোষের উপযোগী—বুদ্ধিমান যত্ন গঠনের নহে” ।

বুড়ি, ভীক প্রতিভা ও শিক্ষাবর্জিত সুরুচি লইয়া উচ্চতমভাবে প্রণোদিত যুবক কিশোরীচাঁদ কিরূপে বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন তাহাই পরপরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে। কিন্তু এই পরিচ্ছেদ সমাপ্তির পূর্বে কিশোরীচাঁদের জীবনের একটা ঘটনা লিপিবদ্ধ করা উচিত। হিন্দু কলেজ পরিচাল্যনের কিয়ৎকাল পূর্বে কিশোরীচাঁদ রামপুরনিবাসী ৬গোরাচাঁদ ঘোষ মহাশয়ের বুদ্ধিমত্তা স্মৃশীলা ও স্মরণী কথা কৈলাসবাসিনীর সহিত পরিণয় যুজে আবদ্ধ হইলেন। কিশোরীচাঁদের দাম্পত্য জীবন অতি সুখময় হইয়াছিল।

শ্রীমদ্বন্দ্যনাথ ঘোষ ।

প্রতিদান।

(১)

সে আজ অনেক দিনের কথা। আমি এক, এ ক্লাসের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। আমাদের পের “মেনে” অনেকগুলি ছাত্র থাকিত। আমি যে ঘরে থাকিতাম, তাহাতে আর একজন ছাত্র থাকিত; তাহার নাম ছিল জগন্নাথ মোদক। আগাগোড়াই সে একটু “সাহেবিয়ানা” ভালবাসিত। আমা-দিগকে সৰ্ব্বদা “নেটিভ” বলিয়া ঘৃণা করিত। সে কখনও পূরা নাম লিখিত না; সৰ্ব্বদাই “জ্যে. মোদক” লিখিয়া সারিত। সে তখন বি. এ ক্লাসের ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

তাহাকে কেহ জগন্নাথ বাবু বলিলে সে মহা চটিয়া যাইত;—কাসেই বাধ্য হইয়া আমরা তাহাকে ‘মিষ্টার মোদক’ বলিয়া ডাকিতাম। কলেজের সব লেকচারে সে বড় একটা উপস্থিত হইত না, যখন যেটার ইচ্ছা হইত, যোগ দিত।

তাহার কেরানীগুল উচ্ছল করিবার জন্য আর বিশেষ লিখাপড়া করিবার প্রয়োজন ছিল না,—কেন না, সে জমীদারের ছেলে, তাহার পিতার অগাধ পরদা; সে যে কখনও কেরানীগুল উচ্ছল করিতে বাইবে না, ইহা নিশ্চয়। তবে তাহার বিলাত যাইবার ইচ্ছাটা খুব প্রবল ছিল।

তখন তাহার পরীক্ষার আর বড় বেশী দেৱী ছিল না, হঠাৎ এক দিন মিঃ মোদক আমার বলিল,—“ওরে যতে! আমি যে বিলেত যাচ্ছি!”

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। হঠাৎ তাহার বিলাত-যাত্রার কারণ বুঝিতে পারিলাম না; জিজ্ঞাসা করিলাম,—“সে কি? পরীক্ষাটা দিবে না? আর ক’দিন-ই বা দেৱী—এই ক’টা দিন থেকে যাও না। এমনই বা কি বিশেষ দরকার যে, একজামিনের আগেই যেতে হবে?”

“না, এখানে আর বি. এ. দেব না; একেবারে বিলেতেই দেব, তার পর আই, সি, এস, পাশ দিয়ে ইতিহাস কিরব। তোরা চিরকালই ‘নেটিভ’ থাকবি; বিলেতের সুখ তোরা আর কি বুঝবি বল? তোর বাড়ীর ঠিকানাটা আমার বল। মাকে মাকে চিঠি-পতর দেব।”

মিঃ মোদক আমার বাড়ীর ঠিকানা লিখিয়া লইল। সে একটি লিগারেট ধরাইয়া বিলাতের নানা সুখকালভিত্তি গল্প বলিতে লাগিল। আমি

যত্নবৃত্তের জায় শুনিতে লাগিলাম ;—কখনও বিলাতে যাই নাই, আর কখনও যে যাইব, তাহার আশাও খুব কম। কাণেই বিনা প্রতিবাদে শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার তখন মনে হইয়াছিল, বিলাতের মত সুখের স্থান বৃষ্টি এ জগতে দুর্লভ !

মিঃ মোদক সেই দিন রাত্রিতেই আমাদের “বেল” ভাগ করিলেন।

ভাষার পর চারি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমি বি, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ও “টেস্ট কলারসিপ” লইয়া বিলাতে আসিয়াছি। আমার বহু দিনের সাধ, বহু দিনের স্বপ্ন এত দিনে সত্য হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম, বিলাতে আসিয়া মিঃ মোদকের সাক্ষাৎ পাইব,—এখন আর সে আমার ‘নেটিভ’ বলিয়া ঘণা করিতে পারিবে না। ছুরোপীয়া যদি আমাদের এ কথাটা বলেন, তাহা হইলে আমাদের বড় একটা গায়ে লাগে না; কেন না, ভারতবিশ্বের পর হইতেই এ টাইটেলটা আমাদের একরূপ পা-সওয়া হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের জ্যেষ্ঠভাইও যদি আমাদের একে এই নামে অভিহিত করে, তবে প্রাণে বড় বেদনা বোধ হয়। আমার আশা কিন্তু পূর্ণ হইল না ;—মিঃ মোদকের সাক্ষাৎ পাইলাম না।

আমি বিভ্রাণিকার নিমিত্ত বিলাতে আসিয়াছি; কিন্তু বিশ্বের বিষয় যে, মোদক নামে কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে সে গেল কোথায় ?

বহু অন্বেষণের পর জানিতে পারিলাম, মিঃ মোদক প্রায় চারি মাস পূর্বে চলিয়া গিয়াছে। কোথায় বা কেন গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। আমি আর সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া আপন কর্তব্যে মন দিলাম।

প্রায় এক মাস পরে আমার নামে একখানি বুকপোষ্ট আসিল। উপরে মিঃ মোদকের লিখিত আমার বাটার ঠিকানা। তাহা লাল কালিতে কাটিয়া আমার পিতাঠাকুর আমার বর্তমান ঠিকানায় রি-ড্রাইংয়েট করিয়া দিয়াছেন। দেখিলাম, বুকপোষ্টখানিতে আট দশখানি কাগজ আছে।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় বাতি জালিয়া বুকপোষ্টখানির আবরণ খুলিয়া কেলিলাম ;—প্রথমেই মিঃ মোদকের একখানি পত্র। তাহাতে এইরূপ লিখা ছিল,—

২২শে মার্চ ।

টোকিও, জাপান ।

প্রিয় বতীন্দ্র ।

আমি তোমার নিকট প্রতিক্রান্ত ছিলাম, যথো যথো তোমার পত্র লিখিব এবং তাহাতে বিলাতের কথা বলিব । কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই । তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিলাম । আমার ভারতে ফিরবার আর বড় আশা নাই ;—আমি এখন জাপানে বাস করিতেছি, ভারতের সমস্ত বিষয় বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি । আর ,ভারতে কি জন্মই বা যাইব ?—সংসারের একমাত্র বন্ধন ছিলেন আমার পিতা—তিনিও আর ইহজগতে নাই । তবে মাতৃভাষাটা এখনও ভুলি নাই, কখনও যে ভুলিব, তাহাও বোধ হয় না । এখন আমি প্রেমযমরী পত্নী পাইয়াছি,—পিতার অগাধ টাকাও পাইয়াছি । এ দেশে ঘনী কিনিয়া বেশ সুখেই আছি । তুমি কেমন আছ, লিখিবে । ইতি—

তোমার বন্ধু—

জে. মোদক ।

তাহার পর অল্প কাগজগুলি পড়িলাম । সে যেন উপভাস । পাঠক-বর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার অবিকল নকল দিলাম ।

(২)

তখন ১৯— মার্চের এপ্রিল মাস । আমি আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম । একবার মনে করিলাম, কন্টিনেন্ট ভ্রমণ করিব ; কিন্তু সে ইচ্ছা বড় বেশীক্ষণ স্থলি না । ভারতীয় দীঘারে বধে যাত্রা করিলাম ;—আমার সহিত কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুও ছিলেন । আমি ভারযোগে ‘ক্যাপিটেল’ হোটেলে আমাদের চারিখানি ঘরের বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম । কারণ, এক দিন তথায় থাকিবার ইচ্ছাও ছিল । যে দিন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিলাম, ঠিক সেই দিন বেশ এক পল্লী হুটি হইয়া গিয়াছিল । তীরে অত্যন্ত কাদা, নামিবার উপায় নাই । একজন হুটিয়ার কাঁধে চড়িয়া তীরে নামিলাম । হুটিয়ার প্রাপ্য তিন আনা হইলেও আমি তাহাকে ছয় আনা দিলাম । ঠিক সেই দুহুর্ন্তেই পতঙ্গপালের মত ভিক্ষকের দল আসিয়া আমার ঘেরিয়া ফেলিল ;—ফলে আমি আমার ইংরাজ বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিজ্ঞির হইয়া পড়িলাম । তথায় পথ বাট আমার ভেমন পরি

চিত না থাকায় অগত্যা একজন পথ-প্রদর্শকের অহুসরণ করিতে লাগিলাম । একটি দেশীয় মুটিয়া বালক আমার পথপ্রদর্শন করিতে চাহিলে আমি তাহারই অহুসরণ করিতে লাগিলাম ।

তখনও আমার পশ্চাতে প্রার্থিদল ! আমি তাহাদিগকে তাড়াইতে বাস্তব থাকায় বালক আমার কোথায় লইয়া যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করি নাই । বহুকণ ধরিয়া গলির পর গলি পার হইলাম ; কিন্তু তবুও ‘ক্যাপিটেল’ হোটেলে পৌছিতে পারিলাম না । তখন আমার একটু সন্দেহ হইল ;—মনে করিলাম, বালক আমার জন্য কোথাও লইয়া যাইতেছে । সন্দেহের সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাহার গলাটি জোর করিয়া টিপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—‘দুর্ভাগ্য ! আমি তোমার চাপাকি ধর্তে পেরেছি ;—শীত আমার হোটেলে পৌছে দে । তা’ নইলে উচিত শাস্তি দেব ।’

বালক এতক্ষণ দেশীয় তাহার কথা কহিতেছিল ; কিন্তু এবার স্পষ্ট ইংরেজিতে বলিল,—“মহাশয় ! ঈশ্বরের দিবা, একবার আমার সঙ্গে একটি নির্জন স্থানে গিয়ে আমার প্রার্থনাটি শুুন । আপনাত হাতেই আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে ।”

বালককে দেখিলে হীনজাতীয় মুটিয়া বলিয়া মনে হয় না । তাহার মুখখানি বেশ সুসুন্দর ; চক্ষু দুইটি কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বল, তাহাতে প্রতিভার লক্ষণ বেশ স্পষ্টই প্রতিভাত হইতেছিল । তাহাকে দেখিয়া আমার মনে দয়া হইল ; আমি বলিলাম,—“আচ্ছা চল, তোমার কথাটাই শুনে আসি ।”

আমরা আবার চলিতে লাগিলাম । বালকের নাম হোসেন । তাহার চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল বটে ; কিন্তু তাহাতে কি একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছিল । তাহার সেই কমনীয় কান্তির উপর অজ্ঞাত বিষাদের ছায়াপাত হওয়ার অতি সুন্দর দেখাইতেছিল । আমি মনে মনে তাহার অস্ত্র বড় ক্ষুদ্র অহুসরণ করিতে লাগিলাম । তাহাকে দেখিলে মনে হয়, তাহার বয়স প্রায় বোল বৎসর । অজ্ঞাতস্বরূপ মুখখানি চিত্তাঙ্গাভীর্ণো পূর্ণ । তাহাতে যৌবন-সুন্দরত চপলতা প্রায় নাই বলিলেই হয় । আমরা কত সৌভাগ্যমাকীর্ণ বিতীর্ণ পথ অতিক্রম করিলাম ; কিন্তু আমাদের অহুসরণকারিগণ অহুসরণে নিবৃত্ত হইবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না । অবশেষে আমার অন্ত্যস্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল । আমি বালককে বলিলাম,—“হোসেন ! এরা ত

বাণু ছাড়বার কোন লক্ষণই প্রকাশ করছে না ; তোমার কি বক্তব্য আছে, বল। এরা তার বিশ্ময়িত্ত্বের বৃদ্ধিতে পারবে না।”

সে একটু আশ্রয়ভরে বলিল,—“না মহাশয়, আপনি জানেন না ; তাই ও কথা বল্লেম ;—এদের মধ্যে গুলুচরও ত থাকতে পারে।”

আমি তাহার বুদ্ধিপ্রার্থণা বিম্বিত হইলাম। তাহার কথার আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমি আবার তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আর কত চলিব ? প্রায় এক ঘণ্টা গরিয়া পথে পথে ঘুরিতেছি, আর ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল লাগে না ;—প্রান্তিতে আমার সারা দেহটা অবশ হইয়া পড়িয়াছে ; কাষেই আমি আর পদযাত্রাও বাইতে চাহিলাম না। তখন অগত্যা সে আমার নিকটবর্তী টেনস ‘ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে’ লইয়া গেল।

টেনসে আমাদিগের কোনই প্রয়োজন ছিল না ; কাষেই গ্রহণী ছাড়িতে চাহিল না ; আমি তাহার হস্তে একটি শিকি শুজিয়া দিয়া হোসেনের সহিত টেনসে প্রবেশ করিলাম। প্রাৰ্থিদল আর আমাদিগের অনুসরণ করিতে পারিল না। আমরা দুই জনে একটি নির্জন ‘ওয়েটিং রুম’ প্রবেশ করিয়া ধার বন্ধ করিয়া দিলাম ;—তাহার পর উভয়ে সামনাসামনি ভাবে দাঁড়াইয়া দুই জনের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ পরে হোসেন বলিল,—“মহাশয় ! আমি এ দেখি লোক নই।”

“বালক। তা’ আর তোমার বলে দিতে হবে না।”

মুহু হাসিয়া সে বলিল,—“আমি বালকও নই।”

বিশ্বয়ের উপর বিশ্বয়। আমি দুই পদ পিছাইয়া গেলাম ; সবিস্ময়ে বলিলাম,—“তবে কি তুমি কুলত্যাগিনী।”

“না মহাশয় ! গৃহস্থের অন্তঃপুরই এখন আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। আমার বাড়ী রুশিয়ার—ইউরোপের অন্তর্গত স্থানে। আমার বাবা সে স্থানের একজন ধনী ব্যবসায়ার ; আর আমি তাহার একমাত্র কন্যা—লিলি।”

“তবে তোমার বাড়ীতে এত স্নেহ থাকতে বোম্বাইয়ে হুটগিরি কর্তে এলে কেন ?”

“সাধ করিয়া কেহ এ সব ত্যাগ করে না ; আজ আমার জীবনের ইতিহাস বলব বলেই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এতটা এনেছি। আমার নাম বলেছি লিলি। কিছুদিন পূর্বে রুশিয়ার জনকতক নিহিলিষ্ট বরা পড়ে গুনে-ছিলেন ?”

আমি বলিলাম,—“না ।”

“কিছুদিন পূর্বে ক্রিশ্চিয়ান একদল নিহিলিষ্ট ধরা পড়ে । সে দলের মধ্যে আমিও একজন ;—আমরা আরকে হত্যা করুব মংলব করি, কিন্তু সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার পূর্বেই আমরা ধরা পড়লাম । ক্রিশ্চিয়ান কৰ্ণপক্ষ আমার সহকর্মীদের গুলি করে মার্লেন,—আমি অনেক কষ্টে তাঁহাদের কবল থেকে রক্ষা পেলাম ; সেই দিনই একখানি জাহাজে চড়ে ফ্রান্সে পালানুম । কিন্তু সেখানেও ভীষণতঃ পারলুম না ; সবে সবে গুলচর গিয়ে ফরাসী কৰ্ণপক্ষের কাছ থেকে আমার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করলে । ফ্রান্সের দ্বারে আমি বোম্বাই পালিয়ে এলাম ; কিন্তু এখানেও দেখছি, গুলচর আমার লিঙ্ক নিয়েছে, আর দিনকতক থাকলেই ধরা পড়ব ।” যোশেন একবার সেই ক্লান্ত ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল ; তাহার পর আবার বলিল,—“খুব সম্ভব ঐরাই তারা ইংরাজ কোম্পানীর কাছ থেকে পরোয়ানা বার করবে । এখন যদি আপান তাদের অজ্ঞাতে আমার দেশান্তরে না নিয়ে যান, তবে যত্নে আমার অবধারিত ।”

কুমারী তাহার যুগল-কোমল হাত দুইখানি আমার হাতের উপর রাখিয়া এমন কাতরভাবে চাহিয়া রহিল যে, তাহার গুণনকার অবস্থা দেখিলে পাবাগও গলিয়া যায় । তাহার ছন্দবেশ-ধারণেও নৈপুণ্য ছিল । হঠাৎ দেখিলে তাহাকে একটি অপ্রদর্শন সুটিয়া বালক ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না ।

আমি বলিলাম,—“আমি যদি তোমার অন্ত কোথাও নিয়ে যেতে পারি, তবে সেখানে বোধ হয়, আর এমন কষ্টে দিন কাটাতে হবে না ? বর যদি আমেরিকা..... ।”

আমার পিতার ইচ্ছাপূর্বেই যত্নে হইয়াছিল ; সুতরাং তারিতে আমার কিছুমাত্র বন্ধন ছিল না । আমার ইচ্ছা ছিল, আমেরিকায় বা জাপানে বাইরা বিজ্ঞান-ভাষার আলোচনা করিব ।

কুমারী লিলি একটু নৈরাত্তের হাসি হাসিয়া বলিল,—“আপনি জানেন না ; তাই ও কথা বলছেন । সেখানে গুলচররা একবার সম্মান পেলে কৰ্ণপক্ষের নিকট কোন পরোয়ানা না বার কর্তে পারলেও আমার বারবার লোকের অভাব হবে না । গুলী করে, বিষ খাইয়ে, জলে ডুবিয়া বা অন্ত যে কোন উপায়ে আমার মারবেই মারবে । যদি তারা আমার অঙ্গলয়ণ করে, তবে

পৃথিবীর কোন শক্তিই আমার স্বভাব হাত থেকে উদ্ধার কর্তে পারবে না। আমার শক্তির একমাত্র উপায় কোন জাহাজে আত্মপোষন করে কোন দূর দেশে পাণিয়ে যাওয়া।—তা ভিন্ন আর অস্ত্র নথ নেই।”

আমরা বহুক্ষণ ধরিয়া উত্তরে উত্তরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার মনে হইল, জুয়ারী শিলির চোপের তারা দুইটি বহি অস্ত্র সন্দেহ না হইত, তবে বোম্ব হর, তাহার মুষ্টিয়ার ছন্দবেশ বেশ মানাইত।

যাহা হউক, আমি কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। ইতঃপূর্বে পিতার স্বভাবটি ছিল; ইতঃপূর্বেই আমার উকীলকে স্বাবর, অস্বাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া টাকা পাঠাইতে লিখিয়াছিল। আজই সেই টাকা হোটেলে পাইবার কথা ছিল; আমার বরাবরই ইচ্ছা ছিল, বোম্বাই হইতে জাপান যাইব; আগামী কলা একখানি জাপানযাত্রী জাহাজে বোম্বাই ত্যাগ করিবে; আমি তাহাতেই যাইব স্থির করিলাম। শিলিকে সকল কথা বলিলে সেও আমার সহিত জাপানে যাইতে স্বীকার করিল।

অস্ত্রাস্ত্র কথাবার্তার পর শিলি বলিল,—“জাহাজ যে দিন বন্দর ত্যাগ করবে, সেই দিন রাত্রিতে একবার শুমানবরে এস; কিছু খাবারও সঙ্গে এনো।”

আমি তাহার কথার স্বীকৃত হইলে সে আমার হোটেলে পৌছিয়া বিল।

(৩)

তখন প্রায় দুই ঘণ্টা হইল, জাহাজখানি বন্দর ত্যাগ করিয়াছে। সমুদ্র নীরব, বৃহৎ সমাগ্রপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডেউগুলি ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল; ক্রকপক্ষের প্রতিপদ; চতুর্দিক্ বোর অন্ধকার। আমি ধূমপানের বরে বসিয়া একাকী ধূমপান করিতেছিলাম, আর শিলির স্মরণ যুগ্মখানি ভাবিতেছিলাম। কি স্মরণ সে যুগ্মখানি! বালকের মতই নিশাপ, সরল। আর ভাবিতেছিলাম, আমার ভাগ্যের কথা! কেন আমি শিলির দায়িত্বপূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম? বহি সে বর পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও জেলের বন্দোবস্ত হইবে।—কেন যে তাহার ভার লইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। তাহাতে কিম্ব কি একটা আকর্ষণ ছিল। সে কি যাহু জানে?

বীরে বীরে ডেকের উপর আসিলাম; তথায় তখন কেহ ছিল না। বেশিরূপ উপর তর দিরা একদৃষ্টে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

ବାହିରେ ତখন ସେମନ ଆହାଜ୍ଞାଧାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଅନ୍ତରାଳର ପର ଅନ୍ତ-
କାର ଜ୍ୟାଟ ବାଧିତେছিল, ଅନ୍ତରର ମଧ୍ୟେ ଓ ଡେମନି ଚିନ୍ତାର ପର ଚିନ୍ତା
ଆସିଲା ଜ୍ୟାଟ ବାଧିତେছিল । ଲିଲିଇ ତখন ଆମାର ଶ୍ରଦ୍ଧାନ ଚିନ୍ତାର
ବିସର ।

କ୍ରିୟାକ୍ଷମ ପରେ ଆମାର ମନେ ପଡ଼ିଲ, ଲିଲିର ଅନ୍ତ ଗୋପନେ ବାନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ
କରିତେ ହଇବେ । ଶୀରେ ଶୀରେ ଗୋଜନ-କଙ୍କେ ଶ୍ରବେଣ କରିଲାମ । ମୌତାମ୍ୟାକ୍ରେ
ତখন ତହାର କେହ ଛିଲ ନା । ଆମି ବିଷୁଟେର ଡିମ୍ ହଇତେ ଅନେକଗୁଣି ବିଷୁଟ
ମକେଟେ ପୁରିଲାମ, କରେକଟି କମ୍ ଓ ସଂଗ୍ରହ କରିଲାମ, ତାହାର ପର ମେଣ୍ଡଲି
ଲୁଇଲା ସନ୍ତର୍ପଣେ ଆମନ କେବିନେ ଶ୍ରବେଣ କରିଲାମ । ଆମାର କେବିନିଟିଆ ଆର
କାହାର ଓ ହାନ ଛିଲ ନା ; ଆମିଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଡାକ୍ତା କରିଗାଛିଲାମ । ଆହତ
କଳଗୁଣି ଏକଧାନି କ୍ରମାଳେ ବାଧିଗା ଏକଟି ବୋତଲେ କରିଗା ଏକ ବୋତଲ ଜଳ
ଲୁଇଲାମ । ଏକଧାନି କବଳେର ମଧ୍ୟେ ମୂଳ ଶ୍ରବ୍ୟାଶୁଳି ଗାଧିଗା ଆମି ବାହିରେ
ଆସିଲାମ ।

ରାତ୍ରି ଶ୍ରୀୟ ଏଗାରଟାର ସମୟ ଜାହାଜ୍ଞେର ସକଳ ବାଜିଇ ନିସ୍ତ୍ରାତ ହଇଲ । ତখন
ଆମି ଶୀରେ ଶୀରେ ଗୁମାସ ବରେର ଦିକେ ଅନ୍ତରର ହଇଲାମ । ମେ ଦିକ୍ଟାର ଘୋଟିଇ
ଆଲୋ ଛିଲ ନା ; ସବ ହିର, ଶୀର, ନୀରବ । ଆମାର ବୋଧ ହଇଲ,
ଆମି ସେନ ଅନ୍ତ ଦେଖିତେଛି ; ମେ ନୀରବତା ଡାକ୍ତା କରିଗା ଆମାର କଥା
କହିତେ ମାରୁସ ହଇଲ ନା ; ଗୁମାସେର ପାର୍ଶ୍ବେଇ ନାବିକାସିଗେର ସର, ବାଦି ତାହାର
ଶୁନିତେ ମାର ।

ଅନେକକ୍ଷମ ହୁମ କରିଗା ଶାକ୍ତିଗା ଆମି କୋମଳକର୍ତ୍ତେ ଶୀରେ ଶୀରେ ଡାକି-
ଲାମ,—“ଲିଲି ।”

ପରସ୍ପରୁର୍ତ୍ତେଇ କାମଦେର ସୁଦ୍ଧ ବସ୍ ବସ୍ ସବ୍ ଡାନିତେ ମାହିଲାମ । ତାହାର
ପରସ୍ପରୁର୍ତ୍ତେଇ ଅବତ ମ୍ଲଟବେ କୋମଳକର୍ତ୍ତେ ଉତ୍ତର ଆସିଲ,—“ଆପନାର ବଡ଼
ବୟା । ଅବିନୀର ଶ୍ରୀତି କ୍ରମା ଆପନାର ବସେଟ । ଆମିଓ ତେବେଛିଲୁସ, ଆପନି
ଆସବେନ ।”

ଆମି ସହାହୁତୁତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲାମ,—“କହି ତୁମି ?”

ହୁମାରୀ ଶୀରେ ଶୀରେ ଆମାର ନିକଟ ଆସିଲା ମାଡ଼ାଇଲ । ଆମି ତାହାକେ
ଏକଟି ମ୍ୟାକିଂ ବାଲ୍ବେର ଉପର ବସାଇଗା ନିଜେ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ବେ ବସିଲାମ । ହୁମାରୀ
ମେ ଦିନ କରେକଧାନି ବିଷୁଟ ବାଧିଗା କାଟାଇଗା ଦିଲ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରବ୍ୟାଶୁଳି
ତବିଷାତେର ଜନ୍ମା ମକ୍ତର କରିଲ ; ତାହାର ପର ବାଲିଲ,—“ଆପନି ସା’

দিয়েচেন তাই যথেষ্ট ; কিন্তু এখানে শোবার বড় অসুবিধা । বাসগলো বড় শক্ত ।”

“আমি নরম করে দিচ্ছি ।” এই বলিয়া আমি তাহাকে কবলখানি দিলাম । সে আমার হাত জুইখানি গরিয়া বলিল,—“এখন আমি বড় সুখেই থাকুব । আপনি যদি কাল স্নাত্তিতে না-ও আসতে পারেন, তবুও সিজাপুর পর্য্যন্ত যেন বেতে পারব । সিজাপুরে পৌঁছিলেই শুদামের দরজা খুলে দেবে ; তখন থেকে আপনি রোজ আসতে পারবেন । তখন—আপনার স্নেহের কৃত্য হোসেন আবার আপনাকে দেখতে পাবে !”

“কুমারী, সত্য কথা বলতে হলে আমিই তোমার কৃত্য ! কিন্তু সেখানে আহাজ পৌঁছতে তিন দিন লাগে ; এত দিন কি করে উপবাসী হয়ে থাকবে, হোসেন ?”

“তা’ আমি খুব পারব ; এখনও আমার কাছে কতকগুলি বিছুট আর সব ফলগুলিই আছে ; এতেই তিন দিন কেটে যাবে :—এক দিন ত তার যথো কেটে গেল ! কিন্তু আহাজের কাপ্তেন যদি বোতলটার খোঁজ করে তবে কি করবে তুমি ?”

“আমি বলব, বোতলটা ভেঙ্গে যাওয়ার জলে ফেলে দিয়েছি ; কাল যদি শুদামের দরজা বন্ধও করে দেয়, তবু ঐ হাওয়া যাবার ফাঁক দিয়ে আমি কুমালে বেঁধে খাবার পাঠিয়ে দেব ; সময় মত খুলে নিয়ো ।”

“আমাকে তুমি বিশ্বাস করেছ ?”

“হ্যাঁ, হোসেন !”

“তোমার কিন্তু খুব দয়া ; সব কথা না শুনেই আমার বিশ্বাস করেছ । আমিও তোমার সব কথা খুলে বলতে পার্ত্তুম—আমি যে বাস্তবিকই দোষী নই তা’ কুমারীসেই প্রমাণ কর্ত্তে পার্ত্তুম ; কিন্তু থাক, এখন আর সে কথার উত্থাপন করে তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করব না । আমি বড় আর্থপর । না ?”

“আমায় আর একটু থাকতে বলছ ?”

“হঁ । তুমিই মনে..... ।” কুমারী হঠাৎ ধামিছা গেল । তাহার সমস্ত শরীরখানিতে যৌবনের পূর্ণ শ্রোতঃ প্রবাহিত । তাহার সেই যৌবন-লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি কি মন্দর ।

আদি সমবেদনাপূর্ণ হয়ে বলিলাম,—“আহা । তোমায় বড়ই নির্ভরনে কাল কাটাতে হবে । বড় হ’এক দিন ত নয় পূর্ণ ঐশ দিন ।”

কুমারী বলিল,—“না। তুমি ঠিক বোঝ নি ;—তুমি যখন রেলিংএর উপর তর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক আমি তখন বৃদ্ধগেত্র তোমার ঐ দেবকান্তির দিকে চেয়ে থাকি ; কায়েই তখন আমি একলা থাকি কই ? আর এখন ত কথাই নেই।”

উষার প্রথমরাগ পর্য্যন্ত আমি সেই স্তম্ভীর পাখে বসিয়া কাটাইয়া দিলাম। কুমারী তাহার সমস্ত ইতিহাস বলিল। তাহাতে অল্প কয়েকজন লোক সংশ্লিষ্ট থাকার এ স্থানে আর তাহার উল্লেখ করিলাম না। তাহার সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—“তুমি যে সে ক্রমে হাতে কলুষিত কর নি, তা' শুনে আমি ব্যক্তিবিকই অত্যন্ত শান্তি লাভ করু'ম।”

সে একটু উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—“এখন তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে কি ?”

“তোমার এ অহুরোষের পূর্বেই আমি তোমায় বন্ধুর মত মনে করেছি। আর তোমার যত দোষই থাকুক না কেন আমার এ মত অপরিবর্তনীয়।”

তাহার অবরোধিত হাতোজল হইয়া উঠিল। সে আমার কাছে হাত রাখিয়া স্নেহাপ্লুত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—“যদি কেউ তোমার ভ্রাতাকে অপমান করে তুমি কি করবে ?”

আমি তাহার কথার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলাম,—“তুমিত ভ্রাতা নহ ; তুমি যে আমার অলস-রক্তিম হৃদয়তোষিত্বী !”

“বন্ধু ! এখন তবে বিদায় ; নিরাশ্রয়ের আশ্রয় পরমেশ্বর তোমার সব্বেষের উপযুক্ত প্রতিদান দিউন ; এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।”

তাহার পর কুমারী বীরে বীরে তাহার নিভৃত আশ্রয়-স্থানে অবস্থান করিতে গেল ; আর আমি তাহারই যথুময় স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া বীরে বীরে কেবিনের দিকে অগ্রসর হইলাম।

যখন কেবিনের দ্বারে দাঁড়াইলাম তখন পূর্বদিনের সমস্ত আকাশটা আবিরমাখা ; প্রভাতবার্যুবিভাদিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেউগুলি তাহারই ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাহার উদ্দেশে পরে পরে ছুটিয়া চলিতেছিল। ক্রমে ঈষৎ অভকারের পাণ্ডু যবনিকা সরিয়া গিয়া উদীয়মান সূর্য্যের করজাল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে।

আরও দুই দিন পরে আমরা সিকাপুরে পৌঁছলাম। আমি নগরে গিয়া কিছু খাদ্য ও মাংস কিনিয়া আনিলাম; জুযোগমত এক সময়ে সে তলি কুমারীকে গিয়া আসিলাম। কুমারী আমার হস্ত চুম্বন করিয়া আমার প্রতি প্রেম প্রকাশ করিল।

সেই দিন হইতে বরাবর শুদামের দ্বার খোলা ছিল; আমি প্রায় প্রতি রাত্রিতেই কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলাম। জাহাজ ইয়োকোহামার পৌঁছিলে কি উপায়ে তাহাকে উদ্ধার করিব, সেই চিন্তাই প্রতি দিন আমার ব্যস্ত করিয়া তুলিল। এই বিষয়ে প্রতি রাত্রিতেই আমরা আলোচনা করিতে লাগিলাম। ক্রমে একটি উপায় স্থির হইল।

সোমবারে আমরা ইয়োকোহামার পৌঁছিব। আজ রবিবার। রাত্রিতে আমি একখানি ভিলা ফ্যানেল, একখানি সাবান ও একখানি তোয়ালে লইয়া লিলির নিকট উপস্থিত হইলাম। সে আমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া শিশুর মত সরল মনুর দ্বারা দ্বন্দ্ব করিল। আমি অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়াও তাহার মূখের কাল রঙ্গ তুলিতে পারিলাম না। সে হাসিয়া বলিল,—“আমি চিরকালই তোমার রক্ত কৃত্য থাক্‌বো।”

উদার প্রথম রাগে আকাশ আলোকিত হইলে আমি সকলের অভ্যন্তে লিলিকে আমার কেবিনে লইয়া গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। সে তখন সাবান মাখিল। হাতের ও মূখের রঙ্গ উঠিলে আমি তাহাকে আমার একটি ফ্যানেলের পোষাক পরাইয়া দিলাম; দে-ও দৈর্ঘ-প্রস্থে প্রায় আমার সমান; কিন্তু এই করম্বিনের স্বভাবেরে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাবেই পোষাকটি একটু ঢীলা।

ক্রমে জাহাজ আসিয়া ইয়োকোহামার পৌঁছিল। আমি তাহার সহিত সমুদ্রক্রমণসম্বন্ধে গল্প করিতে করিতে নামিয়া গেলাম। লোক মনে করিল, সে বুঝি আমার কোন বন্ধু—জাহাজ আসিতেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। কাবেই কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ হইল না। আমরা তাঁরে আসিলে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া আমি লিলিকে একটা হোটোলে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। তাহাকে বিদায় দিতে আমার ক্ষময়ে কি যেন একটা গম্ভীর আঘাত লাগিল। আমার সর্বদাই মনে হইত, হোসেন

ধর্মীর কক্ষা; আমার মত পিপীলিকার অঙ্ক সে কোকনদ প্রস্তুতি হয় নাই ; কিন্তু তবুও কি জানি কেন আমার হৃদয় শান্ত হইত না । যখন সে গাড়ীতে উঠিয়া আমার নিকটে বিদায় চাহিল তখন আবেগভরে ঐরূপ কি একটা কথা আমি তাহাকে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম । অবশেষে আমি ভয়-হৃদয়ে বলিলাম,—“হোসেন ! যদি কখনও আমার কোন প্রয়োজন হয় তবে তখন আমার কাছে আসিতে লক্ষ্যেচ বোধ করো না ।”

তখন ঠিক বিপ্রহর । একটি হস্তময়ী উদ্ধাম যৌবনের তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা কুমারী আমার গৃহে প্রবেশ করিল—সে লিলি, আশ্চর্যের বিষয় তখন আর তাহাকে হোসেন বলিয়া চিনিবার উপায় ছিল না । কুমারী লক্ষ্য রক্তিম গন্তে ঠিক হোসেনেরই মত আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল,—“তোমার সাহায্য আমার বড় দরকার হয়ে পড়েছে । আর বোধ হয় সারা জীবন তা' থেকে মুক্ত হইতে পারিব না ।”

আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলাম,—“লিলি ! লিলি !”

সে আমার আলিঙ্গন করিয়া বলিল,—“তুমি যে মহৎ উপকার করেছ এ তারই ক্ষুদ্র প্রতি দান ।”

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

গান শেষ ।

(লংফেলো হইতে)

এই যোর গান শুনি যদি কোন বিদেশীর

নাহি তোষে প্রাণ,—

সে যেন মানিয়া লয় দোষী এতে কেউ নয়,

বহে যোর গান ।

গানেরো জীবের মত জন্মভূমি আছে এক

চিরদিন কার,

সে তথা স্থপরিচিত সুসুগন্ধের গীত—

সে শুধু ভাবার ।

শ্রীবল্লভ কুমার চট্টোপাধ্যায় ।

আর্য্যাবর্ত



শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী ।

সমালোচনা।

—:—

গৈরিক।*

—•—

কবি ভাবকে ভাষায় ব্যক্ত করেন, সে-ও কাব্য ; আর কবি ভাষায় চিত্র অঙ্কিত করেন—সে-ও কাব্য। চিত্রাঙ্কনকারী কবিদ্বয়ের মধ্যে কালিদাসের জ্ঞান নাই। বলেছেন ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—“বস্তু বস্তু চিত্র রচনার কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শব্দক যেমন অতি সহজেই আপনার চারিদিকে বিচিত্রে চিত্রিত আবরণ নির্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমন দোষেতে দোষেতে আপনাকে চিত্রময় স্নোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমন মানব-প্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র-আকারে পরিমূর্ত করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের প্রায়-অসংখ্য সর্গপদ্যগ্রন্থ এই ছবি আঁকিবার অনেকটা অবসর পাওয়া যায়। একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয় সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়, অনেকগুলি ক্রেমে বাধানো ভাল ভাল ছবি।—দীনীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের সুগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অস্ত্রবর্ষণের ইন্দ্রির স্তম্ভসম্মোগ। এই সবগুলি ছবি, বাকি সবই ক্রেম। * * * * * মেঘদূতের মত এমন সামান্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া কেবল কাল্পনিক কথা লইয়া এমন একখানা সমগ্র কাব্য কালিদাসের পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। কিন্তু কালিদাসের চিত্রাঙ্কর কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকিবার জন্য আপন মনে মত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছে। যেকের বিরহবর্ণনা উপলক্ষ্য যাত্র। মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অবিভীত কেবল এই চিত্রপটলপট।”

‘গৈরিক’ের কবি চিত্ররচনার যে বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকেন, তাহার

* গৈরিক—ঐশ্বর্যবান হার চৌধুরী প্রণীত—২০২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট হাইবে গুজরান
৪ গোটাং এও সপ্তম বর্ষক একাধিত। মূল্য ২১ টাকা।

এমাণ তাঁহার পূৰ্ণপ্রকাশিত পুস্তকেই পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আর কোন কবিতা পুস্তকের কবিতায় তিনি এমন ভাবে আপনার আনন্দপ্রদ কাব্য করেন নাই। ‘ঐগরিক’ কবিতায় চিত্রের সংগ্রহ। প্রথমেই হিমালয়ের বর্ণনা—

“নীলে ধবলের চূড়া ! মুকুটবিত্ত জীবনের মত
 ভুল্য এক দেখিলাম, সপত্ন্যে ঘাইতু এগত ;
 ত্রুব হয়ে গেল চিত্ত, চেখিলাম একি নেত্র-আগে,
 বিশ্বয় ? আনন্দ ? চিত্তা উর্ধ্বে—মতা উর্ধ্বে লাগে।
 স্মৃজন-প্রভূষে কি এ বিরাটের গিরাট কল্পনা।

আপনি দেখিয়া মুগ্ধ আপনার অপূৰ্ণ রচনা
 বুঝি সে কবির কবি। করেছিল। পাই ছিন্নমায়া
 ঘেঁয়ে যে প্রপোঙ্কাস, তাহার কি সত্ত্ব এ মায়া ?
 কেমনে বাখানি আমি রূপ, না এ আঁখির গৌরব ?
 এখানে এখানে একি নৃত্য, সঙ্গে সঙ্গে একি কলরব ?

নিরে ভুবারের জটা, পঙ্ককেশ রাজবির মত
 মহাযোগে সমাসীন, বল যোগী, কত যুগ সত ?
 গেলে দীর্ঘ ভপস্তায় কত বর কত আশীর্বাদ,
 তবু ভপ ছাড়ি নাই। আশ্রয় দেবের প্রসাদ—
 যেন সতীদেহ স্বাক্ষ চলিয়াছে পাগল মহেশ,
 আপনার ভাবে ভোর, নাই শ্রান্তি নাই কোন শেষ।
 যুগ যুগ ধরি’ তুমি জুটিতেছ স্বর্ণের ভাতার,
 সহস্র ব্যারায় তাহা করে জড়ে জীবনী স্ফার ;
 ভব রস স্ফারিত বরষীর ধূলি তরে তরে,
 তাই তা’র মাতৃভনে সুধাধারা মেহসব করে।”

সমুদ্র-বাজার বর্ণনাটি সরল ও সুন্দর—

“উর্ধ্বে নীল, নিরে নীল,—মাঝে

মিলিয়ে ছাচ্ছে বীরে পার পার

ছত্রিভ-ছিন্নগ শেখা বরার ছবি,

যেতে যেতে ফিরে ফিরে চায়।

“মোগল পাঠান কোথায় গেল মুছে
মহাকালের সত্যক খেলায়,
কবে হ'ল বেচা-কেনার শেষ
কল্লোলিত ঐশ্ব্যের সেই খেলায় ।”

চিৎকারে প্রত্যাহার বর্ণনা ও চেতনাই মনোরম—

“পথে যেতে চিৎকার সঙ্গে দেখা,
তখন অর্থ্য হচ্ছে সব লাল,
মস্ত-পরের যুগলগুলি এসে,
জড়িয়ে বসে জল-পরের নাল ।
হুদ ?—না, এ হুদসমুদ্র ঘেঁষে,
নীলাকাশ তরলনীলে নয়ান,
আদি-দেব কীরেদ-সিদ্ধ স্রোতে,
কছেন যেন অনন্তে প্রয়াণ ।”

এমন ছবি পুস্তকে অনেক আছে ; বাস্তবিক পুস্তকখানিকে এমনই ছবির
সমষ্টি বলিলেও অত্যাতি হয় না ।

কিন্তু কবি যে এইরূপ ছবির মধ্যে ভাবের স্ফূর্তি করিতেও নিপুণ—
“আবার বাগান” কবিতাটি পাঠ করিলে তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না ।
এই কবিতার মধ্যে করুণরসের যে একটি বিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত তাহা সর্বত্র
স্থলভ নহে । এই কবিতাটি পাঠ করিলে নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠে ।

কেবল একটি বিবরণে আমাদের একটু আগতি আছে ।—

সিংহল-বালক আজ ত কাদামুখে
‘বার্ডনাই’ ফোঁকে, ইংরাজী ঘের বেড়ে,
সিংহল-বালা ‘ক্লক’ ‘পয়েটম্’ ঘেঁষে
কালো রংএ চেকুনাই তোলে বেড়ে ।
সিংহলীর বেশ ‘নেকটাই’ ‘কলার’ ‘ছাট’
সিংহলিনীর ‘মাফলার’ ‘ক্রোক’ আর ‘গাউন’ ।
সোনার লজ্জা গেছে যে, মা, পুড়ে’
দেখলাম একটি ‘আপ-টু-ডেট্’ টাউন ।”

এরূপ বর্ণনা বিস্তার পত্রের সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেও ইহাতে সাধারণ পাঠ্য
কবিতার গাভীরা নষ্ট হয় ।

“মরুভূমির যন্ত্র” কবিতায় কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ করিব। ইহাতে কবি যে যন্ত্রকথা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে টেনিসনের যন্ত্রই স্বরণ করায়—

“Till the war-drum throbbed no longer, and the
battle-flags were furled
In the Parliament of man, the Federation of
the world.”

“যে দিন আসিবে শুভদিন

তেদান্তেদ হানাহানি শান্তিযন্ত্রে হইবে বিলীন ;
বন্ধে বন্ধে দেবালয়, কঠে কঠে বিদ্যালয়ের গান,
এক ভাষা, এক বর্ষ, এক জাতি, এক ভগবান !

• • • • •

সে দিন আসিবে বিশেষ সত্য লাগি সত্যের সাধনা,
কবিতায় বর্ণধূপ, সৌন্দর্যের পূর্ণ আরাধনা।
কুস্র জেব বিব্রজেবে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন।—
হ'বে জগতের নীতি, জগতের গতি জানিহীন।
আত্ম-গৌরবের কাছে সাম্রাজ্যের গর্ব তুচ্ছ হ'বে,
উচ্চাশা আত্মশ্রম নব সাধাইবে স্বর্গের বৈতবে !
হোক লাভে ক্ষতি, নর শ্রায়-বহা ধরে র'বে কবে,
হোক জয়ে পরাজয়, সত্য-বোণাসনে র'বে বসে।”

কবির এই শুভদিনের যন্ত্র সফল হউক,—সত্য জয়যুক্ত ও শান্তি-
নয় সর্বত্র প্রদত্ত হউক। কবিতায় সেই বর্ণধূপ ধরায় আবিস্কৃত
হউক।

— — —

সংগ্রহ ।

—১:১—

বিবিধ ।

—১:২—

প্রাচীন প্রাচ্য-বিষয়বিদ্যালয় ।

অতি প্রাচীন কালেই ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল । কি ভাবে প্রাচীন ভারতে লোকশিক্ষা প্রবর্ত হইত, তাহা জানিবার অল্প অনেকেরই কৌতূহল হইতে, পারে । দূর্ভাগ্যক্রমে প্রাচীন ভারতের অনেক তথ্য বিস্তৃতির অল্পকায়ে বৃথক । আত্মপোষণ করিয়াছে । বৌদ্ধ বিগ্রহের পূর্বতন ভারতীয় ইতিহাস উদ্ধারের উপায় নাই । ঐ প্রাচীন যুগের যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে,—তাহা বর্ধগ্রন্থ । তাহাতে অসংখ্য ভাবে অভ্যস্ত তথ্য উল্লেখ থাকিলেও এখানেতঃ আবাস্তিক তথ্যই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে । ঐ সকল গ্রন্থে পরবর্তী কালে অনেক বিষয় প্রকৃষ্ট হওয়াতে উহার দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যের সম্ভাব্য অভ্যস্ত কটন হইয়া উঠিয়াছে । বৌদ্ধ বিগ্রহের পূর্বতন কালে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন যুগ । সেই যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও পুরাণ অল্প বিস্মৃত । বৌদ্ধ বর্ণের আবির্ভাবের পরই অর্ধ এশিয়াবাসী যে বিগ্রহ আর-একপন করিয়াছিল তাহাতে পুরাতন ভাসিরা গিয়াছিল; নৃতনের পত্তন হইয়াছিল । ঐ সময়ে ভারতীয় ইতিহাসের বহাযুগ আরম্ভ হয় । বহাযুগ প্রাচীন যুগের পট্ট বিনিময়ের উপরই আগমার কীর্তিনৌব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । প্রাচীন বিগ্রহবিলাস সৌখ্যের উপাধান দিয়াই বহাযুগের কীর্তিনৌব নির্মিত হইয়াছিল । তাহাতে অল্পা পত্ত বিগ্রহে বিলাস । কিন্তু সেই কীর্তিনৌবের জগাবশেষ এখনও দিকে দিকে বিকীর্ণ । বিশেষতঃ প্রতিবেশিনী জাতিরা কিছু কিছু সাক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন । এই সকল সাক্ষ্যসমাধানি সংলুপ করিয়া বহাযুগের ইতিহাসেরচনার চেষ্টা হইতেছে । সে চেষ্টার সম্পূর্ণ ইতিহাসের উদ্ধার হইবে প্রতাপ নাই । বিশেষতঃ বহাযুগের প্রথম ভাগের ইতিহাসও কালপ্রভ হইতে বসিয়াছে । শেষ ভাগের ইতিহাসও কল্পনাশূলক কিংবদন্তীর এবং বিস্তৃতির তবদার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে । এই সময়ের ইতিহাসের উদ্ধারকমে অনেক অল্পসম্ভাবনের বর্তিকা জালিতে-ছেন । সেই অল্পসম্ভাবনের কলে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইতেছে । সম্ভ্রুতি অধ্যাপক ঐযুক্ত ব্রহ্মদেব দত্ত বহাযুগ বিক্রমশিলার বিষয়বিত্ত বিষয়বিদ্যার সম্বন্ধে একটি ভ্রমের প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । ইহাতে বহাযুগের শেষাংশে ভারতে বিক্রম শিকার ব্যবস্থা ছিল, তাহার ভিত্তি পরিচয় পাওয়া যায় । আমরা নিজে তাহার সার সন্ধানিত করিয়া বিলাস ।

পালমামণের দ্বারাওকালে বিক্রমশিলার বৌদ্ধ বিষয়বিদ্যালয় বিশেষ ব্যাতিলাত করিয়াছিল । ঐ সময় উহা বৌদ্ধবিগ্রহের সর্ব-প্রধান প্রতিষ্ঠান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মালম্বার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় বিদূত হইলে বিক্রমশিলার
বিক্রমশিলায় উৎপত্তি।
বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধিকচান্দ্রিহতলিহ মনো আশঙ্ক লাভ করে।
মালম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংক্রান্ত হইয়াছিল। অনন্তরতিতে
একমাত্র যে পতমোজুহ মালম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বিক্রমশিলায় উদীয়মান বিশ্ববিদ্যালয়ের
বিশেষ বসিষ্ঠতা ছিল। তিস্তত বেধে একটি অব্যাহ আছে যে, একমাত্র মালম্বা বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের জটনক অধ্যাপক উন্নয় করিতে করিতে পর্যাভারে এক অত্যাচ্ছ দ্বারাভোহ পর্যন্ত
বেধিতে পাইলেন। এই অধ্যাপকের নাম—কামদাস। ইবি তত্ত্বনাভের অধ্যাপনা
করিতেন। উহা বেধিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ঐ দ্বামটি বসিষ্ঠতারে বোধ্য
পর জন্মে কামদাস চান্দা বর্ধপাল হইয়া জন্মগ্রাহিলেন এবং ঐ বৈলের শিবরমণে
বিক্রমশিলায় বসিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ দ্বানে বিক্রম নামে জটনক বক্ষ পর্যাচ্ছ
দ্বয় বলিয়া উহার নাম বিক্রমশিলা হইয়াছে। বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় মালম্বা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের আদর্শে সঠিত হইয়াছিল সত্য। কিন্তু পেনোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অব্যোক্ত বিশ্ব-
বিদ্যালয় অপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে সময়
বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাতিলাভ করিয়াছিল, সেই সময় ভারতবাসীর আদর্শক একমাত্র
সঠি হইতে আদ্যত কাছাকাছল, সুতরাং মালম্বার জ্ঞার বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় একমাত্রাশী
হইয়া উন্নতিত পারে নাই। এই কারণে বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়
না হইয়া বমণের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। তবে কান্দার, বেপাল ত তিস্তত
জটনক জন্মেত (বহ্যাবী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আদিশা বিদ্যাপ্রাণক করিত।

পাল-বংশীয় রাজপুত্রের খেতাব বা তুখার মাধ্যমে বঙ্গপাল কর্তৃক বিক্রমশিলার যত আভি-
 ঞ্চিত হয়েছিল। তুখীর এবং শতাব্দীতে বঙ্গপাল আনুষ্ঠিত-করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে
 অনেক রাজা ও উচ্চ বংশীয় মহাজনপন ইহার বিস্তারিত
 অতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহা মেঘবিহার বলিয়া খ্যাতিলাভ করে।
 সম্রাট হুয়ান ত্সং ও এরান যত্নসহকারে লইয়া এই প্রদেশের কাৰ্য্যপরিচালনা করিতেন।
 হুয়ান ত্সং অবশেষে লইয়া পরিচালক-সামন্ত পদে হইত এবং যত্নের অধীন অধ্যক্ষ সেই
 পরিচালক-সামন্তের অধিকার করিতেন।

পালাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধ অপেক্ষা বিক্রমপুরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধের রচনা উৎকৃষ্টতর ছিল; যাহা বর্ণপালা যেভাবে এই সৌধরচনার কল্পনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে যখন ইহার আরম্ভনবুড়ি করা হইয়াছিল, তখন সেই বাবদ্য। কল্পনা অনুসৃত হইয়াছিল। এখানে কেবলক ক ছিল। উহা বিজ্ঞান সম্বন্ধি মায়ে কথিত হইত। এই ককে তত্ত্বের অনেক জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা ও শিক্ষা প্রদত্ত হইত। যথাযথকই এই বিভাগের আচাৰ্য্য ছিলেন। এই বিশাল কক্ষে বহুটি ঘর ছিল। ঐ বহুটি ঘর দিয়া বহুটি বিভিন্ন বিষয়ের গুরুশাস্ত্রীতে পাঠ্য ২২ হইত। ঐ বহুটি টোলে বহুই আচার্য্যপদ অব্যাপনা করিতেন। যাহা বর্ণপালার সময়ে বহুই আচার্য্যসংখ্যা ছিল এক পক্ষ হই। এতোক টোলের এক জন করিয়া অধ্যাপক থাকিতেন।

এই অধ্যক্ষ “স্বায়ং পরিচালিত” নামে অভিহিত হইতেন। রাজ্য ভাষণশালার সময় এই অভিযাটিক্রমে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তদবধি বর্তমান সময় পর্যন্ত উহা এচলিত রহিয়াছে। টোলার সারিগোই নহে। সমস্ত ভাষণ আহার ও অবস্থিতি করিত। ঐ সকল সময়ে বার-মির্জাদার্ব্ব প্রচুর সম্পত্তি প্রদত্ত হইত,—রাজ্য ও অভিযান্ত্রিকত্ব অনেক পৈতৃক প্রতিষ্ঠা করিতেন। জেতারি প্রথমে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন অধ্যাপক। পশ্চিম পূর্বদেশে বরেন্দ্রহরির অধীনে একটি সমস্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কলেজ বা টোলগুলির সারিগোই অনেক বৈবাহিক বিবাহ করিত। কলেজের পুষ্টিমিষ্টি চারিদিকে কলেজের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের আলোচ্য প্রতিষ্ঠিত থাকিত। এই আলোচ্যচিত্রণএবং সানার সানার বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা হইতে অনুকৃত। এখনও বিদ্যতে—অধ্যাপক ও কেবল এইরূপ ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যক্তিগত বৈবাহিক ব্যক্তির একটি সুস্থ বর্ণমালা প্রতিষ্ঠিত হিয়া। অত্যাগত লোক আসিলে তথায় অবস্থান করিতে পারিতেন। ভিক্ষুত বেশ হইতে যে সময় লোচনা লাগতো বিক্রম-শিলার আদিত্যছিলেন, তখন চাত্রি হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সেই রাত্রির বহু রুদ্ধ হইয়াছিল। বর্ধমানের এই সমস্ত বিহারের কর্তা ছিলেন। প্রথমে বর্ধমানের নাম আচার্য্য বুদ্ধ জ্ঞানেশ। ইনি বর্ধমানের সমসাময়িক।

মালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অধিক বিষয়ের শিক্ষা প্রদত্ত হইত, সম্ভবতঃ বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু অধিক বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত না। যে সময় বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যাতি লাভ করিয়াছিল, সেই সময় তাত্ত্বিক বৌদ্ধ

বিষয় শিক্ষা।

বর্ধের আবেলার মূল। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমগণ

বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য তত্ত্বের বিজ্ঞান, বাস্তবিক্য প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। কলে কলে—বিজ্ঞানমন্ডিরে এই সকল বিষয় অধ্যাপনা করা হইত। তত্ত্ব ভিন্ন বিক্রমশিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, দর্শন এবং দ্বারেরও অধ্যাপনা করা হইত। মালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বার পাত্তের বিশেষ অতীন্দ্র হইত,—বিক্রমশিলাতেও ঐ পাত্র বিশেষরূপে অধ্যাপিত হইত। বিক্রমশিলার অনেক অধ্যাপক তর্ক-শাস্ত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিক্রমশিলার অধ্যাপক জেতারি হেতুতত্ত্ব উপদেশ, দর্শন বর্ধবিশিষ্ট, বলবন্ত তর্ক প্রভৃতি প্রদত্ত প্রণেতা। ইনি রাজ্য মধ্যশালার নিকট হইতে সন্যাস লাভ করিয়াছিলেন। দীপাকর জ্ঞান এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই দ্বার। বাল্যকালে তিনি শিক্ষালাভার্থে জেতারির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন। জেতারির নিকট দীপাকর পাঁচটি সামান্য সামান্য পাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যাচার কলে তিনি দ্বন্দ্ব ও দর্শন শিক্ষার সমর্থ হইয়াছিলেন। গোড়নিবাসী জ্ঞানজী কলকাতার সময়ে কিছুকাল বিক্রমশিলার দ্বার পঠিত ছিলেন। দীপাকর তাঁহার নিকট কিছুকাল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। জ্ঞানজী বৌদ্ধ দর্শনে প্রগাঢ় পাত্তিতা লাভ করেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তাঁহার এছ বৌদ্ধ দর্শনের প্রাথমিক গ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছিল। বিদ্যাত সাধবাচার্য্য তাঁহার সর্বদর্শনগ্রন্থে বৌদ্ধ-দর্শনের অনেক ইংহার প্রদত্ত হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছেন। জ্ঞানজী তর্ক-শাস্ত্র লিখিয়াছিলেন।

জানাইর সমকালে বিক্রমশিলার মহাব্যায়সক পজবন্তত বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি কান্টারীর ভ্রাতৃপ । তিনি বৌদ্ধ তন্ত্র শাস্ত্র ও বিজ্ঞান শাস্ত্র সমস্ত করিয়া তিস্তত যেনে জানের আলোক বিকীর্ণ করিতে যত্ন করেন । হস্তাকর শাস্ত্রি উদাত্তপুয়ের সর্বাধিব্যাস শ্রেষ্ঠত্বত হইয়াছিলেন । তিনিও বিক্রমশিলার ভ্রাতারি হস্তশাস্ত্রি একুতি অধ্যাপকনিদের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন । হস্তাকর শাস্ত্রি বিক্রমশিলার তর্কে ভীর্কিকাবিশেষে পরাক্রুত করিয়াছিলেন,—এবং সিংহল রাজ্যের আমন্ত্রণে সিংহলে যত্ন করিয়াছিলেন । ইনি তর্ক শাস্ত্র এবং রূপ শাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ রচিয়াছিলেন । ইহার ভ্রাতো-গ্রন্থের নাম রত্নোদয়াকর । কিন্তু শীপাকর জিজ্ঞানের বশোভাতি অস্ত্র সকলের বশোভাককে মলিন করিয়া ফেলিয়াছিল । ইহার আর একটি নাম “মতীপ” । একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে ইনিই তিস্তত দেশে নির্জাণ-আর বৌদ্ধবর্ণ আবার জ্যাকাল্যমান করিয়া তুলিয়াছিলেন ।

১৮- শ্রুটাকে পৌড়াজিবাংশে বসের বিক্রমপুর নগরে শীপাকরের জন্ম হইয়াছিল । ইহার পিতার নাম ছিল কল্যাণী, মাতার নাম একামতী । ভ্রাতারি নিকটই ইনি এখনে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন । তৎপরে ইনি হীনবান সম্রাজ্যের শীপাকর জানাই । তিনটি পীঠক, বৈশেষিক মর্শন, মহাব্যাস সম্রাজ্যের তিন পীঠক,—যোগাচর, সাধানিক, এবং চতুর্বিধ তন্ত্র শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । তর্কে জটনক ব্যাভনাম্য ভ্রাতৃপকে পরাজিত করিয়া ইনি এসিভি লাভ করিয়াছিলেন । ইহার পিতৃপুত্র নাম—চন্দ্রপতি । শীপাকরের তিন বংশের দিকে আকৃষ্ট ছিল বলিয়া তিনি ককশিরি বিহায়ে অধ্যাত্তিক বৌদ্ধবর্ণে দীক্ষিত হইয়াছিলেন । হাছিল শুদ্র পীঠকে শীপা এদান করিয়া শুদ্ধজানবন্ত এই অভিখ্যা এদান করিয়াছিলেন । ইহার পর যখন তিনি ওজপুয়ের মহাসজিকাগারের নিকট সতিবর্ণে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নাম হয় শীপাকর জানাই । একত্রিংশ বর্ষ বয়সে শীপাকর যখনে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া এসিভি-লাভ করিয়াছিলেন । তৎপরে ইনি স্বর্ধীপের (পেত) এধানাচাৰী চন্দ্রকৃতির নিকট অধ্যয়ন করিয়া আপনায় জামার্জমান্দ্র্য পরিতুত্ত করিতে ইচ্ছা করেন । তিনি চন্দ্রধীপে যাদণ বর্ষকাল বাস করিয়া সিংহল সুরিয়া ভাষাতে এত্যাভর্জন করেন । তিনি যখনে এত্যাভর্জন করিলে শাস্ত্রি মরোপাত্ত একুতি পণ্ডিতগণ তাঁহাকে আশ্রুকুলা করেন । তিনিই তখন যখনে এধান পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন । মহাবোধিতে তিনি তিনবার তর্কযুদ্ধে তর্কিকবিশেষে পরাক্রুত করিয়াছিলেন । রাজা ভ্রাতৃপাল কর্তৃক ইনি বিক্রমশিলার এধান আচাধীর পদে এতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন । রাজা ভ্রাতৃপাল কান্দ্রুজাবিশিষ্টর সহিত বে সজিবজনে আনত হইয়াছিলেন তাহাতে শীপাকরের বিশেষ হাত ছিল । শীপাকর দুইবার তিস্তত বাইবার জন্ম আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । তিনি এখন নিমন্ত্রণ এত্যাধ্যায়ন করিয়াছিলেন । বিতীযবার নিমন্ত্রণে তিনি বিশেষ অশ্রুত হইয়া তিস্ততে যত্ন করিয়াছিলেন । বাইবার সময় বেনাল ও তিস্ততের রাজা তাঁহার এতি রাজোচিত সম্মান এদর্শন করিয়াছিলেন । ত্রয়োদশ বর্ষকাল তিস্ততে অধিকার তিনি তথায় বৌদ্ধ বর্ণের এচাচর করেন, ১০০০ শ্রুটানে লাসার সারিখে ইনি

১০ বৎসর বয়সে দেহভোগ্য করিয়াছিলেন । তিনজনে এতৎ মধ্য এশিয়ায় যে সমস্ত এলেনে এখনও বৌদ্ধধর্ম অবলম্বেই সমস্ত এলেনেই ইহার নাম বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়া আসিতেছে, ইহার চরিত-কথার ভাষার অশীত হৃদ্বিধানি এছের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । তত্বেযো বোধিপঠি অশীণ নামক সংস্কৃত কবিতাগ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে । উহা তন্ত্ররসে উজ্জ্বলিত ।

তিনজনে দেশে নীপাত্তরের বে চরিত লিখিত আছে তাহাতে অনেকগুলি পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায় । তন্মধ্যে এই করম্মনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য—মহাবীরি, বৈদ্রোজারকিত, বেগালের কক্কি । অতীয়ার সময়ে অত্যন্ত পণ্ডিত । বিক্রমশিলায় ৪৭ জন পণ্ডিত ছিলেন । তন্মধ্যে দ্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপক যদ্যতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । শেবোক্ত পণ্ডিত মহাবীর অত্যন্ত মন্ত্রিত্বের সুতীরে অভিহিত ছিলেন,—কিন্তু তিনি খীর প্রভাবলে আপনায় দারিত্র্যঃঃঃ বোধন করিতে সক্ষম হইলেন । তিনি বিক্রমশিলাতেই সামান্যত করেন এবং তর্ক শাস্ত্র সম্বন্ধে একবারি গুরুতর্য করিয়াছিলেন ।

১২০০ খ্রষ্টাব্দে বজ্রিয়ার বিলিবি বিক্রমশিলায় বিববিক্রত সৌধ তদন্তপে পরিগত করিয়াছিলেন । কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার ব্যাতি ত স্মৃতি বিদ্যমান ছিল । বৌদ্ধধর্মের “অমর পুরাণে” একটি উপাখ্যানে বিক্রমশিলায় উল্লেখ আছে । তবে উপাখ্যানকার আভির্ভবে উহাকে ব্যাপ্যগীয় সন্নিহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

তিনজনের সভ্যতাঃ ইতিহাসে বিক্রমশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় বর্ষেই প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল । কেবল বিক্রমশিলায় পণ্ডিতগণ তিনজনে বর্ষ ত সাহিত্য প্রচার করেন নাই ; পরন্তু গাঠিস্থ ত দাপতো প্রভৃতি তিনজনের দ্বারাও বিক্রমশিলায় তিনজনে প্রভাব । বসিয়া তিনজনের ভাষায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অনুদিত করিয়াছিলেন । বিক্রমশিলায় তিনজনেরদ্বারা প্রভু একটি বস্ত্র বসন্তবস নির্দিষ্ট ছিল । বিক্রমশিলায় অনেক তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচিত হয় । তন্মধ্যে জিনরকিতকৃত প্রণয়ন প্রোক্ত গীতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

পার্ব ত অর্থযোবের সন্নিহিত দ্বান তিলোবিকার বিহারও এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । প্রথম সাং বলেন, মগধরাজ বিবিসারের শেখবংশের কর্তৃক এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । প্রথম সাংএর এই উক্তি সন্দেহ করিবার

তিলোবিকা । যথেষ্ট হেতু আছে সত্য । কিন্তু মালবার সারিবাঃহেতু সপ্তদশ শতাব্দীতে এই বিহার বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । যে সময়ে উক্ত গীত পরিভ্রামক উক্ত বিহার দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন,—সেই সময়ে সমস্ত মহাবীর সপ্তদশকৃত প্রথম এই বিহারভূমিতে অত্যন্ত প্রবৃত্তি করিতেন । এখানে তিনটি মন্দির ছিল । অত্যাশ্চর্য কালে প্রথম সাং এই নামে পজাতন্ত্র দ্বারা প্রথম মহাপণ্ডিতকে দেবিয়াছিলেন এবং প্রথম সাংএর নাম দ্বারা প্রথম পজাতন্ত্র দ্বারা প্রথম মহাপণ্ডিতকে দেবিয়াছিলেন এবং প্রথম সাংএর নাম দ্বারা প্রথম পজাতন্ত্র দ্বারা প্রথম মহাপণ্ডিতকে দেবিয়াছিলেন ।

উদ্বেগ করিয়াছেন । তবে উহা কানাকুজ কি না সে বিষয়ে কেহ কেহ কানাকুজ । সন্দেহ করিয়া থাকেন । ৪-৫ খুটাকে কা হিরান্ন এই স্থানে আগমন করেন । তখন ইহা বিক্রয়াদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্র চন্দ্র) রাজার রাজধানী ছিল । তখন তথায় তিনটি বাত্র বিহার বিরাজিত । পশ্চিম পতাকাতে হর্ববর্ধনের আদেশ ইহার উন্নতির লক্ষ্য । যত্নে সাং এই স্থানে এক পত মঠ ও মহল্ল প্রদত্ত দেখিয়াছিলেন । তদন্থে তিনি তদ্রবিহারে বীর্ঘসেনের দিকট তিন বাস অবস্থান করিয়াছিলেন । যত্নে সাংএর সময় ব্রাহ্মণা বিদ্যা ও বৌদ্ধ বিদ্যা এই উভয় বিদ্যাই কানাকুজে অধীত হইত । রাজা হর্ববর্ধন উভয় সম্প্রদায়কে সমানভাবে সাহায্য করিতেন । হর্ববর্ধনের পর কানাকুজে বৌদ্ধ পিকার অবনতি ঘটয়াছিল । সুতরাং এই স্থান তিস্ত্র তিস্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত দেখিয়াছিলেন । কিন্তু তথায় ব্রাহ্মণা বিদ্যাচর্চা ক্রুর হয় নাই । রাজার সমাজ ও বর্গ সন্তোষের লক্ষ্য রাখা আদিশুর কানাকুজ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা এই সিদ্ধান্তেরই সর্ব্বম করিতেছে । ১১২০ খুটাকে হুসলমান আক্রমণে কানাকুজের বিদ্যা-শিল্প বিলম্ব হইয়া গিয়াছে ।

মাতৃ-স্নেহ ।

কাউপার কর্তৃক অনুরূপিত গ্রীক কবিতা হইতে)

সকল সার্বী যবে শুইল সন্ধ্যা' পরে
শাট্টা নিবাসী এক করিল তাহার ঘরে ;
মৃণা লজ্জার মাতা বধিল অল্পে তা'র
শাট্টায় কজু নাই অস্ত্রের অধিকার ;—
সাহস, পুত্রে করে—জননী'র আপনার ।

শ্রীমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

পুরাতন প্রসঙ্গ ।

২৮শে মাঘ, ১৩২০ ।

সম্প্রতি ‘হিতবাদী’ পত্রিকার “পুরাতন এসঙ্গে বিভাগাগর” শীর্ষক একটি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে । আর আচার্য্য ঐযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত তৎসঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি । তিনি বলিলেন,—

“লেখক মহাশয় ‘অহুতালের ঘটা’ বলিয়া আমাকে একটু টিটকারী দিয়াছেন । আমি কিন্তু কৃত্রাপি বিভাগাগর মহাশয়কে উদ্ধত-বক্তাব বলি নাই । আমার বলিবার অভিপ্রায় এই,—আমরা চুনো পুঁটি আমরা তাঁহার দেখা দেখি চলিতে গেলে উদ্ধত হইবার সম্ভাবনা । সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয়ে বড়লোকের অহুকরণ করা আহানুখি মাত্র ; কিন্তু যে ব্যক্তি বড়লোককে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করে, সে অনেক সময়ে সেই আহানুখি করিয়া ফেলে । আমারও যৌবনাবস্থায় তালাই ঘটিয়াছিল । এই কথাই কেবল আমি বলিয়াছি । তাঁহার পক্ষে যেটা তেজবিতা, আমার পক্ষে তাহা উচ্ছতা দাঁড়াইয়া গেল ।

“বিভাগাগর মহাশয় যে বক্তৃতির লিখা পছন্দ করিতেন না, তাহা আপাত্তর সাধারণ সকলেই জানেন । তাঁহার একজন গোঁড়া ভক্ত প্যারী কবিরত্ন এই সম্বন্ধে একটা ছড়া ঐবিদ্যা গিয়াছেন । সেই ছড়াটি লিখদারপাড়া লেন নিবাসী ঐযুক্ত বহুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখস্থ আছে । বক্তৃতির অপ-ব্রাধ,—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, তারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিভাগাগরের কিছু নরম পরম, সমালোচনা করিয়াছিলেন । অনেকেই ইহাতে চট্টয়া গেলেন । ‘হালিসহর পত্রিকা’ লিখিল,—

“কতু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে,

নাচিতেছে বাহুবলি হাততালি দিয়ে ।

যা’রে পায় তা’রে ঘরে দিগাদিগ নাই,

বাহবা বৃক্কের পাটা বলিহারি বাই ।

আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস

‘সাপরে’ সাঁতার দিতে করেছে সাহস ।

কাল চোখে কচি থাকা পরিধা কাকল,
 আপন রূপেতে হন আপনি পাপল ।
 ইবরতশ্রেষ্ঠ দিতে কলঙ্কের রেখা,
 সে দিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা ।
 ভারতের যদুনাথ কবিভাগৱতী,
 অন্য'মে ফেলিল ছিঁড়ে আশ্বাস করি ।
 এখন 'ছিঁড়িব' বলি পাড়িয়াছে ঘুম ।
 আর আর আর 'বঙ্গবর্ষনের' ঘুম ॥

প্যারী কবিরত্ন গাহিলেন,—

বঙ্গবর্ষনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
 এ দোষ দর্শনে রোধ হয় না কা'র ?
 অত্বে যে জন, নাইকো গোচন,
 সমালোচন কেন তা'র ?
 পদে পদে দেখতে পাই,
 কর্তব্য কৰ্ত্তা বোধ নাই,
 ভাববসের মা গৌসাই,
 কেন'লেখার ছল ধরে ?

ছোটো একটা গল্প লিখে,
 স্বাধাকৃতক বলতে শিখে,

 বরাটাকে শ্রাস্তব জ্ঞান করে।
 এ আশ্চর্য্য ক'ব কা'রে
 লোশব বল না বা'রে

ভাগর সাগরে বোঁচা দিতে ভয় হোলো না তা'র ?
 হ'তেন যদি কুপ কি ভোকা,
 তা' হোলোও ত সেজে শোকা,
 নদ নদী বধো খুঁজে মেলা ভার ।
 বরি আপনোমে
 কোন দাছলে,
 কি জিনিস বেরুলো দেখে,
 কিংসর এত অহকার ?

ভারতচন্দ্র শুধাকরে,
নিম্বুকেরাই নিন্দা করে,
সেধপ রসমায়ুরী ভাষার কি বেকলো আর ?

অতাপি কবি সকলে,
হুতকণ্ঠ কে না বলে,
কবিতুলে ছিলেন কর্ত্তরজ্জহার ।

সমকক্ষ নর,
যেলা সুহৃৎকর,
ভারতে 'ভারত'তুল্য কবি কেউ হবে না আর ।

'চ্যাংড়া' কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
তনে শরীর অশে যায়,
এর চেয়ে চ্যাংড়াম করা খোঁষ ঘর হোতে পারে না আর ।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য,
প্রভায় প্রভাহীনাদিত্য,
যে বদ অতাপি ধরায় ধরে না ।

ভার নোব ধরা,
ক্যাপান করা,
বাণেশ্বর শঙ্করাঙ্গি সত্য ছিলেন সত্য ধীর ।

এখন গ্রন্থকর্ত্তা ধরে ধরে,
Editor বহু নরে,

কিছু কলম বে কিছুপে ধরে তা' অনেকে জানে না ।

ভূবিমাল গর্দ্যভরা,
ভেতরেতে ময়লা পোরা,
কাগজগুলি কেবল ভাল,
Binding পরিপাটি ;

একধানা বিকোয় না দেশে,
মসলা বাঙে অবশেষে,
ভু কত সর্জনেশে,

কলম ধরতে ছাড়ে না ।

অতি বা'জে তাই,
 যা' দেখতে পাই,
 'শাগর' বৈ কে লিখতে আনে.
 কা'র লেখার কি উপকার ?
 'হুতোম প্যাচা' বলে ছিল,
 (বলতে বলতে মনে হোলো)
 যেওয়ারিস্ বাকাল্য ভাষা,
 যা'র যা' ইচ্ছা তাই করে।
 ওয়ারিস্ কেউ থাকলে পরে,
 অনেকে হুমকুমি পোরে,
 লেখার শুণে প্রায় বেতো বীপান্তরে।
 কেউ শত্রু নাই,
 এরা বাচে তাই,
 যে যা' করে তাই শোভা পায়,
 মগের মূহুর্ত অবিচার।
 Gunny cloth যা'রা বোনে,
 তা'রা ভাবে মনে মনে,
 কিংবাপ কান্দীর শাল, সে অতি সহজে হয়।
 শাল যে কি বস্তু বোকা,
 তা'দের পক্ষে বিষম বোকা,
 কবিরত্ন বলে কথা সোজা নয়।
 বামন হয়ে হার,
 চাদে হাত বাড়ার,
 কালে কালে হোলো কবি-
 কদম্বের হাটবাজার।

“চিঠির উপর শ্রীহরি লেখা থাকিলে লোক নাস্তিক হয় কিন ইহার
 উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; তবে আমি নপথ পূরক বলিতে পারি
 যে, কোনও কোনও সময়ে বিভ্রাসাগর এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া-
 ছেন,—“ঈশ্বর যদি থাকেন ত তিনি ত আর কামড়াবেন না।” এ কথা
 আন্তিক বা নাস্তিকের মুখে শোভা পায় তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা

করিবেন । আর Cannot bear a brother near the throne এ দুর্বলতা অতি ভুল । বিত্তর নড়লোকের স্ত্রী না ; ইহাতে কাহারও বড় কিছুমান্ত্র হ্রাস পায় না ; এবং আমার অনেক সময়ে মনে হইয়াছে যে, এটুকু কিকিদ্দাত্তার তাঁহার ছিল । ইহার প্রমাণ এই যে, আমি কখনও তাঁহার স্নানক্ষেত্রালামত্ৰ, Revd. K.M. Banerjee প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষদিগকে সমুচিত প্রশংসা করিতে স্মনি নাই ; এমন কি তিনি ‘সাংঘ’দিগের সংস্কৃত-জ্ঞতা বিষয়ে অনেকসময়ে অসন্তুষ্ট অবস্থা প্রকাশ করিতেন । Goldstuckerএর একটা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে কি একটু ভুল করিয়াছিল, তাহাই বলিয়া তিনি কখনও কখনও এরূপভাবে কথা কহিতেন যে সংস্কৃতজ্ঞতাসম্বন্ধে Goldstucker যেম মালুম্বের মতোই নহে ; ইহা অরণ করিলে আমাদের ত গা শিথরিয়া উঠে ।

“বিজ্ঞানাগরের রচনা-পদ্ধতির প্রতি আমি যে যতাবতঃই পক্ষপাতী হইব ইহা ত আমার Educationই ফলস্বরূপ । আঠার বৎসর যয়সে ‘বিচিত্রবীর্ভা’ নামে আমি একখানি বাঙ্গালা বাহি লিখিয়াছিলাম । সে বাহি বড় একটা পেউ পড়েও নাই, আদরও করে নাই ; কিন্তু বন্ধিম বাবু তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—‘এ ত বাঙ্গালা না, এ ত সংস্কৃত’—তাহাতেই মুক্তি । লইবম যে রচনাপদ্ধতিসম্বন্ধে আমি বিজ্ঞানাগরের চেলা কি বিধেবী । তবে আমার এই বিশ্বাস যে ভাষার বিকাশসম্বন্ধেও একটা Natural selection আছে । কেন যে বিজ্ঞানাগরের ভাষাই ঠাড়াইয়া গেল, আর কেনই বা লোকে স্নানক্ষেত্রালামিত্রের বা কৃষ্ণবোহন বন্দোপাধ্যায়ের ভাষা ভুলিয়া গেল, ইহার কারণ নির্ণয় করা ভার ; নতুবা ইহায়া দুইজন বাঙ্গালাতে বিত্তর লিখা লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু কই, আর কাল কেহ তাহা পড়েও না জানেও না । তবে আমি এখন ইহাও দেখিতেছি যে, বন্ধিম বাবুর বয়ীজ্ঞনাপের আবির্ভাবে বিজ্ঞানাগরের ভাষাপদ্ধতি অনেকটা পক্ষাতে পড়িয়া গিয়াছে ; এখন যে বাঙ্গালা চলিত হইয়াছে, বিজ্ঞানাগরের কাছে তাহা বরিলে তিনি ‘ছি ছি’ করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেন ।

“আমার গুরুভক্তির বিষয়ে একটু কটাক্ষপাত করা হইয়াছে । কিন্তু পুরাতন এসকের বিত্তর আরম্ভার তাঁহার প্রতি যে প্রকার দেবতার জ্ঞানভক্তি প্রদর্শন করিয়া কথা কহিয়াছি সে সবগুলি এই পত্রের লেখক চাপিয়া রাখিয়াছেন ; কেবল দুই একটি সামান্য কথা বহিয়া আমাকে টিটকারি

দিয়াছেন। অবশ্য কাহাকেও গালি দিতে হইলে এই নিয়মেই চলা উচিত। ইহাতে আমার কোনও ক্ষোভের কারণ নাই। ভ্রাতাচরণ বাবুর ব্যাকরণ-সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে তাঁহাকে নীচপ্রকৃতি কিম্বশে বলা হইল। ইহা ত বুঝিতে পারিলাম না; তিনি বাস্তবিকই বহিষ্যনি অসার ভাবিয়াছিলেন, এবং সেই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমাদের একপে বো জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহাতে সে মতের পোষকতা করিতে পারি না। অতএব এখন বুঝিতেছি যে, তখন তাঁহার সঙ্গে সার দেওয়ান্তে ভাল করি নাই; কিন্তু ইহার চারা কি আছে? তখন আমাদের বোষণ বিভাবৃদ্ধি ছিল, আমরা সেইরূপ কাছই করিয়াছি। বহিষ্যনি কিন্তু অপ্রচাৰিত রহিয়া গেল। এখন তাহার এক Copy বুঝিয়া পাওয়া যায় কিনা সম্ভব, তবে আমরা একটু একটু মনে হয় যে, সম্ভবত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলি Copy কেমনা হইয়াছিল। যদি আমার এ ধারণা সত্য হয়, তবে বোধ হয় সেই সময়ে বিদ্যাসাগর সম্ভবত কলেজের সহিত সংস্কষ্ট ছিলেন না। লেখক আমার প্রযুক্ত ‘অকৌশল’ কথাটি যেন অচল ও অপ্রযোজ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু ‘অকৌশল’ বলিতে মনোত্তর বো চলিত আছে সেটা কি তিনি মনেম না?

“মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনোমালিঙ্গের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে; তবে লেখকের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্ত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের প্রভাব হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে। আর সেনেটে তিনি কেন বাইতেন না, এ বিষয়ে সঠিক আমি কিছু বলিতে পারি না। তবে আমার একটা অজুমান হয় যে বিদ্যাসাগর ঈড়াইয়া বক্তৃতা করা কখনও অভ্যাস করেন নাই, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার কথার ধরণে বোধ হইত যে, এ প্রকার বক্তৃতা করা তিনি যেন একটা সংস্কার মত জ্ঞান করিতেন, এই জন্তই তাঁহার বোধ হয় সংস্কারিতে ইচ্ছা হইত না। ফলতঃ কোনও বিশেষ গুরুতর বা দরকারি কাৰ্য সভা সমিতির দ্বারা যে ভালরূপ হয় ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। ওসব তিনি কেবল ডেপোমি ও নিজের বাহ্যচরী দেখানর উপায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে কখনও বড় একটা কোনও সভা সমিতিতে বোণ দিয়াছিলেন এমন শু আমার মনে পড়ে না, তবে Bethune Societyতে পণ্ডিত হইবার জন্ত ‘সংস্কৃত সাহিত্য

শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি প্রবন্ধ বাঙ্গালার রচনা করিয়াছিলেন ; নিজে কতকটা ত্যাগী বলিয়া বরণ পড়েন নাই, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী পড়িয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি ঐ বিষয়ের অদ্যাবধি চূড়ান্ত রচনাবরূপ হইয়া আছে ।

“বাহ্য হউক, ‘হিতবাদীতে’ আমার পুরাতন প্রসঙ্গ লইয়া এই যে আলোচনা হইয়াছে ইহা অতীত আঙ্গানদের বিষয়। কারণ হিতবাদীর জন্মের সময় আর পাঁচ জনের সঙ্গে আমি রাজীরা কাৰ্য্য করিয়াছি, এবং প্রথম লালন-পালনের তার আমারই উপর ক্ষত হইয়াছিল। ইহার পিতার কাৰ্য্যটা যে আমার কতৃক সূচকরূপে নির্দ্ধাৰিত হইয়াছিল, আমি জ্ঞান পূৰ্ব্বক সে অহঙ্কার করিতে পারি না। এত দিনের পর ‘হিতবাদী’ সেই প্রথম পালনিতাকে যে স্বরণ করিয়াছে ইহাতে আমি বহুশ্রদ্ধ। শ্রীযুক্ত যিৎকেননাথ ঠাকুর প্রাত্যহিক অশ্রুণের জন্ত যে স্নোকেণ্ডটি বাছিয়া দিয়াছিলেন সেই ‘হিতং মনোহারী চ কুলভং বচঃ’— তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা যেন চিরকাল চলে, ইহাই প্রার্থনা!”

ঐবিপিনবিহারী ভট্ট

কালোবঁধু।

—।ঃ—

এসো এসো কালোবঁধু নাহি' শুণ শুণ গান
নাহি তব পায়,
হুলের জীবনসার— বৌবন লাগ্যন্তার
তবপদে বিকসিত চার।
কহিয়া আমার প্রতি করে গেছে প্রজ্ঞাপতি
“হৃদয় তোমার দেবি, মধু ঢল ঢল।”
পবন ছাড়িয়া বাস তাকেছে আমার বাস,
বলেছে পরশ ময় নিরস শীতল।
বনচর পত্নপাবী বিমোহিত তোর আঁখি,—
স্বারে টানিয়া আনে আমার সৌরভ।
মানব নয়নগুলি চাহিয়া, আপনা ভুলি
কিরে যেতে গেছে যার রূপের পৌরব।
এ সব কিসের তরে রেখেছি বৃকের গরে ?
শকলি বুঝায়,
কালোবঁধু, তুমি যদি নাহি এস, নাহি পাই
ঢালিবারে তব রাজ্য পায়।
রূপ আছে, আছে রূপ রয়েছে গন্ধের বন,
পরশ মধুর,
নীরব এ অড় প্রাণ তাই সখা স্নিগ্ধমান,
পর্যাপের দীর্ঘখানে পরাণ বিধুর।
পাথার পরশ দিয়ে দাও আশা শিহরিরে,
কেশর হোমায়ে ছুঁই কর যে চকল।
নাহি শুন শুন গান বিকল এ মুক প্রাণ
হৃদয় করছে সখা হরষ-বিস্তল।
তুমি বিনা সবি ছার এ রূপ হয়েছে তার
তোমার পরশ বিনা ওগো কালোবঁধু,

গন্ধ সে পীড়িয়া এাণে মরণ-যাতনা আনে,
 কালকূট বরে অণে পরাণের মধু ।
 কাব্যের বিস্তব পহি' আর কতকাল রহি,
 কবি বিনা সকাল বুধায় ।
 এস এস কালোবধু গাহিয়া শুভ্র গান,
 মরি ভাল সেও তব পায় ।
 মধু গন্ধ এত আলা নীরব এ নাট্যশালা,
 গান বিনা আধার স্বপন ।
 এত শত আয়োজন বিনা শুধু একজন,
 আধিত্যরাহীন যেন অরুণ নয়ন ।
 কালার বাশরী বিনা রাগা যে মলিনা বীনা
 সুলের বাশরী তা'র ধ্বনয় গুটায় ;
 কালো নীরদের রব বিনা এাণে অমৃতব,
 বহুরীর শিখি-শোভা বিধায়ে গুটায় ।
 কালো কোকিলের গান বিনা বসন্তের এাণ,
 শুভ্র ফুল পত্রে শুধু করে মর মর ।
 বিনা ঐ কালো আঁধি ফুল রক্ত গুণ্ড, তা' কি
 লক্ষ্য প্রক্ৰিয়ায় মধু শোভিবে স্তম্ভর ?
 কালাদীঘিটির নীর বিনা আর ছাখিনীর
 উপায় কোথায় ?
 এস কালোবধু যোর, হৃদয়পর্যাপ্তোর,
 আপনায়ে সঁপি তব পায় ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

আর্য্যাবর্ত



বসন্ত ।

—•—

রজনীর শেষে স্বপনের মত
শিশির সমীর কুহেলি বিগত ;
যলয় পবন আনিয়াছে কত
কলগান—ফুলরাশি !
আগিছে বরষা নবীন জীবন,
দিকে দিকে শুভু প্রেমের স্বপন ;
প্রকৃতির দেহে নব যৌবন
অবশ্যে যত্ন হানি ।
অশোক শিমুল পলাশের ফুলে
বরণ-বিকাশ হরিৎ ছত্বে ;
করা ফুলে ভরা বকুলের ফুলে
হরিতে ঝেঁসের শোভা ;
মুকুল-আকুল চুতের ফুলে
ঘন-দৌরভ, মধুপ ফুলে ;
নাথবীর দেহে পুঞ্জে পুঞ্জে
কুমুদ লোচন লোভা ।
শরদী-সলিল স্বচ্ছ ঐতল,
তটিনী-জীবন মুহু-চঞ্চল ;
দিকে দিকে ভাসে পিক কল কল
কত বিহগের গান ।
সুখদ পরশ মধু সমীরণ ;
অধীর জগরে প্রেমের স্বপন ;
অসহ হয়েছে বিরহ-বেদন,—
মিলন-পিপাসী প্রাণ ।

গয়া-ভ্রমণ ।

(২)

স্থান করিতে যাইব, হির হইল। ক্ষুদ্র কণা পূর্বে অনেক তুমিহাছি ও পড়িয়াছি, সেই অস্ত্র উহা দেখিবার ক্ষুদ্র ক্ষৌদ্রলও হইল। প্রথম দিন সন্ধ্যা করিয়া থাকিতে হয়, অস্ত্রাং তেল মাখা হইল না। গয়ায় যতকাদি যুগল করিবার প্রয়োজন নাই। শান্ত বসেন ;—

যুগলং চোপবাসন্ত সর্গভীর্বেষণং বিধিঃ ।

বর্জ্জিত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশাখাং বিরজাং গয়াম্ ॥

বায়ুপুরাণ—১০৫ অ, ২৫ ।

কুরুক্ষেত্র, বিশাখা, বিরজা ও গয়া ভিন্ন আর সকল ভীর্বে যুগল ও উপবাস করিতে হয়।

স্থান করিতে বাহির হইলাম। বাসার ঘরবান পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। দেখিলাম, গয়া সহর সত্য সত্যই আবর্জ্জনাপূর্ণ। ঘোলা ড্রেনে মাছি ভন্ ভন্ করিতেছে,—অনেক স্থান হইতে দুর্গন্ধও বাহির হইতেছে। রাস্তাগুলি অধিকাংশই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অনেক বাড়ী নিত্যই সেকলে ধরণের; উহার জানালাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। সুবিধার মধ্যে দেখিলাম, সহরে জলের কল আছে। বোধ হইল, প্রকৃতি স্থানটি স্বাস্থ্যকর করিলেও মানুষ ইহাকে যতদূর সাধ্য আবাস্যকর করিয়া তুলিয়াছে। একদল সহরে যে শ্রেণ, কলো প্রভৃতি গোপের একোপে প্রতি বৎসর বহু লোক মরিবে, তাহাতে বিশ্বাসের বিষয় কিছুই নাই। অথচ সহরে মিউনিসিপ্যালিটি আছে, কমিশনারও আছে; নাই কেবল আবর্জ্জক কর্তব্য-বোধ। সেই ক্ষুদ্রই আমাদেয় এত দুর্দশ। যে স্থানে ভারতের সকল দেশ হইতে লোক পিতৃকর্তব্য করিতে আইসে, যে স্থানে কোনও সংক্রামক ব্যাধি হইলে ভারতের সর্বত্রই তাহার বীজ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক,—সে স্থানের স্বাস্থ্য-রক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কি সকলেরই কর্তব্য নহে? কিন্তু মানুষকে আক্কেল দেওয়া বড় কঠিন। তাই আমরা কর্তব্য-পালনে উদাসীন। বাজালায় ত তাই দেখিয়াছি, পোড়া বেহারেও কি তাই! আমাদের কি ভবে আর কোনও আশাই নাই? আমরা কি সকলেই চিরকাল ক্ষুদ্র স্বার্থ

লইয়া মত থাকিব,—বড় ও বহুদূর বিস্তৃত পার্শ্বে চিরদিনই কি অন্ধ হইয়া রহিব ?

ভাবিতে ভাবিতে বাইতেছি, এমন সময় এই অপূর্ণ লক্ষীতটী আমার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল ;—

তুমি আর কেন কর বিষয়-বাগ্যনা ।

যিহে কাজে গেল দিন দিনে দিনে তবু কীণ

দূর কর যমেরই বাগ্যনা ॥

চারি পাশে মায়ালাল কেনাঞ পরিষে কাল

ইহা তুমি জানিয়ে জান না ।

কমলাকান্তের কাছে এখনও উপায় আছে

কালী ভাব পুরিবে কামনা ॥

অমিষ্টে চড়া গলায় বাঁধান হুত্রে এই গান গীত হইয়া বেদ সে স্থানটি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল । লক্ষীত যেন ভরলিত ও ভরজিত হইয়া কাণের ভিতর দিয়া মরমে পলিল ; প্রাণ আকুল হইল । বিজয়া-দশমীর দিনে বেহারের পশ্চিম প্রান্তে এমন সুধাযাযা কণ্ঠে এমন বাজালা গান কে গাহিতেছে ? স্বজন-বিরোগ-বেদনায় যাহার হৃদয় কাতর, এ গান তাহার মন উচাটন করিবেই । তাই গায়ককে দেখিবার জন্য চারিদিকে চাছিলাম । গায়ককে দেখিতে পাইলাম না । কিন্তু কি দেখিলাম ?

দেখিলাম, যা দশভূজা দশ বস্ত্রে দশ প্রহরণ বরিয়া সিংহপুটে ত্রিতল-ভল্লম ঠামে দণ্ডায়মান । যারের অতলীপুলসম বর্ণে রক্ত-সুত্র অলঙ্কার-রাশি অপূর্ণ শোভা বিস্তৃত করিতেছে । যারের দশ হস্তে দশ প্রহরণ অলঙ্কার করিতেছে । যারের দক্ষিণে লক্ষী—বামে সরস্বতী । পদতলে মহিষাসুর বিবর্জিত ; কেশরিনখরে রক্তাশ্রিতকৃত্যাক । লক্ষীর পার্শ্বে গণপতি, সরস্বতীর পার্শ্বে কালিক । ভক্তের মস্তক আলো করিয়া যারের প্রতিমা ভদ্রায় বিরাজ করিতেছে । দেখিয়া যেন চক্ষু জুড়াইল । বারানসীতে যারের পূজা দেখিয়াছি, আবার পরাধামেও যারের মূর্তি দেখিলাম । এ মূর্তি ঠিক বাজালা দেশের মূর্তির অনুরূপ করিয়া গঠিত হইয়াছে । চারি দিকে পূজার উপকরণ রহিয়াছে । উপকরণাদির বিস্তার দেখিয়াই সন্দেহ হইল,—বেহারে শক্তিপূজা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র । যে স্থানে এই প্রতিমা রহিয়াছে, তাহা চণ্ডীমস্তক নহে, একটি বেহারী বণিকের বিপণি । বিপণির দাওয়ার

এক প্রান্তে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত, অত্র প্রান্তে বসিয়া দোকানদার বেচা-কেনা করিতেছে। বাজালায় একুণ হয় না, হইতে পারে না। বাজালায় দুর্গাৎসব একটা বিরাট ব্যাপার। পরে অস্থাননে জানিয়াছিলাম যে গয়া অকলে অনেকগুলি দুর্গা-প্রতিমা পূজা হয় সত্য, কিন্তু এখন বাজালায় মত পূজা হয় না। এই সময় আবার সেই সজীত আসিয়া কর্ণে লাগিল ;—

“চারিদিকে মায়াভাল, কেশাশ্র বরিয়া কাল”

এইবার দেখিতে পাইলাম, প্রতিমার পার্শ্বে—একটু দূরে একজন বাজালী গায়ক,—ভিক্ষুক কি না, বৃষ্টিতে পারিলাম না,—ঐ গান গাহিতেছেন। গয়ার বেহারী বাসিন্দারা বেশ বাজালা জানে। তাহারা উৎকণ্ঠ হইয়া সেই গান শুনিতেছে।

আমার পরিগ্রন্থক একটু অগ্রসর হইয়াছিল এবং আমাকে না দেখিতে পাইয়া আবার কিরিয়া আসিয়া আমাকে ডাকিল। তাহার সঙ্গে চলিলাম। পথিপার্শ্বে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি একান্ত পুত্রিণী দেখিলাম। পুত্রিণীটি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা। দৈর্ঘ্যে দেড় শত হস্তের উপর হইবে, প্রস্থে আশ্চর্য্য হাতের কম নহে। কুণ্ডলীতে প্রবেশের প্রধান পথ পূর্বদিকে, প্রবেশ-দ্বারের পার্শ্বে ই একটি মন্দির। শুনিলাম, মন্দিরের মধ্যে সূর্য্যদেবের বিগ্রহ বিরাজমান। কুণ্ডলের পশ্চিমতীরে একটি নিম্নবক্ষ। নিম্ন বক্ষের তলে একটি স্তম্ভের বেণী বর্ত্তমান। যেদিকে ঐ নিম্নগাছ, সেই দিকের স্থানকে কনকল বগে। “তুনিলাম, পুত্রিণীর নাম সূর্য্যকুণ্ড।” এখানে পিতৃগণের পিতৃ দিতে হয়। ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যস্থ গবাক্ষ দিয়া দেখিলাম, কুণ্ডের জল পচিয়া নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহা অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। অথচ এই ভীর্ণে স্থান করিয়া পিতৃগণের পিতৃ দিতে হয়। ইহাই পৌরাণিক মানস ভীর্ণ। মানস-সংস্কারের প্রতিনিবিদ্বপে এই ভীর্ণ গম্বাধামে বিরাজমান। কেবল মানস নহে, এখানে তিনটি ভীর্ণের সমাবেশ দৃষ্টিগোচর। শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

দক্ষিণে মানসে চৈব ভীর্ণত্রয়মুদাহৃতম্

শ্রাব্য তেহু বিধানেন সূর্য্যাক্ষাঙ্কং পুথক্ পুথক্ ॥

দক্ষিণ-মানসে তিনটি ভীর্ণ আছে, প্রত্যেক ভীর্ণে স্থান করিয়া পুথক্ পুথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু একবার এই জলের সঙ্গীত হইলে যে প্রাণ ত্যাগ পত হয়। ইহাতে শ্রাদ্ধ করিয়া এই মন্ত্র পাড়িতে হয়,—

বিধাকর করোমীহ স্থানঃ দক্ষিণমানসে ।

স্থধাং নব্বাচ্ছিত্ত্বা চ স্থধালোকং নগ্রেৎ পিতৃন ॥

নমামি স্থধাং তৃত্বাৎ পিতৃণাং ভাগ্যায় চ ।

পুত্রপৌত্রনৈনখ্যায়াদ্বারোপ্যাবুচ্ছদে ॥

লিচ্ছানা করি, এই অতি দুর্গন্ধ জলে স্নান করিলে আবহুর্ভুজি ও আরোগ্য
হুজি হয় কি ? আর এই ভীষণ জল পিতৃগণকে অঞ্জলি পুরিমা দেওয়া কর্তব্য
কি ? সহস্র বর্ষ হরিদ্রা বে জলে ক্রমাগত পিও পড়িতেছে, আর বাহার
সংস্কার হইতেছে না, সে জলের অবস্থা কিরূপ, তাবিদ্রা দেখুন দেখি । এই-
রূপ অবস্থেলাতেই ত বহু হিন্দুর তীর্থভলি লোপ পাইতেছে । এখানে অনেক
এখন শ্রাদ্ধ করেন না,—বাঁহারা এখনও এখানে শ্রাদ্ধ করেন, তাঁহারা এখানে
স্নান করেন না, কোনও রূপে অঞ্জলি করিয়া জল মন্তকে দিয়া থাকেন ।
পিতৃকার্যে এরূপ “মধ্বভাবে শুড়ং দদ্যাৎ” ব্যবস্থা করা কখনই বিধের
মহে । এখানে তবুও কেহ কেহ এখনও শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন,—কাশীস্থ
মানস-সরোবরে কেহই স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করেন না । তাহার দশা আরও
শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে । অথচ শাস্ত্রে ঐ তীর্থে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা
আছে । ইহার পূর্বের বৎসর আমার সহধর্মিণী ভক্তির আভিলাষে কাশীস্থ
মানস সরোবরের উত্তর দিকে নামিয়া তীর হইতে ঐ তীর্থের জল মন্তকে
দিতেছিলেন । তাহা দেখিয়া ভতীরবাণী জনৈক হিন্দুস্থানী তাঁহাকে
বলিয়াছিল,—“আর যারি । এখন উহার দিন গিয়াছে, এখন আর কেহ
উহার জল মাথার ধের না—ত্রিশ বৎসর পরে আমি আপনাকে উহার জল
মাথার দিতে দেখিলাম ।” রাজা মানসিংহ কাশীস্থ মানস-সরোবরের একবার
সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন,—তাহার পর আর কেহ উহাতে হস্তক্ষেপ করেন
নাই । স্মৃতগ্রাং উহার জল বিবতুলা হইয়াছে, স্মৃতগ্রাং এখন ঐ তীর্থ পরি-
ত্যক্ত—পরে ক্রমশঃ উহা লোপ পাইবে । এইরূপে কাশীর ও গয়ার অনেক
তীর্থ লোপ পাইয়াছে । এই মানস তীর্থে আর কখনও সংস্কার হয় নাই, তাহা
নহে । বহুকাল পূর্বে পালরাজাদিগের আমলে ইহার সংস্কার হইয়াছিল । তবে
এখন আর সংস্কার না হইবে কেন ? কেহ কেহ বলেন,—মুলমানদিগের
রাজত্বের প্রথম আমলে ইহা একবার সংস্কার হইয়াছিল । তাহার পর আর
হয় নাই । ইহাতে কি আমাদের ধর্মের প্রতি অনাস্থা হুচিত হইতেছে

না ? এইরূপ হুট, হুগুগুগরু জলে কি পিতৃগণের স্রীতির অন্ত পিতৃপ্রদান করিয়া ? কখনই নহে ।

স্বাভাবিক ছাড়াইয়া কতকগুলি দোকানে সরাসর পাতরের দ্রব্য বিক্রয়ার্থে সম্বন্ধিত রাখা আছে, দেখিলাম । এক সময় সরাসর পাতর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল । প্রাচীন গৃহস্থের ঘরে এখনও তাহার অনেক নিদর্শন আছে । এখন সেসর পাতর বড় একটা দেখিলাম না । সম্ভবতঃ বিদেশে বোঝা করিলে সেইরূপ পাতর মিলিতে পারে । যাহা হউক, নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সরাসর আঁত লক্ষ্য গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফন্ততীরে পৌঁছিলাম । তীরে পিতের উপকরণ ও পাই পরমা লইয়া কত লোক বসিয়া আছে । বাহাদের আবস্তক, তাহারা তাহাদের নিকট হইতে উহা কিনিয়া লইতেছে । ভিক্ষকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে । ইহারা কানোঘাটের কালালীর মতই নাছোড়বান্দা,—বুঝি তাঁহাদের কালালীর ইহাই ভাব । কানিতে কিন্তু এতদূর কালালী নাই ।

কোনওরূপে তীরের জনতা পার হইয়া ফন্ততে অবতরণ করিলাম । বামিয়া দেখিলাম, চারি হইতে আট আঙ্গুল মতের এক হস্তগরিমিত বিকৃত একটা জলধারা তীরের নিকটই প্রবাহিত হইতেছে । আমি প্রথমেই ভাবিলাম, উহা বুঝি নালায় জল ; কিন্তু দেখিলাম, অনেক ঐ জল মস্তকে ধিতেছেন । তখন বুঝিলাম, ইহাই অন্তঃসলিলা ফন্তর জল । তখন আমিও ঐ জল মস্তকে ধিলাম । দেখিলাম, চারিদিকেই বাজুকার বিস্তার,—সে বাজুকা দক্ষিণ-বাল্যলার বাজুকার জায় নহে,—কলিকাতায় মগরার বালি বলিয়া বাহা বিক্রীত হয়, ঠিক সেই বালির মত । বাল্যলার মেদিনীপুর অঞ্চলে এইরূপ বালি দেখা যায় । ফন্তর খাত বিস্তীর্ণ । সেই বিস্তীর্ণ খাতের পূর্বদিকে রক্ত-রেখার জায় একটা ক্ষুদ্র জলধারা বহিয়া বাইতেছে আগ্র ওয়ার শত শত মগনারী স্নান করিতেছে । আমি বীরে বীরে সেই বিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম । পথ অত্যন্ত সরলা ও আবর্জনাপূর্ণ । আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,—“পূর্বকালে ব্রহ্মা এই গয়াক্ষেত্রে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞের দক্ষিণাধিতে আছতি-প্রদত্ত দ্রব্যের রজ হইতে এই লোকপাবন তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে । ফন্ত সরিষার কাছকাই হইতেও পুণ্য-পয়া । শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

ব্রহ্মণা প্রাধিতো বিষ্ণুঃ কন্তকোহুতবৎ পুরা ।

দক্ষিণায়ৌ হন্তং তত্র তত্রজঃ ফন্ততীর্থপন ॥

তীর্থানি যানি স্তূপানি ভূবনেষ্বিলেখনি।
 তানি স্মারুং সমারাগ্তি ফলতীর্থং স্মরৈঃ সহঃ।
 গঙ্গাপাদোদকং বিকোঃ ফল্যভাদি গদাধরঃ।
 অয়ং বি প্রবক্তঃপণ তস্যাং গঙ্গাধিকং বিহুঃ।

বাঘুপুরাণ—১১১ অধ্যায়।

পৃথিবীর সকল তীর্থই এই ফল্যভাদি নামে কথিত আছে।—সেই সঙ্গে দেব-
 তারাগ এই তীর্থে স্মরণ করেন। বিষ্ণুর পাদোদক বলিয়া গঙ্গা মহিমময়ী
 কিন্তু অয়ং বিহুই স্রবীকৃত হইয়া ফল্য হইয়াছেন। স্মরণ্য হিন্দুর দৃষ্টিতে
 এমন তীর্থও আর নাই। ফল্য তীর্থশ্রেষ্ঠ, কিন্তু বাহ্যগা হিন্দু বলিয়া
 আত্মপরিচয় দিয়া থাকে, তাহারাই এই ফল্যর বন্ধে মলমুক্ত ত্যাগ করিতেও
 সূতী বোধ করে না। দেবিলাম, সেই দ্বিপ্রহরের দিবালোকে ফল্যর সেই
 গভীর জলধারার অতি সারিগো কয়েকজন খোঁটা শৌচ প্রসঙ্গের কার্য
 করিতেছে,—আর তাহারই নিকটে বাকালী, হিন্দুস্থানী, আরহাট্টী মেয়েরা
 স্নান করিতেছেন। জলে মলমুক্ত ত্যাগ করাই শাস্ত্রে অত্যন্ত নিষিদ্ধ,—
 তাহার উপর তীর্থের জল,—অয়ং আদিগদাধর যে তীর্থে জলরূপে অবতীর্ণ,
 সেই জলের তীরেই হিন্দু হইয়া কিরূপে মলমুক্ত ত্যাগ করিতেছে,—
 তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। ইহার নিতান্তই অজ্ঞ। ইহাদের
 শিক্ষার সুব্যবস্থা করা উচিত। শাস্ত্র ভুলিয়া, বর্ষ ভুলিয়া আত্ম
 হিন্দু অত্যন্ত হৃদয়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই হৃদয়গ্রস্ত কি শেষ হইবে
 না?

দেবিলাম, ফল্যতে অনেক বাকালী নগ্ননারী স্নান করিতে আসিয়াছে।
 এবার বর্ষা অধিক হইয়াছিল, তাই ফল্যতে এবার একটু জল আছে। জলের
 বাতাবিক গভীরতা ছয় ইঞ্চি হইতে এক ফুট, কতিং কোথাও দেড় ফুট হইতে
 পারে। তবে লোক জলের মধ্যে বালি সরাইয়া স্থানে স্থানে একটু গভী-
 রতার বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে এবং তাহাতেই স্নান করিতেছে। একজন
 হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ একস্থানে একটু বালি সরাইয়া স্নান করিতেছিলেন, তিনি
 উষ্ণিয়া গেলেন, আমি তাঁহার স্থান দখল করিয়া বসিলাম। দুই একজন
 হিন্দুস্থানী একটু কোপ দেখাইয়া ঐ স্থানটি অধিকৃত করিবার চেষ্টা
 ছিলেন,—আমি কিন্তু সংখ্যের পুরুষের দত্ত অথবা আত্মস্বনিরত শাসকের
 দত্ত তাহাদের কোন কথাতেই কর্ণপাত করিলাম না। আমি স্থানটি আগে

দখল করিয়াছি,—তথাপি তাহারা গায়ের জোরে জায়গা দখল করিতে চায় । সংসারের গতিই এই । তাঁহাদের উচ্চরব ভবনে ও আয়তনয়ন দর্শনে সন্নিহিত কয়েকজন বাঙ্গালী পুরুষহিলা ভীত হইলেন । একজন শ্রোতা আমাকে বলিলেন,—“বাবা, একা বিদেশে আসিয়া কেন খোঁটাদের সঙ্গে বিবাদ করছো । শেণে একটা হাঙ্গামা হবে ।” একজন হিন্দুস্থানী বলিলেন,—“উহার খোঁটা লোক মখে,—উহার ভৈলদী । অকারণে হাঙ্গামা করে ।” তখন আমি তাহাদিগের দিকে চাহিয়া My own Hindusthanিতে বলিলাম,—“বক্ বক্ মাং ক'রো বাবা ! একখটা বাদ হাম উঠে গা ।” লোক করজন তখন সে স্থান হইতে যেন অভিযানে অনেকটা দূরে চলিয়া গেল । পোড়া কপালের এমন ফের, তীর্থে আসিয়াও ফালাবু ।

বাঙ্গালী মেয়েদের স্থানের বড় কষ্ট হইতেছিল । যাঁহারা ঘরোয়নী, তাঁহারা কোনওরূপে স্থান করিয়া লইতেছিলেন,—হাঁহারা অল্পবয়সী, তাঁহারা একটু বিপদা হইয়া পড়িয়াছিলেন । হাঁহারা অন্তঃপুরে থাকেন, ঘরের বাহির করেন না, তাঁহাদের পক্ষে এতদূর সঙ্কট আত্মবিক । একটি বাঙ্গালী যুবক দুই ভাৰ্যা লইয়া স্থান করিতে আসিয়াছেন । তন্মধ্যে একটির বয়স আত্মমানিক বাইশ, আর একটির আত্মমানিক আঠারো বৎসর হইবে । তাঁহারা “সরমে জড়িত চরণদুগল” বীরবিক্ষেপে ছায়ার স্রায় পতির অঙ্গবর্তন করিতে ছিলেন । ইহাদের ননদিনীও ইহাদের সঙ্গিনী । তিনি অপেক্ষাকৃত একটু সঙ্গতিত । পরিচ্ছন্ন বেশিয়া বুকিলাম, তিনি সধবা । একজন ঘরোয়নী বাঙ্গালিনী ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাহাতেই সকল রহস্য জানা গেল । যুবক কুসুমিনের সন্তান । ভগিনীকে বিবাহ দেন, এতদূর সঙ্গতি ছিল না । তাই ভগিনীকে পার করিয়া দ্বিতীয়া পত্নীকে স্বজ্ঞে লইয়াছেন । শ্রোতা ভগিনীকে বলিলেন,—“মা, কয়েটো কি ? সোয়ামীর সঙ্গে ভিন্ন কি এয়েত্নী মেয়ের গরায় আসিতে আছে । তাইয়ের সঙ্গে কি কন্ততে স্থান করে ? ও মা, তোমরা কোন্ দেশের নোক ?” ভগিনী যেন অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া তীরের দিকে চাহিলেন । ভ্রাতৃজায়া দুইটি এই উপলক্ষে পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া বিলক্ষণ হাসিয়া লইলেন । সে হাসি আর ফুরায় না । তখন ভগিনীর চঃষকাতর ভ্রাতা বলিলেন,—“ওগো, আমার ভগিনীপতিও আসিয়াছেন,—তিনি কাপড় চোপড় লইয়া ঐ দাঁড়িয়ে রয়েচেন ।” বেশিলাম, কতকটা দূরে বালুকা-বিজ্ঞারে একটি যুবক কতকগুলি কাপড় লইয়া দাঁড়া-

ইয়া আছেন। তাঁহার বয়স এই যুবতীর বয়সের অপেক্ষা অধিক ত হইবেই না, বয়স অল্পও হইতে পারে। তখন প্রোচা আবার একটু হাসিয়া বলিলেন,—“জন্মানীকে ব্রহ্মে ভূমি আপন ফল শুভে নামলে যে, ও মা, এমন ত কখনও দেখি নি।” তখন যুবতী তাড়াতাড়ি জল হইতে উঠিতে গেলেন। রত্নশঙ্করের স্তায় বিশ্রামদানে সিদ্ধা প্রোচা আবার বলিলেন,—“স্নান করিতে জলে নামিয়া আবার উঠা? তীর্থেত,—মা কস্তুর অপমান?” পাতকভয়শঙ্কিতা যুবতী একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার সকলের ভাব যেন কেমন হইয়া পড়িল। তখন আমি বলিলাম,—“কেন, কি হইয়াছে, উ’হার ঐ দিকে প্রথমে ত একদিকে জল মাথায় দিয়াছেন,—উনি কস্তুর গর্ভে দাঁড়াইয়া আছেন। তা’তে দোষ হয় নাই।” প্রোচা রায়-বাগিনীর মত গর্জিয়া আমাকে বলিলেন,—“ঘটে ঠাকুর। শান্তের তো খুব জান দেখ’তি। এক সঙ্গে ভুব দিতে হয়। এখন কাল হয়েচে কলি, যা’র বা ঠোকা, সে তাই করে বামন হ’য়ে এমন বিবেক দিলে ভোমারই পাপ, আমার কি বাবা?” বলা বাহুল্য, আমি পরের অল্প পাপের পরমা মাথায় করিয়া লইতে রাজী নই। এ দিকে এই দোফলা স্ত্রায়পকাননের সহিত তর্কে পারিয়া উঠি,—সে অধকার আমায় ছিল না। আমি বলিলাম,—“আচ্ছা, উনি কেন আমার লোকটির কাছে কাপড় চোপড় রাবিয়া আসুন না।” তখন জলস্থ গগিনীপতি তটস্থ গগিনীপতিতে ডাকিলেন। তিনি আসিয়া জলে নামিলেন। প্রোচা বলিলেন,—“যাও এখন ছুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া নাও গে।” গগিনী তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্যার সঙ্গ ছাড়িয়া বাণীর সহিত একটু অতর্কিতে আসিলেন। এ দিকে অল্প যুবক স্নানার্থ গামছা চাহিলে, তাঁহার ছুই তর্ক্যাই যুগপৎ আপন আপন গামছা দিতে গেলেন। কাহার গামছা লইবে তাবিয়া লোকটা একটু গোলে পড়িল। শেষটা গামছা-পিছাতে বড়ই সন্ধান রহিল।

যে স্থানে স্নান করিতেছিলাম, তাহার সম্মুখেই রামগঙ্গার কূব পাহাড়। ইহা কস্তুর ঠিক পূর্বে তীরে অবস্থিত। অনিলাম, এ স্থানে বাণির পিণ্ড দিতে হয়। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি বিধ্বস্ত মূর্তির স্তম্ভাংশ বিকীরণ আছে। পাহাড়ের উপর একটি মন্দির আছে। তথায় রাক্ষস শরপের হাত রহিয়াছে। প্রকাশ, এই স্থানে দাঁতাবেবী শরবকে বাণির পিণ্ড দিয়াছিলেন। এই স্থানে পূর্বে অনেক দেবালয় ছিল। কোনও বিপ্লবে উহা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কানিংহাম বলেন, এখানে শ্রীমহেশ্বর পাল দেবের একটি শিলালিপি

ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আর কোনও পুরাণও নাই। যে স্থানে স্নান করিতে-
ছিলাম, তাহার দক্ষিণ দিকেও নবতি উচ্চ একটি বিস্তৃত পাহাড় দৃষ্ট হয়।

গরার প্রান্তে চারিদিকেই আড়াই কোশ ব্যাপী মৃতপৃষ্ঠী তীর্থ বিস্তৃতমান।
যথা ;—

মৃতপৃষ্ঠী পূর্ব্বাশ্বিন পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে ।

দার্কক্রোশবয়ং মানং গয়্যমাং পরিকীর্ত্তিতম্ ।

গরুড়পুরাণ—৮৩।

এই গ্রামগরারই পৌরাণিক মৃতপৃষ্ঠী পৰ্ব্বত। এই স্থানেই কল্প তীর্থের
আরম্ভ। যথা

মৃতপৃষ্ঠীরাগাংস্তাৎ সাক্ষাৎ তৎ কল্প তীর্থিকম্ ।

বায়ুপুরাণ—১১১৪৫ ।

মৃতপৃষ্ঠী পৰ্ব্বতের অবলম্বনে হইতে সাক্ষাৎ সেই কল্প তীর্থ বিব্রাজিত।
তদবস্থায় তামচন্দ্র এইখানেই দশরথের পিতৃ স্নান করিয়াছিলেন। ফলে এই
স্থানটিতে একটি বিশেষ তীর্থ ছিল। ইহাই কল্পপাত্ত ; এখন বিধ্বস্ত। তবে
এখনও কেহ কেহ এখানে পিতৃ দিবা থাকেন।

স্নানান্তিক প্রকৃতি গারিয়া আমি বিহুপাদপত্র দেখিতে গেলাম। অত
আমাকে সংঘম করিয়া থাকিতে হইবে—কার্য্য কিছুই নাই। কেবল গদা-
ধরের পাদপত্র দর্শন-কাননাতেই উত্তর দিকের দ্বার দিয়া মন্দিরে প্রবেশ
করিলাম। এই মন্দিরের চারি পার্শ্বেই অনেক দেবালয় বর্ত্তমান। চারি
দিক ভিক্কুক কাদালীতে আকীর্ণ। অদ্য বিহুপাদপত্রে প্রণাম করিয়াই
ফিরিলাম। কারণ, বেলা অধিক হইয়াছিল। স্মরণ্য অদ্যকার রাত্তিতে
মন্দিরের বিবরণ প্রদত্ত হইল না।

বাগার ফিরিয়া যথাক্কে হবিসায় প্রস্থত করিলাম। গরার দ্বত ও দধি
উত্তম পাওয়া যায়। চাউলও সুন্দর। ইহা তিন্ন মাটির উমান অতি উত্তম।
এক পরসার উনানে এক জনের ভাত বেশ রীণা যায়। ছুই পরসার উনান-
তলি আরও ভাল। আমি প্রত্যাহই উমান হাঁড়ি সব ফেলিয়া দিলাম।

আহারান্তে একটু বিগ্রাম করিয়া ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখিতে বাহির
হইলাম। চাঁদচৌগা হইতে যাত্রান্তে এতঃ ভাড়া লাভ আনা গায়া হইল।
তুড়াটিকে সঙ্গে লইলাম। সহরের দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মযোনি পাহাড়।
পাহাড়ের পাদদেশে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গৃহ আছে। স্থানটি অতি

স্বয়ং। ব্রহ্মবোনির দাণ্ডিঘোষেই অক্ষয়-বট। নারদ গুহিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, “পিতৃপাং তত্র বৈ দত্তমক্ষয়ং ভবতি প্রত্যো” (পদ্মপুরাণ, ৪র্থ খণ্ড) এইখানে পিতৃলোকদিগকে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। আমি এই বিন বাহির হইতেই অক্ষয়-বট দেখিলাম। ক্রমে একা ব্রহ্মবোনি পাহাড়ের পাদমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাহাড়টি দেখিয়া আমার বোম্ব হইল, আমি অন্যদিকেই উহার উপর উঠিতে পারি। উপরে উঠিবার বেশ শক্তি আছে। মহারাষ্ট্রের দেবরাও তাও সাহেব এই শোপানাবনী প্রকৃত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় ৮-৯৫ বাপের পর একটা বিশ্রাম-গৃহ আছে। এইটুকু উঠিতেই আমার কষ্ট বোম্ব হইল। পাহাড়টি প্রায় সোলা উঠিয়াছে। অনেকই বলেন যে, ইহাতে উঠিতে বড় কষ্ট হয়। পাহাড়টি উঠে সাড়ে চারিশত ফিট বা তিন শত হস্তের অধিক। বিশ্রামগৃহে বিশ্রাম করিয়া উঠিতে ও প্রথমে গৌড়ে কষ্ট হইয়াছিল। বিশ্রামগৃহের পর অনেকটা একে-বারে সোলা উঠিতে হয়। তাহার পর একটা মোড় আছে। মোড়ের পার্শ্বেই ব্রহ্মহুত। হুতের কল ‘টোকা সেওলা’ বা পানার আধার। ইহারই দাণ্ডিঘো একটি শূড়াল আছে। তাহাই ব্রহ্মবোনি। তাহার এক স্থ বিনা প্রবেশ করিয়া অস্ত্র স্থ বিনা বাহির হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, সেই অস্ত্র সে চেষ্টা করি নাই। সেই স্থানে আমি আবার কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া গইলাম। তাহার পর বীরে বীরে উপরে উঠিলাম। উপরে স্বয়ং চম্বর। তৎপরে সাবিজী বা গায়ত্রী দেবীর মন্দির। চম্বর হইতে মন্দিরে উঠিতে কয়েকটা ধাপ আছে। মন্দিরটি দক্ষিণদ্বারী। মন্দির-মধ্যস্থিত। দেবীমূর্তি পঞ্চমুখী। আমি এতদূর ক্রান্ত হইয়াছিলাম যে, মন্দিরের পদ্যতে আলিসার উপর শুইয়া পড়িলাম।

শুইয়া তাবিত্তে লাগিলাম,—এই সেই কোনাহল গিরি, যেখানে গয়াস্থর উৎকট তপস্যায় দেবগণকে প্রভু করিয়াছিল। এই কোনাহল-গিরিতে সে ব্রহ্মকে বক্ষ করিবার জন্য আত্মদেহ দান করিয়াছিল। তাহার পরে এই তীর্থ বোনিবার তীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পদ্মপুরাণ বলেন,—

বোনিবারক তত্রৈব বিষ্ণুঃ কুরুতগর্ভত।

তজ্জাতিগম্য যুচ্যেত পুরুষো বোনিমলকটঃ।

ভরতগর্ভত! সেইখানে বোনিবার তীর্থ; তথায় বাইলে মাজু বোনিমলকট হইতে যু জি পার। বক্রপুরণ বলেন,—

ব্রহ্মধোনিং বিনির্গচ্ছৎ প্রথমঃ পিতৃমানসঃ

তর্পয়িত্ব পিতৃন্ দেবান্ ন বিশেষধোনিমকটে ।

এখন আর কেহ এখানে পিতৃতর্পণ করিতে আইগেন না । এখানে আসিয়া পোক ঘোনিবার তীর্থ দেখিয়া থাকে । সাবিত্রী-মন্দিরের সম্মুখ চব্বরের টিক দক্ষিণে আর একটা গ্রহা আছে । একজন সম্রাসী বলিলেন, উহাই ঘোনিতীর্থ । আমি উহার ভিতর প্রবেশ করা আবশ্যক মনে করিলাম না । তবে আকৃতি দেখিয়া এটাই ঘোনিতীর্থ বলিয়া আমার বিশ্বাস হইল । এই সময় কয়েক জন অন্নবরসন্ন যুবক তথায় উপস্থিত হইলেন । দেখিলাম তাঁহারাও অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন । তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—“আপনি এখানে ?” আমি তাঁহাকে বলিলাম, “হাঁ, আপনি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন ?” তিনি আমার নাম ও পেশা সবই বলিয়া বলিলেন,—“মহাশয় ! আমি সীমাচলে উঠিয়াছি, কিন্তু এত কষ্ট ত হয়নাই । বড় ললপিপাসা । প্রাণ গীয়া ।” আমিও অত্যন্ত পিপাসার্ত । তখন যুবক-দল জল জল করিয়া পুত্রাণীকে ধরিয়া বলিল । তিনি বলিলেন, এ পাখাড়ে জল কোথায় পাইব ? পাখাড়ে এক ব্রাহ্মণকন্যাই সমস্ত দিন থাকেন । অল্প কেহ প্রায় থাকেন না । শেষে তিনি ব্রহ্মকৃত হইতে এক লোটা জল আনিয়া দিলেন । আমরা তাহাই পান করিলাম ।

ক্রমে লক্ষ্য প্রায় বনাইয়া আসিল । আমরা পর্ত্ত হইতে নামিতে আরম্ভ করিলাম । একজন আমাকে বিদূরকৃত গোবামী মহাশয়ের সাধনস্থান দেখাইয়া দিলেন । পাখাড়ের গারে আর একটা পাঞ্জাবী সাধুর আশ্রম আছে । এই পাখাড়ে বড় শব্দ হয় । সম্ভবতঃ শুভার মধ্যে বাহু প্রবেশ করিয়া ঐ শব্দের সৃষ্টি করে ।

যখন বাসায় ফিরিলাম,—ওখনু কল। হইয়া গিয়াছে । বাসায় আসিয়া শুনিলাম, বিসর্জনের বাদ্য বাজিয়াছে । এখানে অনেক গয়ালী ঠাকুরের বাড়ী দুর্গোৎসব হয় । আমার বাসস্থান সম্মুখ দিয়া অনেক প্রান্তিক বিসর্জনাধী লইয়া বাজিয়া হইল । দেখিলাম,—প্রতিমাতুলি ঠিক বজদেশীয় দুর্গা প্রতিবার জায় বেশ সুসজ্জিত । তবে বাজনা ব্যাগ পাইপ আর আলো আশিটিলিন গ্যাসের । বজের সে বিদ্যদর্মাণা বিসর্জনের বাদ্য এখানে প্রত হইল না ।

ক্রমঃ

শ্রীমদ্বিভূষণ যশোপাধ্যায় ।

কিশোরী চাঁদ মিত্র।

—:০:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

— ০ —

সাহিত্য।

(১)

লিখিত দেশবাসীর দায়িত্ব কত গুরুতর, কৰ্মক্ষেত্র কত বিস্তীর্ণ, সৰ্ববিধ উন্নতিবিধিনিয়মী শক্তি কত অধিক তাহা আমরা অনেকেরই বিস্মৃত হই। অথবা আমরা দিন দিন নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছি। ইহা শিক্ষা না অবনতি? আমাদের সেই সরলচিত্ত পূৰ্বপুরুষগণের শিক্ষাম সাধনা ও উদ্বারভাব নশ্বন করিলে ও আজিকার স্বার্থপরতা ও আত্মপ্রতিতা পর্যবেক্ষণ করিলে এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদ্ভূত হয়। ঐহাদিগকে লোকে দানবীর বলিয়া পূজা করিতেছে, তাহাদিগের মধ্যে উপাধিলালুপতা বৃষ্ট হইতেছে; ঐহাদিগকে ধর্মবীর বলিয়া অৰ্জুনা করা হইতেছে, ঐহাদিগের মধ্যে ভক্ত্যামী ও যশলিপ্সা বৃষ্ট হইতেছে; ঐহাদিগকে কর্মবীর বলিয়া সম্মান করা হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে স্বার্থপরতা ও বাগাড়ম্বর লক্ষিত হইতেছে। আমাদের প্রাচীন সনাতন শিক্ষাম ভাব আর নাই। আমরা ইংরাজী শিক্ষার সহিত ক্রমে ক্রমে জাতীয়তা বিসর্জন দিতেছি। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাউন্সেল ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বেথুন সভায় বলিয়াছিলেন, “ভারত কেবল পাশ্চাত্য-জগতের অঙ্গকরণ করিবে না (অনেক হিন্দু তাহাই করিতে প্রস্তুত)—যেন জাতীয়তাবিহীন হিন্দু গঠনই আমাদের শিক্ষার উদ্দিষ্ট ফল। ইহা ভারতবর্ষের পক্ষে বর্থাৎ কল্যাণকর হইবে না। প্রাচ্য প্রাচ্য থাকিবে—প্রতীচ্য শিক্ষা তাহার নিম্নে থাকিবে ইহাই ভারতবর্ষের কাম্য।” কিশোরী চাঁদ ইংরাজী সাহিত্যরসে আকীর্ষন বিভোর ছিলেন, ইংরাজী সমাজে সর্বদা বিশিষ্টেন, এমন কি সময়ের প্রভাবে তিনি অনেক বিষয়ে ইংরেজের তৎপ অঙ্গকরণ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের গৌরবের কথা—তিনি ইংরাজী শিক্ষার সহিত জাতীয়তা বিসর্জন দেন নাই। তাহার জীবনের প্রতি পক্ষে হিন্দু জাতীয়তার চিহ্ন পরিষ্কৃত। সেই আধাশুলত সরলতা ও নিতীকতা, মহত্ত্ব ও উদ্বারতা অঙ্গুপম সাধনা ও আত্মত্যাগ, তাহার

জীবনের প্রতি দৃষ্টি দেখিতে পাই। মনুষ্য কোনও জাতীর একচেটিয়া নহে বটে কিন্তু হিন্দুর ইতিহাসে যে নির্যাস কষ্ট, সাবিক দান; কঠোর সাধনার মহিমোজ্জ্বল উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস তাহা পৃথিবীর আর কোনও জাতীর ইতিহাসে নাই।

শিক্ষিত কিশোরীটাম বিদ্যালয়ের পঠিত সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করিলেন না, কিংবা আপনার স্বাধঃখেণে ব্যাপ্ত হইলেন না বা আপনাকে বিলাসলাগরে মজ্জিত করিলেন না। প্যারীটামের সহবাসে ব্যাকিরা এই অল্প বয়সেই তিনি বুদ্ধিতে পারিগ্রাহিলেন, শিক্ষিত ব্যক্তির দারীশ কত আধিক, দেশের অবস্থা কত শোচনীয়, দেশ ভাষার নিকট কি আছে,—তিনি দেশের লজ্জা কি করিতে পারেন। অজ্ঞতার অন্ধকারে দেশবাসী মিজিত, কুৎসিত লোকাচারে উদারতম বর্ষ গছচিত, কুসংস্কারের নিগড়ে সমাজ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। দেশের লোক আপনার রাজনীতিক অধিকার বুঝে না, বুঝিতে চাহে না, রাখিতে জানে না, রাখিতে পারেন না। এই অজ্ঞতার অন্ধকারে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করিবার ভার কাহার উপর? এই সজীবতা পূর্ণ বর্ষকে প্রচারিত করিবার ভার কাহার উপর? এই সমাজের সম্বিধ কলজ মোচনের ভার কাহার উপর? এই রাজনীতিক অধিকার অর্জন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার ভার কাহার উপর?—বুটিনের শিক্ষিত যুগের উপর। শত বাবা, শত বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইবে কিসের দ্বারা? উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগের দ্বারা।

কিশোরীটাম দেশের কল্যাণের লজ্জা কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। রামমোহন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণের জীবন ভাষার আদর্শ হইল।

এই সময়ে একজন পবিত্রচেতা, উদারহৃদয় মহাত্মার সহিত কিশোরীটাম পরিচিত হইলেন। তিনি আর কেহই নহেন চিরন্তনশ্রীর ডাক্তার আলেকজান্ডার ডফ্। যে অদম্য উৎসাহ ও অসাধারণ একাগ্রতা লইয়া এই ডেক্সা বর্ষযাজক এদেশে শিক্ষা বিস্তার ও নৈতিক উন্নতিসাধন জন্য প্রযত্ন করিতেছিলেন তাহা কিশোরীটাম লক্ষ্য করিলেন—মুগ্ধ হইলেন। তিনি অবিলম্বে ডাক্তার ডফের সহৎ উদ্বুদ্ধ উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন! ডফের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। কিশোরীটাম সেই বিদ্যালয়ে বিনা-

বেতনে শিক্ষাদান। করিতে প্রীত হইলেন এবং ক্রিয়াকাল শিক্ষকতা করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার ডফের সহিত তাঁহার সখ্য আরও ঘনিষ্ট হইল এবং ডক কিশোরীচাঁদের একজন প্রধান বন্ধু ও মঙ্গলা-কাম্বী হইলেন। এই বন্ধু চিরদিন অন্ধুর ছিল এবং কি সম্মানে কি বিপদে ডাক্তার ডফের উপদেশ, সহায়ত্ব ও উৎসাহ তাঁহার জন্মে নব আশা নব বল সঞ্চারিত করিত। যিনি বাল্যে পাণ্ডীচাঁদ কর্তৃক, কৈশোরে ডেভিড হেরার কর্তৃক, এবং যৌবনে আলেক্সণ্ডার ডক কর্তৃক জীবনের দারীদ্র ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেষ্ট হইয়াছেন তিনি যে উত্তর-কালে অসাধারণ কর্মবীর বলিয়া অন্ধর বশঃ অর্জন করিবেন তাহাতে আর বিষয়ের কারণ কোথায়?

কিশোরীচাঁদ এই সময় হইতেই সাহিত্যলোভী আগ্রহ করিলেন। তিনি প্রথমে ‘বেঙ্গল হরকরা’ নামক বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন; পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ‘থেলন স্পেস্ট্র’ নামক বিষয়োপক্রম প্রকাশিত হইলে পাণ্ডীচাঁদ মিত্র, তারাতাঁদ চক্রবর্তী রামমোহন বোষ প্রভৃতির সহিত তিনিও এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হইলেন এবং অনেকগুলি মনোহর প্রবন্ধ দ্বারা উক্ত পত্রিকা অলঙ্কৃত করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন তারিখে দেশের অকৃত্রিম বন্ধু “এদেশে ইংরাজী শিক্ষার পিতা” ডেভিড হেরার তাঁহার অসংখ্য চাক্ষুশ শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ডেভিড হেরারের সহিত কিশোরীচাঁদের কিরূপ মেহের সখ্য ছিল তাহা পুঙ্খপরিচ্ছদে উল্লিখিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা কিশোরীচাঁদের তরুণ জন্মে কিরূপ আঘাত করে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। হেরারের দেহ সমাধি হইলে তাঁহার অসংখ্য হিন্দু ভক্ত কর্তৃক স্তুতিগুণ্ড, প্রস্তরমূর্তি ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত ও স্থাপিত হইল। কিশোরীচাঁদ এই সকল অস্থানে আন্তরিকতার সহিত বোগদান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; পঞ্চম বাহাতে বৎসর বৎসর তাঁহার পবিত্র স্মৃতি পূজিত হয়, নবীন-বৃদের জ্ঞাতগণের জন্মে তাঁহার মহৎজীবনের পুণ্যকণ্ঠগুলি সর্গদা জাগরুক থাকে ও উন্নতভাবগুলি প্রতিক্ষিপ্ত হয় এতদ্ব্যতীত স্বীয়ভবনে হেরারের বন্ধু ও ভক্তগণকে আহ্বত করিয়া হেরার বার্ষিক উৎসব পুণিতি গঠিত

করিলেন। কিশোরীচাঁদ ইহার প্রথম সম্পাদক হইলেন। এই সমিতির উদ্যোগে প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে ঘোষার-স্মৃতি-সম্মিলনীতে ভারতবাসী-দিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে বক্তৃতা প্রদত্ত বা প্রবন্ধ পঠিত হইত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজকর্ষাছুরোধে কলিকাতা ভাণ্ডারকাল পর্যন্ত কিশোরীচাঁদ এই সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং পরে পুনরায় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ম্যাগিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিলে উৎসাহের সহিত ইহাতে যোগদান করেন। তিনি নিজে এই বাৎসরিক স্মৃতিসম্মিলনীতে কয়েকটি মনোহর প্রবন্ধ পাঠ করেন। যথা;—১৮৬২ খৃষ্টাব্দে “Hindoo college and its founder”, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে “The Medical college and its first Secretary” এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে “Memoris of Dwarkanath Tagore.” তিনি কয়েকবার উক্ত সম্মিলনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াও কয়েকটি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঘোষারের পুণ্য-স্মৃতি কিশোরীচাঁদ আজীবন ভক্তি, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই কিশোরীচাঁদ আর একটি শোকের ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ২৬ অক্টোবর দিবসে তাঁহার পিতা রামনারায়ণ ইংলোক পরিত্যাগ করিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তিনি পিতাকে দ্বেষতার মত ভক্তি করিতেন। কিশোরীচাঁদের সহদর্শিণী ভ্রাতৃক লিখিত একটি অসমাপ্ত জীবন-চিত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে, এই হৃদয়নায় কিশোরীচাঁদের কোণস হৃদয় এত আঘাত প্রাপ্ত হয় যে, এই শোক-সংবাদ কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি মুগ্ধিত হইয়া পড়েন। তাঁহার নবীন হৃদয় ভয় ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল।

কিন্তু তাঁহার মানসিক অবসাদ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। বহাওয়া ডক তাঁহার যুগক বছর এই অবসাদপূর্ণ নিশ্চেষ্ট ভাগ দর্শন করিয়া তদ্বৃত্তিকরণান্তি-প্রায়ে সম্বন্ধানুগ উপদেশাদি দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় কর্ণধীবনে উদ্বীলিত করিয়া তুলিলেন। এই সময়ে ডাক্তার ডফের উপদেশে কিশোরীচাঁদ প্রাকৃতিক বর্ণ বিজ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার মন পুনরায় সুস্থ হইল। পুনরায় মানবজীবনের দায়িত্ব তাঁহার মনস্তত্ত্বের সম্মুখে সমুদিত হইল। বাহ্যতে প্রত্যেক দানবের প্রতি প্রত্যেকের প্রেম এবং সর্বোপরি সেই “একমেবাদ্বিতীয়ম্” পরমেশ্বরের প্রতি অকুরাগ উদ্বীলিত হয়, তৎকালে তিনি

আগ্যাবর্ত



ডেভিড হেয়ার ।

সচেষ্ট হইলেন এবং এতদ্ব্যবস্থায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দিবসে স্বীয় ভবনে Hindu New Philanthropic Society নামক বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভা প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই সভায় বিবিধ সম্প্রদায়ের সাধু ও সত্যপ্রিয় ব্যক্তি যোগদান করেন। তন্মধ্যে ডাক্তার ডক্, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, রানগোপাল দোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও প্যারীচাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সভায় প্রতি মাসে একটি করিয়া অধিবেশন হইত এবং তাহাতে ইংরাজী অথবা বাংলা ভাষায় ঈশ্বরের প্রকৃতি ও গুণ এবং নীতি ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাদি পঠিত হইত।

এই সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই সভার পঠিত “প্রবন্ধাবলী” * ভূমিকার নিম্নলিখিত অঙ্গবাদ হইতে প্রতীয়মান হইবে।

“হিন্দু বিশ্বপ্রেমোদ্দীপনী সভার কার্য-নির্বাহক-সমিতি এই সভার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বোধ করেন। ভারতের নবজীবন যে তাহার নৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় উন্নতির প্রতি যত্নবান্ না হইলে সম্ভবপর নহে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে এই যে সত্যটি অপ্রতিহতভাবে উদ্ভূত হইতেছে—ইহাই এই সভার লক্ষ্যবস্তু।

“১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী দিবসে দেশবাসীর নৈতিক উন্নতির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় নির্ধারণের লক্ষ্য সমবেত কতিপয় এতদ্ব্যবস্থায় বহুবর্গ কর্তৃক এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উন্নতির বিপক্ষে বহুবিধ প্রবল এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় সকল প্রকার যত্ন এবং সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এইরূপে প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র সমবায় উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং এক্ষণে চিরস্থায়ী ও কল্যাণপ্রদ অস্থান হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। নৈতিক ও ধর্মবিষয়ক সাধনার আবশ্যিকতা ও উপকারিতা যে শিক্ষিত হিন্দু-গণের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক জনও কার্যতঃ সমর্থন করেন, গত বর্ষের কার্য-বিবরণী তাহার আনন্দজনক নিদর্শন।

“হিন্দু গৌতলিকতা বিনষ্ট করা এবং ঈশ্বর, পরলোক, সত্য ও শ্রেয়সম্বন্ধে মুক্তিলাভ ও উন্নত অভিমত প্রচার করাই এই সভার উদ্দেশ্য। হিন্দুগণকে

* Discourses read at the Meeting of the Hindu New-Philanthropic Society Vol I Calcutta. P. S. D, Roza rio & Co. 1844.

পরমাত্মা এবং সত্যরূপে ঈশ্বরকে পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং তাঁহাদিগের মূর্ত্তিকর্তা, স্বভাবভীষণ এবং আপনাদিগের প্রতি যে সকল নৈতিক ও পবিত্রতম কর্তব্য আছে, তাহা পালন করান ইহার অভিলষিত উদ্দেশ্য ।

“ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে সকল সত্য প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য, সে সকল কোনও বর্ণাশ্রমভেদেই সকল মানবজাতির নৈসর্গিক বিচারের অঙ্গব্যাপী হইবে । যদিও সকল বর্ণমত হইতে পৃথক্, তথাপি এই সত্যগুলি, বলিতে কি, সকল বর্ণ-বিচারের মূল । এই বিষয় যে একজন ব্রাহ্মণ ও নৈতিক শাসনকর্তা আছেন, মানবের মধ্যে এমন যে কিছু আছে যাহা দেহপিঞ্জর ভঙ্গ হইলেই বিনাশ পায় না এবং চিরস্থায়ী, পুণ্যের সহিত যে সুখ এবং পাপের সহিত যে দুঃখ অবিনশ্বেদভাবে জড়িত, এই সকল সত্যই সত্য এবং অসত্য উভয় জাতিরই ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ, মূলতত্ত্ব । এতদ্ব্যতিরিক্ত সাধারণ দেশবাসিন্যের কর্তব্য এই সকল সত্য কার্য্যভঃ স্বীকার করা ভারতের যথার্থ হিতৈষীদিগের আশঙ্ক্যের কারণ না হইয়া থাকিতে পারে না ।

এই সত্যের উদ্দেশ্য, ঈশ্বর এবং মানবের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করা । ইহার নামেই সে উদ্দেশ্য প্রকাশ্য । সকল ধর্ম্মিক এবং সুন্দর ব্যক্তি যে ইহার উদ্দেশ্যে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ।

এই সত্যের মানিক অধিবেশন হইয়া থাকে এবং তথায় ইংরাজী ও বাঙ্গালী প্রবন্ধাদি পঠিত হয় । ধর্ম্ম ও নীতিতত্ত্বই এই সকল প্রবন্ধাদির বিষয় । ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক বাঙ্গালী গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ, ঐ বিষয়ক সংকলিত ও বাঙ্গালী গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ এই সত্যের উদ্দেশ্য-সাধনের অত্যন্তম উপায় বলিয়া অবলম্বিত হইয়াছে ।

এই সত্যের উদ্দেশ্য এত উদার যে অস্বদেশস্থ সকল শিক্ষিত যুরোপীয় ও ভারতীয় যে ইহাতে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিবেন এই আন্তরিক আশা করা যায় ।

কলিকাতা, ১লা অক্টোবর ১৮৫৪ ।

এই সত্যের উদ্দেশ্য কিশোরীটাদ কর্তৃক লিখিত প্রথম প্রবন্ধে আরও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । “কলিকাতা রিভিউ” পত্রের ৩য় সংখ্যার ডাক্তার ডক্‌ মহাশোচনা প্রসঙ্গে বলেন,—“সকল প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রবন্ধটি কয়েক বিষয়ে অতি শক্তিশালী এবং উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় ।

• • • অধিকন্তু এই রচনার মধ্যে যে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইতেছে—বাহ্য আশাদের বর্তমান তুহার-শীতল উদাসীনতার মধ্যে একটি মনোমুগ্ধকর ব্যাপার। মাহুঘের মধ্যে যে বুদ্ধিবৃত্তির ন্যায় বর্ণ ও নীতিশক্তিও নিহিত আছে, এবং ইহার ন্যায় অন্তরিত ও চর্চ্কা এবং বর্জন করা উচিত, এই মহান অথচ সত্যত উপেক্ষিত সত্যটি এইরূপ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মাহুঘের প্রকৃতির আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আরও কিছু আছে। সে কেবল বুদ্ধিমান নহে; পরন্তু বর্ণ ও নীতি প্রবণ জীব। সে ঈশ্বর, স্বজাতি এবং আপনার নিকট তিন প্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রথম সম্বন্ধে ভক্তি, দ্বিতীয়ে পরোপকারিতা এবং তৃতীয়ে দ্বিত্যাহিতজ্ঞান দ্বারা সে বিকৃষিত। মাহুঘের জন্মের ঈশ্বরের দত্তদ্বারা ভক্তি ও প্রীতির বোল উল্লসিত হইয়াছে; কিন্তু করণ না করিলে তাহা বিকশিত ও ফলপ্রসূ হইতে পারে না। আশাদের ধর্ম ও নৈতিকবৃত্তি সকল এবং প্রেমের বিকাশই আশাদের জীবনের প্রধান কর্ম। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্পূর্ণ হইতে পারে? নিম্নচর্যই কেবল বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের দ্বারা নহে? না—বুদ্ধিবৃত্তিগুলির চর্চ্কা করা বর্ণ ও নৈতিকবৃত্তি বিকাশের সহিত এক নহে। প্রেমের সহিত শ্রেয়বৃত্তিগুলি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নহে। শিক্ষাসমিতি কর্তৃক অল্পমাত্র শিক্ষাপদ্ধতি যদিও ভারতবর্ষের পরোপকারী ফলসমূহ প্রসব করিতে পারে; তথাপি ইহা শিক্ষার বর্ষা উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণেইভাবে লাভ করিতে অসমর্থ। ইহার সত্ত্বিকের সহিত সম্বন্ধ আছে জন্মের সহিত নহে। ইহার সহিত বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ মাহুঘের সম্বন্ধ আছে নৈতিক ও ধর্মবৃত্তিসমূহ মাহুঘের সম্পর্ক নাই। কিন্তু মাহুঘ কেবল বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা আবৃত্তি জীব নহে; নীতি এবং বর্ণপ্রবণ জীব অর্থাৎ অতি সুন্দর বিকাশকর্ম করণ ও শ্রেয়ভিত্তিক জীব—এই পার্থক্য জগৎ, এমন কি, আকাশের অনীমতার মধ্যে ঘুরায়মান সূর্য এবং গ্রহসমূহ বিকাশপ্রাপ্ত হইলেও বাহ্যিক জীবিত থাকিবে সেই অমরহলাতের জন্য নির্দিষ্ট জীব হইয়া আশাদের নৈতিক ও ধর্মবৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সাধনে অবহেলা করার ন্যায় আশাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত কার্য আর কিছুই করিতে পারি না। এই সত্যের সংগঠন যে আশাদের নৈতিক ও ধর্মবৃত্তি সমূহের পরিপূর্ণ ও উৎকর্ষ সাধনের সম্ভাব্য হইবে তাহা স্বীকৃত হইবে। আশাবিপদের উদ্দেশ্য

সাধনের ইহা একটা উৎকৃষ্ট উপায় । গণমিলিত শক্তি ও উদ্যম আশ্রিত সাধন করিতে পারে ।

“যে সকল উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্ততঃ মনে মনে হিংস্রবর্ণের ভয়ানক কুসংস্কার সমূহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও কোনও শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ম অবলম্বন অথবা অবেষণ করিতে কোনও চেষ্টা করিতেছেন না, এই অশুভ সত্যটি এইরূপ স্পষ্টরূপে বোঝাত ও শাস্তভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ?

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করিলে একদিকে যেরূপ শিক্ষার অনন্ত শক্তি সমৃদ্ধত মহান পরিবর্ত্তন সকল দেশেরা আমরা বিমত হই, অপরদিকে শিক্ষিত অথবা তথা কথিত শিক্ষিত দেশবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক ধর্ম্মের অভাবের শোচনীয় চিত্র দেখিতে পাই । ইহা নিতান্ত লজ্জার বিষয় ; অশুচি হিংস্রমাণ সত্য যে, দেশের কুসংস্কার সমূহ পরিত্যাগ কালে, সাধারণ দেশবাসিগণের ক্ষমতা বহুশূল প্রাচীন সংস্কার সকল হইতে ক্ষয়কে মুক্ত করিবার কালে, তাঁহারা বিভ্রান্তের অথবা মহত্তর ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই । যদিও তাঁহারা এক সত্যাক্রম পরমেশ্বরের বিশ্বাস করেন, শতকরা নিরানব্বই জন তাঁহাদিগের বিশ্বাস অগ্রে ধর্ম্মবিশ্বাস নহে—কেবল নিষ্ক্রিয় সম্মতি মাত্র । তাঁহারা ব্যক্ত ধর্ম্ম ও ঋণ ধর্ম্ম উভয়ের মধ্যে দোহলামান । কিন্তু তাঁহাদের জীবনের গতি তাঁহাদিগের স্বীকৃত ধর্ম্মের অনুরূপ নহে । কারণ যে সকল বুদ্ধ শিক্ষিত নামে পরিচিত প্রদান করেন, তাঁহাদের অধিকাংশ আদৌ ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করেন না । তাঁহাদিগের মধ্যে মনে করেন ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন্য প্রকাশ করিতে দেখা দিয়াছেন । যখন তাঁহারা তাঁহাদিগের দেশের ধর্ম্মের প্রকৃতি লইয়া জগন্মের তর্ক উপস্থিত করেন, যখন তাঁহারা যুরোপীয় আচার্য্যসনে বসিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন এবং মনে করেন, তাহাতেই ধর্ম্মসংস্কারের অস্থি-নক্ষা নিহিত আছে । তখন তাঁহারা ধর্ম্মতাবসমূহের অস্থূলকোনে কোনও চেষ্টা পানেন না । বর্ত্তমান কালের এই সকল স্বাধীনপ্রকৃতিক পুরুষগণের, দেশের তবাকথিত সংস্কারকগণের জানা উচিত যে, তাঁহাদিগের জ্ঞান, অজ্ঞানতমসাজ্ঞান, জনসাধারণ হইতে তাহাদিগের উন্নতি স্বপ্নমাত্র—কল্পনা-মাত্র । যদি কুসংস্কারের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার সময় তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিস্তারের বিকাশের জন্ত, পরমেশ্বরের অদ্বৈত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে পরি-বৃত্তমান তাঁহার শক্তি ও বললেচ্ছার বিষয় অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার লব্ধে

জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারার্থে সেইরূপ আশ্রয় প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার্য্য জাতির পৌরষ, দেশের আলোক বলিয়া অভিনন্দিত হইতেন। কিন্তু বর্ধচর্য্য তাঁহাদিগের অবহেলা ও ভৈরবীত্বের বিষয় চিন্তা করিলে তাঁহাদিগকে লৌকিক বশ্য ত্যাগ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান না করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কারপর দেশভ্রাতৃগণ অপেক্ষা নিম্ন আসনে স্থাপন করে। সাধারণ দেশবাসিগণের সত্য হউক, মিথ্যা হউক, একটা বর্ষ আছে। তাহাদের সংকার্য্যসাধনেচ্ছার সম্পূর্ণ অভাব মাই— কুসংস্কার তাহাদিগকে সংকার্য্যসাধন হইতে বিরত করে না। তাহাদের মস্তকে অর্থাৎ ঈশ্বরের শাস্তি ও সুবিচারে বিশ্বাস তাহাদিগকে পুণ্যকর্মে প্রণোদিত ও পাপভূতান হইতে বিরত করে। কিন্তু আমাদের কতিপয় শিক্ষিত বন্ধু (আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি) একেবারে পরলোকে অবিশ্বাস করেন এবং আমাদের সকল আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ইহলোকেই আশ্রয় করিয়া রাখিতে চাহেন, অপর অধিকাংশের পরলোকে এত অল্প বিশ্বাস যে, শাস্ত্র-কথিত পুরস্কার ও শাস্তিতে দৃঢ় আস্থাবান কুসংস্কারপর দেশবাসিগণের জায় উহা গতাহুগতিকের জায় পুণ্যকর্মে প্রণোদিত করে না।

“নৈতিক ও বর্ধবিষয়ক সংস্কারের নেতৃগণ যাহা সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি হইতে অবিলম্বে বলিয়া নির্ধারণ করেন, জাতীয় উন্নতির সন্ধে এই প্রবন্ধ-রচয়িতা সেই সকল গভীর ও শাস্ত্র মতসম্মত গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইরাছি। রাজনীতিক সংস্কার যেরূপ ভাষ্যের জ্ঞান ও ভাষ্যের বিষয় রোগসমূহের একমাত্র যথোপযুক্ত, এইরূপ যন্ত্র বাহারা দেখিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জায় ভয়ানক মতিভ্রম বোধ হয় আর কাহারও ঘটে নাই এবং একজন শিক্ষিত হিন্দু কর্তৃক এই সকল সতীর্ণ ও প্রান্তিকজনক মস্তের আবিস্কৃতি এবং পোষকগণকে কিছু বাধীনভাবে এইরূপে যথোচিত নিশ্চিত হইতে দেখা কিছু আশ্চর্য্য ও আনন্দের বিষয়।

“আমরা গবর্ণমেণ্টের অবিচারের কথা বলি। আমরা আমাদের লিডন-হল স্ট্রীটের প্রভুগণের স্বার্থপর ও শুল্কপাতী নীতির কথা উত্থাপিত করি। আমরা দেশের রাজনীতিক হীনতার কথা বলি। কিন্তু নিম্নের জানিয়েন যে দেশের নবজীবন-প্রদানজনক মনঃ কার্য্য কেবলমাত্র রাজনীতিক উন্নতির দ্বারা ইচ্ছাকৃত হইতে পারে না। আমাদের দেশ বহুবিধ রোগে আক্রান্ত এবং

আমাদের রাজনীতিক অপেক্ষা নৈতিক রোগই অধিক । এতদ্বারা এমন বুঝিবেন না যে, রাজনীতিক সংস্কারে আমাদের সহায়কুতি নাই । বরঞ্চ ইহার বিপরীত । আমাদেরই বণিক্রাজ্যগণের—আমাদেরই যৌবসম্রাটগণের সজীব ও ত্রাস্তজনক নীতির প্রতিবাদ করিতে, বাণিজ্যে তাঁহাদের লবণ ও আকর্ষের আধিপত্য বন্ধ করিতে, তাঁহাদের শাসনবিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে আমি সক্ষমপক্ষ । উৎসুক । তাহা হইলে দেশবাসীগণ অবাধ-বাণিজ্যের মুক্ত লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহাদেরই আপ্য দায়িত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদসমূহ অধিকার করিতে পারেন । আমার বিশ্বাস যে, ভারতকে নবজীবন প্রদান করিতে হইলে, উন্নত করিতে হইলে তাহার প্রতি রাজনীতিক স্রবিকার করা অগ্রতম প্রদান উপায়—ভারতবর্ষ যে সকল রাজনীতিক ব্যবহার কই পাইতেছে, সে সকল হইতে তাহাকে মুক্ত করা, রাজনীতিক অনবিগম্য পথ তাঁহার সম্ভানগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া—শেষ সন্থের ৮৭ তম নিয়মে যে উদার মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা প্রবর্তিত করা—তাঁহাদিগকে দেশশাসন-কাৰ্য্যে নিযুক্ত করা, যেতৎপরের উচ্চ আসন দূর করিয়া এবং বর্ণনির্ধিমেণে কাৰ্য্য দেখিয়া পুত্রস্বার প্রদান পূর্বক অত্যাধিপত্য-জনিত চিহ্নিত এবং সাধারণ রাজকর্মের পার্থক্য দূর করা । আমি পুনশ্চ বলি, উচ্চ নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম ও নীতিবিষয়ক জ্ঞানসমূহের চর্চ্চা, কৃসংস্কার ও ক্রনীতির বিনাশ, দেশবাসীর মধ্যে ইহর সম্বন্ধে বিভূত্ব এবং উন্নত মতসমূহ বিস্তার এবং যে বর্ণের তিনি একাই আরাধ্য দেবতা, এই শিক্ষা দেয়, সেই বর্ণ দেশবাসীগণ কর্তৃক গ্রহণের উপায়-বিধান ব্যতীত দেশে নবজীবন প্রদান অসম্ভব । লোককে নীতি ও ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রদান করুন, লোক পুনর্জীবন লাভ করিবে । নীতি ও ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ও পুনর্জীবিত ভারত, আধ্যাত্মিক দাসত্ব হইতে বিমুক্ত ভারত, যে কৃসংস্কারে প্রতিমাঙ্গা এবং এক নিরাকার ইহরকে তেত্রিশ কোটি ভাগে বিভাগ করিতে প্রণোদিত করে, ত্রাস্তগণের সেই কৃসংস্কারের নিম্ন হইতে মুক্ত ভারত অপ্রতিহতভাবে এবং ক্রতগতিতে উন্নতির সোপানে উঠিবে এবং

৪ সত্যতা ও স্বাধীনতার গুণ এবং অধিকারে বিভূষিত হইবে ।”

ঐশ্বর্যবন্দ্য বোধ ।

ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস ।

চতুর্দশ অধ্যায় ।

(ফরাসী রাজের বিচার ও প্রাণদণ্ড)

ফরাসীরাজ সমিতিগৃহ হইতে টেম্পল-ভবনে প্রত্যাগত হইলে, প্যারিস মিউনিসিপালিটির কঠোরতানিষেধন পরিবারবর্গের সহিত ভাষার সর্বপ্রকার সম্ভাব এককালে অন্তরিত হইল। এই মর্মেদেী আত্মা শুনিয়া তিনি হারপর নাই ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—“পুত্রকেও কি একবার ঘেঁষিতে পাইব না ? অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে বৃথা নির্ধ্যাতনের কারণ কি ?” অনন্তর রাজি এক প্রহরকালে তিনি পুত্র-দর্শনের নিমিত্ত নিত্যস্থ ব্যাকুল হইয়া কর্তৃপক্ষ-গণের সমীপে আবেদন করিলেন। কিন্তু তৎসমুদয় দুর্বল ব্যক্তির কাভরোক্তি শ্রবণে ক্রোধানগণের পাদ্যন চিত্ত ত্রবীভূত হইবার নহে। স্বাধারা সংহার-মত্রে দীকী গ্রহণ পূর্বক রাজ্যের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বৃথা রক্তপাতে কলুষিত করিয়াছেন, ভাষারা সামান্ত কারাবাসীর আর্জনাতে ব্যথিত হইবেন, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। স্তত্রাং রাজার আবেদনে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। পরদিবস রাজা পুত্র দর্শনের অসম্ভবিত প্রান্ত হইবার নিমিত্ত জাতীয় সমিতি-সমীপে আবেদন করিলেন। সমিতি রূপাবিষ্ট হইয়া রাজপুত্র ও রাজকন্তাকে ফরাসীরাজ-সরিগানে গমনের নিমিত্ত অসম্ভবিত প্রদান করিলেন ; কিন্তু এইরূপ আদেশ করিলেন যে, বিচারকাণ্ড সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভাষারা রাজ্যের নিকট বাইতে পারিবেন না। রাজা এতদপ সর্ভে পুত্র কন্তা ঘেঁষিতে অস্বীকৃত হইলেন ; বলিলেন,—“আমার অপেক্ষা রাজ্যেরই পুত্র কন্তার অধিক প্রয়োজন”।

পরদিবস জাতীয় সমিতির জটনৈক কণ্ঠচরী রাজার নিকট আসিয়া বলিল,—“আপনার বিক্রম্বে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বিচার আগামী ২৬শে ডিসেম্বর সমিতি-গৃহে হইবে। আপনি ইচ্ছা করিলে আপনার লক্ষসমর্থনের নিমিত্ত গুণীল, ব্যাতিষ্টার প্রভৃতি ব্যবহারচীষণের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।” সমিতিঃ আদেশ অবগত হইয়া ফরাসীরাজ ট্রুকেট এবং টার্বের্ট নামক অপ্রসিদ্ধ ব্যাতিষ্টারদ্বয়কে স্বীয় লক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। ট্রুকেট বিচারকালে রাজপক্ষ সমর্থন করিতে স্বীকৃত

হইলেন ; কিন্তু টার্গেট বীকৃত হইলেন না । তখন রাজা যোগ সাটেজ নামক ব্যাপ্তিহীনের ও সীজ নামক উকীলকে ট্রাকেটের সাহায্যার্থে নিযুক্ত করিলেন । সেই দিবসই রাজার উইল অর্থাৎ চরম পত্র সম্পাদিত হইল । চরম পত্রের সাহায্যে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“পুত্রের প্রতি আমার এই অহরোধ যে, তিনি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন দিন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা হইলে যেন প্রকৃতিপুত্রের কল্যাণার্থে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হয় । তিনি যেন সর্বদা শ্রমণ রাখেন যে, ব্যবহার-শাস্ত্রোক্ত বিধি লঙ্ঘন পূর্বক রাজ্যশাসন করিলে জনসাধারণের সুখবৃদ্ধি-তার বৃদ্ধি হইতে পারে না । আমার দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত তাঁহার জন্মের যেন কোন ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা, ক্রোধ বা বিদ্বেষ স্থান প্রাপ্ত না হয় । কিন্তু ইহাও শ্রমণ রাখা কর্তব্য যে, রাজার রাজশক্তি অন্তর্হিত হইলে তিনি কোন প্রকার কল্যাণকর কার্য্যসূচানে সমর্থ হইবেন না । রাজার প্রতি কার্য্যেই বাধা-বিঘ্ন ঘটিলে তদ্বারা হিত না হইয়া বরং অহিতের উৎপত্তি হয় । ঐহাদের কার্য্য-পরম্পরায় এই বর্ত্তমান অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, আমি তাঁহাদিগকে কমা করিলাম । আমি ভগবানের বিচার-মন্দিরে গমন করিবার পূর্ব্বকণে তপস্বানকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি নির্দোষী ।”

অনন্তর (১৭১১ খৃঃ, ২৬শে ডিসেম্বর) রাজবিচারের নির্দ্ধারিত কাল সমাপ্ত হইলে, প্যারিস নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সমিতি-গৃহে সমবেশ হইল । সমিতিগৃহে গিরান্দিষ্ট সত্যগণ সত্যাপত্তি মহোদয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং জেকবিনগণ তাঁহার বাম পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিয়াছেন । বিচারের নির্দ্ধারিত কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে কারাবাসী ফরাসী-রাজ প্রহরবিধি হইয়া নগরাত্যাক্ষ সমভিব্যাহারে সমিতি-গৃহে আগমন পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন । অনন্তর ট্রাকেট প্রকৃতি ব্যবহাঙ্গজীব রাজপক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক করিলেন :—

“রাজার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ সমিতির বিচার্য্য নহে ; কারণ, প্রথম জাতীয় সমিতি “রাজদেহ পবিত্র” এই মর্মে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া-
ছেন । এইজন্য সেই ব্যবস্থার প্রতিফলিত হইয়া সমিতি কি প্রকারে বর্ত্তমান অভিযোগ প্রবণে প্রবৃত্ত হইবেন ? যদি রাজনীতিক মতদৈব নিবন্ধন রাজা সমিতি-সন্নিধানে দণ্ডার্থ হইবেন, তাহা হইলে সমিতির অতিশয় অচিরে বিলুপ্ত হইবে । কারণ, তদ্রূপ সভাবিতরতা প্রযুক্ত সমিতির কোন প্রবল

সম্প্রদায় অপর কোন দুর্বল সম্প্রদায়ের ধ্বংস-সাধনে সমর্থ হইবে । সুতরাং মতভেদ হেতু কোন ব্যক্তিই দণ্ডার্ত হইতে পারে না ।”

বাগ্‌দবর সীল বলিলেন :—

“ক বলিবে যে, ১০ই আগষ্ট তারিখে রাজত্বোদ্যমী ব্যক্তিগণ প্রাসাদ আক্রমণ করিলে সেই উচ্ছৃঙ্খলাচারিগণের পদানত হওয়া রাজার কর্তব্য ছিল ? যদি সংখ্যাগত উন্নত সম্প্রদায়ী আপনাদিগকে এই পবিত্র গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে, তাহা হইলে প্রাসাদ আক্রমণকালে রাজা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, আপনারা তত্ত্বিত কোন্ পন্থা অবলম্বন করেন ? রাজার প্রতি বল প্রযুক্ত হইলে, ব্যবহারশাস্ত্র-প্রণেতার্য্য তাঁহাকে আত্মরক্ষার অবিকার প্রদান করিয়াছেন । ব্যবহার-শাস্ত্রে এক্ষণ বিধান নাই যে, রাজার প্রতি বল প্রযুক্ত হইলে তাঁহাকে অবনতমস্তকে ঠাড়াইয়া থাকিতে হইবে ? কিন্তু তথাপি তিনি শোণিত-পাতের আশঙ্কা-প্রযুক্ত পাশব শক্তি প্রয়োগে অনিচ্ছুক হইয়া সমিতিগৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । তৎপরে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে রাজার কোন সংশয় ছিল না । তিনি তখন কেবল যুদ্ধ নিবারণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । সেই আদেশ নিবন্ধনই লুইস টেন্যাগণ সংরক্ষণ-কাণ্ডে পরিত্যক্ত করিয়া বিজ্রোহিগণের হস্তে পকড় প্রাপ্ত হইয়াছিল । সুতরাং ফরাসী জাতির শোণিতপাত করিয়াছেন বলিয়া রাজার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত তাহা যুক্তি ও ন্যায়বিরুদ্ধ ।

“বিশ্লিষ্ট বংশের বরংক্রমকালে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া লুই তৎকালেই ফরাসী জাতিকে পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রদান করিয়াছেন । রাজত্ব-কালের প্রারম্ভ হইতেই তিনি ন্যায়পথে বিচরণ করিয়া একুতিপুত্রের একত্ব বাক্যের ন্যায় কাব্য করিয়াছেন । ফরাসী জাতি অবৈধ রাজত্বের দ্বার হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, রাজ্য তাহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন । দাসত্ব প্রচার প্রতিকূলে দণ্ডনমান হইয়া ফরাসী জাতি তত্‌সমীপে আবেদন করিয়াছিল ; রাজা ফরাসী রাজ্য হইতে দাসত্ব প্রথা দূরীভূত করিয়াছেন । ফৌজদারী আইনের নিকটতর ব্যবস্থাবলীর সংশোধনের নিমিত্ত ফরাসী জাতি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল ; রাজা ফৌজদারী আইন সংশোধিত করিয়াছেন । প্রাচীন প্রথাহসারে শত সহস্র ব্যক্তি রাজনীতিক সঙ্গীনিব অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল ;

রাজা তাহাদিগকে সে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ফরাসী জাতি বাশী-নত্যা-
লাভের কামনা করিয়াছিল; রাজা তাহাদিগকে বাশী-নত্যা প্রদান করিয়া-
ছেন। ইচ্ছা একালের পূর্বেই তিনি ফরাসী জাতির ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।
অতঃ সেই ফরাসী জাতি তাহার প্রতি দত্তাজ্ঞা প্রচারের নিমিত্ত সমুৎসুক
হইয়াছে; আমি অধিক বসিতে ইচ্ছা করি না। আমি ইতিহাসের হস্তে
বিচারের তাব অর্পিত করিলাম। ইতিহাস আপনাদের কার্য্যকলাপ ভীত-
ভাবে সমালোচনা করিবে। ইতিহাস যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে, আবহ-
মান কাল যথং মানবজাতি সেই সিদ্ধান্ত অস্ত্রান্ত জানে শিরোবার্ধ্য
করিবে।”

মহাজুতব সৌক আগুন গ্রহণ করিলে ফরাসীরাজ অগ্নং দত্তায়মান হইয়া
বলিলেন :—

“আপনার অভিযোগের উত্তর যাহা প্রবণ করিলেন তন্নিম্ন আমার অন্য
কিছুই বক্তব্য নাই। সত্ত্ববতঃ আভ শেব দিবসে আপনাদের সমকে দত্তায়-
মান হইয়া একাংশ করিতেছি যে, মৎপকার উকীল ও ব্যারিষ্টার মহোদয়গণ
অভিযোগসম্বন্ধে বাহা বাগিয়াছেন, তাহা অগুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। পাপ-
কার্য্য নিবন্ধন আত্মরানি কদাপি আমার হৃদয়ে উপস্থিত হয় নাই। আমার
রাজকাব্য সমালোচনার আমার কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু আমি
ফরাসী জাতির অমঙ্গলের হেতু এবং তাহাদের শোণিতপাতের কারণ, ঈদৃশ
অভিযোগ প্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। একাগণের প্রতি আমার
অকৃত্রিম অহুত্যাগের প্রচুর উদ্যোগ প্রবত্ত হইয়াছে। সত্ত্ববতঃ আমার বিরুদ্ধে
যে একপ্রণ অভিযোগ হইবে, তাহা কদাপি কল্পনা করি নাই।”

রাজার বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে তিনি অপকীর উকীল ব্যারিষ্টারগণ সমষ্টি-
ব্যাহারে সমিতিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন সমিতিগৃহে রাজার
অপর্য্যাপ্ত এসঙ্গে নানাবিধ বাগ্যবতত্তা উপস্থিত হইল। গিরদ্বিষ্টপ্রবর
লজ্জর বলিলেন :—

“ঐহারা অভিযোগকারী, তাহারা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইবার অধিকারী
নহেন। ১০ই আগষ্ট তারিখে তাহারা একাশাভাবে রাজসিংহাসন উৎ-
পাটনকল্পে বহুমন্ত্র করিয়াছিলেন, অন্য তাহারা ই বিচারকের স্থান অধিকৃত
করিয়াছেন। সত্ত্ববতঃ তাহারা যে রাজার উত্তর প্রবণের অগ্রেই তাহার
অপর্য্যাপ্ত নির্দারণ করিবেন, তাহাকে বিশ্বাসের কারণ নাই।”

জেনৈক জেকবিন সভা লঙ্ঘনের অন্ত্যযোগ শুনিয়া বলিলেন :—

“সভাপ্রবর এই প্রকারেই সমিতি-গৃহে উপবেশন করিয়া ১০ই আগষ্ট তারিখের কার্যাবলীর প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। কিন্তু তিনি বিম্বিত হইয়াছেন যে, সেই কার্যাবলীর সমালোচনার প্ররক্ত হইতে হইলে বর্তমান সমিতির প্রতি দোষারোপ করিতে হয়। কারণ, সেই কার্যাবলী হইতেই বর্তমান সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। সভাপ্রবর অত্র প্রজাপীড়ক কৃপতির জীবন রক্ষার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেছেন; কল্যা সেই প্রজাপীড়কের হস্তে আপনাদিগকে সমর্পিত করিবেন। ইহাই ইঁহার বাসনা। অন্তর্য্য সভা যথোদয়ের সেই প্রজাপীড়কের সহিত একত্রে দেহভাগ করাই সুবাবস্থা।”

রাজা নির্দোষ নির্জীৱিত হইলে সমগ্র ফরাসী রাজ্য জেকবিন-বিষেবানলে ভস্মীভূত হইবে, এইরূপ আপত্তা করিয়া গিরপিন্ঠিগণ রাজার জীবন রক্ষার নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বিচারের ভার সমগ্র ফরাসী জাতির হস্তে সমর্পণের প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাবে উভয় দলে বোর বাগ্‌বিতস্তা উপস্থিত হইল। জেকবিন নেতা সেন্ট জাষ্ট বলিলেন :—

“পুত্র-পৌত্রাদিগণ এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি অন্ত্যকার কার্যকলাপের নিমিত্ত আপনাদের নিকট তিরস্কৃত্যভাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীও সর্ব-স্থানে হৃদয়বান্ পুরুষগণ আপনাদের নির্ভীকতা দর্শনে প্রীতিলাভ করিবেন। কুমণ্ডলের কোন্‌ জাতি ফরাসী জাতির স্তায় স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে? ফরাসী জাতির স্তায় কোন্‌ জাতি নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন রাজনীতিক প্রত্যাবার প্রত্যাহিত হইয়াছে? ফরাসী জাতির ন্যায় কোন্‌ জাতি প্রতিবিংশা-বৃত্তির চরিতাবতা সাধনে পরাযুগ? বহির্ভাগ দৃষ্টি করিলে রাজার কার্যকলাপ উৎকৃষ্ট বলিয়া অহমিত হয়। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? যথেষ্টের প্রতি কার্যোই তিনি ফরাসী জাতির সহিত সাংঘলিত হইয়াছেন। কিন্তু সে সন্নিগনের ভাংগব্য কি? জনসাধারণের প্রেম ও অহুয়গ হইতে বদনকে বকিত করিয়া সেই প্রেম ও অহুয়গ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি প্রজাপীড়ক, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক তিনি সস্ত্রদায় সমিতির আত্মন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে কেবল কুখ্যামিগদের গর্ভ বর্ধক করিবার জন্য। ৪ই জুলাই ও ১০ই অক্টোবর তাঃঃ তিনি প্রজাবলনের

নিমিত্ত প্রজ্ঞপ্তাবে শক্তিসকর করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন যে, জাতীয় শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবে রাজশক্তি অতীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন তিনি করাসী জাতির সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ধর্মগ্রাণের মার্য দণ্ডায়মান হইলেন । তদবধি বলপ্রয়োগে অসমর্থ হইয়া তিনি স্বদেশবৎসল বাক্তিগণের চিত্ত কলুষিত করিবার নিমিত্ত অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছেন । ১-ই আগষ্ট তারিখের পূর্বেই তিনি রাজত্ববনে সংখ্যা-ভীত মৈনাসংস্থাপন করিয়াছিলেন ; তৎপরে প্রশান্তভাবে প্রদর্শনের নিমিত্ত তিনি সমিতিগৃহে আগমন করেন । স্মৃতরাং জনসাধারণের হস্তে বিচারের ভার অর্পণের প্রয়োজন নাই । প্রজাপীড়ক জীবিত থাকিতে বিপ্লবের প্রকৃত কাৰ্য্যারম্ভ সম্ভবপর নহে । করাসী জাতি বহুকাল বাৎস তৎপ্রতি অকৃত্রিম অহুদ্রাগ প্রদর্শিত করিয়াছে ; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে চির-দাসত্ববন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য পক্ষা অহুদ্রাগ তির্যকিছুই করেন নাই । রাজা ন্যায়পরায়ণ হইলে প্রজাবর্ণ কখন বিপ্লবগণে সমন করে না ।”

সেই জাতি উপবেশন করিলে, জেকবিন-দলপতি বহুপিয়র বলিলেন ;—“জনসাধারণ যোরতর অভ্যাচারে প্রলোভিত হইয়া প্রজাপীড়ক ভূপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেই, সেই প্রজাপীড়কের অপরাধ নির্দোষ করা হইল । স্মৃতরাং সমিতি উপস্থিত অভিযোগ শ্রবণের নিমিত্ত যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার পূর্বেই রাজার অপরাধ নির্দোষিত হইয়াছে । আর কালবিলম্বের প্রয়োজন কি ? আপনারা রাজার উক্তি শ্রবণ করিয়াছেন । এইজন্য যত্ন অতিমত ব্যক্ত করিলেই হইল । রাজার অপরাধ-প্রসঙ্গে কি আপনারদের হৃদয়ে অসুখাত্ম সন্দেহের কারণ বিদ্যমান আছে ? সেজন্য সন্দেহ করিলে রাজকুলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের পবিত্র অধিকারের প্রতি সন্নিধান হইতে হয় । সেজন্য সন্দেহ করিলে, রাজার নির্দোষিতা অবধারণ পূর্বক করাসী জাতির প্রতি দোষারোপ করিতে হয় । সেজন্য সন্দেহ করিলে বর্তমান মহা বিপ্লবের প্রতি দোষারোপ করিতে হয় । জনসাধারণের হস্তে বিচারের ভার অর্পণের প্রস্তাব একটি চক্রান্ত মাত্র । জনসাধারণ কি অতিমত ব্যক্ত করিতে সক্ষম ? তাহাদের উদ্যম, অগাধসার ও সাহসের অভাব নাই সত্য ; কিন্তু তাহারা নৃশংসপ্রতি ব্যক্তিস্বপ্নের বুদ্ধিধারা চালিত । তাহারা প্রজাপীড়কের

অল্পে আঘাত করিতে সক্ষম হইলেও, প্রভাবকগণের পাক্ষ্যপ্রসঙ্গে মুক্ত। রাজ্যের অপরাধপ্রসঙ্গে ফরাসী জাতির হস্তে বিচারের ভার অর্পিত করিয়া অনিকাশে ব্যক্তির মত গ্রহণ নিম্নপ্রয়োজন। অরণ্যভীত কাল হইতে জগতে অল্পসংখ্যক ব্যক্তিকেই সন্তুণের অধিকারী হইয়া আসিয়াছে। স্ত্রতরাং ন্যায়-বিচারে বিয় প্রদান পূৰ্ণক ফরাসী জাতির মধ্যে আত্মকলহের বীজ বপন তিন্ন একপ প্রভাবের অন্য কোন উদ্দেশ্য হইতে পারে না।”

অনন্তর ফরাসী দেশের সৰ্ব্বপ্রধান বক্তা পিরদিত্ত নেতৃপ্রবর মহাপুতব ভাণ্ডারত মণ্ডারমান হইয়া বলিলেন;—“এদা ফরাসী জাতির প্রতিনিধি-বণ্ডীর সম্মুখে আমরা গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছি। লোকবিন সভ্য মহোদয় বলিয়াছেন যে, আত্মকলহের বীজবপন পূৰ্ণক আমরা ফরাসী জাতির সৰ্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছি। এই পবিত্র গৃহে সৰ্ব্বজনসম্মুখে প্রকাশ করিতেছি যে, একপ অভিযোগের কোন ভিত্তি নাই। পক্ষান্তরে বাঁহারা ছুরতিসিদ্ধি-পরিচালিত হইয়া তিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিক সম্প্রদায়কে প্রজা-পীড়নের সাহায্যকারী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; বাঁহারা অহর্নিশি অনতিক্ত ব্যক্তিগণকে তিন্ন মতাবলম্বী প্রতিনিধিবর্গের বক্ষঃস্থলে অত্রাণাত করিবার নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করিতেছেন; বাঁহারা অল্পসংখ্যক হইয়াও পানশব বক্তিত্তপ্রভাবে সমিতির বহুসংখ্যক সত্তোর স্বাধীনতার মূলে স্ত্রটারাঘাত করিয়াছেন, আমি বিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় কি? বাঁহারা সৰ্ব্বদা একান্তভাবে ইতর সাধারণকে সংহারমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছেন, বাঁহারা মানবজন্মরহস্যত দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সন্তুণরাশিকে রাজনীতিক বড়বস্ত্রের নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন; বাঁহারা ন্যায়-বিচারকে পত্তপ্রব বলিয়া তৎপ্রতি অনতিক্ত ব্যক্তিগণের ঘৃণা উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছেন,— আমি তাঁহাদিগকেই আত্মকলহের স্ত্রীকৃত কারণ বলিয়া মনে করি। অল্প ইতর সাধারণের উক্তি কোন ব্যক্তি না প্রবণ করিয়াছেন? তাহারা রাজাকেই সৰ্ব্বপ্রকারে অনর্ধের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। পত্ত মহার্ষ হইলে তাহার কারণ রাজা! অর্ধভাববশতঃ সৈন্যগণ বেতন না পাইলে, তাহার কারণ রাজা! রাজপথে দরিত্র ব্যক্তিগণের সংখ্যাধিকা স্ত্রুই হইলে তাহার কারণ রাজা! কে বলিতে পারে যে, তাঁহারা অন্য রাজার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপিত করিতে শিক্ষাদান করিতেছেন, রাজা-লোকান্তরিত হইলে, তাঁহারা সেই সমস্ত অভিযোগ সমিতির বিরুদ্ধে উত্থা-

পিত করিতে শিক্ষাদান করিবেন না ? কে বলিতে পারে যে, রাজার মৃত্যুর পর শত মহার্ষ হইলে তাঁহারা সমিতির প্রতি দোষারোপ করিবেন না ? ফরাসী যুদ্ধে ইংলণ্ড ও স্পেনবাসীগণের যোগদাননিবন্ধন যদি ফরাসীরা জ্যে মৃত্যুসংখ্যা বর্জিত হয়, কে বলিতে পারে, তাহা হইলে সে দোষ রাজার অভাবে সমিতির ক্ষেত্রে নিপতিত হইবে না ? আমার ঐ বিশ্বাস যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁহারা এতদূর করিবেন যে, রাজার যথেষ্টাচারের পরিবর্তে সমিতির যথেষ্টাচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্মরণ্য ১-ই আগষ্ট তারিখের ক্যার শুনরায় অত্রধারণ করিয়া জনৈক ব্যক্তিকে “একাকর্তার” পদে নিযুক্ত করা আবশ্যক । আর কোন্ ব্যক্তি সেই পদে নিযুক্ত হইবেন ? যিনি প্যারিস নগরের ব্যাভূক-সন্তানীর দলপতি । যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে দেশের চরিত্রের পরিণীমা থাকিবে না । তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি এই জনমানববিহীন শ্মশানপুরীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিবে ? তাহা হইলে ভ্রমজীবনগণ ভিক্ষুকের দশপ্রাপ্ত হইবে । তখন কোন্ ব্যক্তি তাহাদের চরিত্রাঘোচন করিতে সমর্থ হইবে ? কোন্ ব্যক্তি তাহাদের অনশনক্লিষ্ট পুত্র-কন্যার প্রতি রূপাদৃষ্টি করিবে ? তখন হা অর, হা অর হবে আশুনাথ করিলে সমাদিবক চইতে অস্থি-কঙ্কালরাপি উদ্ধৃত করিয়া উদরপূর্তি ওর উপায়ান্তর চুট হইবে না । তাই বলি, আপনারা একমত হইয়া বদেশকে আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন ।”

বহুক্ষণ বাবৎ উভয়পক্ষে এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল ; কিন্তু পরিশেষে গির-দিষ্টগণ লোকবিনদিগের দোষকষায়িত কটাকট্টে ভীত হইয়া সাধীন মত ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলেন না । স্মরণ্য ফরাসী জাতির হস্তে বিচারের তার অর্পণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া সমিতি ফরাসীরাঞ্জের অপরাধ নির্দ্ধারিত করিলেন ।

সমিতির বিচারে রাজা দোষী সাব্যস্ত হইলে তৎপ্রতি দত্ত নির্দ্ধারণ সমগ্র প্যারিসের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল । কিয়ৎকাল বাবৎ তৎপ্রসঙ্গে সমিতি-সূত্রে বাগ্‌বিতণ্ডা চলিল । রাজনীতিক সভাসমূহে লোকবিন বক্তৃগণ জলদ-

- সঙ্গীতরসে মৃত্যু-আজ্ঞা প্রচারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিল । মিউ-নিসিপালিটি, জাতীয় সৈন্যগণ এবং ইতর সাধারণ রাজার প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সমিতি-সকাশে আবেদন করিল । অত্রপার্শ্ব ইতর সাধারণ সমিতিসূত্রে পরি-বেষ্টিত করিয়া সত্যমতলীর জ্বরে আতঙ্ক উৎপাদিত করিল । গিরদিষ্টগণ

শান্তি রূপাণের অণ্ড যুক্তর নিকট পরাভূত হইয়া হুগুটে ফরাসীরাঙ্কে লেজবিন-কোপানলে নাক্ত করিলেন। অন্তর সভাপতি মহোদয় আবকাং সভ্যগণের অভিশ্রাব অবগত হইয়া রাজার প্রতি হুতু-আজ্ঞা প্রচার করিলেন।

হুতু-আজ্ঞা প্রচারিত হইবার পূর্বেই ফরাসীরাঙ্ক খার বিষাদময় পরিণাম উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রিয়বন্ধু ব্যারিয়ারএবর মেল সাক্ষেপ অত্যন্ত বহুগণসহ টেম্পল-ভবনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি দ্বিচ্ছাদা করিলেন,—“টেম্পল-ভবনের সন্নিহিতে আপনি কোন বেতবসনা প্রমত্তকে দেখিয়াছেন ?”

মেল সাক্ষেপ বলিলেন,—“আপনি কি বলিতেছেন ? আমি আপনার কথার অর্থ বুঝতে পারি নাই।”

রাজা বলিলেন,—“আমাদের যংশের কোন রাজার বা রাজপুত্রের হুতুকাল উপাধৃত হইলে এক বেতবসনা মাংলা রাজভবনের চত্বর্ধিকে ভ্রমণ করেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।” বহুবর্গকে সন্বেশন করিয়া তিনি বলিলেন,—“আমি সত্তরই ভগবানের জায়রাঙ্কে বাইতেছি। ভগ্নর আপনাদের সাহেত সঞ্চারিত হইব। ইহলোকে আপনাদের কণ্ঠ চির-অরুণ হইবে। পুত্র-কন্তাকে যে অবস্থার রাণিয়া ধাইতেছি, তাহা চিত্রা করিলে আমার ছন্দ বিদার্য হয়। উপাসনাধারা ক্ষদ্রে শক্ত সক্ষর তির তাহাঙ্গিরের সাহেত শেখ মুহুর্থে সাক্ষাৎ করা বড়ই কঠিন। আমার বিষয় ভূত্যাগণের কি উপায় হইবে ? সম্ভবতঃ তাহার শক্রগণের ক্রোধানলে ভষ্মভূত হইবে। ফরাসীরাঙ্ক আত্মকলহে ও উচ্ছ্বলতার আচরে উচ্ছর যাইবে। ভগবন্! এই কি আমার ত্যাগ-ধাকারের ফল ? এই জন্তই কি আমি করাদা জাতির কল্যাণের নিমিত্ত অহনিশ প্রয়াস পাইয়াছিলাম ?”

অন্তর ২-শে জাহুয়ারা (১৭২০) মিউনিসিপালিটির জটনক কর্ত্তারী রাজার নিকট আশ্রয় হুতু-আজ্ঞা প্রচার করল। রাজা অনুমাত্র বিচালিত না হইয়া অগ্রমকালে ভগবাক্তার নিমিত্ত সমিতি সযীপে ভন বিবসের অব্যাহতি প্রার্থনা করিলেন। ভক্তর পরিবারবর্গের সাহেত সাক্ষাৎ-লাভের অশ্রুতি প্রার্থনা করিয়া এবং দেহত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত জটনক ধর্ম্মবাক্যের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তিনি এক-খানি আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন। সমিতি রাজার প্রার্থনানুসারে

তাঁহাকে পরিবারবর্গের সহিত সাক্ষাতের অহুমতি প্রদান করিলেন। রাজার ধর্ম্মপ্রভাব চরিতার্থতা সাধনের নিমিত্ত জটনক ধর্ম্মপ্রচারক টেম্পল-ভবনে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু রাজার ভিন দিবসের অব্যাহতি প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া সমিতি পরদিবস বেলা ১০টার সময় তাঁহার দেহত্যাগের সময় নির্দ্ধারিত করিলেন।

অনন্তর রাত্রি ৮৪০টার সময় রাজা পুত্র-কন্যা ও রাজভগিনী সমভিব্যাহারে ফরাসীরাজকে অস্ত্রবিদ্যায় প্রদানের নিমিত্ত রাজ-প্রকোষ্ঠে আগমন করিলেন। সেই পবিত্র গভীর ভাব, সেই বিষাদ-ভিম্বিময় চিত্র, সেই দেবতা-হ্রদত দৃষ্ট—ধরাভালে তাহার উপমা নাই। রাজকুমার ও রাজকুমারী দুই হইতে পিতৃদেবের দেবমূর্ত্তি দর্শনে উদ্ভূত-হৃদয়ে উর্দ্ধ্বাশ্রয় ধাবমান হইয়া তাঁহাকে আশির্জন করিলেন। অনন্তর রাজা উপবিষ্ট হইলে তাঁহার বামে রাজা ও দক্ষিণে রাজকন্যা উপবিষ্টা হইলেন। রাজভগিনী রাজার সম্মুখে এবং রাজপুত্র তাঁহার জাহ্নবেশ আশ্রয় করিয়া উপবেশন করিলেন। বহুক্ষণ যাবৎ কাহারও মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল না। তাঁহারা নিশ্চিন্তভাবে চিত্তোপার্জনের ক্রম অবস্থিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে প্রশান্ততাব মটিকারস্তর পূর্ণাভাসমাত্র। উহা ক্ষণকাল পরেই অনন্ত বিষাদের প্রবল ঝটিকায় অন্তর্ভুক্ত হইল। তখন হাহাকার ত্রিপ্র আর কিছুই শ্রুত হইল না। তখন বিষাদসাগরের উত্তাল তরঙ্গরাশি ত্রিপ্র কিছুই বুট হইল না। কিয়ৎকাল পরে রাজা রূদয়ের আবেগ কিয়ৎ পরিমাণে নিবৃত্ত করিয়া পুত্র-কন্যাকে আশীর্বাদ করিলেন। রাজকুমারী তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে আশির্জন করিয়া দত্তারমান থাকিলেন। রাজা বৃহৎভাবে কন্যার হস্ত ধীরে ধীরে হইতে উদ্ধৃত করিয়া সবিধানে পরিবারবর্গের নিকট অগ্রিম বিদায় কামনা করিলেন। তখন হাহাকার চতুর্দশ বর্দ্ধিত হইল। রাজকুমারী মুচ্ছিতা হইয়া পিতৃচরণে পতিত হইলেন। রাজা কন্যাকে বহুদূর ভুলিয়া পুনর্বার প্রত্যেককে আশির্জন করিলেন। অবশেষে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে আর্জনা করিতে করিতে থ থ নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগত হইলেন।

পরিবারবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজা ধর্ম্মরাজপ্রবরের সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইয়া ভগবচ্ছিত্তার মনোনিবেশ করিলেন।

কিয়ৎকাল যাবৎ এইরূপে অতিবাহিত হইলে বিবস্ত্র কৃত্য জ্ঞাপি তাঁহার ভোজননের নিমিত্ত খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া দিল। ভোজনান্তে রাত্রি ১২টার সময় রাণা শয়ন করিলেন। পরদিবস প্রাত্যহ (২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩) যাত্রোত্তরান পূৰ্ব্বক তিনি ভূত্যের হস্তে একটি লক্সুরী, একটি বনামান্তিক্র মোহর ও পুত্র-কঙ্কার বেশ-সম্বলিত একটি লকেট দিয়া বলিলেন,—“লক্সুরী এবং লকেটটি রাজার হস্তে দিয়া বলিও যে, আমি মর্মান্তিক হৃৎস্পন্দে সহিত তাঁহাকে ভ্যাপ করিয়া ইহলোক হইতে চলিলাম। মোহরটি রাজ-কুমারের হস্তে দিও। সকলকেই বলিও যে, যাত্রাকালে কাহারও সহিত যাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না।”

বেলা ৯টার সময় সত্তার নামক মিউনিসিপালিটির কর্মচারী ফরাসী-রাজের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন,—“আপনি আমাকে অবহেলন করিতেছেন, অগ্ণকাল বিলম্ব করুন।” এই বলিয়া তিনি প্রকোষ্ঠ হইতে তৎসম্পাদিত উইলখানি আনিয়া সত্তারকে বলিলেন,—“আপনি এই চরমপত্রখানি রাজার হস্তে দিবেন।” সত্তার বলিল,—“মহাশয়, উহা আমার কাব্য নহে। আমি আপনাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইব; কেবল সেই ক্ষণ আসিয়াছি।” তখন রাণা উইলখানি অপর একজনের হস্তে দিয়া সত্তারকে বলিলেন,—“মহাশয়, চলুন।”

অনন্তর ফরাসীরাণ প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া মর্দ্যযাজকপ্রবুর সম্মতি-ব্যাহারে একখানি লকটে বধ্যভূমিান্তিমুখে যাত্রা করিলেন। পবিত্রমো তিনি পুনঃ পুনঃ টেম্পল-ভবনান্তিমুখে কাঁতার কটাকপাও করিতে লাগিলেন। সেই কারাগৃহে অল্প তাঁহার বধ্যসংকল্প রহিল। যাত্রাকালে কাহারও সহিত দেখা হইল না, এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু অন্য তাঁহার হৃৎস্পন্দে বাধিত হইবে, এতদপ ব্যক্তি ফরাসী দেশে কোথায়?

টুইলারি প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান এবং ইনিসা-ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে রাজার দেহভ্যাগের স্থান নির্ধারিত হইয়াছে। বধ্যভূমির চতুর্দিকে কতকগুলি কামান শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। অবাগোহী ও গদাভিকগণ বন্ধু ও সঙ্গীনের হস্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সজায়মান। বধ্যভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দশকমণ্ডলী উপবিষ্ট। মধ্যস্থলে সেই সর্বাঙ্গাকারী গিলটিন যন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে। পাশ্বে বাস্তবিকগণ স্তব্ধ স্তব্ধে বাস্ত করিতেছে। অন্য রাজহস্তা লোকবিনগণের মহোৎসব।

কিরংকাল পরে রাজশকট নির্ঝরিত স্থানে উপনীত হইল। রাজা শকট হইতে নামিলে, বাতকগণ রাজার হস্তবন্ধনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তদুত্তে রাজা বলিলেন,—“হস্তবন্ধন তির তোমাদের প্রতি অত্র যে কোন আদেশ থাকে, তাহা পালন করিতে পার, কিন্তু আমার হস্ত বন্ধন করিতে পারিবে না।” তখন বাতকগণ বলপ্রয়োগের নিমিত্ত পার্শ্বস্থ সৈনিকগণের সাহায্য প্রার্থনা করিল। তদুত্তে ধর্মযাজকপ্রবর বলিলেন,—“দ্রাণকর্তা যীশু হস্তবন্ধন-নিগ্রহ সঙ্ঘ করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহার পবিত্র দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন; তাহা হইলে অচিরে তিনি আপনাকে মুক্তিদান করিবেন।” রাজা বলিলেন,—“দ্রাণকর্তার পবিত্র দৃষ্টান্ত তির আমি কখনই হস্তবন্ধন-নিগ্রহ সঙ্ঘ করিতাম না।” এই বলিয়া তিনি বাতকগণকে কহিলেন,—“এখন তোমাদের ইচ্ছানুসরণ কার্য্য করিতে পার।” এই বলিয়া রাজা গিলটিন যন্ত্রের নিরুদ্বেশে পাপচারণ করিতে লাগিলেন। তখন ধর্মযাজক রাজাকে বলিলেন,—“সেই সূত্র পুত্র, বর্ধে আরোহণ কর।” তৎক্ষণাৎ করাসীরাজ গিলটিনের উপরিভাগে গমন করিয়া বাহ্যকরণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর সমবেত বান্ধিগণকে সঙ্ঘোষন করিয়া তিনি বলিলেন,—“অলৌক অভিব্যোগে অভিযুক্ত হইয়া আমি দেহত্যাগ করিতেছি। হত্যাকারিদিগের অপরাধ মার্জনা করিয়া আমি আত্মমকালে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার দেহনিঃসৃত কবিরধারায় যেন ফরাসী রাজ্যে কোন অনর্থ সংঘটিত না হয়। হতভাগ্য করাসী জাতি—”

রাজার বাক্য সমাপ্ত না হইতেই বাহ্যকারীরা সভারের আদেশে ছোর ছোলে বাধা আরম্ভ করিল। তখন তিনি বুঝা বাক্য ব্যার না করিয়া একাগ্র-চিত্তে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

পরক্ষণেই তিনি গিলটিন যন্ত্রে সমর্পিত হইলেন। নিমেষে দেহ হইতে বস্তক বিদ্রুট হইল। জনৈক পাষাণ সেই মুণ্ড সইয়া নানাবিধ কৌতুক করিতে লাগিল। বস্তকবিদ্রুত দেহ হইতে অনর্গল কবিরধারা প্রবাহিত হইল। সেই উত্তপ্ত রাকশোপাঙে ধর্মযাজকপ্রবরের সর্কাদ সিক্ত হইল। তিনি শবদেহপার্শ্বে হৃদিভনয়নে উপবিষ্ট হইয়া মুক্তিবাতা-সন্নিবানে পরলোকগত জুগতির পারলৌকিক বঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। (ক্রমঃ)

ঐশ্বরেয়নাথ বোথ

রাধারানী।

(২)

ডেপুটী বৃন্দাবন বাবু কত্না রাধারানীর বিবাহের জন্য বন্ধকরপ্তরে এক পুণ্ড্রা ছিন্ন করিয়াছিলেন। পাত্রেয় নাম অলকানন্দ। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকৃষিত এবং বনিপুত্র। তাহার রূপের অভাব ছিল না। বৃন্দাবন বাবু বিবাহের সম্বন্ধ এবং দিনকণ্ড ছিন্ন করিয়া অল্পকাল অন্তিমতের জন্য পিতাকে পত্র দিলেন; কিন্তু তাঁহার পিতা হরেরাম চক্রবর্তী নিত্যকাল সেকালের শোক, উত্তর দিলেন, “কখনই ওখানে বিবাহ হইতে পারে না।” কারণ, কত পুত্রবৎ বয়স। তাহাও বংশে পুণ্ড্রা চহিয়া আসিতেছে; আর আশা তিনি কেশবকুণ্ডের বয়ে নাতিনীকে সম্প্রদান করিবেন।—অসম্ভব। বৃদ্ধ হরেরাম পত্রে অনতিমত আনাড়িয়াই দ্বন্দ্ব হইলেন না, পরদিন একেবারে বৃন্দাবন বাবুর বাসায় হাজির। তথায় বাইরা তিনি বধূমাতাকে বয়সী বলিলেন, “মা! বংশমর্যাদাটা যুটাইও না। চক্রবর্তী-পোড়ার মেয়ের বিবাহ কেশবকুণ্ডের বয়ে!—হইলই বা সে পুণ্ড্রা।” বৃন্দাবন বাবুর বৃহন্নী স্বত্তরকে পিতার মত ভক্তি করিতেন, বড়রের মতের অল্পকালে বলিলেন, “তা বেশ, আপনি আর কোথাও রাধার বিবাহ দিন। পাত্রেয় চেয়ে ত আর মাথা শক্ত নহে?—আপনি থাকিতে কি আমরা বাদীমতাবে কোন কায করিতে পারি?” প্রান্তিতে কি কথাবার্তা হইয়াছিল জানা যায় নাই, কিন্তু পরদিন সকালে বৃন্দাবন বাবু কিছু বিরতভাবে হরেরামকে বলিলেন, পাত্রেটি পাওয়া গিয়েছিল ভাল, কিন্তু আপনার মন মত নাই, তখন আর তথায় কিরূপে বিবাহ দেওয়া চলে?” তাহার পর উচ্চবংশের কোন পুণ্ড্রার সহিত রাধারানীর বিবাহের ভাব লইয়া হরেরাম বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

দুই মাস পরে শিখলহাটীর ব্রাহ্মবাদ্য যুগোপাধ্যায়ের পুত্র জ্ঞানবোমকেশ যুগোপাধ্যায়ের সহিত রাধারানীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের সময়ে বৃন্দাবন বাবু বাড়ী আইসেন নাই। কেহ বলে তিনি ছুটি পায়ের নাই, কেহবা বলে পাত্রেটা তাঁহার আলো মনোমত হয় নাই,—পাত্রেয় বত গুণই থাকুক, সে মার্কি কোন সওদাগরী আকিমে মাত্র পঁচিশ টাকা বেতনে চাকরী

করে। বাহা হউক এ সবকে কথ্য উঠিলে একদিন হরোরাম বলিয়াছিলেন, “মাহিনা কম দেখিলে কি হয় ? ভায়ার উপরি-পাওনা ভাল রকমই আছে, সব শুদ্ধ করিলে শিক্ষানবিশ সবচেপ্তার চেয়ে তাহার উপায় কিছু কম নহে ; আর—বিশেষতঃ—হুলের মূণ্টা—বিক্রী ঠাকুরের সম্ভান।”

হরোরাম বাহাই বলুন বৃন্দাবন বাবুর ধারণা যে, বৃদ্ধ পিতার নিকটুজিতার মেয়েটা জলে পড়িল, এবং তাহার উদ্ধারের আর উপায় নাই। বৃন্দাবন বাবুর জামাই—বোমকেশ। একটা মগনা কেরানী ! কথটা ত বন্ধ-বাঁধবের নিকট বলা চলিবে না। পিতার উপর সামান্য অভিমানের এবং জামাতার উপর অবজ্ঞার অজ্ঞাত দৃষ্টি রাখিয়া বৃন্দাবন বাবু মূহুরে এখানে বোমকেশের পরিচয় প্রদানে যথাসম্ভব বিরত থাকিয়া হাদিদা-বেলিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এদিকে বোমকেশ নবোদয়ে সংসার-রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাত্র দিলে যত্নের উত্তর দেন না, হস্ত তাহা তাহার হস্তগত হয় না, নহেত কাণের বজ্রাটে তিনি পাত্র লিখিবার অবসর পানেন না ; অসম্ভব কি ? ভাবপি যত্নের যত্নই। ক্রমে অকস্মে “বড় বাবুর” কাণে উঠিল যে, বোমকেশের সহিত তাহার বালাবল্ল (এখন হাকিম) বৃন্দাবন বাবুর কস্তার বিবাহ হইয়াছে। ও বোমকেশ ত এখন ঘরের ছেলে। শ্রুতিই সেই অকস্মে চল্লিশ টাকার একটা পদ বালি হইল এবং বড়বাবুর “নোট” অমুদারে “মেধাবী” “কার্যদক্ষ” ইত্যাদি বিশেষিত বোমকেশ বিপ বাইনজনের ডিকাইরা সেই পদে বসিল !

তিন বৎসরের মধ্যে বোমকেশের বেতন সত্তর টাকা হইল। শুভ-গ্রহের দৃষ্টি পড়িলে আজুল ফুলিয়া কলাগাছ হয়—সুখা যায়। পরের ভাল দেখিয়া জামরা অক্লবিসর্জনের কারণ দেখাইতে না পারিলেও, সজ্ঞত বা অসজ্ঞত হউক—এ সবকে অনেকের অনেক কথা বলিবার ছিল, ও অনেকে অনেক কথা বলিত।

(২)

আর বুদ্ধির সহিত অত্যাবণ নিজের প্রসার বৃদ্ধি করিয়া লয়। অল্প-বেতনভোগী কর্মচারী বড় জোর “মেসের” বাবুর চালচলনে তেমন অত্যাব অমুত্তব করেন না ; কিন্তু বেতনের সহিত পদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধারণা জ্ঞান্তে পারে যে, “মেস” নানানিধ কষ্টের আকর।

এবং ভাষার থাকিয়া জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা যাত্র। স্তত্রাং ছোট বা বড়, মন্দ বা ভাল একটি বাণায় ছোটখাটো একটি সংসার পাতা-টমা বসিবার জন্য তাঁহার জন্ম হুটুহুটু করিয়া উঠে।—পকাশ টাকার মধ্যে উনপঞ্চাশ টাকা পৌনে-খোল আনা তিনি হাসিমুখে ব্যয় করিতে প্রস্তুত! এইপ্রকার মনের ভাব অল্প কাহারও না। হইলে আমাদের কিছু কতিয়ত্তি নাই, কিন্তু বোমবেশের অবস্থা যে এইরূপ পীড়াইয়াছিল, এ কথা আমরা হলপ লইয়া বলিতে পারি।

এককালে যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে, কিন্তু এখন বাতস্ত্রাস্থ্য করিয়া না চলিলে তার সম্মান থাকে না। “যেসে” থাকিতে হইলে কোন কোন সময়ে একজন অবতন কর্তব্যের হাসিতে না হাসিয়া পাকা যায় না, কেননা অধিকারের মত পাঞ্জীর্ণ। সহজলভ্য নহে। আবার যাহাকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা যায় এমন কেহ হয়ত কখন সম্মুখে হাঁকা ধরিয়া বসে।—কি গুণ্ডতা। “যেসের দাদ দাদী ও পাচক জ্ঞান কোন বিষয়ে একটু বিশেষর দেখাইতে গেলে অমনই আর পাচজন প্রথমে কাণাকানি, তারপর ‘হাঁ-চাঁ’ করিয়া উঠে। সত্তর টাকার একজন বাবু—বিশেষতঃ হাকিমের জামাই—কিছুপ সম্মান, কিছুপ বিশেষর পাইতে পারে, এই সাধারণ জ্ঞানটুকু যাহাদের মস্তিকে স্থান পায় নাই, তাহাদের সহিত একত্র বাস যে অরণ্যবাসেরই নামান্তর!

সাত পাঁচ ভাবিয়া বোমবেশ বস্ত্র বাসা করিল। বোমবেশের মাতা হাকিমদুহিতার সহিত বরকল্পা করিবার, অথবা হাকিমদৌহিত্র যে তাঁহারই পৌত্র এইভাবে অপ্রাপ্ত হইবার পাট্টা লইয়া এসংসারে আইসেন নাই, স্তত্রাং বোমবেশের বিশাখের কিছুদিন পরেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন। বোমবেশের মাতার সম্বন্ধে তাঁহার বৃত্তাসংবাদ ব্যতীত বেশী কথা বলিতে আমরা সাহস করি না; কেননা দারিদ্র্যাক্রান্তি, হিম্মতিবহার জীবনে লক্ষ, দুহু ছাড়া অল্প কোন কথা শুনিতে ভেমন ভাল লাগে না।

মাসিক সত্তর টাকা আয়ের বাবুর পক্ষে বেতন আয়োজন সম্ভব, বোমবেশ তাহার কিছুই ক্রীড়া রাখিল না। পাচক ছিন্ন হইল, কিনিয়ুক্ত হইল, এবং কার্যতৎপর অথচ অনববেতনে সম্বষ্ট একটা চাকর যে দুইদিন পরে লাগিবে, সে বিষয়ে অখুন্মাজ সম্বন্ধে মহিল না। বাকি

কেবল রাধাগ্রাণীকে বাসায় লইয়া আসা । রাধাগ্রাণীকে বাসায় পাঠাইতে হরেরামের কোন আপত্তি ছিল না । বিবাহসূত্রে রাধাগ্রাণীর উপর বোম্বকেশের প্রবেশ বহু অনিচ্ছাছিল সত্য, কিন্তু আদরের বেগে রাধাগ্রাণী কেরানীপতির হাতে পড়িয়া বাসায় না-জানি কি কষ্টই পাইবে, হরভ পাচিকারূপে তাহার সেবার অঙ্গে কালি পড়িয়া যাইবে, ইত্যাদি চিন্তার পর যখন বৃন্দাবনবাবু ভুলিলেন যে, বোম্বকেশ খাটি কেরানীর আদর্শে চলে না, তাহার বাসায় দাসদাসী আছে, পাচক আছে, এবং সে ভাল ব্যর, ভাল পরে, ভাল বিছানার শয়ন করে, উপরন্তু তাহার আর মন্দ নহে, এবং যেলামেশা ভাললোকের সঙ্গেই, তখন তিনি রাধাগ্রাণীকে বাসায় পাঠাইতে অসুস্থিচিন্তিতে সম্মতিদান করিলেন । তাহার পর এক সপ্তদিনের স্তব-মুহর্ত্তে—(বোধ হয় সেটা যথেষ্টকণ হইবে) রাধাগ্রাণী বোম্বকেশের বাসায় আসিল ।

(৩)

সুখাতায়া হাকিমজ্জহিতা রাধাগ্রাণীর চরিত্র আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা অনেক রমণীর আদর্শে গঠিত হইলে হরভ শরের গতি অল্প দিকে কিরিত । কিন্তু বৃদ্ধ হরেরাম তাহার মেহের মাতিমীর জ্বরে ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিলেন । সারসংছার পর হরেরাম আলা জনিতে বসিলে রাধাগ্রাণী গল্প শুনিতে আসিত ; তখন সাবিত্রী সত্যবান ও নল সমরভী প্রভৃতির উপাখ্যান আরম্ভ হইত । সেকালের একটা বৃদ্ধের বর্ণিত সেই সকল পৌরাণিক কাহিনী কি তাবসম্পদে কি বর্ণনাভঙ্গিতে বালিকার হৃদয়ে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিত কোন সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর তুলিকাসম্পাতে সে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিয়া উঠে না । দাদা মহাশয়ের বানী “পতি পরমগুরু”—রাধাগ্রাণীর জ্বরের পরতে পরতে একটা রূপ পাইয়াছিল ।

বনিকস্তার বনজটী-বিধানের জন্য বোম্বকেশের সীমাবদ্ধ আর বাহা কিছু আয়োজন করিতে পারিয়াছিল, সে সকল রাধাগ্রাণীর পক্ষে অতিরিক্ত বোণ হইল । বেশবিলাস যে অভ্যাবস্তক এ ধারণা বোম্বকেশের ঘতই বহুদূর থাকুক না কেন রাধাগ্রাণী বলিত, “এত বেশী খরচের কি দরকার ?” তাহার পর একদিন সে বিরক্তির সুরে বলিল, “পাচকভ্রামণ কেন ? চাকরেরই বা এমন কি কাজ ? বাসায় একটা ভি থাকিলেই যথেষ্ট ।” বোম্বকেশ বলিল, “তা

ঘটে, কিন্তু একটা চাকর বা ঠাকুর না রাখিলে তোমার বাবা কি মনে কারবেন ?” রাধারাণী উত্তর দিল, “তিনি কি মনে করিবেন তাহা তুমি জান, আর তিনিই জানেন। কোন অজ্ঞার কাজ করিতে গেলে অজ্ঞের মতামতের উপর নির্ভর করা বাইতে পারে ; কিন্তু বাহা ভাল তাহার অত্র আবার পয়ের মুখেই দিকে তাকান কেন ?” ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, “বাবা হলেন ‘পর’, আর আর আমিই এত নিম্নের, কেমন ?” রাধারাণী হালিল, “তা জানি না।”

পরদিন বেলা পেল—রাধারাণীর অর।—পাচকত্নাশ্রম ও স্ত্রত্যকে মিষ্ট-বচনে বিদায় দেওয়া হইল।

এইবার ব্যোমকেশের কথা।

সরীর ভাঙিলে যেমন একটা রোগ অত্র রোগকে ডাকিয়া আনে, একের পর অত্র উপসর্গ জুটে, তেমনই অতিরিক্ত আশ্রমধ্যস্থাবোধরূপ ব্যাধি ব্যোমকেশকে শীঘ্রই অবনতির পথে নামাইয়া দিল। সমস্ত্রেশীর বাবুদের সাহিত্য ব্যোমকেশের মিলামিশ্য কমিয়া উঠিল। উচ্চশ্রেণীর বাবু অর্থাৎ কালে বা অকালে জলের মত অর্থ ব্যয় করিয়াও ঐধাকে অভাবের আবাদ গ্রহণ করিতে হয় না, তাহার কথা সত্য। সামাজিক হিসাবে নিকট শ্রেণীর বাবু অর্থাৎ ঐধার মাসিক আর “তথৈবচ”, সে রকমের লোককে প্রায়ই দ্বিধা-হারা হইতে দেখা যায় না, কেননা দ্বিধারাশ্রিত অভাবের সাহিত লড়াই করিয়া আনিজ্ঞাস্থেও তাহাকে পিণাসা দমন করিয়া চলিতে হয়। আর সমস্ত্রেশীর বাবুর কথা ? ই’হারা দারিদ্র্যসংবাসকে নরকবাসের তুল্যই মনে করেন, এবং লক্ষ প্রবান পুরুষ একেবারে উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অন্নদিনের মধ্যেই নিম্নের শাক্ত হারাইয়া পড়ার আশঙ্কায় সহ-কারে যে স্থানে গিয়া পড়েন, তাহা নিকটশ্রেণীর বহু পশ্চাতে। অন্যের কথা বাহাই হউক ব্যোমকেশের অবস্থা এইরূপ ঐড়াইল।

সেটা বোধ হয় স্মৃতকাল হইবে। ষষ্ঠাৎ ব্যোমকেশের বাসার বলয়ের আবিভাব হইল। পাড়ার সকলে জ্বিলি ব্যোমকেশের বাসার কে গাহিতেছে—“তরী বীরে বীরে বীর সমীরে চলে হেলেহলে !” সঙ্গে সঙ্গে হার-খোঁদনের শব্দ উঠিল।

পরদিন—মধ্যাহ্নান্তিতে গোলমাল শুনিয়া পাড়ার দুই চারিজন লোক ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, তত রাত্রিতেও ব্যোমকেশের বাসার বাবুদের পুরা-

হয়ে মজলিস চলিতেছে, হারমোনিয়মের বাজের পাশে দুইটা বঁধের বোতল ।

তিন চারি মাস ঐ ভাবেই গিয়াছে । পাড়ার লোকের নিত্যম যথেষ্ট ব্যাঘাত জ্বলিলেও, বাবুদের শাস্তিতে বিন্দুমাত্র বিরক্তিব্যঙ্গনশব্দেবের লাব্য কাহারও ছিল না । অবস্থা বিপর্য্যয়ে তক্তিস্বচক ‘সোলাম কৃত্তিতে’ যাহারা অভাব, উচিত বা অসুচিত কোন কথাই যে ভাষাভের মুখে সাজে না ।

(৪)

স্বামীর কোন কার্যে বাধ্যগ্রনান করিবার ক্ষমতা গ্রীষ্ম না থাকুক, তথাপি মোহাছ স্বামীকে আলোক দেখাইয়া স্পর্শে আনয়নের চেষ্টায় কঠোর অবস্থেলা হয় না, কেননা স্বামী দেবতা হইলেও মানুষ, এবং মানুষ ভ্রমের অধীন । ব্যোমকেশের অধঃপতন দেখিয়া রাধারানী চাঞ্চল্য ও যত্নবত্ব, কিন্তু সে কি করিবে ? সে কতদিন ব্যোমকেশের পায়ে ধরিয়া কত কাতর অশ্রুস্রব সহকারে বলিয়াছে, “ওগো ! শরীরটা মাটা ক’র না ।” কিন্তু ব্যোমকেশ তাহার কথা শুনিবে কেন ? প্রথমতঃ সে ত্রৈলোক্য হইতে সন্নত নহে ; দ্বিতীয়তঃ সে বোপার্জিত অর্থ ব্যয় করিতেছে, ভাষাতে অন্যের কি ? তৃতীয়তঃ সে মদ খায়, তা সেটা এমন মন্দ কাজই বা কি ? তবে একটা কথা ‘লোকনিম্মা’, কিন্তু সকল বিষয়ে লোকমতের উপর নির্ভর করিয়া কয়টা লোক চলিতে পারে ?—কে বলিতে পারে যে নিম্নুক ভ্রান্ত নহে ? স্তত্রাৎ রাধারানীর কাতর নিবেদন কিরূপ কঠোর ভাষায় উপেক্ষিত হইত তাহার প্রকাশ না করিলেও চলে । এক্ষেত্রে রাধারানীকে পিতৃমরণে পাঠাইতে পারিলে অথবা সখ্যাঙ্কনীহতে ব্যোমকেশের সম্মুখীন হইতে দেখিলে আশ্রয় নিশ্চিন্ত হইতাম । কিন্তু যাহার কপালে কষ্ট আছে, সে যে স্রব পায়ে ঠেলিয়া দেয় ।

রাধারানী অনাহারে অনিদ্ৰায় বেবতাকে ডাকিত—“প্রভু, এ দাসীকে আর কষ্ট দিও না ।”

ব্যোমকেশের স্মৃতি দিন দিন বাড়িয়া উঠিলেও, স্বাক্ষর চিন্তিতার রাধারানীর শরীর ভাঙিতে লাগিল । কে জানিত এত শীঘ্র পিতামাতার স্নেহের এবং পিতামহের আদরের রাধারানীর আশ্রয় এই ঘণা হইবে ? ক্ষণে বল নাই, মেহে লাগণ নাই, নয়নে জ্যোতিঃ নাই,—রূক্ষ কেশ, মলিন বসন ও জীর্ণ দেহ লইয়া এ কে ?—একি সেই রাধারানী ?

রাধারাণীর অন্তরের সংবাদ পাইয়া হরেন্দ্র তাকে লইয়া আসিবার অত্র লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু রাধারাণী বলিয়াছিল, “এমন অন্তর কিছু না, এখন যাব না ।”

সে দিন রাধারাণী—ছুটির দিন । বেলা বাত্রটা হইতে মজলিস বসিয়াছে । রাত্রি আর একটা, তখনও বোমকেশ বন্ধুগণের সহিত আবেদ উপভোগ করিতেছিল । হটাৎ কি ডাকিল, “বাবু ! এদিকে একবার আসুন । মা’র বড় অন্তর তিনি কেমন করিতেছেন !” বন্ধুগণকে বিদায় দিয়া টলিতে টলিতে বোমকেশ ষির সহিত রাধারাণীর ঘরে প্রবেষ্ট হইয়া দেখিল, রাধারাণী মুক্ত করে দানকণ্ঠে কি বলিতেছে । পরদিন পুণে রাধারাণী সহিত বোমকেশের একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । সে দিন রাধারাণী তাহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল, “ছিঃ ! দিনরাত এমন করে মদ খেয়ে কাটান কি ভাল ?” বোমকেশ বিশেষ বিরক্তির সহিত উত্তর দিয়াছিল “আঃ ! জ্বালাতন করলে দেখছি, আর কথা শুনে চলেতে হবে, আমি এমনি কাণ্ডকার ?” তাহার পর এই কয়দিন রাধারাণীর সহিত বোমকেশের কোন কথা হয় নাই ।

বোমকেশ একবার অতিবিকটে ডাকিল, “রাধারাণী !” তারপর শব্দ আর পড়িয়া অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল । রাধারাণীর কাতর অন্তরের কথা শুনিবার অবস্থা তখন তাহার ছিল না ।

পরদিন সকালে নিজাভক্তের পর শয্যা বসিয়া বোমকেশ বলিল, “মাই, ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি ।” রাধারাণী ধীরে ধীরে বলিল, “না, একটু বস, আর একটু—তোমার সেবা করতে পেলাম না, আমি বড় অভাগী—”

এই সময়ে কি বোমকেশের হাতে একখানি কাগজ দিল । তাহাকে বাহা লিখা ছিল তাহার অনুবাদ—

অফিস—ডগলাস এন্ড কোম্পানি
কলিকাতা ।

হুজুম নং—৩৫*, তারিখ ১২ই জানুয়ারী, ১৯১০ ।

ইত্যাদি দুইবার সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও বাবু বোমকেশ হুজা

তিনদিন অফিলে আইসেন নাই ; এবং ছুটির ক্ষত কোন দরখাস্ত দাখিল করেন নাই, অতএব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করা গেল ।

(বাক্সর) আর ডগলাস

ম্যানোজিং এজেন্ট ।

অবগতির ক্ষত হকুমের একখণ্ড মকল বাবু বোমকেশ মুখার্জির নিকট পাঠান যায় ।

বি, ডস,

হেড ক্লার্ক ।

১৩।১।১০

পাঠ লাক হইলে বোমকেশ কাগজখানি শত বণ্ড করিয়া রাধারাণীর উদ্দেশে বলিল, “যেও না, যেওনা রাধারাণি ! এ অত্যাগাকে ছেড়ে যেও না ।”

কিন্তু রাধারাণী তখন কোথায় ? তাহার দেহ অসাড়, পলকহীন, চক্ষু-প্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্তার যত জলিতেছে !

ত্রিকালোপদ বন্দোপাধ্যায় ।

রূপ ও গুণ ।

রূপ—সেত মোহ সখা, আলোরার আলো ।

অগ্নিকের তরে চ’খে লাগে বড় ভালো ॥

রূপের আধারে যদি নাহি থাকে গুণ—

সকলি অসার ভবে, সকলি নিতৰ্ণ ॥

একাধারে রূপগুণ খুঁজিতে খুঁজিতে ।

আজিকে এসেছি আমি তোমারে পূজিতে ॥

রূপ গুণে শোভায় হে দেব আমার—

চরণে শরণ আজি নিলাম তোমার ॥

শ্রীঅনিলচন্দ্র দত্ত ।

ব্যাধি ও তাহার প্রতিষেধ ।

(৩)

প্লেগ বা মহামারী ।

কিছুদিন হইতে আসামের হিমাতল ভারতের প্রধান প্রধান সহরে প্লেগ রোগের অসহ্য গ্রস্তি পড়িয়াছে । বলবিক্রমে এই ব্যাধি ওলাউটা অপেক্ষা কোন অংশে ছীন নহে । অনেক মনে করেন, প্লেগ এতদ্দেশে :নবায়িত কিন্তু সে ধারণা অযুক্তক । এই রোগ হিন্দুস্থানে পূর্বপরিচিত । সেখানে লোক ইহাকে মহামারী বলিত । পুরাতন লেখকগণ বলেন, মিশরের কাইরো-নগরই ইহার আদি স্থান । এই অনবহণ অবস্থায়কর সহরে ইহা উৎপন্ন হইয়া ক্রমে জনঘ্যাপী হইয়া পড়ে । কাইরো নগরের রাজপথগুলি তখন অত্যন্ত অপ্রশস্ত ছিল ; তবাকার অধিবাসিগণও নিত্যন্ত মলিনভাবে বসতি করিত । নাইল নদীর একটি শাখা এই সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় । বৎসরের কোন কোন সময়ে এই শাখানদীটি প্রায় জলশূন্য হইয়া থাকিত । তখন নাগরিকগণ গ্রাম্যজগল ও গো মেথাদির মৃতদেহ ইহার গর্ভে নিক্ষেপ করিতে ইতস্ততঃ করিত না । এই প্রকৃষ্ট আবর্জনারাশির পুতিগন্ধে দিচ্ছন্তল আয়োদিত করিলে সহরে প্লেগ আদিয়া দেখা দিত । কিন্তু নাইলের জনগৃহের সঙ্গে সঙ্গে শাখা নদীটি আবার বরষোত্তা হইলেই এই সাংঘাতিক ব্যাধি অন্তত হইত । যে সকল বিগলিত জীবের দেহোৎপন্ন ভৃগন্ধ প্লেগ-রোগকে আহ্বান করে বলিয়া প্রাচীন মিশরবাসিদের মনে ধারণা ছিল, সেই সকল জীবের মৎস শুদ্ধ করিবার জন্য দেশের লোক সমবেত হইয়া নতুনি জাতীর এক প্রকার পক্ষীর অগ্ৰাধনা করিত ।

খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই রোগে এবেল নগরে এত লোকের হইয়াছিল যে মহামাংসভুক্ লৃগাল কুহ্মরেও শবদেহ স্পর্শ করে নাই । চতুর্দশ শতাব্দীতে মহামারী যুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশগুলিকে বিশেষভাবে বিধ্বস্ত করে । ইহার আক্রমণে এক যুরোপের ২,৫০,০০,০০০ লক্ষান বিনষ্ট হয় । ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এই বিষম ব্যাধি যখন উগ্র নৃষ্টিতে ইংলণ্ডে প্রবেশ করে, তখন লন্ডন সহরের অধিবাসী সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ ইহাতে মৃত্যুবধে পতিত হইয়াছিল । প্রাচীন কাল হইতে হিমাত্রিপ্রদেশের অনেক স্থানে প্লেগ গমনাগমন করিতেছে । জাহাজীর বাসনাহের রাজত্বকালে,

১৬১১ হইতে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কান্দীর, আত্রা প্রভৃতি ভাগভের প্রধান প্রধান স্থানে মহামারীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া গিয়াছে। তৎকালে নগর-বাসিন্দগণ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া গৃহপ্রস্থ পরিত্যাগ পূর্বক প্রান্তরে পলায়ন্য নিৰ্ধাণ করিয়া বসতি করিয়াছিল। ইহার উৎপাতে স্বয়ং দিল্লীর আত্রা হইতে বাহাদুরাবাদ সহরে পলায়ন করেন; কিন্তু ঐ স্থানও নিরাপদ ছিল না! সম্রাট যখন দেখিলেন ভীহার পক্ষে এই নবানুষ্ঠাচিত স্থানও নির্জিন্দ নহে, তখন তিনি অনন্তোপায় হইয়া এই দেশকে “দেয়ারি স্থান” অর্থাৎ রোগ-নিবাস বলিয়া সোধন করিয়াছিলেন। এক সময়ে লাহোরে ইহার আক্রমণে এত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল যে, শব-দেহের পুতিগন্ধে অবশিষ্ট লোক ঘরের বাহির হইতে পারে নাই। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে বারতানপুরে ইহার একটু মৃষ্টি কণা মনে পড়িলে অস্তাবদি লোকের ক্ষুৎক্ষ উপস্থিত হয়। ইহার আগমনে সম্রাট লাহোর লাহের সেনা-নিবাস দেখিতে দেখিতে শব-নিবাসে পরিণত হইয়া পড়ে। এক দিকে শিবির প্রবী এবং অপর দিকে অসংখ্য সমাধিস্থপ, এই লোমহর্ষণ দৃষ্ট দেখিয়া যত্নে মাত্রই ভীত, চকিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ে তিন কোশ দূরে একটি শব-দেহ স্থানান্তরিত করিতে প্রতি বাহককে ছুড়ি টাক। পর্য্যন্ত পারিশ্রমিক দিতেও লোক কাতর হয় নাই। ১৮১২ হইতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্লেগ মহাদেবে বিঘ্ন উৎপাত করে। তৎকালে বাহাতে এই রোগ দেশান্তরে পরিবাস্ত না হয়, সে পক্ষে যত্নের ক্রটি হয় নাই। কিন্তু ফুটিল বাদি সকল চেষ্টা যত্নকে উপেক্ষা করিয়া সর্গর্ষে পার্শ্বগর্তী স্থানসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বালানোর সহরে ইহার ভাণ্ড লীলা ভদ্রেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮২৬ চইতে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন বৎসরে ইহা ব্যাধি সমগ্র ভারতে ষোট ৪,৩০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু তন্মধ্যে ৩,৭৬,০০০ জন কেবল বোম্বাই প্রদেশবাসী। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন প্লেগ রোগ কলিকাতা মহানগরীতে নব প্রবেশ করে তখন ঐ জন-কোলাহল মুগ্ধিত স্থানের কি দুর্দশা হইয়াছিল তাহা কে না বিদিত আছেন? এই ব্যাধি-লক্ষ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে বাদশাহ নিজ অমূল্য জীবন বক্ষার আগ্রহবশত স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু বোম্বাই ও কলিকাতা—এই ধনজন-সৌন্দর্য্য চইতি—যখন প্লেগের ধৌদ্রাক্ষে প্রকলিত, তখন কর্তব্যপন্থায় লব্ধ ভাণ্ডার ও মহামতি শাহ্ জন উচ্চবর্ণ প্রভৃতি প্রাথমিক পালন-

কর্তৃগণ নখর জীবনের যাব্য মনস্তা পরিহার করিয়া নির্ভীক ভাবে রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন এবং রোগ দূর করিবার বিহিত ব্যবস্থা ও নাগরিকগণকে অলেশ শাস্ত্রনা প্রদান করিতে ক্রটি করেন নাই। এই স্থানেই ইংরাজের সহস্র।

এই ব্যাদির নিদান নির্ণয়ের অল্প অনেক কাল হইতেই নানা চেষ্টা হইতেছিল। কিন্তু সে সকল চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন এই দুরন্ত ব্যাদি হংকং নগর আক্রমণ করে, তখন জাপানী বৈজ্ঞানিক কিটামাটো প্রমুখ কয়েক জন পণ্ডিত অনেক গবেষণাধারা স্থির করিলেন যে, এক প্রকার জীবাণুই এই রোগের জননিত্য। এই জীবাণুর নাম "ব্যাসিলাস পেস্টিস" (*Bacillus Pastis*)।

শ্লেগ জীবাণু ক্রিপে এক স্থান হইতে অল্প স্থানে সঞ্চালিত হয় তদ্বিষয়ে চিকিৎসকগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। কেহ কেহ বলিতেন, মূষিকই ইহার বাহন। অপর সমুদায় এই মতের পরিপন্থী। তাঁহাদের মতে গণপতি-বারনের সঞ্চিত এই রোগের সঞ্চয় আছে বটে কিন্তু মূষিক কর্তৃক ইহা অল্প স্থানে নীত হয় না। শ্লেগ জীবাণু ভূগর্ভে বাস করে। মূষিককুল সর্বপ্রথমে ইহার ষাণ্ডা আক্রান্ত হইয়া দলে দলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মূষিক-দেহে এক প্রকার রক্তপায়ী ক্ষুদ্রমক্ষিকা (*Rat flea*) বসতি করে। শ্লেগজাত মূষিকের রক্তপান করিয়া এই মক্ষিকাগণ যখন ব্যাদিপ্রসূ হয়, তখন তাহারা যে মন্থনকে সংশ্লিষ্ট করে তাহার শ্লেগ রোগ হইয়া থাকে। এইরূপে মূষিকদেহবাসী ক্ষুদ্র মক্ষিকা বিশেষে ষাণ্ডা শ্লেগজীবী মানব দেহে অগ্রব্রিষ্ট হয়। শ্বেষাক্ত মতই অধুনা পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পুনা সহরে শ্লেগের প্রাদুর্ভাবকালে এই বিষয়ের উত্তম প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। যে কয়েকটি গৃহে শ্লেগ প্রথম প্রবেশ করে সেগুলি শীঘ্রই জনশূন্য হইয়া পড়িল। ঐ সকল গৃহবাসী মূষিকগণও ইতঃপূর্বে পক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও শ্লেগের পরিব্যাপ্তি নষ্ট হয় নাই। তখন চিকিৎসকগণ কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন মূষিক দেহবাসী ক্ষুদ্র মক্ষিকা সকল শ্লেগদুস্ত স্থানে উড়িয়া বেড়াইতেছে! অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের ক্ষুদ্রদেহাভ্যন্তরে অসংখ্য শ্লেগজীবাণু পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কালের লোকসভাও মূষিকের সহিত এই মহামারীর সঞ্চয়

আছে বলিয়া বিশ্বাস করিত। এক সময়ে ইহুদিদিগের “ইখরের দিল্লুক” নামক পূজা বস্তু পালেণ্টিনের লোকরা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই পালেণ্টিনে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। তখন ধর্ম্মবাজকও মন্ত্রজগণ দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন ; “ইহুদিদিগের পূজাবস্তু কিগ্রাইয়া দাও এবং পালের আয়ত্তির বস্ত্রণ ঐ সঙ্গে তাহাদিগকে পক্ষ বর্ণ মূষিক ও পক্ষ হিরণ্যর অর্কুদ প্রদান কর ।” (I Samuel vi)

প্লেগজীবাণু বেহাভাস্তরে পাঁচ ছয় দিবস শুশ্রূষা দ্বারা থাকিয়া রোগ আনয়ন করে। ডাক্তার ইয়ারসিন্ বলেন যে, কোন উপায়ে এই ভীষণ জীবাণু দেহপ্রবিষ্ট হইলেই মৃত্যুর আর নিস্তার নাই। বস্ত্রাদি সংযোগে অথবা খুলিকণার সহিত এই জীবাণু স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। পণ্ডিত কিতাসাটো পরীক্ষাধারা দ্বির করিয়াছেন যে, প্রথম রৌদ্রে কার্বলিক লোষণে এবং চুণের জলে এই জীবাণু ক্ষণকাল মধ্যেই পক্ষর প্রাপ্ত হয়। লক্ষণ ভেদে এই রোগ চারি ভাগে বিভক্ত ; যথা বিউবোনিক্ (Bubonic type), নিউমোনিক্ (Pneumonic type), সেপ্টিসিমিক্ (Septicaemic type), ও ইণ্টেস্টাইনাল (intestinal type) ।

এই রোগে মৃত্যুর হার সতকরা ৯০ অশেষও অধিক। নিউমোনিক্ প্লেগ অত্যন্ত সংক্রমক। রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস ও রেগার সহিত এই রোগ জীবাণু বহির্গত হয় ; সুতরাং এই সকল রোগীর পরিচর্যাশ্রিতগণের বিশেষ সতর্কতাকা উচিত। রণকেশরী নেপোলিয়ান যখন বিরাট বাহিনী লইয়া সিরিয়া প্রবেশে অভিযান করেন তখন তাঁহার সেনাদলের মধ্যে অনেকে নিউমোনিক্ প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল। নির্ভীকরূপে বোনাপার্ট ঐ সমস্ত পীড়িত সৈন্যকে স্বয়ং দেখিতে বাইতেন ; কিন্তু তিনি সকলকে এই উপদেশ দিতেন যে, অমত দূরে থাকিয়া রোগীর সহিত বাক্যালাপ করিবে যেন তাহার পরিতাপ্ত প্রশ্বাস বা রেগা কোন প্রকারে তোমাদের মুখ স্পর্শ করিতে না পারে।

কলরু তোজন, বাতালোকহীন আব্রি ও জনাকীর্ণ স্থানে বাস অপরিষ্কৃত বেশভূষা, দুর্ব্বন্ধ ভোগ শ্রীতসেবা প্রভৃতি রোগের সৌণ কারণ। পণ্ডিতগণ বলেন—It is a disease of filth, a disease of dirt and a disease of poverty."

যে রূপে একদিন এই রোগের আকর ছিল, আজ তাহার প্লেগের

প্রবেশাবিকার নাই বলিলেই হয়। বর্তমান কালে বিজ্ঞানানুযায়িত স্বাস্থ্যোন্নতিকর পৰ্যাবলম্বেন যুরোপের জনপদগুলি রচিত হইয়াছে। ভূরক্ষ ও কৃষিয়ার কোন কোন নগর এখনও পূৰ্ণবৎ অস্বাস্থ্যকর আছে। এই জন্ত ঐ সকল স্থানে প্লেগের গভায়াত আশি ও বহু হয় নাই। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে লন্ডন নগরে এক ভীষণ অর্য্যপাত হইয়াছিল। তৎকালে ১৩০০০ সহস্র গৃহ ও ৮০টি ভজনালয় একেবারে ভস্মরূপে পরিণত হয়। এই চূর্ণটনার পর স্বাস্থ্য বিধি মতে ঐ নগর নবনিৰ্ম্মিত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের পর বৎসর হইতে আশ পৰ্য্যন্ত এই উন্নত সহরে কখনও প্লেগ হইতে স্তন্য যায় নাই। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান নগরগুলি স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিবৃৎজনের মনোজ্ঞ নহে। নাগরিকগণও স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ উদাসীন। নিবিড় লোকারণ্য কলিকাতার মধ্যে বড়বাজার প্রভৃতি কতিপয় পল্লী সম্পূর্ণরূপে যত্নবাহ্যসের অযোগ্য। গৃহস্থের বাড়ীগুলি এক ঘন সন্নিবিষ্ট যে, তন্মধ্যে বাতালোক প্রবেশের উপায় নাই। এক একটা অপ্রশস্ত পথে কখন সূর্য্যাকিরণ পতিত হয় না; তাহার চিত্রদিনই অস্বাভাব্য রহিয়াছে। জনগণন বোম্বাই সহরেও এইরূপ গলিগৰ বিরল নহে। তথায় কোন কোন বাড়ীতে আবার সংস্রাধিক লোক একত্র বসতি করে। কান্দি, এলাহাবাদ, কাণপুর, আম্র, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি ভারতীয় সহরের মধ্যে নিবাস নিশ্চয় স্থানের অপ্রাচুর্য্য নাই। পশ্চিম দেশীয় ভ্রমণলোকদিগের অনেক বাড়ী এমতভাবে প্রস্তুত যে, একটিমাত্র দ্বার ভিন্ন গৃহভ্যন্তরে বায়ু প্রবিষ্ট হইবার বিতীর্ণ পন্থা দেখা যায় না। ইহার উপরে নগরের কলকারখানাগুলি আবার যুগো-দগারণ করিয়া অবিরত বায়ু দূষিত করিতেছে; সুতরাং প্লেগ বলিয়া কেন, এই সকল দোষবহুল সহরে সকল রোগই অজাতবাস করিতে পারে।

প্লেগ সংক্রামক ব্যাধি; কিন্তু তাহা বলিয়া রোগীকে স্পর্শ করিলেই প্লেগ হয় না। সাধারণতঃ ইন্দুর মক্ষিকার (Rat Flea) দংশন দ্বারা এই রোগ-বিষ মানবদেহে প্রবিষ্ট হয়। তবে শরীরে কোনপ্রকার ক্ষত থাকিলে প্লেগরোগীর গৃহে না যাওয়াই সমীচীন। বাড়ীর কাহার প্লেগ হইলে রোগীকে তৎক্ষণাতঃ এক পৃথক ঘরে রাখা উচিত। ভ্রমণকারিগণ হস্ত ও পরিধের বসনাদি উত্তমরূপে পরিশোধক জলে দৌত করিয়া অগ্নিপানাদি গ্রহণ করিবেন। সংক্রামক রোগীর পরিচর্য্যাকারী যে সকল সাধা-

রূপ নিয়ম পালন করিতে বাধ্য, ইহাতেও সেই সকল নিয়ম অবশ্য প্রাতি-
পাল্য। নিউমোনিঙ্ প্রোগ্রাক্স রোগীর সংস্পর্শ যত কম থাকে, ততই
মঙ্গল। এই রোগীর পরিভ্রান্ত প্রমাদ বা রেয়া যুগে লাগিলে প্রোগ্র
অপত্ত্ব নহে। অবস্থার সুসাইলে বাড়ীর সুস্থজনগণকে স্থানান্তরে পাঠা-
নই সুব্যবস্থা। রোগীর কক্ষে ঘাঘাতে যথেষ্ট পরিমাণে বাতালোক প্রবেশ
করে, তবিশয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। প্রোগ্রাক্স ব্যক্তির কক্ষ, কাম,
মুত্রপুরীষাদি যে স্থানে নিকিষ্ট হয়, তৎস্থান অবিলম্বে ফেনাইল অথবা কার্ব-
লিক লোষণ দ্বারা দৌত করিবেন। কলেরা, টাইফয়েড্ রোগীর বস্ত্রাদির
ভার প্রোগ্র রোগীর সমল শয্যাবসনাদি অবিলম্বে দক্ষ করা কর্তব্য। ঘরে
মথো মথো গন্ধক, অগুরু, লোহান প্রভৃতি পুড়াইলে ভাল হয়। গৃহ-
ভ্যন্তরস্থ বায়ুতে যে সকল রোগজীবাণু ভাসমান থাকে, এতদ্বারা সেগুলি
বিনষ্ট হইতে পারে। রোগীর গৃহে অধিক লোক থাকা নিষিদ্ধ; কিন্তু এই
সুনিয়ম আমাদের সমাজের নিকট সঙ্গীত অনাদৃত। এদেশে কাহারও
রকান পীড়া হইলে রোগীর স্বজন বান্ধব হইতে প্রতিবাসী গ্রামবাসী
পৰ্য্যন্ত সকলেই দিবানিশি তাহাকে দেখিতে আগিয়া থাকেন। এই সময়ে
কুটুম্ব কুটুম্বীগণের বহুভরদে রোগা-নিবাস মুগ্ধরিত হইয়া উঠে। লোক
লোচনে ইহা আপাততঃ মধুময় হইলেও জ্ঞান দৃষ্টিতে ইহা বিষকূপ। গৃহ-
জনতা আপো ব্যাবিভজনমনোরঞ্জন নহে। বহুবর্গের উপযুক্তপার প্রস্রবণে
জর্জরিত হইয়া রোগী বিনিম্ননয়নে কাল কাটাতে বাধ্য হয়; বিত্যাগতঃ
ইহার দ্বারা স্থানীয় বায়ু অধিকতর দূষিত হইয়া পড়ে। অব্যাহত বিগ্রামই
রোগাণনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা ভালবাসার বাতিরে এই সঙ্গ-
বাদিসম্মত হিতোপদেশ প্রোচ্ছ করিয়া রোগীর রোগগ্রস্তির বেতুত্ব হইয়া
থাকি। কোন কোন মায়্যাবিনী রমণী সজ্ঞান রোগীর সম্মুখেই আবার অক্ষ
বিশর্জন করেন। ইহাতে রোগীর মনে মরণ-ভ্রাস উপস্থিত হইয়া দ্রুত
দৌর্ভাগ্যরূপ যে অভিনব ব্যাবি আনয়ন করে, তাহা স্বশ্রোবণির অসাধ্য।
“বিবাদোরোগবর্জকান্যে”—ইহাই চারুকীর নীতি। রোগ বর্জক নিধান
সমূহের মধ্যে বিষদেই (Depression) প্রক্টতম। অনেক সময়ে সমাগত
জনসম্ম বাদ্য নানাদিক্ ঘেণে রোগ-ব্যাপ্তির পথ অগম হয়। দেশবাসীর
জ্ঞান চক্ষুরোষিত হইলে এই মন্দপ্রকার সহজেই তিরোধান হইতে পারে।
প্রোগ্র রোগীর শব্দেহ দাহ করাই প্রমত্ত; যেহেতু কবর দিলে রোগবিজ্ঞা-

গ্রেস সত্তাপনা থাকে । যে গৃহে এই রোগী বাস করে তাহা পরিশোধক
জলে দৌত করতঃ চূণকাম করিয়া ব্যবহার করিবেন ; কাঁচাঘর হইলে
অগ্নিদাহে সকল আপদ দূর হয় । প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তি নিরাময় হইলেও মাসা-
ধিককাল তাহাকে স্নানক্ষেত্রে আসিতে দেওয়া অসুচিত ; পরিচর্যাকারিগণকেও
৭ দিন পূর্বক বাস করাইলে দেশের স্বেচ্ছা হইতে পারে ।

পল্লীর কোন বাড়ীতে প্লেগ হইলে তথায় গতয়াত করা অসুচিত ;
অধিকন্তু সম্ভব হইলে স্থানভ্যাগই প্রশস্ত । এই সময়ে বাহ্যপ্রকার
নিয়মগুলি প্রতিপালন করা অত্যাৱশ্যক । বাড়পানীয়েব বিতৃষ্ণতার প্রতি
সর্বদাই বর দৃষ্টি রাখিবেন । ভোজ্য সামগ্রীতে মক্ষিকা বসিলে অথবা
দীড়িত মুষিকের মল সংযুক্ত থাকিলে ভোজ্যের প্লেগ হওয়া আশঙ্ক্য নহে ।
প্লেগজুই স্থান হইতে আনীত প্রব্যাদি কখনই ব্যবহার করিবেন না । ইন্দুর-
মক্ষিকাগণ (Rat-flea) ঐ সকল সামগ্রীসম্ভারের সহিত স্থানান্তরে নীত
হয় । শয্যাবসনাদি প্রত্যহ রোজতত্ত্ব করা ভাল । দৃঢ় ও জল স্নান
মা করিয়া কড়াচ পান করা উচিত নহে । রোগের প্রারম্ভাবকালে আত্ম-
স্বত্বিকার শয়ন ও ময়ূরপদে বিচরণ উত্তমই সম্পূর্ণ অসিদ্ধকর । প্লেগ-জীবাণু
পৰলয় হইয়ামানবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে ; স্তত্রাং মোক্ষা ও জুতা
পরিহিত হইয়া ভ্রমণ করিলে অনেক সময় প্রাক্তন ব্যাধির আক্রমণ হইতে
মিত্তি লাভ করা যায় । এই রোগ নিরন্তরবাসী অপরিষ্কার লোকদিগের
মধ্যে অধিক হইয়া থাকে । অতএব অবস্থার কুলাইলে বিতল অথবা জিতলে
বাস করাই সমস্ত । বাড়ীর প্রত্যেক ঘর বাহাতে খটখটে ও বাতালোকপূর্ণ
থাকে তদ্বিষয়ে গৃহস্থ মনোযোগী হইবেন । রবিকরসম্পৃষ্ট অবাধ-বাত-
স্ফার গৃহে প্লেগের অনুদেহী জাবগণ অত্যন্তকালও থাকিতে পারে না ।
শান্তাফুড়, পাইবানা ও পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি দুর্গন্ধবর স্থলসকল প্রত্যহ
দুইবার কেনাইলদ্বারা ধৌত করিবেন । মোট কথা, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন
থাকিলে প্লেগ সহজে আক্রমণ করিতে পারে না । “Cleanliness is
health”—এই নীতিকথা সর্বদাই মনে রাখা উচিত । বাসগৃহে বাহাতে
মুষিককুল আশ্রয় না পায় তদ্বিষয়ে সদা সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে । শস্ত-
ভাণ্ডার, চাউলের গুদায়প্রভৃতি যে সকল নিবৃত্ত স্থানে মুষিকদল বাস করে,
তথায় এই রোগের প্রারম্ভাব অধিক । ইন্দুর পতাহুঃ হইলে তদেববাসী
কুত্র মক্ষিকাগণ আশ্রয় অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে এবং

যে গৃহে নৃষিকের বাস আছে তথায় গিয়া উপস্থিত হয়। বাড়ীতে বৃত্ত ইন্দুর দেখিলে সর্বাঙ্গে তরুণি ক্রিষ্ণং কেরোসিন তৈল ঢালিয়া দিয়া একটি কাঠের চিম্টা দ্বারা উহাকে উঠাইবেন এবং দূরে এক স্থানে ত্যাগাচ্ছানিত করিয়া ঐ চিম্টা সহ উহাকে দত্ত করিয়া ফেলিবেন। এই সকল যে স্থানে বৃত্তদেহ পতিত ছিল, সে স্থানও ফেনাইল দ্বারা ধৌত করিতে হুণিবেন না। নৃষিকগণ নিবালোককে গছের হইতে বাহির হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে গছের পাইলে নৃষিকে হইবে, ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। এমনত ক্ষেত্রে বস্তুটি আশ্রয়ভাগ করাই উচিত। এবিধ দ্রুতিত গৃহ, ঔষধ-জলে বিশোধিত ও চূর্ণকাম করিয়া জনশ্রুত অবস্থায় কিছুকাল উষ্ণত রাখিলে পুনর্বারোপযোগী হইতে পারে। এই সকল অর্ধগর্ভ শাস্ত্রাংশাসন শুনিয়া কেহ কেহ ঔদাস্যবাজন সহ্যত আত্মে বলিয়া থাকেন, “অদৃষ্টে থাকিলেই রোগ হইবে; ভাটার জল এত পরিভ্রম করিবার আবশ্যক কি?” ইহাদের মতে যত্নব্যমাত্রই ভাগ্যবান; শ্রুতরাং সেই অলঙ্ঘনীয় ভাগ্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া বৃথা হস্তপদাদিচালনে ক্লান্ত হওয়া অপেক্ষা প্রায় সংক্রামক রোগে দ্রুততলে ঘাইলেও নিশ্চেষ্ট অবস্থায় সন্মুখ-কলিতা-কিরীটিনী গড়গড়ার দেখা করাই বিধি। এই সকল জ্ঞানগর্ভিত পুরুষসিংহের মনোনির্ভার দূর করিতে পারি আমরা এমনত নক্তি নাই। তবে ধূলিমলপরিপ্লুত বাতালোকময় স্বর্গভূলা স্থানের অধিবাসী অপরিচ্ছন্ন বেতালদিগের বাহ্যের সহিত আবর্জনা-রাশিপরিপূর্ণ হৃৎকমর নরকনির্মিত স্থানের অধিবাসী অপরিচ্ছন্ন কৃষ্ণাঙ্গদিগের বাহ্যের তুলনা করিয়া দেখিলে অদৃষ্টবানীর মনের আঁধার ঘুচিতে পারে।

জনপদধ্বংসকারী বহুতরী প্রেণেরাঙ্গসের কবল জুইতে যত্নবানগিকে ব্রহ্ম করিবার জন্ত জগতের প্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ বহুনিধ চেষ্টা করিতেছেন। কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈল দানিলে এই রোগাক্রমণের ভয় থাকে না। আবার কেহ কেহ ইয়েনিয়া নামক তৃক বিশেষের বীজ দক্ষিণহস্তে ধারণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। আনুবেদিনির্মানগণ প্রেণের প্রাচুর্য্যকালে এই বীজ বাহমূলে ধারণ করিত। কিন্তু তাহা বলিয়া ঐ সকল কব্জর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা বাইতে পারে না। ‘এসিয়াটিক কোয়ার্টারী রিভিউ’ নামক পত্রে ডাক্তার দাম্পেল লক্ষ্যকে এই রোগের প্রতিষেধক বহিরা বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম-

দেশবাসীর মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিম্নোক্তজনের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন, প্রত্যাহ নিম্নপত্র খাটলে প্লেগ হয় না। লবণ ও নিম্নপত্র উভয়ই জীবাণুনাশক, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। আমাদের পরীচেষ্টা যে সকল উপায়ান আছে লবণ তদ্ব্যতীত অত্রত্য। লবণভাব হইলে রক্ত নিষ্কটাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং দেহ রোগপ্রবণ হইয়া পড়ে। পরীক্ষাধারা দ্বিতীকৃত হইয়াছে যে, ওলাউটা রোগেও লবণ সুফলপ্রসূ। গেলিগ স্ট্রীট চিকিৎসালয়ে কেবলমাত্র লবণমিশ্রিত ওলাউটা রোগীর চিকিৎসা করাতে ঐ রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ১৪ হইতে দেখা গিয়াছিল। উপরোক্ত নিত্যাবহাৰী সামগ্রী দুইটির গুণাবলী পরীক্ষা করিলে উভয়দিককে প্লেগের প্রতিবেদক বলিয়া বিশ্বাস হয়। সন্দেহই হইয়া করিলে এই অনুপায় তৎক্ষণাতঃ পক্ষি পরীক্ষা করিতে পারেন। কিছুদিন হইল প্লেগ-নিবারক এক প্রকার “টীকা” আবিষ্কৃত হইয়াছে। যদিও এই টীকার শক্তি মানবদেহে অধিক দিন স্থায়ী হয় না, তথাপি ইহাধারা রোগের প্রাদুর্ভাবকালে অনায়াসে আশ্রয় করা করিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের জনসাধারণ প্লেগের টীকা গ্রহণ করিতে ভীত হইয়া থাকেন; কিন্তু ইহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। যে সকল ব্যক্তি প্লেগহুই হানে ব্যক্তি করেন অথবা প্লেগরোগীর শুশ্রূষা করেন তাঁহারা অবিচলিত চিত্তে এই টীকা গ্রহণ করিবেন। প্রথমতঃ মাংসের কাণ্ডে প্লেগজীবাণু নিষ্কৃত করিয়া প্রক্রিয়াধারা উভয়দিককে নির্জীব করা হয়। পরে ঐ মৃত জীবাণু লবণিত কাণ্ড লইয়া টীকা দেওয়া হইয়া থাকে। এই টীকার রোগনিবারক শক্তি বহুপরীক্ষাধারা প্রমাণিত হইয়াছে। ১৮৯৭ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যেরূপ ব্যানারমান টীকার ফলাফল দেখিয়া নন্দবা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উপরুক্ত সময়ে ইহা গ্রহণ করিলে রোগাক্রমণের ভয় ও মৃত্যুসঙ্কটনা অপকৃত অনেক কম থাকে। আশা করি, বহুদূরী ভাষ্যের ব্যানারমানের দ্বারা বিশ্বাস করিয়া সকলেই এই নির্দোষ টীকার প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইবেন।

শ্রীমুরেশ্বনাথ তট্টাচার্য।

সংগ্রহ ।

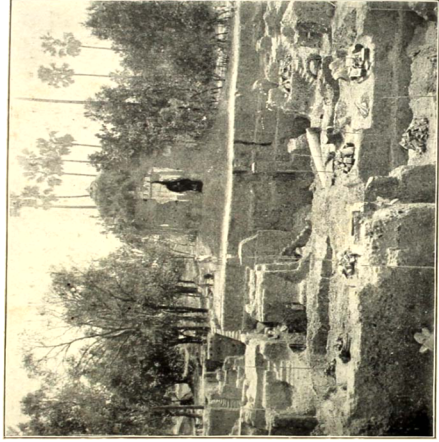
—:—:

বিবিধ ।

—:—:

করমান পূর্বে আমরা পাটলীপুত্রের (বর্তমান পাটনা) নিকটে আলোকের
 আলোদীপনের আবিষ্কারের বিবরণ দিরাছিলাম । এখন যতই অনুসন্ধান হইতেছে, ততই
 নিস্বকর হর্দ্যাবেশে আবিস্কৃত হইতেছে । এই আবিষ্কারে ভারতীয় অজ্ঞতাবের একটি
 অজ্ঞাত অধ্যায় ইতিহাসের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে । মোঘা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা
 বিপুলখীরা বুদ্ধিবীর চেষ্টাওত্রের সমগ্র হইতেই পাটলীপুত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করে । বৃষ্টপূর্ব ২০০
 অব্দে বাবিলনে আলেকজান্ডারের দোহস্ত হয় । তাহার পরেই তাঁহার বিনাশ, কিন্তু বিপুলখল
 রাজ্যে বচিবিলত হইয়া যায় । এই সুযোগে রাজ্যবিজয় করিয়া চন্দ্রগুপ্ত কবে যে রাজ্য
 হস্তগত করেন তাহা পূর্বে বজোপসাগর হইতে পশ্চিমে আরবসাগর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে
 হিমালয় হইতে পশ্চিমে উচ্ছিন্নী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । আলেকজান্ডারের রাজ্যের এক
 অংশ সেলিউকসের করতলগত হয় । সেলিউকস চন্দ্রগুপ্তের সহিত ঐতিবন্ধনে বদ্ধ হইলেও
 তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্র একজন দূত প্রেরণ করেন । এই দূত মেঘাবিহসই সুযোগ
 ভারতের আশাশী ইতিহাসের অবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । তিনি পাটলীপুত্র-
 সম্বন্ধে অতি বিস্তৃত বিবরণই নিশ্চিন্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু তাঁহার মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়
 না । আরিয়ান, কতিবান, স্ট্রাবো, জাস্টিন, অগিয়াস, ইত্যো ও সিনি—এই সকল লোক
 সেই গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ আপনাদের রচনায় উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, সেই সকলই
 কর্তব্যমানে আশাভের সম্বল । সে সকল হটতে পাটলীপুত্রের সমুদ্রগিরির পাওয়া যায় ।
 তখন পাটলীপুত্র বৃহৎ নগর ছিল—আশাভেই চারি লক্ষ লোক বাস করিত । চক্ষিণ নদের
 তীরবর্ত্তের পর অশোক নোকাভিহিত হইলে তাঁহার পুত্র বিম্বসার বা অবিজ্ঞাতা দিল্লী-
 রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন । তদীয় পুত্র অশোক বৃষ্টপূর্ব ২০০ অব্দে রাজ্য লাভ করেন এবং
 প্রচলিত বঙ্গের রাজ্য করেন । বিম্বসার দক্ষিণাভে, রাজ্য বিজয় করিয়াছিলেন, অশোক
 মহানদী ও গোদাবরী নদীতটস্থবাসভী কলিক রাজ্য বিজয় করেন । এই দুই লক্ষ বেক
 সিহত ও এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক বন্দী হয় । বেগোলিয়ন-বিজয়ী বীর ডিউক যে
 অরলিউন দাকি বলিয়াছিলেন—অর কেবল পরাজয় অপেক্ষা কম ভীষণ । কলিকবিজয়
 অশোকেরও তাহাই বনে হয় । তিনি আগুনগে কাতর হইয়া বৌদ্ধ মতে আত্ম হইলেন
 তিনি জীব যাজেরই কল্যাণকামনারে সে সকল অগ্রগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত করেন তাঁহার বিনাশিণি
 সমুদ্রে তাহার পরিচয় হইয়াছে । তিনি জীবযাজেরই চিকিৎসারও সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন,
 বাস কাটিয়া জুঝিতে লগা দিব্যর উপায় করিয়াছিলেন, প্রাণবিভাগের ব্যবস্থাত করিয়াছিলেন ।
 বৃষ্টপূর্ব ২০২ অব্দে অশোকের মৃত্যু হয় । তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই মোঘা সাম্রাজ্যের অব-

आर्यावर्त



নতির ব্যৱহৃত। আজ সেই সাম্রাজ্য কেবল ইতিহাসের গৃহায় অস্ত্র-কল বর্ণে বিদ্যমান। অব্যবহৃত হুণ্ডাবশেষ সেই সাম্রাজ্যের সবুজির নিদর্শন। সম্প্রতি ভাঙার স্মৃতির এই অস্থলজ্ঞানের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

সংগতি পাটনার উপকণ্ঠে যে বৃহৎ হুণ্ডাবশেষ অব্যবহৃত হইয়াছে তাহা মৌর্য-সাম্রাজ্যের সময়ের অর্থাৎ হইপুর্ন তৃতীয় শতাব্দীর। হুণ্ডার কথা হাতিয়া দিলে ভাঙার মার্শাল কর্তৃক সাক্ষীতে অব্যবহৃত হৈতাসক ব্যতীত এতদ্র এটীক পূর্ণকথা।

হুণ্ডা ভাঙতে আর অব্যবহৃত হয় নাই। এই স্থানে অস্থলজ্ঞান-কলে ভাঙার ওয়াতেল যে সকল ভাঙাবশেষ আঁত হইল, তাহাতে তিনি যেন করেন, এই স্থানে হিউয়েনসাং-বর্ণিত অশোকের নীলীরত ছিল। কিন্তু এবার অস্থলজ্ঞানে সহজেই বুঝা গেল, যে সকল যশন অন্তরবৎ পাওয়া গেল সে সকল একটি তত্ত্বের অংশ হইতে পারে না। ক্রমে অস্থলজ্ঞানকলে বুঝা গেল, এই স্থানে একটি হুণ্ড ছিল। তখন যখন ও পর্বাংশকণ চলিতে লাগিল। সামান্যানে যখন করিয়া এ পর্বাংশ আটটি তত্ত্বজ্ঞেয় অব্যবহৃত হইয়াছে। এতি সারিতে যশনটি তত্ত্ব—পরস্পর ১০ ফিট ব্যবধানে অব্যবহৃত। কিন্তু গুহটি আরও বিস্তৃততম ছিল।

এই গুহের অব্যবহারে অন্তরবৎ একটি অটিল রহত তেন হইবার সম্ভাবনা। বর্তমানে যে অস্থলজ্ঞান চলিতেছে, তাহাতে বিক্ষিপ্ত ও বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত করিয়া আদ্য হাত ব্যতীত সমগ্র গুহের নির্মাণ-এগালী বুঝিতে পারিব, মৌর্য ভারতীয় ভাণ্ড। ভারতের ভাণ্ড। চিত্রে লিখিত হইবে। তখন ভারতীয় ভাণ্ডের সবচেঁ ছিন্ন দিচ্চা উৎপন্ন হওয়া বাইবে। ভাঙার স্মৃতির যে অটিল রহতের কথা বলিয়াছেন, আদ্য পাঠকদিগকে সে কথা জানাইব। এতীক যশনবিদ্যা-বিশারদগণ কালসনের মতালখী হইয়া এই মতই এতদ্র করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতে পূর্বে কঠিই যশনিকার্যে ব্যবহৃত হইত। আলেকজান্ডারের অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে এ যেনে গ্রীক এতদ্র বিস্তৃত হয়, এবং তাহারই কলে ভারতবাসীরা যশনিক কার্যে অন্তর ব্যবহার করিতে শিখে। কামিংহাম জয়সঙ্ঘের বৈঠকের অংশ দেখাইয়া এই মত বক্তিত করিতে এতদ্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিপক্ষবাদিগণের উক্ত চীৎকারে তাঁহার ক্ষীণ বর ভুবিয়া গিয়াছিল। সেই উক্ত চীৎকারের মধ্যে কিন্তু এক জন ভারতবাসীর অভিযান বুঝাপত্ত মুষ্টিকাপক্ষের মত তদা গিয়াছিল। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, আলেকজান্ডারের অভিযান এলরমুর্ন্ত অবল ব্যতায় মত ভারতের একাংশের উপর দিয়া বহিরা গিয়াছিল। আলেকজান্ডার রণজয়ী বিজয়লালসামুৎ ব্যাকী আবিদ্য-ছিলেন—কলাকুশল শিল্পী লইয়া ভারতে আইসেন নাই। তবে কেমন করিয়া বিলাস করিব, যে জাতি তাঁহার আশ্রয়কালে অন্তরভাণ্ডো অত্যন্ত ছিল না সেই জাতি গ্রীক এতদ্রো তাঁহার অভিযানের অকাল পরেই যে সকল তত্ত্ব দিখিত করিয়াছিল সে সকল আলোক যশনিকদিগের বিশ্বর উপাদিত করিতেছে। আজ এটীক পাটনীপুত্রে অন্তর-আদ্যের অব্যবহারে হুণ্ডা রাজেন্দ্রলালের অস্থলজ্ঞান এতদ্র উপর এতিষ্ঠিত হইল।

বর্তমানে আমরা এট রংজ অনুমান করিতে পারি যে, বৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর বহাভানে মৌর্য সম্রাট অশোক এই স্থানে বহু হস্তানিষ্ঠান করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ণ্য্য সেই সকলের অন্ততম। বর্ণ্য্য্যাহাত আর এক শত ভক্তের উপর বর্ণ্য্য্যের কথা। অবস্থিত ছিল। ভক্তগুলির ব্যাস মূল সাড়ে তিন ফিট।

সেগুলির উচ্চতাত ২০ ফিটের কম ছিল বলিয়া বনে হয় না। সেগুলি চুনায়ের বাসুপ্রস্তরে পঠিত ও মণ্ডন। সম্ভবতঃ চুনায় হইতে নদীগর্ভে অন্তর আনয়ন করা হইয়াছিল। সেগুলি ভূতলে অোষিত হয় নাই। কেবল কাঠের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ যে যে স্থানে ভক্ত স্থাপিত হয় সেই সেই স্থানে ভূগর্ভে দীর্ঘ কাঠের “চোকোর” অোষিত হইয়াছিল। ভক্তগুলি ১৫ ফিট ব্যবধানে সংস্থাপিত—হুই প্রোঞ্জির বহোর ব্যবধানত ১৫ ফিট। এ পর্য্যন্ত ভারতে যে সকল আটাল গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সকলের কোনটিরই পঠনএগালী এইরূপ নহে। তবে ইহার সহিত পানিপলিসের শতভক্ত গৃহের বর্ণ্য্যেট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান গৃহের আবিষ্কার ও অনুমান সম্পূর্ণ হইলে এই সাদৃশ্যের কারণানুসন্ধানের সমর উপস্থিত হইবে। ছাত ওস্ত-ভার দালকাঠের পঠিত হইয়াছিল। ভক্তগুলি ভক্তের উপর সংস্থাপিত করিয়া বাতুনিষ্ঠিত—সম্ভতঃ ভক্তের—কীলক দিয়া ভক্তনীর্বে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। কীলকগুলি ভক্তদ্ব্যে আর ১ ফুট অোষিত করা হইয়াছিল। আট ইক বা ভক্তোষিত দীর্ঘ কীলক দিয়া কাঠগুলিকে পরস্পর বদ্ধ করা হইয়াছিল। বর্ণ্য্য্যতল কাঠনিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে তাহা ভূমির ১৭ ফিট নিরে অবস্থিত। সম্ভবতঃ ভখন ইহা ভূমি হইতে উঠে অবস্থিত ছিল এবং কাঠনিষ্ঠিত গোপানগর্ভে বর্ণ্য্যে প্রবেশ করিতে হইত। ছাতের আকার ও প্রকার কিন্তু ছিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। তবে অনুমান হয়, তাহা অতি প্রাচীন ভবান্বিতের ছাতের মতই ছিল। এই ককটি যে অতি বৃহদায়তন ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার বর্ণ্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে পানিপলিসের কথাই মনে করিতে হয়। এই কক কোন্ কার্যে ব্যবহৃত হইত তাহা বলা যায় না, তবে এই ককের সম্ভার বর্ণ্য্যতলের প্রাচ্য ছিল এবং কক শতাব্দী ব্যাপিতা এই ককে বোধ মুক্তি সংগৃহীত হইয়াছিল। বৃষ্টের অনেক প্রায়তকালে কোবিত মণ্ডার বোধিসত্ত মুক্তিই তাহার প্রাণ। তাহাতেই মনে হয়, কিছুকাল ব্যাপিতা এই ককে ভূবাসনয়ন হইত।

তাহার পর কোন অবস্থিই সময়ে—সম্ভবতঃ বৃষ্টের অনেক প্রায়ভেই—প্রাণ-প্রবাহ গুহে প্রবেশ করে। এই প্রাণ কত দিন স্থায়ী হইয়াছিল, বলা যায় না। তবে এই প্রাণে ককদ্ব্যে আট মর ফিট পলী মাজি অবস্থিত। এই প্রাণকালে একটি ভক্তের মূল সরিয়া বাতায় সেটি স্থানচ্যুত হইয়া সেই মাজির উপর পড়িয়া যায়। অত ভক্তগুলি বহাশ্বানে অবস্থিত থাকিয়া আরও বহু বৎসর গৃহটির ছাত বহন করিয়াছিল। বোধ হয় প্রাণবপ্রবাহ প্রশ্নিত হইয়া ককদ্ব্যে বারিশ্রু হইলে আবার সমর সমর গৃহ ব্যতীত হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করিলে আগত্যতঃ প্রুর্ক্যেব অনেক সম্ভার সমাধান সম্ভবসাধ্য হইয়া

উঠে। কিন্তু সে সময় পলী সরাইয়া গৃহ পরিষ্কৃত করা হয় নাই। সে বাহা হটক, পরিণেবে বন্ধিগায়েই গৃহটি বিনষ্ট হইয়াছিল। সত্বেতঃ দ্বিতীয় পক্ষ পতাকীতে এই বন্ধিগায়ে সংঘটিত হয়। এই অগ্নিতে গৃহের ছাত পড় হইয়া যায় ও সেই স্থানে ভবভগ্নাঙ্কাদিত হয়। অগ্নির তাপে তত্তমবাস্য বাতু-কীলক স্বীত বস্ত্রাদি ভগ্নবিন্ধ্য হয় ও এতদ্ব্যতীত গুহগুলে গতিত হয়। ভবের নিরাশে ও বে অংশ পলী বাড়িতে প্রোথিত হইয়াছিল—এই অগ্নিতে নষ্ট হয় নাই। তখন সমস্ত স্থানটি তত্তমবাস্যের দ্বারা আকার ধারণ করে, আর সেই তত্তমবাস্যের মধ্যে মধ্যে তত্তমবাস্য ও বিভিন্ন ভগ্নাংশগুলি প্রাচীন প্রাচীরের পরিধির দিতে থাকে। এই ভগ্নাংশগুলি বস্ত্রাদি থাকায় এই স্থানে নতুন গৃহ-নির্মাণে অগ্রবিধা হয়। এবং পরবর্তী গৃহনির্মাণে এগুলিকে ভাঙিয়া ভূমি সমতল করেন।

সুতরাং সরাটপগই ভূমি সমতল করিয়া এই ক্ষেত্রে ইটক-নির্মিত গৃহ গঠিত করেন। সে দ্বিতীয় পক্ষ বা বট পতাকীর কথা। সুতরাং সরাটপগই ভূমি সমতল করিয়া গৃহ-নির্মাণে অগ্রবিধা হয়।

কলিকাতায়, বোম্বাই, গুয়াডালার গৃহগুলি বহুলাংশে বিলাসবাস্য থাকিত। কিন্তু গুয়াডালা তাহা না করিয়া কেবল ভূমি সমতল করিয়া তত্তমবাস্য গৃহনির্মাণ করিলেন। কালে অপেক্ষের হর্ষের তত্তমবাস্য কাঠবক পতিয়া পেল; সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানেই অলপ প্রবেশ করিল। কলে তত্তমবাস্য ভূমিতে বসিয়া পেল। কারণ, পলীপড়া অথবা তত্তমবাস্য কঠিন হয় নাই। কালেই তত্তমবাস্যের গৃহের ভিত্তিক-নিরে অনেকগুলি পর্ত হইয়া পেল। আর উপর হইতে বিভিন্ন প্রকারের ও তত্তমবাস্য সেই-সব পর্তে গঠিত হইতে লাগিল। গৃহভিত্তি বসিয়া পেল—গৃহ ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। তখন লোক এই স্থানকেই গৃহনির্মাণে বিরত হইল। তাহারা তত্তমবাস্যের সৌন্দর্য্যাকার কর্তব্যের কারণ বুঝিতে পারিল না। সে রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা কলেক্ট করিল, এ স্থানে গৃহনির্মাণে বিরত নহে। তাই মুদীকাল এই স্থানকেই গৃহ-নির্মিত হয় নাই। সেবে মুদীকালবাস্যের সমস্ত স্থানকে এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করে।

অতঃপরে নির্ভর করিয়া এই যে বিবরণ গঠিত হইল সত্বেতঃ বোম্বাই উপর ইহাই অপেক্ষের হর্ষের ইতিহাস। তবে এখনও গৃহের সমস্ত অংশ আবিষ্কৃত হয় নাই।

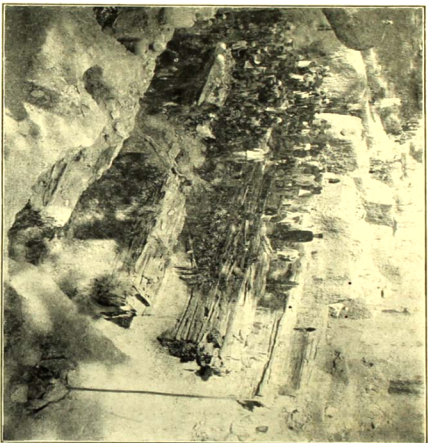
কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল তাহাও স্থিরীকৃত হয় নাই। আর
সোপানব্রেজী। এই গৃহের বাকি পের ভবভগ্নের পক্ষান্তে যে কাঠনির্মিত সোপান-
ব্রেজী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যও বুঝা যায় নাই। এই

সোপানগুলি ত্রিশ ফিট দীর্ঘ, ছয় ফুট বিস্তৃত ও সাড়ে চারি ফিট উচ্চ। এগুলি ত্রিশ ফিট দীর্ঘ পাল কাঠে গঠিত। সে কাঠ এখনও বিদ্যমান হয় নাই। বস্ত্রাদি ইহাদের উদ্দেশ্যে আনাদের অভ্যন্তর। হস্ত এগুলি অত্যন্ত গুরুতর ভবের ভিত্তিকরণে গঠিত হইয়াছিল। সাধারণ লোকের বিশ্বাস মৌখী সরাটপগই বিলাসভরীগুলি এই ঘাটে আনিয়া

ভিত্তি । এই সোপানশ্রেণী সেই ঘাটের অবশেষ । সে বাহাই হউক, এই সোপানশ্রেণীও অপেক্ষের বিনাশ প্রভৃতির মত দুঃখ ও শিষ্টনৈশুণ্যের পরিচায়ক । তাহারাও এই প্রাণেশ্বরই মত মৌর্য সাম্রাজ্যের সৃষ্টির ও প্রাচীন ভারতের সভ্যতার প্রকাশ বকে লইয়া আবিষ্কারেরই অপেক্ষার ছিল । তাহারাও প্রাণেশ্বরই মত ইতিহাসের উপাধান ।

এইরূপ ভারতীয় পুরাবস্তুর সম্বন্ধে যত প্রাচীন কীৰ্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই প্রাচীন ভারতের সভ্যতার স্বরূপ নিশ্চিত হইতেছে ; ততই ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে ; ততই লোক বুঝিতেছে যে সভ্যতা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সঙ্গে তির্যক্ত, প্রাচীন, আপনাকে ও কোরিচার ব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে সভ্যতা আমেরিকাতেও বিস্তৃত হইয়াছিল, সে সভ্যতা অল্প কয়েক দশকীয় সভ্যতার অতিক্রান্ত জ্যোতিঃতে ভাস্বর মনে । পরন্তু স্বয়ং জ্যোতিষ্মান । ওলডেনবার্গ বলিয়াছেন ; প্রাচীন ভারত আপনায় সীমামধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়াছিল । বর্তমানে প্রকৃত্যের অনুসন্ধানকারী ততই অগম্য হইতেছে, ততই অভিজ্ঞানের বিশ্বাস অধিকৃষ্ট—প্রাচীন মানবের আদিম সভ্যতার অনুসন্ধান । চুংয়ের বিশ্ব বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাসম্বন্ধে লোকের যে ধারণা প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতাসম্বন্ধে সে ধারণা নাই । অথচ বিশ্বের সভ্যতার ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব সহজেই বুঝিতে পারা যায় । প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রাচীন গ্রীস ও গ্রীসতাসম্বন্ধে প্রভু ধারণা কবির পোষণ করিয়া অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইলেন ; সেই অনুসন্ধান ফল হয় । কিন্তু বাহাই প্রাচীন গ্রীসের প্রাণেশ্বর তাম্র আত্মস্থাপনে অসিদ্ধ, প্রাচীন চুংয়ের এই সকল পুরাবস্তুর প্রাণেশ্বর তাহারাও অসিদ্ধ করিতে পারিবেন না । আর এই সকল পুরাবস্তুর বিকল্প কিন্তু বিনয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়াই আবিষ্কারের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইবে । তাই আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের এই কীর্ত্তিচক্রে অবশিষ্টাংশের আবিষ্কারের আশায় উৎসাহিত হইয়া যাইয়াছি ।

ଆସାନାବୁ



সমালোচনা।

—:০:—

অন্নপূর্ণার মন্দির।*

—o—

আফিমের যাত্রা চড়াইয়া কমলাকান্ত মনে করিয়াছিলেন—“মহুচ-সকল দলবিশেষ।” প্রমথীমণ্ডলীকে নারিকেলের সহিত তুলিত করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—মালা জ্রাণোকের দিগ্ভা—“কখন আশ্বখানা বৈ পূরা দেখিতে পাইলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাণে লাগে না; জ্রোনোকের বিজ্ঞাও বড় নয়। ঘেরি সমরাবল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন, জেন্ন অষ্টেন বা জর্জ এলিয়ট উপক্ৰাস লিখিয়াছেন—মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাগে।” কথাটা কেবল “কমলাকান্তি” নহে; পরন্তু পুরুষের প্রাধাত্তে ও আত্মশক্তিতে অতিবিক্ত ও অত্যধিক বিশ্বাসের পরিচায়ক। জ্রাপুরুষের কর্মক্ষেত্র ঐশ্বর্য; তাই উভয়ের স্বাভাবিকাল ও ভিন্নরূপ হইয়াছে। ইহাই স্বাভাবিক। তাই ক্রয়োদর্শনে পুরুষের প্রেত্ব, স্ত্রীর পূর্বাবেক্ষণে প্রমথীর প্রেত্ব। এই যে স্ত্রীর পূর্বাবেক্ষণ, ১শ্রে ইহার উপযোগিতা অধীকার করিবার উপায় নাই। এই গুণেই প্রমথীর চিত্ত শিরকোটি বভাবহুগ ও চিত্তরঞ্জক হয়। এ কথার প্রমাণের অভাব নাই। আমাদের আশোচ্য পুস্তকখানিতে ইহার অস্তুতম প্রমাণ। এই প্রমাণে আমরা কমলাকান্তের বেরাল বভিত করিতে পারি। যে দিগ্ভায় বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালীকে ব্যুৎপন্ন করিতে প্রয়াসী—সে বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদার-পথে না হউক—বাঙ্গালা সাহিত্যের সজীর্ণ পন্ডাঙ্গার দিয়া বাঙ্গালীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে এবং সময় সময় এমনও মনে হয় যে, সহজবোধ্য ভাষায় পরিচিত পথে বাহুল্য-বর্জিত ভাবে প্রবেশ করায় তাহা বেরূপ ভাবে মানসিক পরিপুষ্টির সহায়তা করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যা সকল সময় সেরূপ ভাবে সহায়তা করে না। আমরা যাহা আহার করি, তাহাতেই আগাদের পুষ্টি হয় না—যাহা জীর্ণ করিতে পারি, তাহাতেই হয়। অজীর্ণ বাদা ও learned lumber কোনটাই উপ-

* অন্নপূর্ণার মন্দির (উপন্যাস)—ঐমতী বিরূপা দেবী-প্রণীত। কলিকাতা, ২৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হইতে ইতিহাস পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। দুইটি খণ্ডে।

কায়ী নহে। অল্প দিনের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যে কতকগুলি সুখপাঠ উদ্ভব মহিলাচিত্র উপন্যাসে সমৃদ্ধ হইয়াছে। ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’ ভাবাদেয় মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকখানি আরম্ভে ব্রহ্ম নহে, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত—বাহ্যলীল্যের কথার পূর্ণ। সমালোচনা করিতে হইলে দোষ দেখাইতেই হয়। আলোচ্য পুস্তকে দোষের ভাগ অতি অল্প; তাই আরম্ভে দোষেরই উল্লেখ করিব। ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’ বোধ হয়, লেখিকার উপন্যাস-রচনার প্রথম বা তরুণ উদ্যম। তিনি সতীকে সখী কমলার দৌত্যকার্য্যে যখন বিশেষ-বরের কাছে পাঠাইয়াছেন, তাহার সে সময়ের ব্যবহার তাহার বয়সের ও শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্যে স্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই। যে সতী আহত অন্তিমানে উপবাস করিয়াও বিশেষবরের দয়াদত্ত অর্থ ফিরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল—“আমরা গরিব সতী, কিন্তু তেবে দেখুন, যতক্ষণ আমরা নিজে চালাতে পারিব, ততক্ষণ কেন পরের তিকে নেব?” যে সতী আপনায় বৃত্তাবসদনাবিবাক্ত পত্রবাহনে বিশেষবরের অস্বাভাবিকতার কঠকঠোর আবরণ নষ্ট করিয়াছিল, এ ব্যবহার সেই সতীর পক্ষে সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। কিন্তু বালিকা সতীর বকে সেই ভাব ত তখনও বিকশিত হইবার কারণ ঘটে নাই। এই সামান্য অসামঞ্জস্যই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। ৪৯ পৃষ্ঠায় রামশঙ্করের যে সখলের কথা বলা হইয়াছে; তাহা “শুধু মাসে দশটি টাকা” হইবে। ‘কমলাকে আমরা তারাপুরের জমীদার-বরের মেয়ে বলিয়াই জানিতাম—তাহার পিতার ডেপুটির আমাদের নিকট ৮০ পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

আরও একটা কথা বলিব, যে কমলাকান্তের কথা তুলিয়া এই সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছি, আমরা সেই কমলাকান্তের খুতুরার কিছু পক্ষপাতী। তাহার প্রসাধনে আমাদের একটু আনন্দ আছে। লেখিকা কথোপকথনে চলিত ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকিলেও ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু অনাত্ম তিনি সেই দিকেই একটু আকর্ষণ দেখাইয়াছেন। তাহার ভ ভাষা সম্পদের অভাব নাই!

কিন্তু দোষ-পরিচয়ের ক্ষণ এ গ্রন্থের আলোচনা করিতে বসি নাই; শুধাবিকোই ইহা আদরবীর। প্রথম গুণ—সুস্থ পূর্ণাবেক্ষণ। আমরা একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম,—“সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে। জীব স্তর

বাগীখানির দাওয়াতে বলিয়া অকালপুত্র রামচন্দ্র তট্টাচার্য্য তাহাকে টানিতে-
 ছিলেন। নিকটে কড়িকাঠ হইতে স্কুগানো একটা পিঙ্করের মধ্যে লম্বা
 আগরিত টিয়া পাখীটি কয়েকবার 'চুর্গা, চুর্গা, তাদা প্রমদনী, হেরকুফ' প্রকৃত
 নাম পড়িয়া আপাততঃ তট্টাচার্য্য মহাশয়ের কানি ও তাহাকে টানা শব্দের
 প্রতিধ্বনি করিতেছিল। জীর্ণ, বড়ে ছাওয়া রান্নাঘরের নৈশতার এক ঘারে
 কুহুরটা শুইয়া আগায়ে নাক ডাকাইতেছিল। আগ্রণের মধ্যেহলে একটা আত্ম-
 রক্তের নিরে খোঁটার ধাধা গাভীটি সপ্তাহে বৎসের পাজ লেহন করিতেছিল।
 চারিদিকই স্থির, শান্ত। বাতাস নিতান্ত নিরুবেগচিত্তে আগ্রণের এক পাশে স্থিত
 কলাপাছে কয়টির পাতাগুলি নাড়িতেছে, গাছের ডাহাতে যেম ঢাকলোর তাধ
 নাই। তট্টাচার্য্য বোধ হয় ভাবিতেছিলেন যে, লবাই এখন নিশ্চিত, এখন
 স্থির, কেবল মাছুষই এত উদ্বিগ্নচিত্ত, এত চকল কেন ?" এই পর্য্যবেক্ষণ-
 শক্তির প্রভাবেই তিনি দারিত্র্য-দুঃখতিক্তজীবন রামচন্দ্রের, আত্মায়িক
 জোঠাইয়ার, পরমার্থোৎসর্গের ক্ষান্তর ও করুণাময়ী অন্নপূর্ণার চিত্র
 অঙ্কিত করিতে পারিয়াছেন। এই পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে কল্পনা মিশাইয়া তিনি
 আদর্শ সহগুণমালিনী জাহ্নবীর ও যে বাঙ্গালী হিন্দুকতা "কষ্ট হইলেও দুই
 দিনেই নিজের অবস্থার মধ্যে আপনাকে ডুবাওয়া লয়," সেই সাবিত্রীর
 সৃষ্টি গঠিত করিয়াছেন। আর যে স্ত্রী এই উপত্যার মেরুদণ্ড, বাহ্যকে
 অবলম্বন করিয়া গল্পটি দময়ন্তীর মত কুসুমসুখময় শোভিত হইয়াছে, সেই
 আকস্ম-দুঃখ-লালিতা, সর্বসুখবাদখকিতা, প্রদীপ্ত তেজের সহিত অসাধারণ
 বিনয়ের সম্মিলন, সংসারের উপেক্ষিতা, পাপ-প্রলোভনজয়ী স্ত্রী তাঁহার
 অপূর্ণ সৃষ্টি। অভাগিনী সত্য সত্যই বুকের মধ্যে সমুদ্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল;
 তাহার জীবনে সেই সমুদ্রের অস্থির আর্জুনাদই ধ্বনিত হইয়াছে।

প্যারীচরণ মিত্রের কথায় বক্তব্যচক্রে বলিয়াছিলেন,—“তিনিই প্রথম
 দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আত্মার ঘরেই আছে।
 * * তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে
 ঘরের সামগ্রী মত স্মরণ, পরের সামগ্রী মত স্মরণ বোধ হয় না।” ‘অন্নপূর্ণার
 বন্ধির’ আত্মাদের ঘরের সামগ্রী লইয়া রচিত। সে লোকচাতার আত্মাদের
 অবিরল আর্জুনাদে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, যে দারিত্র্যের সহিত বিষম
 সংগ্রামে আত্মাদের যন্ত্রণাব্যপ্ত বিকশিত হইতে পাইতেছে না—এই পুস্তকে
 সেই লোকচাতার কথা আছে, সেই দারিত্র্যের বিকট সৃষ্টি একট। বাঙ্গালার

দরিদ্র সংসারের চিত্র বহু লেখক অঙ্কিত করিয়াছেন । কিন্তু যে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলে সে চিত্র আমাদের অশ্রুজলে অভিষিক্ত হয়, বাঙ্গালী সমাজের সহিত সে প্রত্যক্ষ পরিচয় অনেকেরই নাই । তারকনাথের ছিল, তাই ‘বর্ণলতা’ তাঁহার কল্যাণস্থায়িনী কীর্ত্তি । এই স্থানে পুরুষ লেখক অপেক্ষা মহিলার প্রকৃত অবস্থা জানিবার সুযোগ অধিক । দরিদ্র গৃহস্থ প্রাণপন যত্নে বাহিরে যে দারিদ্র্যের চিহ্ন গোপন করিয়া থাকে—অন্তঃপুরে, আমাদের সংসারের সেই কেন্দ্রে, তাহা আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে—তাৎকালিক চাকিয়া রাখা অসম্ভব । ‘অন্নপূর্ণার মন্দিরে’র লেখিকা সে সুযোগের সম্ভাবনার করিতে ক্রটি করেন নাই । আর যে কল্পনা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবাংশ পূর্ণ করিতে পারে, সে কল্পনায় সকলের অধিকার নাই ; বর্তমান লেখিকার আছে ।

পুস্তকের কতকগুলি কথা বাঙ্গালার সুভাবিত-সংগ্ৰহে স্থান পাইবার উপযুক্ত—“প্রকৃতি সমতাময়ী, ভাগ্য দেবতা অকারণ ।”—“দরিদ্রের একটা গুঢ় অভিমান ধনীদেব বিরুদ্ধে দেখা যায় ।”—“সর্ব্ববাস্ত হইবার পর একটা ভীত নিশ্চিন্ত ভাব আসে ; দুহুর পর যন্ত্রণাকাতর মুখে শান্তির শাক্তবর্ণ জাগিয়া উঠে ।”—“সম্রাজ্য বা তত্ত্ব গৃহস্থ পরিবার যদি কালবশে দরিদ্র হইয়া যায় ত তাহাদের সেই কষ্টের উপর আত্মগত্মানজ্ঞানজনিত অত্যধিক অভিমানই সমধিক কষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়ায় । সত্যই এ অভিমান । ‘কিন্তু এ অভিমান মানুষের উপর নহে, ভগবানের উপর ।’—“দারিদ্র্য দশ্য যুগনাতিরই মত ।”—সংসারে ভালবাসার “আদান-প্রদানেই শ্রেষ্ঠ সুখ ।”

পুস্তকের গল্পাংশের বিবরণ বিবৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না । গল্পাংশ—আখ্যানবস্ত্র জটিলতাম্ব্য । ঘটনার সংস্থানে—গল্পের বিবৃতিতে—ভাবের উল্লেখ লেখিকার ক্ষমতার পরিচয়, কন্যা সতীকে রামশঙ্করের শেষ কথায় “তোমায় আশীর্বাদ করবার মূলোচ্ছেদ ত আমি করে দিযোছি,—আর কি বলে আশীর্বাদ করব যা ? তবে—তবে জেনো—অনেক কষ্টে, নিভাস্ত নিরুপায় হয়ে, আমি তোমাকে—সন্তানকে হত্যা করেছি,—আমার হাত ছিল না”—কন্যার দুহুশান্তিসিদ্ধ শব্দ বন্ধে ধরিয়া জাহ্নবীর পুঞ্জীকৃত অব্যক্ত বেদনা-বিকাশে—“সতী আমার কুমারী । আমি কি তার বিয়ে, দিযোছি ? সেই ঘাটের মড়া কি তার বর ? আমার কুমারী মেয়ে তাঁর

কোলে যাচ্ছে। সতীর এ ধান কাপড় ছাড়িয়ে দাও, দিদি। ছোটবেলার সেই নীলাবরীখানি পরিয়ে দাও, যে কাপড় পরে তাঁর হাত বগ্রে সে বেড়িয়ে বেড়াত। কাদের কালো চূড়ি কপাছি পরিয়ে দাও, বিবহার বেধে আমার সতীকে যেতে দিতে পারব না, তিনি আমার কি বলবেন—” বখন চক্ষুতে অঙ্গ উত্থলিয়া উঠে, তখনই লেখিকার ক্ষমতার প্রকাশ্য না করিয়া থাকার না। শোককাতরা জননী কথায়—“যদি একবার যা বলে শেষ বার ডেকে যেতে গা। কাল রাত্রে বখন পায়ের তলায় শুয়ে পায়ের হাত বুলিয়েছিল, তখন জানিনি যে, তুমি বিদায় নিচ্ছ; তা হলে একবার যা বলে ডাকতে বলতুম”—পাঠ করিয়া বখন সত্যানবিশ্রাস-বেদনা-বিধুর হৃদয়ে কত কথা জাগিয়া উঠে, তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি—লেখিকার রচনার বাক্যলা সাহিত্য সমলঙ্ঘিত হইবে। এই গ্রন্থে সর্বত্র যে সরল সরস সৌন্দর্য্য সপ্রকাশ, তাহা বাক্যলা সাহিত্য্য মূলভ নহে। আর এই গ্রন্থে যে সচিব্য বিজ্ঞান—বিলাস-লালসা-কলুষিত-চরিত্র নরেকের কদর্য্য প্রত্যবেগ তাহার স্তম্ভতা মলিন করিতে পারে নাই।

কিন্তু এই কথাতেই গ্রন্থের পরিচয় শেষ হয় না। লেখিকা এই পুস্তকে মুখ্যভাবে দুইটি ও গৌণভাবে আরও একটি সামাজিক সমস্যার উত্থাপন করিয়াছেন—সমাধানের চেষ্টাও করিয়াছেন। মুখ্যভাবে উত্থাপিত সমস্যা—কৌলীন্য ও পণপ্রথা।

ঔপক্ৰমের স্বাভাবিক সামাজিক সমস্যা—ইংরাজীতে বাহ্যকে Sex Problem বলে।

আর প্রথম সমস্যা হইতে উদ্ভাবিত—গৌণভাবে উত্থাপিত সমস্যা—“নিরস্ত্র দরিদ্র পিতা কোন্ অধিকারে; আপন সন্তানে আনে দরিদ্র-সংসারে?”

প্রথমে গৌণ সমস্যার কথা বলিব। সমাজে দারিদ্র্য্য বৈষম্য বৃদ্ধি পাই-তেছে, তাহাতে এ সমস্যা সকলেরই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে প্রথমে ‘মোহাইমা’র অধারে এই সমস্যা উত্থাপিত হইয়াছে—ছেলেকে কৃত্য দিতে পার না। “না বেবে ত বাপ হরেন্ছিলে কিসের জন্যে?” লেখিকা স্বাভাবিক সচেতনতায় এ সমস্যার বিচারের সুযোগ সন্ধান করেন নাই; কেবল গ্রাম্যজগতের অস্তিত্ব কথায় ইহার সমাধানের সন্ধান দিয়াছেন,—“দোদী? হাঁ। আমি দোদী বই কি! কি দোদ জান, মা? অশক্ত হয়েও আমি সংসার করেছি, বিয়ে করেছি, সন্তান-সন্ততি হয়েছে। দোদী বই

কি বিয়ে আনি করেছি বটে, কিন্তু সে দোষে দোষী, আমার মা-বাপ ।
তাদের পাণে আমি কষ্ট পেলাম, আমার পাণে তোমরা কষ্ট পেলেন—
দোষী বই কি যা—”

টেনিসন বলিয়াছেন,—

“Our little systems have their day,

They have their day and cease to be”

কিন্তু যখনই সমাজের প্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত প্রথা প্রয়োজনান্তেও দৃঢ়ীভূত না
হয়, তখনই সে স্বাভাবিক বিচিত্রতাপকতা হাবাইয়া কট্টিন হইয়া সমাজের পক্ষে
পীড়াদায়ক হয় । তখনই অন্যতরে তাহার পরিণতি হয় । কৌনীন্ত-প্রথারও
তাহাই হইয়াছিল—নবধাতুপলক্ষণহীন দেবীঘরী কুলীনের কুলে কদাচারেরই
বাহুল্য হইয়াছিল । কিন্তু এষে বর্ণিত “নবগ্রামবাণী অনামধ্যাত তিনকড়ি
'লাহিড়ী’” মহাশয়ের মত বিবাহব্যবসায়ী কুলীনদিগের ব্যবসা আর ভাল
চলিতেছে না । কৌনীন্তের সে বিবধীত বিস্তর । তাই সে সৰ্ব্বদে আর
অধিক কথা বলিব না । কিন্তু যে কুলপ্রথা তাহাকে বিলুপ্ত করিয়াছে, তাহার
প্রত্যাবৃত্তি প্রসার যে আরও অধিক ! যে স্বাক্ষর তাহাকেও গ্রাস করিয়া
জীর্ণ করিয়াছে, তাহার সর্বগ্রাসী ক্ষুধার যে নিয়তি নাই । পণপ্রথার পাণ
বহনিন হইতেই সমাজ-সঙ্গীরে প্রবেশ করিয়াছে । প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে
'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রসূতিক শিশিরকুমার ঘোষ ‘নবশো রূপেরায়’ ইহা-
রই উপর কশাঘাত করিয়াছিলেন । কিন্তু তখন তাহার অস্ত্র ভ্রপ ছিল ।
এখন নবকলনের তাহার বোড়শোপচারে পুষার ব্যবস্থা হইয়াছে । তখন
সে সমাজের এক প্রান্তে সম্বোধে অবস্থান করিত ; আজ সে “উচ্চ শিক্ষার”
(! !) ছাড় লইয়া সমাজের সর্বত্র অবাধে বিচরণ করিতেছে । দরিদ্র-কন্ডা
সতী বলিয়াছিল,—“বিয়ে কি অমনি বয়েই হয়, কখনা ? বাপ-মা আগে
পাশল হয়ে উঠবেন, বর-হরের সব বিক্রী হবে, সবাই পাছতলার ধাঁড়াবে,
তবে ত বিয়ে হবে ।”—হইয়াছিলও তাহাই । তাহার বিবাহের বায়ে সর্ব-
স্বাস্ত হইয়া তাহার মা-ভগিনী যখন পাছতলার ধাঁড়াইতে চলিলেন—তখন
আগনাকেই অপরাধী মনে করিয়া তাঁহাদের উদ্ধারের আশায়—পাছে
নিকলত জীবনে কলঙ্ককালিমা লিপ্ত হয়, এই আশঙ্কায়—প্রলোভন পদদলিত
করিয়া সতী আত্মঘাতিনী হইয়া সকল আশা ফুড়াইল । সমাজের পৈশাচিক
অত্যাচারের দুগুণাৰ্ধে সতী পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিল । উপদেশে, রজনকে

অভিনয়ে, উপভাসে, কবিতায়, প্রতিবাদে যে প্রথা বিলুপ্ত হয় নাই--সেহ-
সত্য আত্মহতিপুষ্ট স্বহস্ত-প্রজ্জ্বলিত হোমানলিখায় যে পাপ তম্বীকৃত হয়
নাই--এই ভিত্তি যে সে প্রথা--সে পাপ দূর হইবে, এমন আশা আমরা করি
না। তবে এই পাপের উপর আমাদের দৃষ্টি যখন আমাদের সংসারের
কেন্দ্র অতঃপূরে স্থায়ী হইবে--যখন দাঙ্গালী ছেলের মা'রা ইহার
বিক্রমে দণ্ডায়মান হইবেন তখনই এ পাপ আমাদের সমাজ হইতে দূর
হইবে। সে বিষয়ে 'অগ্রপূর্ণার মন্দির' যে সহায়তা করিবে, তাহাতে আমা-
দের সন্দেহ নাই।

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। আয়ত্তা মুখাভানে উৎখাপিত দ্বিতীয়
সমস্তার কথা বলিয়া সমালোচনা শেষ করিব। পুরুষের সহিত সমান অসি-
কারপ্রার্থিনী দুরোপীয়া নবনারীসম্প্রদায় বাহাই বলুন, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে
প্রকৃতিপ্রদত্ত ব্যবধান শিক্ষায় বা সংস্কারে দূর হইতে পারে না; উভয়ের
কণ্ঠে একই ভাষা ভিন্ন। আর সপোনবরের মত সত্য হউক আর না-ই হউক, যে
ভালবাসার আকর্ষণে স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়--সেই ভালবাসার
আদান-প্রদানেই প্রেত স্বপ্ন। এই সমস্তার একাংশ বিবেচকের চরিত্রে ও
অপরাধে সত্যের চরিত্রে দেখা যায়। বাসীমা অগ্রপূর্ণারই মত অতিরিক্ত রেহ-
প্রযুক্ত লেখিকা "আবালা অচুত স্বভাববিশিষ্ট, মুখচোরা, গোবেচারা, ভাল-
মাহু" বিবেচকের অপরাধ কমা করিয়াছেন এবং তাহাকে রেহদানে কার্পণ্য
করেন নাই। কিন্তু সভাই কি সে নির্দোষ? বিবাহের নামে তাহার যে
"একটা আতঙ্ক জন্মিয়া গিয়াছিল"--সেটা যে তাহার চেষ্টাকৃত সঙ্কল্পের--
প্রকৃতির সহিত সংগ্রামের ফল। "জ্ঞানচর্চার অবসরে সে যখন কাব্য ও
সাহিত্য আলোচনা করিত, তখন তাহার মধ্যে নারীজাতির প্রাণান্ত দেখিয়া
সে আরও ভীত হইয়া পড়িত। একজন সামান্য বালিকা বা নারী কিরূপে
যে পুরুষের বিকৃত জীবনের সঙ্কলনসার্থকতার কেন্দ্র-বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়,
তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; অথচ দেখিত, ইহাই কাব্য-সাহিত্যের
প্রাণ; অতএব জনতার প্রাণ।" "এই কি বাস্তবের আকাঙ্ক্ষিত জীবন?
এই যদি স্বপ্ন, শান্তি, তৃপ্তি--তবে দাসত্ব আর কাব্যকে বলে?"--মনে
করিয়া "কিভাবে সেই বোহময় আত্মবিশ্বাস হইতে নিজে রক্ষা পাইবে, সেই
চেষ্টায় সে সমস্ত প্রাণ-মন প্রয়োগ করিল।" যখন সে বুঝিল, তাহার
"খেয়ালে" সে নিজে বিশেষ সুখী হয় নাই, বাসীমা'কে দ্বন্দ্ব দিয়াছে, সত্যের

শোচনীয় যুক্তার কারণ হইয়াছে,—যখন সে বুঝিল—“সংসার যে নিয়মে চলিতেছে, তাহার সহিত সেই নিয়মেই চলিতে হইবে, এক চুল এদিক্ ওদিক্ করিলে চক্রনৌমতে পিষিয়া যাইতে হইবে,”—তখনও সে ফিরিল না। সতীর যোগ-নিদানান্বয়ে ও ভুল হয় নাই। সে যেমন করিয়া বিবেচনাকে অব্যয়ন করিয়াছিল, তেমন করিয়া আর কে করিতে পারে? সে বলিয়াছিল,—“তুমি স্ত্রী জাতিকেই ঘৃণা কর।” এই যে স্বাভাবিক স্বভিষ্ট, টেনিসনের Honest nature's rule—বিকল্পে সংগ্রাম, ইহাতে মাহু-বের পরাক্রম অনিবার্য। সে সতীকে ভাল না বাসিতে পারে। ভালজাক বলেন, রমণীর প্রতি ভালবাসা বিবাহের—তাহাকে পাইবার পর উদ্ভূত হয়। কিন্তু যে আকর্ষণ তাহাকে পাইবার বাসনা বলবতী করে, সে আকর্ষণ পদদণ্ডিত করিলে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। সকল পুরাণই স্বস্তিকে দেবতা করিয়া এই শিক্ষা দিয়া থাকে। সম্ভ্রমাদ্বিবেকের অপ্রীতি-ভাঙন হইবার আশঙ্কায় হিন্দু-পুরাণ হইতে দুইতর দিতে বিরত হইলাম। পাঠককে প্রতীচ্যপুরাণ-বর্ণিত ভিনাসবিবেচী ঘিণোলিটাসের ও ব্যাকাস-বিবেচী পেন্‌বিউলের পরিণাম স্বরণ করিতে অনুরোধ করি। বিবেচকেরও বনজাপে সে শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছিল। আর লেখিকা মেঘপ্রসূক্ত নাট্যকোচিত অন্তর্কিত ঘটনার তাহার দণ্ডকাল সংক্ষেপ করিয়া তাহাকে মুক্ত দিয়াছেন এবং সাবিত্রীর অনাবিল ভালবাসার ভেতলে তাহার হৃদয়-কত দূর করিয়া দিয়াছেন। তখন স্থখী হইয়া সে বুঝিয়াছে, প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কেবল হুঃখ।

এই সমস্তার অনুরাগে সতীর চরিত্রে দেখা গিয়াছে। জাহ্নবী বলিয়াছিলেন,—“সতী আমার কুমারী”। সেই কথাই সত্য। যে হিসাবে হাড়ির টেস সত্য বা প্রাক্ট এলেনের The Woman Who Did সতী—সতী সে হিসাবে—সেই পান্ডিত্য আদর্শে সতী নহে। সে আদর্শের প্রাচ্য নির্ধম ও নির্ধল আদর্শে সতী। বিবেচকের প্রতি তাহার যে অনুরাগ, সে অলঙ্কার প্রতি অনুরাগ—সে ভক্তি। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—“যা’রে বলে ভালবাসা, তা’রে বলে পূজা।” কিন্তু ভালবাসা পূজার নামান্তর মাত্র নহে; পরম পূজা হইতে বহু নিরে অবস্থিত। ভালবাসার কামনা আছে—পূজার সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ। শ্রীধার কৃষ্ণপ্রীতি পূজা বলিয়াই তিনি “ব্রহ্মরমণী কুলদুহুটমণি।” সতীর যে পত্র বার বার পাঠ করিলে তবে তাহার স্বরূপ

উপলব্ধ হয়, সেই পত্রে এই পুকার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভ্রমর গোবিন্দ-
লালকে যে পত্র লিখিয়াছিল, সে পত্রের সহিত সতীর পত্রের তুলনা করিলে
কথাটা সহজেই বুঝা যাইবে। ভ্রমর স্বামীকে পত্র লিখিয়াছিল—তাছাড়া
ভক্তির পাত্রাপাত্র-বিচার ছিল; সতী দেবতাকে পত্র লিখিয়াছিল—“আজ
আর কোন কাজ নাই—আজ আমার বিশ্রাম। তাই বোধ হয়, তুমি আসিয়া
সমুখে দাঁড়াইয়াছ। * * * তোমার উপর রাগ কি সাধে?” সতী
বরিল—কিন্তু বরিব্যবসায় তাহার আঁট কঠোর আত্মসংযম আর তাহার
নারীপ্রকৃতির চাপিয়া রাখিতে পারিল না; তাই সে বিবেচনাকে পত্র
লিখিল। জীপ্তকৃতির সহিত ভালবাসার—ভক্তির পাত্রের উপর কঠোরতার
অসামঞ্জস্য লেখিকা ‘অন্নপূর্ণার মন্দিরে’, ‘আর্য্যাবর্ত্তে’ প্রকাশিত ‘প্রতাপনে’ ও
‘প্রবাসী’তে প্রকাশিত ‘বিদী’তে দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন—কোম-
লতাতেই রমণীর বিশেষত্ব—কোমলতাতেই রমণীর গৌরব। সতী বরিল—
“আত্মবিনিময়ে” “স্বা ভাই বোমকে” বিপদুক্ত করিয়া হিন্দু রমণীর—হিন্দু
বিধবার আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শ অক্ষর রাখিয়া সে বরিল। কেন না, তাহাকে
দিয়া জীপ্তকৃতির স্বাভাবিক সামাজিক সম্বন্ধসমস্তার সমাধান সম্ভব নহে। সে
সমস্তার সমাধান হইল, যখন পুত্রকের শেষ পৃষ্ঠায় “সৌম্য্য ক্ষৌর-বজ্র-পরি-
হিত্য অন্নপূর্ণা একটি অতি ক্ষুদ্র কুম্ভকলিকাভূলা শিশুকে আনিয়া সাবিত্রীর
অঙ্গে দিলেন”—যখন অন্নপূর্ণার দেহ, সতীর অতিশয়লাভপ্রাপী আত্মীয়ের
বিবেচনায় ভালবাসা, সাবিত্রীর ভক্তি সবই সম্মিলিত হইয়া সেই শিশুতে
বিকশিত হইয়া উঠিল—যখন “অন্নপূর্ণার মন্দিরের প্রেমময়ী প্রতিমা যাত্ৰাঘের
পূর্ণ মূর্ত্তিতে অগতে অজস্র রোমাঞ্চ” বর্ধিত করিল। মূর্ত্তনৈজ দর্শককে সেই
পূর্ণা-মূর্ত্তির পৌণৈপাৰ্শ্ব রাখিয়া আত্মতা বিহার লইলান।

ব্রতকথা ও নারীর গাহস্থ্য ধর্ম্ম । ❀

সে কালে আমাদের প্রাচীন লক্ষ্মীধরপিনী গৃহবীরা লক্ষ্য ব্যায় বাঙ্গালার ব্রতকথা বাঙ্গালী সমাজের অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন ।

তাঁহারা সূচাক্রমে গৃহস্থানী করিতে আনিভেন, দেব-সেবা, গো-সেবা, অতিথি-সৎকার, দেবতাত্মাক্ষেণে ভক্তি, পিতা মাতা স্বামী, যত্নর যাতড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি এবং সংসারের সমুদায় কার্য্যে আত্ম-নির্ভরতা শুণে বিজুবিজা ছিলেন । তাই তাঁহারা বালিকা ও বধুদিগের শিক্ষার অল্প পবিত্র সরল সঙ্গীতির কথা বাঙ্গালার ব্রতকথায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন । যাহাতে প্রত্যেক বালিকা ও বধু তাঁহাদের দ্বারা শিক্ষালাভ করিতে পারে এবং তাঁহাদের দ্বারা আদর্শ গৃহিনী হইতে সক্ষম হয়, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল ।

বাঙ্গালার ব্রতকথায় বধু ও বালিকাদের আনন্দে সংসার নির্বাহের ও নারী-বর্ষ-পালনের সুন্দর ব্যবস্থা আছে । যাহাতে বালিকাদিগের অল্প বয়স হইতেই দয়া, যমতা, শ্রেয়, সংযম, কর্তব্যশিক্ষা, ভক্তি, গৃহস্থানী, পরোপকার, অতিথি-সৎকার, গোসেবা, নিত্য-সুচিন্তা সুখে দুখে স্বামীর সহগামিনী হইবার বাসনা প্রভৃতি সবলকষ্টে তাঁহাদের হৃদয়লব্ধ হয়, সেই অল্পই ব্রতকথার সৃষ্টি । খুলাখেলার ছলে আলিপনা প্রভৃতি সুন্দর শিল্পের শিক্ষাও বিকশিত হয় ।

হরির চরণ ব্রতঃ—আমরা বৈশাখ মাসকেই বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া ধরি । সে মাসে হরির চরণ ব্রততে সুন্দর শিক্ষার বিষয় আছে । প্রতিদিন প্রত্যুবে শয্যাভ্যাগের অভ্যাগ করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, আঙ্গিনা প্রভৃতি কাঁট দেওয়া, ঘর ঘর পরিষ্কৃত করা, ফুল চন্দন ইত্যাদির দ্বারা পূজার কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় । অল্পবয়সী বালিকারা খেলার ছলে আনন্দে গৃহস্থানী ও দেবসেবা কেমন সুমধুর ভক্তিমভাবে করিয়া থাকে । আমাদের হিন্দু গৃহস্থের বিশ্বাস, বৈশাখ মাস যদি ভাল ভাবে যায়, তাহা হইলে বৎসরের অবশিষ্ট কালও ঠিক সেই ভাবে যাইবে ।

বসুধারার ব্রতঃ—চৈত্র মাসে এই ব্রত করিতে হয় । ইহাতে জ্বলনী পাছে জল দিতে হয় । হিন্দুগৃহে জ্বলনী গাছ না থাকিলে সে গৃহ

গৃহ বলিয়াই ধরা হয় না—তাই যাহাতে তৈলাঠ মালের রৌদ্রের তাপে পাছটি শুকাইয়া না যায়, তাহারই সুব্যবস্থা ত্রৈলোচর ছপে করা হইয়াছে । যাহাতে বালিকারা নিজের সংসারে ঐ ভাবে প্রকৃতি পণ্যের বাঁচাইয়া রাখিতে পারে এবং হুংখী প্রভৃতিকে স্বাস্থ্য বিতরণ করিতে শিক্ষা করে, এই লক্ষ্য বসুধারার অত-প্রতিষ্ঠা ।

মনসা অত :—স্রাবণ মাসে মনসা অত । ইহাতে বেহলার নারীবর্ষের ইতিহাস নারী মায়েদেরই শিক্ষণীয় ।

ভাত্র মাসে “ভাদ্রশী অত” । ইহাতে আলিপনা দেওয়া এবং ব্রাহ্মণকে ভক্তি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় ।

আশ্বিন মাসে “বমপূর্ন অত” । ইহাতে খত্তর খাওড়ীর প্রতি ভক্তি, দেবতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, পরসেবার শিক্ষা দেওয়া হয় ।

কার্তিক মাসে “কুলকুণ্ডলী অত” । ইহাতে কুলশীতলার প্রদীপ দেওয়া, লক্ষ্যার সময় গৃহস্থের ঘরে হুণ প্রদীপ দেওয়া, গৃহলক্ষ্মীর কর্তব্য কর্ত্ত এবং কুলের মঙ্গলকামনা করা প্রভৃতি অনেক শিক্ষা করিবার আছে ।

অগ্রহায়ণ মাসে “সেঁজুতী অত” । এই ত্রৈলোচর বামীর মঙ্গলকামনার, খত্তর-বাড়ীর ও পিত্রালয়ের মঙ্গলকামনার শিক্ষা হয় । এই সকল ত্রৈলোচর ছপে বালিকারা অনেক কল, কুলের নাম ও অন্যান্য বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলে ।

পৌষ মাসে “ভূষানী অত” । অত-কথাও ছপে প্রাচীন গৃহস্থীগণ কেমন লং শিক্ষার অঙ্কণে করিয়া গিয়াছেন ;—

“সীতার মতন সতী হ’ব,
কুন্ডীর মতন পুন্ডবতী হ’ব,
পৃথিবীর মতন ধীর হ’ব,
লক্ষার মতন শীতল হ’ব ।”
“গৌরী মা গো মাগি বর—
স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে করি বর ।”

এই প্রকার প্রতি ছপে বঙ্গীয় বালিকার শিক্ষার বিষয় আছে ।

মাঘ মাসে “জিহুন-চতুর্ধীর অত” । কথা আছে—এক রাজার রাণী • এবং এক কৃষকের প্রী অত করিয়াছিলেন । রাণী করিয়াছিলেন “অলক্ষ্য-চতুর্ধীর” আর কৃষকপত্নী করিয়াছিলেন “জিহুন-চতুর্ধীর” অত । বিনি

অলঙ্কারের ত্রুটি করিয়াছিলেন, তাঁহার গাত্রে অলঙ্কার পরিত না, আর যিনি ত্রিভুবন-চতুর্ধারী ত্রুটি করিয়াছিলেন, তিনি অলঙ্কার পরেন নাই। তাহাতে তিনি একটুও হুম্বিতা ছিলেন না। রাণীর অলঙ্কারে বাড়ী ভরিয়া গেল, ব্রাহ্মিবার বাইবার ব্যয়গা রহিল না। রাজ্য ভরা অলঙ্কারের ভায়ে সকলে বিরক্ত হইয়া গেল। আর কৃষকপত্নীর ঘানে মরাই ভরিয়া উঠিল—সে সমস্ত তিনি যথেষ্ট রাখিলেন। গোয়ালভরা গরু, মাচাতরা লাউ, কুমড়া, ডাল, কড়াই, গাছের ফল ইত্যাদি প্রবো তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্ঞানি গোষ্ঠি লইয়া তিনি সুখে বস করেন, দীন-দরিদ্রকে খাওয়ান—তাঁহার কোন দুঃখই রহিল না। কিন্তু রাণীর অত অলঙ্কারে কিছুই সুখ হইল না। কেমন লিখা। এই ত্রুটি লিখা আছে, যেন সুখ হয় না—যে নারী পাঁচ জনকে লইয়া এবং দান, পরোপকার করিয়া গৃহস্থালী স্ফটিকরূপে সম্পন্ন করিতে পারেন, তিনিই নারীর আদর্শ এবং সর্ব্ব সুখী।

কান্তন্য মানে “কান্তন্যোৎসব”। ইহাতে শাশু-শাশুরের পূজা কি প্রকারে তত্ত্বিতভাবে তৃষ্ণিত হইয়া করা উচিত, তাহার শিক্ষা আছে।

চৈত্র মাসে “লক্ষ্মীপূজা”। ইহাতে বালিকারা শিবপূজা শিক্ষা করিয়া বাছাতে স্বামীর পূজা করিতে শিখে, তাহারই শিক্ষালাভ করে। চৈত্র মাসে “গোকুল ত্রুটি”ও আছে। ইহাতে সকলে উঠিয়া গো-সেবা করার শিক্ষা আছে।

প্রাচীনায়ু ত্রুটির ছন্দে এই প্রকার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়া-ছিলেন। বালিকা-বয়স হইতেই এই সকল শিক্ষা করা উচিত। কারণ, বালিকার পাপপুণ্য কোমল জগরে এই সকল শিক্ষা সহজেই প্রবেশ হইয়া যায় এবং একবার এই সঙ্গতিগুলির বীজ তাহাদের মনে অঙ্কুরিত হইলে তাহা আর সহজে দূর হয় না।

আমরা বুঝিতে পারি না যে, আমরা প্রাচীনাদিগের ন্যায় আদর্শ-গৃহিণী হইতে পারি নাই। তাহাদের সেই সধিকৃতা প্রভৃতি সঙ্গতিগুলি আমরা হেলায় হারাইয়াছি। আমরা শিবিরাজি, শুধু বিলাসিতা। আমরা বুঝি না যে, পার্শ্ববর্ত্তীই রমণীয় ধর্ম্ম। বাল্যায়ু ত্রুটিবাদের প্রতি ছাত্রের সেই ধর্ম্মের শিক্ষা রহিয়াছে।

এই ধর্ম্মশিক্ষা না করিলে বাল্যায়ু ত্রুটির বিলাসের আগার হইয়া আপনাদের পাপে আপনাদিগের প্রণষ্ট হইবে।

শ্রীমতী কমললতা ভট্টাচাৰ্য্য ।

কম্মা ।

১

বসন্তের শুরুপক্ষে শুভ্র বনবনের মিত্র ক্রিয়ণে পরনী বাত্মরী। প্রস্তুতিত কুম্মের ও অত্রগুহুলের বৃহৎ সৌরভে চরুর্দিক আয়োজিত। বিমনস কুম্মের নবোদগত বৃহৎকারিত পত্রপুষ্পস্ত্রাণে ভরল জ্যোৎস্নার চকল জাড়া। উপরে অসাম নীলিমার শান্ত উদারতা। এমনই বৃহৎ গভবাহী দক্ষিণের বাতাসে তাহার মনে যখন বহুদিনের অল্পষ্ট পুরাতন স্মৃতিজল জাগিয়া উঠিতেছিল, পতির মত সে যখন তাহার ক্ষম্যে এত অপূর্ণ ব্যাধুল তৃকা অহুতব করিতেছিল, যখন বহুদিনের চুখনের পুণ্যতন স্মৃতি আবার তাহার নূতন বোধ হইতেছিল—দেই সময়ে ডাক্তার অমির বাবু গ্রীষ্মা কোন কাৰে মনঃসংযোগ করিতে না পারিয়া বাহিরের বাতাসের আশ্রয় লাভচারণা করিতেছিল।

সুখা সুন্দরী—সুখভা,—নববিকশিত যৌবনের লাবণ্যে তাহার তহু দেহ বসন্তের নবপুষ্টিত লতিকার মত কমলীয় দেখাইতেছিল; সূচিকণ গোলাপী বস্ত্রভূষিত তাহার শোভা সফার রক্তাকালে শুভ্র অলস মেঘের মত লক্ষ্যহীন হইয়া ভাসিয়া বাইতেছিল। সৌন্দর্যের একটা বৃহদীত ছায়া কোমল মাতৃস্নেহের দ্বার তাহার সর্বত্র আশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিল।

নীলাসুখা বহু সময়ের এসল ব্যারিবিভাগের উপর শুভ্র গ্রানাইটের মত, প্রথম যৌবনের অল্পষ্ট প্রেমমগ্নের মত, মানবের অন্তর্নিহিত অতৃপ্ত মৌলভ্য-পিপাসার মত, সমগ্রকীবনব্যাপী কঠোর সাধনার চরম লক্ষ্যের মত, সকল কামনার চির পরিভূতির মত—সুখা—সুন্দরী।

সুখা বারান্দার ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং মাঝে মাঝে হাসপাতালের পথের দিকে চাহিতেছিল। অমির বাবু যদিও বৈদ্যিক যন্ত্রেই নাই এবং নিয়মিত ফার্মা আসিবে, তথাপি এ বিলম্বও যেন তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইতেছিল।

অল্পকাল পরেই রোগী দেখিয়া ডাক্তার বাবু ফিরিয়া আসিলেন। বস্ত্র-পরিবর্তন করিয়া সুখার পাশে বসিয়া উদ্ভাস দৃষ্টি আকাশবদ করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন। আজ হাসপাতালের রোগী দেখিয়া বোধ হয়, তাহার কল হুই ছিল না।

তিনি ভাবিতে লাগলেন—এই জ্যোৎস্না—এই কুসুমসৌরভসুগন্ধিত যুগ্ম পবনের চকল প্রবাহ আর এই বৌধমসৌন্দর্য্যময়ী পতিপরায়াণা পত্নী ; তবুও তিনি আজ এ সব উপভোগ করিতে পারিতেছেন না ? কিছুকণ চিন্তার পর তিনি কহিলেন, “সুখা; আজ আমার শরীর ভাল বোধ হইতেছে না, চল, ঘরে যাই ।”

সুখা চিন্তিত হইল। ডাক্তার বাবু বলিলেন—“সুখা, আজ আমি যেন এক অজানা অচেনা দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। ঈতপ্রভাতের কুক্ষতিকার অন্তরালে লুকাহিত সুদূরলকা উন্নিময় সাগরের অম্পট নীলাভাসের স্রার কোন্ অস্তরঙ্গের কোন্ অম্পট স্বাত যেন আমার মনে পড়িতেছে।”

সুখা বলিল, “আমি ও তোমাকে পূর্ণ্বেই বলিয়াছি, ও হাসপাতাল যারগা ভাল নহে ; ওখানে সন্ধ্যার পর বাওয়া ভাল নহে।”

সুখা ভাবিতে লাগিল—হাসপাতালে কত রোগী থাকে ; কতজন কত প্রাণত্যাগী আশা, কত বৃক্ষফাটা ভালবাসা, কত অতৃপ্ত বাহুল্য বাসনা লইয়া কত অনিচ্ছায় প্রাণত্যাগ করে। উহার বাহু কত হতাশজনদের তত্ত্ববাসে পরিপূর্ণ, উহার প্রত্যেক ঘর—প্রত্যেক দেওয়ান—এমন কি, প্রত্যেক তৃণটি পর্য্যন্ত কত করুণ কাহিনীর ইতিহাস বহন করে ! উহার বক্ষে কত পিপাসী আত্মা বাহিতের স্মৃতির পার্শ্বে সুরিয়া বেড়ায়। সে কহিল, “ওখানে যাইলে শান্তির ঘন উদাস না হইয়া থাকিতে পারে না। হয় ত কোনও ভীষণ মনুষ্যের মরণ-বহন প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাই তোমার এ ভাবান্তর—এখন হুপ করিয়া নিশ্বাস বাও, কাল প্রাতে সব সারিয়া যাইবে।”

ডাক্তার বলিলেন—“সুখা, আমি ও সব ভয় করি না। কিন্তু কেন যে এমন হইল, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না।”

তিনি সুখার কোমল হস্ত দুইখনি আপনার দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া বলিলেন ; কিন্তু তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, তিনি যেন কোন প্রেতের ককালবর স্পর্শ হস্ত ধরিয়া আছেন। তিনি উহা পরিত্যাগ করিলেন।

সুখার চক্ষু আর হইয়া উঠিল ;—সে কহিল, “তোমার মস্তিষ্কের কোন রোগ হয় নাই ত ?”

ডাক্তার বলিলেন,—“না, সুখা, আমি বেশ সুস্থ ও সজ্ঞান আছি।” ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। তিনি যতই তাহাকে টানিতে থাকেন এবং সুখা যতই তাঁহার বুকের সহিত মিশিতে থাকে ততই

তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, দুই জনের মধ্যে যেন কোথাও ব্যবধান রহিয়াছে এবং সেই ব্যবধানে যেম কাহার সুস্থান্ধিতগ পঞ্জরাহি পড়িয়া আছে! তিনি সুধাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং গভ্বাণ্ডা তাহার গও স্পর্শ করিলেন—কিস্ত কৈ? আবেগের সে চিহ্নভাঙ উচ্চতা তথায় কৈ? তথায়ও যে সেই একই রূপ শীতলতা এবং লোল চর্মের নিখিলতা ।

অতঃপর ডাক্তার বাবু অনন্তোপাধ্যায় হইয়া নিভ্রায় চোঁটা করিতে লাগিলেন ।

সুধা নরনের লগ্নে উপাধান সিন্ধু করিয়া স্বামী প্রাণোপায় কামনা করিয়া মিকট প্রার্থনা করিয়া নিভ্রাহীন নয়নে আগিয়া রহিল ।

২

নুতন হইলেও আশানের ডাক্তার বাবুর অস্ত্র দিনেই বেশ সুনাম হইয়াছে । চিকিৎসানৈপুণ্যের সহিত তাঁহার সরল স্মৃতি ব্যবহার এবং দরিদ্র রোগীর প্রতি দয়া সকলেরই শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।

ডাক্তার বাবু আশ সকাল সকাল হাসপাতালে রোগী দেখিতে আসিয়াছেন । হাসপাতালেই সে তাঁহার চিকিৎসার কারণ খুঁজিয়াছে, তিনিও এখন তাহা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন । বিশেষতঃ কাল একটি নুতন রকমের রোগী আসিয়াছে ; তাহাকে দেখিয়াই যেন তাঁহার মন কেমন হইয়াছে । এক্ষণ রোগী ডাক্তার বাবু আর কখনও দেখেন নাই, এবং হাসপাতালের বৃদ্ধা নার্সগণও কখন দেখেন নাই ।

মুক্তবাহুসেবিত বিজ্ঞত মরণানের মধ্যে হাসপাতাল সুহ-অবস্থিত । কক্ষগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—প্রত্যেক রোগীর একখানা খাটিয়া, একখানা কবল এবং একখানা শাণা চাদর ; সম্মুখে একখানি ছোট টুল—তাঁহার উপর একটি মাস অথবা বাটি এবং কোথাও রোগীর পথ—সামান্য কল-মূল ।

কেহ বা সারাগ্রাস্তি অনিচ্ছায় কাটাইয়াছে, কেহ তখনও নিভ্রা যাইতেছে ; কেহ বা অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, কেহ বস্ত্রপাশ ছুঁকট করিতেছে এবং কেহ বা কতকটা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে । যাহারা অপেক্ষাকৃত সবল, তাহারা বসিয়া পরস্পরের সহিত গল্প করিতেছে ।

নার্স ব্যস্ত হইয়া যে স্থানে যাহা দরকার, সে স্থানে তাহা দেখিতেছেন, বাহার বেতন দরকার তাহাই করিতেছেন ।

ডাক্তার বাবু একে একে সকল রোগী দেখিয়া অবশেষে সেই আশ্চর্য রোগীর নিকটে আসিলেন । কাল ব্যস্ততাবশতঃ এবং চিকিৎসাক্রমতার ন্যায়

ইহাকে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই । তিনি নার্সের কাছে অনিলেন, রোগিনী উদ্ভাদ—বুকে ভরফর বেদনা এবং ভীষণ প্রদাহ । রোগিনী বলে, তাহার বুক যেন অনেক দিন হইতে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউতেছে—প্রায় সকল সময়েই সে বুকের আশ্রয় নিবাইবার জন্য বুক জল ঢালে ; কিন্তু কিছুতেই তাহার এ আশ্রয় যায় না । কাল সমস্ত প্রাণিই সে এইরূপ করিয়াছে ।

ডাক্তার বাবুর নিকে চাহিয়াই রোগিনী চক্ষু নৃত্ত করিল এবং পাখ-পরিবর্তন করিয়া শয়ন করিল ।

সন্ধ্যাবে দারুণ মনস্তাপের কালিমার আবরণ থাকিলেও পত সৌন্দর্য্যের একটা লুপ্তমার আভা এখনও রোগিনীর পরীরে দেখিতে পাওয়া যায়—রোগিনী যে এককালে সুন্দরী ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায় । রোগিনীকে দেখিয়াই ডাক্তার বাবু অত্যন্ত মনঃস্থ হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার রোগের কথা মনে করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তোষ এবং অবসন্নতা ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না । তিনি বুঝিলেন না, তাহার বুক একরূপ ভীষণ বেদনা, একরূপ প্রদাহ, তাহার বুক স্তব্ধ থাকিতে পারে না ।

কিছুক্ষণ পরে রোগিনী আবার ডাক্তার বাবুর নিকে চাহিল । এবার তাহার চক্ষু পরিষ্কার—দৃষ্টি করুণ এবং স্থির । ডাক্তার বাবু ভাল করিয়া রোগিনীর মুখ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন—রোগিনী ছই যাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া অনেক কষ্টে তাহার উদাত্ত অঙ্গ কঁচ করিয়া শুধু ডাক্তার বাবুর নিকে চাহিয়া রহিল । ডাক্তার বাবুর ভাল মনে হইতেছিল না ; তবু যেন যেন পড়িতেছি, ইহাকে কোথায় দেখিয়াছেন—এ যেন তাহার পরিচিত ! কিন্তু সে যখন বলিল, “আমার যন্ত্রণা বড়ই বাড়িয়াছে—আমি আর বাচিব না ; আজ সন্ধ্যাকালে একবার তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিও,” তখন আর ডাক্তার বাবুর কোন সংশয়ই রহিল না । তখন তাহার সেই ভাঙ্গা-জীবনের কথা আর সেই সঙ্গে এই রোগিনীর কথা—তাহার জীবনের একমাত্র দুঃখের এবং কলঙ্কের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল । সেই কথা কি তিনি এককাল ভুলিয়া ছিলেন—ভুলিযেন না কেন ? যুগ্ম মত রূপবতী প্রেমময়ী স্ত্রী বাহার ধরে, সে কি যৌবনের অধিমুখ্যকারিতার স্বত্তি সম্বন্ধে রক্ষা করে ? ডাক্তার বাবুর অন্তঃকরণে দুঃপণ্ড যন্ত্রণা এবং লজ্জার উদয় হইল । যন্ত্রণা—এই রমণীর এই দুঃস্বপ্নের অনেকটা কারণ তিনি এবং লজ্জা এই যে,

সুখা ইহা শুনিলে কি মনে করিলে ? কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন, তাঁহার দোষ কি ? এরূপ পাপিনীকে কে আদর করিতে পারে ? ইহাকে ছদ্মরূপে করিয়া কে কৃত্রিম হইতে পারে ? দোষীর ইহা ভিন্ন আর লক্ষণা কি ? তিনি সুখাকে লইয়া আসিলেন কিনা তাহাই চিন্তা করিতে করিতে ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন ; একবার ভাবিলেন, সুখা ইহা না শুনিলেই ভাল হয় ;—আবার ভাবিলেন, যদি সে কোনক্রমে ইহা জানিতে পারে তবে কি তাঁহার এই আত্মদোষে সে সুখী হইবে ? তাহার উপর যুযুঁত এই অস্বস্তি অস্বস্তি। তিনি সুখাকে লইয়া আসিলেন স্থির করিলেন ।

৩

ডাক্তার বাবু বলিলেন, “সুখা, তুমি অনেক দিন হাসপাতাল দেখিতে চাহিয়াছ ; কিন্তু নানা কারণে এতদিন তোমার সে সাধ পূর্ণ হয় নাই । এবার একটি অল্পট রোগী আসিয়াছে, সে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছে । বাইবে কি ?”

সুখা, “আমাকে দেখিতে চাহিয়াছে ! তবে কি সে আমাকে চিনে ?”

“চিনিবেও চিনিতে পারে—সে অনেকটা উদ্বার হয় তা ইহা তাহার একটা খেয়াল মাত্র । তাহার লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, সে আর বাঁচিবে না । তাই তোমাকে বলিতেছিলাম ।”

“নিশ্চয় বাইব । হয়ত সে কত যন্ত্রণা পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে, কিন্তু আমাকে দেখিলে তাহার কিছু শান্তি হইতে পারে । বিশেষতঃ তুমি লজ্জা থাকিবে তখন আর আমার বাইতে বাধা কি ? কখন বাইতে ?”

“আমার যাওয়ার সময় হইয়া আসিল—সন্ধ্যা হইলেই বাইব । এত অনীরা হইও না—আমি কিন্তু বলিতেছি, বাইলে তুমি বোধ হয় বিশেষ সুখী হইবে না ।”

সুখা স্বামীর কণ্ঠস্বর হইয়া প্রেমাপন্ন কণ্ঠে কহিল, “কেন প্রিয়তম, তোমার লজ্জা কি আমার সমস্ত উদ্বেগ দূর করিতে পারিবে না ?”

“সে বাউকু তোমার যখন আন্তরিক ইচ্ছা তখন আর আমার ইহাতে আপত্তির কারণ নাই ।”

“যদি তুমি অস্বস্তি হও তবে আর আমার বাইবার ইচ্ছা নাই ।” সুখার মুখ তার হইল—ইহা দেখিয়া ডাক্তার বাবু সবেহে সুখার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, “চল, আর অভিযানে কাৰ নাই ।” সুখা যেন কি বলিতে বাইতে—

হিস কিস্ত তাহার কলিত রক্তাধর বিতক্ত হইবার পূর্বেই ডাক্তার বাবু বীর অধরেরদ্বারা তাহার বাক্যশ্রোত বন্ধ করিয়া দিলেন ।

৪

আজ আর রোগিনীকে কোন যত্ন নাহি ; বাতুলতার কোন লক্ষণও নাই । আজ তাহার দৃষ্টি বীর স্থির গন্তীর এবং উদাস—তাহার চক্ষু দেখিলে বোধ হয় এককাল ভেঁটার পর সে যেন কিসে কৃতকার্য হইয়াছে । তাহার মুখে স্থিরসংকল্পের ভাব । বৈকাল হইতেই সে উঠিয়া বসিয়াছে ; হাসিয়া কথাবাতা করিয়াছে । ক্রমে বেলা বত পড়িতে লাগিল, তাহার ব্যাকুলতা ততই বাড়িতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে অধীর হইয়া সে পথের দিকে চাহিতে লাগিল ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দূর হইতে কাহার মুক্তি দেখিয়া সে নিবরিয়া উঠিল ; বুকের আলার সে আবার ছটফট করিতে লাগিল । নাস'রাও ব্যত হইলেন ।

অল্পকণ পরেই সুবার সহিত ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন—মাস'পণ তথা হইতে সরিয়া গেল । রোগিনী দুই হাতে কোর করিয়া বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, “সুখা, ভগিনী, তুমি আমাকে চিন না—কিন্তু আমি তোমাকে চিনি । প্রার্থনা করি, চিরকাল স্বামীর এইরূপ সোহাগে সোহাগিনী থাক ।”

সুখা ভক্তিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল । রোগিনী আবার বলিল, “তোমার স্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে, আমি কে ।”

রোগিনী আবার যত্নগায় ছটফট করিতে লাগিল । তাহার মুখে গভীর যত্নগার রেখা হুটিয়া উঠিল । ঘন ঘন আত্মকনপ্রসারণে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্টন হইয়া উঠিল—দেখিয়া সুখা ও ডাক্তার বাবু উভয়েই চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল । যত্নগার বেগ কতকটা প্রশমিত হইলে সে ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—“অমিয়, অনেক কষ্টে তোমার মেধা পাইয়াছি—তোমার বাসায় বাইতে পারি নাই ; কারণ তথায় বাইবার এখন আর আমার কোন অবিকার নাই এবং পূর্বের কথা মনে করিয়া এখন আর এ ভাবে বাইতে ইচ্ছাও হয় নাই । তাই সাধারণ স্থানে তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি । তুমি আমার কথা করিও ।”

ডাক্তার খানু বলিলেন, “তোমার অবস্থার আমি হুঃখিত ; কিন্তু তোমার কন্যা কন্যা। তোমার মত পতিতাকে কন্যা—সেত বাহুবের পক্ষে সম্ভব নহে।”

রোগিনীর শান্ত তাব হুঃ হইয়া গেল, সে উদ্বেজিত হইয়া উঠিল—তাহার চক্ষু অগ্নিতে লাগিল—“অমির, আমি পতিতা, কন্যারও অযোগ্য। আর তুমি ? তুমি বড় পবিত্র ? তুমি আমার সর্জন্য করিয়া আমার এই সরলা বালিকার সর্জন্যে উত্তম হইয়াছ ; তুমি বড় পুণ্যবান ?”

“আমি তোমার কি সর্জন্য করিয়াছি ? তুমি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমার নামে কেন মিথ্যা কপক দিতেছ ? তুমি প্রেরণার স্রোতে ত্যাগী নীচেই কণ্ঠিত হইয়াছ। আমি তোমার সহিত কলুষিত হই নাই ; এই আমার অপরাধ।”

“আমি যে প্রেরণার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলাম, সে কি তুমি আমার দোষ ? তুমি আমার মৃত প্রেরণা অল্পে অল্পে আগাইয়া দিয়া—যখন আমি প্রাণত্যাগী লইয়া—তবিল জীবনের মধুর স্বপ্নে বিতোপ হইয়া—একান্তই তোমার হইয়া সাধক ভক্তের শেষ উপহারের স্বায় আমার মনপ্রাণ তোমাকে নিবেদন করিয়াছিলাম, তখন তুমি বিজ্ঞপের তীক্ষ্ণরে তাহা বিদ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যে তাহাকে ব্যর্থিত করিয়া সেই রক্তাক্ত ছদয়ের উপর দিয়া চলিয়া গেলে। অথচ তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চাপে, মিথোষ ?”

“তুমি হিন্দু ; হিন্দু বিশ্বাস মত হতাশ ছদয়ে সহ্য করিলেই ত পারিতে। পাপের পথে প্রেরণার সেবার কলুষিত হইলে কেন ?”

“বুঝিলাম ; কিন্তু প্রেরণার নিয়োগ এতই সহজ ?” বলিতে বলিতে রোগিনী উদ্বাদের স্বায় উঠিয়া বসিল এবং অবিকৃতর বেগে বক্ষ চাপিয়া ধরিল। সে যেন পূর্ব্বের স্বায় আমার প্রেরণার দুর্ভাগ্যবতী। অতীব করিতে লাগিল। সে বলিল, “রমণীর জীবনে এক বারের দুর্ভাগ্যতা কি কন্যার এতই অযোগ্য ? তাহার পর সর্জন্য তোমার সজ লইয়াছি। তোমার বিবাহের সময়ও উপস্থিত ছিলাম। ভিখারিনী দেখিয়া আমার চিন্তিতে পার নাই—কি কষ্টে সে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে—বুকের সেই বেদনা, সেই আশা ! তাহাই ক্রমে এই দুর্ভাগ্যবতী ব্যথিতে পরিণত হইয়াছে। ওঃ ইহার কি যন্ত্রণা ! তুমি কি বুঝিবে, অমির ? তুমি কি বুঝিবে, রোগী হইয়া কত কষ্টে তোমার নিকট কন্যা লইতে আসিয়াছি ? ঈশ্বর তোমার কন্যা করুন আমার এই

মনস্তাপের আশার ছায়া যাত্রাও যেন তোমাকে ল্পর্শ করিয়া বিলুপ্ত যাত্রা বটে না দেয় ।”

তাহার যত্নশীল আবার বাড়িয়া উঠিল—সে আত্মনাদ করিয়া বিজ্ঞানীর উপর চলিয়া পড়িল,

সুখা হতবুদ্ধি হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল ।

ঐশ্বরীপ্রভুশরণ গোপাধ্যায় ।

সত্য ।

সত্য সে ত অবিনাশ সাধনার ফল,
ওরুহ সুকের রক্তে সরস মধুর,
নহে সে তলীন জ্বল অলস উজল
কণিক কামনারাজ্য লতিকা-বধুর ।

এ নহে জনকমত্ত অনারাগসাগর,
ছলজিত, অগচ্ছত রাজসিংহাসন ।
এ যে জয়—নিখিলজয়—বক্ষে লতি' ক্ষত
হারাইয়া বর্ষসুখে সত্যতিব্রজন ।

এ যে নহে স্বতঃস্ফূর্ত, গিরিপাদতলে,
অতুর ঐশ্যবগত উৎসবারাচর,
ভূমিপতি এ যে বহু বননের বেলে;
উখিত সুপের জল অমল অক্ষর !

এ নহে চাঁদের আলো শীতল তরল,
এ হে দীর্ঘ বন-জন্মে চলল; প্রবর
স্নেহের আশীষ নহে হান্ত দুর্জয়দল,
কাননে কান্তারে তপে অর্জিত এ বর ।

ঐক্যানন্দ রায় ।

বিষ্ণুপুর।

পাঠানগণ কর্তৃক লক্ষণাবতী বিজয়ের কিকিরান পক্ষপাতী পুৰী বিষ্ণুপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। বহুসংখ্যক অংগোমুখ মন্দির আজিও বাহুল্যগা, একটেকর ও লোনাটোপেখণের ছায়াশীতল বনবীথিকার বিজন অন্তঃপুরে বিস্তারিত থাকিয়া বকীর সমুদ্রত শিল্পকমার শাস্ত্রাঙ্গদান করিতেছে এবং করাসুরগড়, অমুরগড় ও ভ্রামহুন্দর গড়ে কতকগুলি প্রাচীন কিলার ভগ্নাবশেষ পর্যটকের দ্বারা বিষ্ণুপুরের অতীত পরিমা-কাহিনী জাগাইয়া দিতেছে।

কালপ্রভাবে সে শৌন্দর্য্যময় বিষ্ণুপুরের সব পরিগর্তিত হইয়া গিয়াছে। যে চকস অজরনদের ফেনিল ও উজ্জ্বলিত উর্জিমালা বিষ্ণুপুরের সীমান্ত প্রদেশ দৌত করিয়া কলনিঃস্বনে প্রবাহিত হইত, সে অজরনদ আজিও বর্তমান,— কিন্তু ভাষার সে উদ্যম বীচিবিক্ষেপে সে গভীর ঢাপলা আর নাই; তাহার ক্রীণ দেহ বালুস্রাবার উপর দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। অতীতের সে সমৃদ্ধ রাজবংশ অবনতির অবতন করে পতিত হইয়া পার্শ্ব ঐশ্বর্য্যখোরবের নব্বর্তা সঙ্গ্রাম করিতেছে। গৃহদেবতা মদনমোহনও ভাষাদিগের গৃহ পরিভ্রাণ করিয়া কলিকাতার এক ধনিপরিবারের হস্তগত হইয়াছেন।

গ্রীক পণ্ডিত আরিস্তোলের উল্লেখিত প্রাচীন Amytis, উইলফোর্ডের মতামুসারে অজরনদ। কিন্তু উক্ত পণ্ডিত Porfalis নামে যে রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আধুনিক বিষ্ণুপুর কি বর্তমান—সুদীর্ঘকর্তৃক তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই।

কবিত আছে যে, বিষ্ণুপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রত্ননাথ সিংহ ব্রহ্মাবনের নিকটস্থ জয়নগরের তৎকালীন কক্সিরনশোভিত নৃপতির সন্তান। (১) কিন্তু ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত The Aboriginal Elements in the Population of Bengal শির্ষক প্রবন্ধে ইহার যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয়। (২)

(১) Vide Hunter's Annals of Rural Bengal, and Records of the Raj Family.

(২) Calcutta Review, 1882.

বিষ্ণুপুরের এই প্রাচীন রাজ্য উত্তরে সাঁওতাল পরগণা হইতে দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল । (৩) বর্ধমানের কিয়দংশ ইহার অধিকারভুক্ত ছিল । যানভূম জিলার প্যাকেট নামক স্থানে আবিস্কৃত শিলালিপিসমূহ হইতে প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে ছোটনাগপুরও বিষ্ণুপুরের পরাক্রান্ত রাজ্যগণের অধীনতা স্বীকার করিত । (৪)

বঙ্গদেশে বিশেষ নৈপুণ্য থাকায় রঘুনাথ বিষ্ণুপুর সিংহাসনে উপবেশন করিয়াই আদিমরূপে উপাধি গ্রহণ করেন । তদবধি বিষ্ণুপুরাধিপতিগণের নামের সহিত উক্ত সম্বানবৃত্তক মরু শব্দ যোজিত এবং বিষ্ণুপুর মরুভূম নামে আখ্যাত হইত । এইরূপ বীরাভূম, যানভূম, গিরেভূম ও ধনভূম প্রদেলে আমরা রাজার নামান্তরারে রাজ্যের নামকরণ দেখিতে পাই ।

আদিমরূপে ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন । তাঁহার মৃত্যুর পর অরম্বর বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে অধিরোধন করেন । অরম্বর রাজকীয় শক্তির প্রভুত পরিমাণে উন্নতি সাধন করতঃ পদাশপুত্ররাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক রাজদুর্গ অধিকৃত করেন । পদাশপুত্রের রাজধানী শত্রুসম্মুখ বিজিত হইলে রাজবাটীর সকলে কানাইসাররের অগ্নে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন । আজিও সে সাররের দেখিতে পাওয়া যায় । উহা দর্শন করিলে পর্য্যটকের মনে এক বিরোধাত্মক নাটকের শেষ কক্ষন দৃশ্যের অংশটুকু ছায়া পতিত হয় ।

অরম্বরের অবতান সপ্তদশ রাজা অগৎমর গৃহদেবতা বাহুবল্লভের নামানুসারে স্বপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী বিষ্ণুপুর বলিয়া পরিচোচিত করেন । (৫) সহসা গোঁরবে ও সৌন্দর্য্যে মহীরাশ এই বিষ্ণুপুর নগরের স্বর্ণমালা, অরম্বর সজীতধ্বনিত প্রবোধকাননশ্রেণী ও ইহার নয়নমুগল কুশাবলী বহু দূর হইতে দর্শকসমূহকে আকৃষ্ট করিত । কিন্তু অগৎমর কেবল সৌন্দর্য্যরসিকের দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই—বিষ্ণুপুরের চতুর্দিকে উচ্চ প্রাকারনির্মাণ ও গভীর পরিধাঘনন পূর্ব্বক উহা সুবৃহৎ ও শত্রুগণের নিকট দুর্ভেদ্য করিয়া তুলেন ।

বীর হাবির এই বংশের আটচছারিপঞ্চম রাজা । বিষ্ণুপুর রাজ্যগণের

৩. (৩) Oldham's Some Historical and Ethnical Aspects of the Burdwan District.

(৪) Reports, Archaeological Survey of India, Vol. VIII.

(৫) বর্তমান অরম্বর বিষ্ণুপুরে বীর রাজধানীস্থাপন করেন ।—লেখক ।

যথোঁতাৰ পিতা বৰ হাৰিহৰী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বৰীয়া স্বেচ্ছাসেৱকগণৰ অধীনত।
 শীকার কৰেন এবং তাঁহাদিগকে বাৰ্ষিক ১,০৭,০০০ টাকা প্রদান করেন।
 বীৰ হাৰিহৰ যে সময় বিজ্ঞপুৰপতি হইলেন সেই সময় বঙ্গগৌৰব প্রতাপা-
 নিভোৰ বীরবিক্রমে বিশাল যোগলবাহিনী পরাক্রান্ত করিয়া দিল্লীর বর-
 তামাশাখন একশ্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। বীৰ হাৰিহৰ বিজ্ঞপুৰ দুৰ্গের
 আকোশপরি আৱেগপ্রসূত্ব সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তৎকালে বিজ্ঞপুৰ-
 রাজের পক্ষনসংখ্যক ও ইহার অধীনস্থ বাহনজন সামন্তরাজের বাহনসংখ্যক
 দুৰ্গ ছিল। (৬) বীৰ হাৰিহরের সময় ঘটতে আমরা বিজ্ঞপুৰের ইতিহাসে
 অগত এই, তাঁহার রাজত্বকালে পাঠানগণ কংলু বীর অধীনে যেদিনীপুৰ
 ও বিজ্ঞপুৰে আধিপত্যস্থাপন করেন (১৫৪২)। (৭) কংলু বীৰ যোগল-সেনাপতি
 বীৰ আম্বেহৰ নিকট পরাক্রান্ত হইলে বিজ্ঞপুৰপতি দিল্লীহরের পক্ষাবলম্বন
 করিলেন এবং মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে শত্রুহত হইতে উদ্ধার করিয়া
 তাঁহার ত্রিগুপ্ত হইয়া উঠিলেন। (৮) তৎকালের ইতিহাসে প্রচেষ্টা
 শ্রীকৃষ্ণ দেবানন্দ ভারতী মহাশয় লিখিয়াছেন,—“বাকালার মানসিংহের
 আগমনকালে যেদিনীপুৰের মাহিষাকূপালগণ, বিজ্ঞপুৰের মল্লকূপালগণ,
 ত্রিগুৰের কুলসন্তানগণ এবং কুচবিহারের বীরবংশীয় রাজগণগণই বাকালার
 সৌৰব আগ্রহ ও আশা ভরসাৰ স্থল ছিল।” কিন্তু মানসিংহের প্রত্যাগমন
 পর উভিভাষ্য পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া বীৰ হাৰিহৰে সাহায্য প্রার্থনা
 করিলে তিনি তৎক্ষণাতঃ কাৰ্য্য না করা হেতু তাহারা বিজ্ঞপুৰ রাণ্য উপকৃত
 করিয়া তুলিয়াছিল। (৯)

বীৰ হাৰিহরের পুত্র তখনাব মল্ল সিংহ এই কজ্জিয় উপাধি গ্রহণ করেন।
 কবিত আছে যে, মূৰ্শিদাবাদের স্বেচ্ছাসেৱক তাঁহার অসাধারণ দৈৱিক বল
 দৰ্শনে ক্রীত হইয়া তাঁহাকে এই উপাধিপ্রদান করেন। কিন্তু ইহার মূলে
 কিছু সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা অসম্ভৱতঃ স্বীকণ স্থির করিবেন।
 তাঁহার ও তৎপুত্ৰগণের রাজত্বকালে বিজ্ঞপুৰ লক্ষ্যতঃ সৰ্বোচ্চ শিখরে
 আৱোহণ করিয়াছিল।

(৬) Jin-i Akbari.

(৭) Stewart's History of Bengal.

(৮) Akbar nama.

(৯) Elliot's History of India.

দুখনাথের পুত্র বীরসিংহ ও ভৎপত্নী শিরমণির নাম তাঁহাদিগের কণ্ঠ-
নিচরে চিত্রশরীর হইয়া রহিয়াছে । দুখনাথ কৃষ্ণবীণ, বহুমাবীণ, কালিন্দী
বীণ, পান্যবীণ, পোকাবীণ, আসবীণ ও খাণ্ডানবীণ এই সাতটি দীর্ঘিকা বনন
করেন । বীরসিংহ ও শিরমণি কৃত মন্দিরনিচর বিষ্ণুপুরে দণ্ডায়মান
থাকিয়া তাঁহাদিগের নাম পরিকীর্ত্তিত করিতেছে ।

সপ্তম শতাব্দীর শেষকালে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমকালে বিষ্ণুপুরের
রাজগণ দৌতাপোর চরবন্দীয়ার উপনীত হইয়াছিলেন । ১৭০১ খৃঃ যোগল-
সম্রাট কর্তৃক বঙ্গ প্রবেশারের সহকারীরূপে দেওরান পদে নিযুক্ত হইয়া
রাজবংশেরে অধিষ্ঠিত অস্তিত্ত মূর্শিবজুলি বঁা এতদ্ব্যেপে আগমন করেন এবং
জমিদারগণের সহিত বন্দোবস্ত সমাপ্ত করিয়া “জমা কামেল জুমারী” প্রস্তত
করেন । এই পাক্ষা বন্দোবস্ত অনুসারে বর্দ্ধমান রাজসাহী নবাবীপ দিনাজ-
পুর প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাপর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ্যকে যথারীতি কর দিতে হইত ।
কিন্তু “প্রথম সৈনীর অর্থাৎ বিষ্ণুপুর, পকংকাট ও ত্রিশুরার প্রাচীন রাজ-
সংগের নিকট বাদহাসী পেশকন, বরপ সাম্যক কিছু গ্রহণ করা হইত । তাঁহারা
আবার ভাল ভাল খেলাত ও পুরস্কার পাইতেন । প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের
স্বাধীন ব্যাপহাঃই ছিল । কুণী বীর পূর্বে তাঁহারা ভাল করিয়া মূলসমানের
আদ্রস্ত হন নাই ।” (১০) বক্তব্যঃ বিষ্ণুপুর রাজ্যের এই সময়ে কমতার অবস্থ
ছিল না । কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ইহার অবনতি আরম্ভ হয় । একদিকে
বর্দ্ধমানাদিপতি কতেপুর মহাল পরাজাত্ত করিয়া লইলেন আর অপরদিকে
পত্রভাষল্য বঙ্গভূমির প্রবেশবার বিষ্ণুপুরের উপর অত্যাচারী বর্গী দল
আগিয়া পড়িল । (১১) বিষ্ণুপুর বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রুপতি গোপালসিংহ
১৬২০ খৃঃ রাজগদীতে উপবিষ্ট করেন । তাঁহার ৩৮ বৎসর ব্যাপী রাজবকাল
সৌরভময় ও মহিমাধিত । ১৭০২ খৃঃ যারাঠাগল ভাঙ্কর রাওএর অধীনে
বিষ্ণুপুরের যারদেশে উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু গোপালসিংহ কর্তৃক পরাজুত
হইয়া শৃগালের জায় পলায়ন করিয়াছিল । কথিত আছে যে, এই যুদ্ধে
বিষ্ণুপুররাজগণের গৃহদেবতা মদনমোহন সমরাজনে আবির্ভূত হইয়া অসা-

(১০) সাহিত্য, অষ্টমবর্ষ, ২য় সংখ্যা ।

(১১) See Hunter's Statistical Account of Brndwan and
Pizaus salatin.

বারং পরাক্রমের সহিত মাগাছা দৈত্যবল বিদূরিত করিয়াছিলেন। মল ও মারগ নামে বিখ্যাত যে দুইটা আয়েরাস্ত্র মন্ডনমোহন কর্তৃক এই যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা এখনও বিষ্ণুপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এই দুইটের উল্লেখ করিয়া কোন লেখক লিখিয়াছেন,—“An immense piece of iron ordnance is lying in the Jungle inside the fort... Tradition states that a Deity gave this and another similar gun to one of the old Rajas of Bishnupur. The fellow gun is said to be at the bottom of one of the lakes. This one though exposed to all weathers free from rust, and has a black and polished outer

১৭৭০ খৃঃ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিষ্ণুপুরের মৌল্য অধিবাসিগণ কলিকাতায় বস্তুপুণে পতিত হয়। উক্ত বৎসর গোপালসিংহ মানদলীলা সংবরণ করেন। তদীয় পুত্রবধীর জ্যেষ্ঠ চৈতন্যসিংহ বিষ্ণুপুরের অধিপতি এবং কনিষ্ঠ কল্যাসিংহ আমৃতপুরি কামরূপীর প্রবাসী হইলেন। কনিষ্ঠের বংশধরগণ এ যাবৎ কামরূপিতে বাস করিতেছেন।

চৈতন্যসিংহ পর্য্যটকের ও ঐতিহাসিক কল্যাণীয়াত করিতেন। তাঁহার প্রিয়ময়ী কন্যা বিধাস (ভজগতি) এর উপর রাজ্যভার দায়িত্ব ছিল। চৈতন্যসিংহের ভ্রাতৃপুত্র নবাব মীরজাফরের সহায়তায় বিষ্ণুপুর রাজসিংহাসন লাভ করেন। চৈতন্যসিংহ মন্ডনমোহন বিগ্রহ লইয়া কলিকাতার পলায়ন করেন এবং বাণবাড়ার প্রান্তে গৌড় মন্দিরের নিকট উদ্যোগ বন্ধ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সাহায্যে পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এইরূপে বিষ্ণুপুরের সেই আশীন ও পরাক্রান্ত রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে এক সামান্য জমীদারের পদে অবনীত হইলেন। চৈতন্যসিংহের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত এথিওরেনাল বিষ্ণুপুরে গমন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ History of the European Settlements in the East and West Indies নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে বিষ্ণুপুর-সম্বন্ধে যে সারগর্ভ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার অভিজ্ঞতার ও বিচক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই।

চৈতন্যসিংহের পুত্রগণ পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দেন। রাজব বাকী পঞ্চাশ লক্ষ কর্ণওয়ালিসের আমলে ইংরাজগবর্ণমেণ্টে বিষ্ণুপুর জমীদারী নিলামে

হুলিয়া দেন। ১৭৮৯ খৃঃ বিজুপুরে নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়। হাণ্টার লিখিয়াছেন—“The disorders in Bisenpore would in any less troubled time, have been called rebellion. The Raja had been imprisoned for arrear of land tax; the head Assistant of the Colloctor, Mr. Hesilridge, was in charge of his estates, and the inhabitants made common cause with the banditti to oppose the government. In Jan 1789. a detachment was hurried out to support the civic power but this did not prevent Elambazar, a trade centre, from being sacked in open daylight—next month Mr. Keating reported to Government that the marauders having crossed the Adji in a large body with tulwars and matchlocks, had established themselves Beerbhoom and that their reduction would simply be a question of military force.”

বিজুপুরস্থ যে সকল মন্দিরের শিল্পকলার শিল্পবিকাশ একদিন সমগ্র বঙ্গ সাহরে উপভোগ করিত আজ সে সকল লোকলোচন হইতে দূরে আশান-ভূমির ঔদাসীন্ধ্য ও বৈরাগ্য লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই সকল মন্দিরের অবিকাশেই আজ সড়ারতির প্রদীপ জ্বল না, শব্দঘটাধ্বনি নীরব। কিশলয়ধন অরণ্যামীর মধ্যে ভূমিমণি ক্রোড়িত প্রস্তরনিচের দর্শকের জ্বরকে ভাবান্বোলনে উত্তেজিত করিত। সেই নিরসতার শুকতার মধ্যে দিল্লীর কল্লা ও ধানক্ষেত্র অস্তিত করিয়া তুলে। নিম্নে উক্ত মন্দিরগুলির নাম, নির্মাণাব্দ ও নির্মাণাধিকারের নাম লিপিত হইল। (১২)

বিজুপুরসংখ্য	খৃষ্টাব্দ	মন্দিরের নাম	নির্মাণাতার নাম।
(যাহা বিজুপুর প্রতিষ্ঠার বর্ষে আরম্ভ হয়)			
১২৮	১৬২২	মলেশ্বর	বীরসিংহ।
১৪২	১৬৪০	জামরায়	রঘুনাথ সিংহ।
১৬১	১৬৫৫	জোতবাঙ্গালা	ঐ

(১২) Report, Arch. Surv. Ind, for 1903—04 and Ropor Arch. Surv. Bengal Circle, for 1903-04.

বিহুপুস্তকসংখ্য	পৃষ্ঠাংক	খন্ডের নাম	নিষ্পত্তির নাম।
৯৬২	১০৫৬	কাচাঁয়	রঘুনাথ সিংহ
৯৬৪	১৬৫৮	লালজি	বীরসিংহ।
৯৭১	১৬৬৫	মদনগোপাল	শিগোমনি।
৯৭১	১৬৬৫	মুরলিমোহন	ঐ
	১৬৯৪	মদনমোহন	দুর্জয়সিংহ
		(বীরসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র)	
১০৩২	১৭২৬	জ্যোতিষ্মির	গোপালসিংহ।
১০৩৫	১৭২৯	রাধাগোবিন্দ	কৃষ্ণসিংহ।
১০৪৩	১৭৩৭	রাধামাধব	কৃষ্ণসিংহের স্ত্রী।
১০৬৪	১৭৪৮	রাধাশ্যাম	চৈতন্যসিংহ।

আজ বিহুপুস্তক অঙ্গলাকীর্ণ ও জনবিহীন স্থানসমূহ দর্শন করিলে শুধু মর্মির একটা ক্ষীণপ্রভ তদ্রূপেই আমাদের আয়োগের ক্ষমতা মূর্তন ভাবের সত্যতা করিয়া দেয়। দুঃখ অতীতের স্থিতিচক্ৰগুলির উপর কাতরতা বাজক সুহৃৎস্রণ। এবং বিলীনমান জ্যোতির চারিদিকে বিশ্বস্তির কুহেলিকা বনাইয়া আদিত্যে।

ঐশ্বর্যধন্য রায়।

বর-পণ। ❀

(গৌরচন্দ্রিকা।)

অনেকের মত, যে সকল কারণে আমাদের সমাজ দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছে, বিবাহে বংশপ্রথা ও তাহার মতো একটা প্রাথমিক কারণ। এই প্রাণহানি প্রথার বিষয়ে দুই একটা কথা বগাই বর্তমান প্রবর্তের উদ্দেশ্য। বিহুগাও এত বড় যে, তাহার বিধি মত নৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা আনুষ্ঠানিক ঐতিহাসিক আলোচনার শক্তি আমার নাই। তবে প্রথাটা এখন যেভাবে দাঁড়াইয়াছে তাহারই সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতে প্রয়াস পাইব।

প্রবন্ধের বিষয়টা যখন সামাজিক, তখন যুগযুগে সমাজের বিষয়ে দুই একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । প্রথমতঃ, আমরা (অর্থাৎ অবিকার্য্য বাণেশ্বরী) একটু চতুর্ভাষী । সমাজে কোন একটা ঘটনা ঘটি-
লেই আমরা তাহা গাইয়া বিন করক একটা মনোযোগ কাঁপিতে পাঠিগে আর
কিছুই চাই না । পরিণামে আমার 'পুনর্ম্মিকে'।

wonder আমাদের সমাজের নিত্যঘটনা । আমাদের দ্বিতীয় ধোম এই যে,
আমরা কোন বিষয়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে পারি আলোচ্য
বিষয় বা বস্তুকে আমরা হয় স্বেচ্ছাচিত্রিত সপ্তমসর্গে উঠাইয়া দেই, আর না হয়
নিম্মার নিয়তম তরে নামাইয়া দিই । আকস্মিক আমাদের সমাজে বর-পণ
প্রথাটাত একটা নিত্য সমালোচনার বিষয় । এবং এক্ষেত্রে আমরা আমাদের
জাতীয় স্বভাব পরিভাগ করিতে পারি নাই । ইহা গটয়াও পরস্পর-বিরোধী
দুইটি বল গঠিত হইয়াছে । এক বল বলিতেছে, পণ-গ্রহণে দোষের ভেদন
কিছুই দেখি না । আবার অপর বল বলিতেছে, বরপণ প্রথাই এখন আমা-
দের সমাজের কঠিনচন রোগ । সমাজকে অচিরে উত্তার তাত হইতে মুক্ত না
করিলে সমাজের আশু বিনাশ অনন্তস্থানী । এখন এই মতভেদের মধ্যে
দণ্ডায়মান হইয়া নিজেদের ছ' মা'রে পা দেওয়ার জায় বিপদাপর মনে করি-
তেছি । এ বিষয়ে বেশী কিছু বলিতে যোগে একপক্ষের না একপক্ষের বিরোধ-
ভাজন হইতে হয়ই । তবে যতটা পারি সংযতভাবে অবলম্বন করিয়া (Via
media) মধ্যপন্থেচলিতে চেষ্টা করিব । দৈবাৎ যদি কোন মতে কোনদিকে
অজ্ঞায় কোঁক দিই, তাহা হইলে পরকণই তাপ সামলাইয়া লইতে চেষ্টা
করিব ।

বরপণের অর্থ-নির্ণয় ।

যখন পণপ্রচার উপর প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, তখন সন্দেহহই
পনের অর্থ নির্ণয় করা উচিত । তবে তাহার পুরূষ একটা প্রস্তাবনার
প্রয়োজন ।

পূর্বে আমরা 'লোকটা দরের লোক' এই কথা বলিলে এই বুদ্ধিভাস যে,
লোকটার পেটে গুণ আছে এবং সে কাষের লোক । এখন কিন্তু কথাটার অস্ত
একটা গুরুতর অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে । এখন অনেক দলেই গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি
বা কাব্যশীতার পরিপন্থে দিবায়ে বস্তুতের নিকট প্রান্ত যৌতুকের পদিনাশ

মাহুষের মূলানির্ণয়ের মাপকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে । * অর্থাৎ এই অদ্ভুত পরিবর্তন কি (Darwin) ডাক্তারের ক্রমবিকাশ-তত্ত্বের প্রতিপত্তি, না রাজকর্নি টেনিসনের The Old order changeth, yielding place to : † বিপ্লববাদের ন্যায়তা ? যাহাই হউক না কেন, উভা যখন গাইয়াছি, তখন আর অর্ধ শতাব্দীতে যেরূপ (old fool) বুদ্ধি-চীন বুদ্ধের মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হইয়া ‡ উদার সম্মানহাদের চেষ্ঠা করিব ।

‘দুর্ধেবনশ্রিনী’র সেপ দিগ্গজ মহাশয় উক্ত গলা করিয়া গাহিয়াছেন, ‘অমার আর সংসারে সারং স্বতর-দল্লিহু ।’

কিন্তু ইহা শুধু সেপ দিগ্গজের কথা নহে, আমাদের এই অষ্টদিগ্গজপরিবেষ্টিত সমাগত মহাজ্ঞান নিঃশব্দ জনমানবের ঐ একটি কথা । সপাতার অর্থ কি ? না—যেমন ভারতের জুতপূর্ণ রাজধানী কলিকাতা নগরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান হুগলারের বাজার—যেখানে অণু পটোলের দর যাচাই হয়,—‘সেইরূপ সমুদ্রের অবনী মাঝারে’ শ্রেষ্ঠস্থান ভাবি মন্তরনন্দির গুহফে খান্নানের বাজার, যে স্থানে ‘জাহাতি’ নামের অভিনায়ী কলির অদ্ভুত (অধিকৃত ?) পদাংক দর যাচাই হয় । § অ’হা, এমন পবিত্র স্থান কি আর পৃথিবীতে আছে । ইতি প্রস্তাবনা ।

এইবার ‘প্রবৃত্ত’ বিপদের আলোচনা করিব । অভিধান বুলিয়া দেবিনাম, ‘গণ’ শব্দের নিম্নলিখিত অর্থগুলি ররিয়াছে :—প্রজ্ঞা, বাসি রূপা, দূত, বিক্রের বস, কৃতি গতা, কার্যাপন, ধন, বরাটক, বেতন, মূল্য, ইত্যাদি । সর্বনাম । সেপক ত এইবার বিবিধার্থে ব্যবহরনে ভোষ সম কাণ ।

এতগুলি অর্থের মধ্যে কোন অর্থটি লইব ? অনেক চিন্তার পর করিনাম স্থির যে, যখন বরপণের কথাই বলিতেছি, তখন সেই দিক্ হইতেই প্রস্তুটার

* অবশ্য বরকে দেহ দৌতুকের পরিবর্তন বরের শুপাদির যাহাই নির্ণীত হয় বটে, কিন্তু কলেক্টর—এ বিহয়ের ব্যতিক্রমও দেখা যায় ।

† শুনা যায়, এক বৃদ্ধ নাকি কোব একটা পনের (শতকী কি তাহা বলি না) আনুদিক ঘুরকণ বর্জিত এবং অর্ধ অনিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া সেকাল ত একপের তুলনা করতঃ কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া দীর্ঘনিঃশব্দ জ্যাপ করিয়াছিলেন ।

‡ সেপক সমাপনের রপক দর যাচাই হয় নাকি বুদ্ধি ?

একটা সুবিধানকক যোগাঙ্গ করিয়া লইতে হইবে। অতঃপর বেতনে আনয় পক্ষপাতের দোষে দোষী না হওয়া 'প্রতিজ্ঞা' হইতে 'বৈতনিক' পূর্ণ অর্থগুলি অক্রেমে পারিত্যাগ করিলে পারি। এখন গোপনভাবে 'বৈতনিক' আন 'মূল্য' লইয়া। কাহাকে রাখিয়া কাহাকে খাই? 'বেতন' অর্থ করিতে গেলে জামাতাকে বস্ত্রের কৃত্য বলা হয়। কিন্তু অস্বাদুশ শিক্ষিত যুবক-গণের এ অপমান সঙ্গ হইবে কি? অতএব দেখিতেছি 'বেতন'ের আর উটিল। এমন বাতী 'মূল্য'। মূল্য কাহার? অবশ্য বরেরই। কেননা, জামাতাকে বরণ করিবার সময় থাকুড়ী না-কি বলেন,

‘কড়ি দিয়ে কিন্লাম,

হড়ি দিয়ে বান্লাম,

হাতে দিলাম মাস্ত,

একবার ভাষ করত বাপু।’†

‘বেতন’ের বেলায় যে গোল বাধিয়াছিল এখানেও সেই গোল বাধে বটে। কিন্তু আনি কি করিব? হাতে হাতে বাহার প্রমাণ পাইতেছি তাহা কেনন করিয়া মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিব? তবে এটা মন্দের ভাল। কেননা বস্ত্র মহাশয়ের বেতনভোগী কুটা হওয়া বস্তা অপমানজনক, তাহার তথা তল্লম্বিনীর চিরকালের কেনা গোলায় (বা কেনাকালের চির গোলায়) হইয়া থাক। বোধ হয় ততটা নহে। আর যখন অসং জীকৃষ্ণই জীরাণ্য চরণমূলে ‘মুগে মুগে বীণা’ রহিবার বাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন অস্ত্রে পরে কা কথা? তবে ইহাতেও যদি কোন অতলিক লোক মানের কান্না কাদেন, তখন অসত্য্য তর্কশাস্ত্রে জাহান্নমে দিয়া বলিব যে, বরণপটা আর কিছুই নহে, কজাদানের দক্ষিণাযাত্র।‡

সেকাল ও একাল।

অর্বের গোল মিটিগ। এইবার দেখা বাউক বরণপণের প্রথটা কতদিন হইতে আমাদের সমাজে চলিয়া আসিতেছে। কেব কেব বলেন এটা বেশী দিন হয় নাই। পঁচিশ বছরের বেশী নহে। আশাও তাই মনে হয়।

* সন্তোষজনক না হইলেও না হইতে পারে।

† কোথাও কোথাও না-কি এ ছড়াটি মণিতে বলিয়া থাকে।

‡ অথবা তল্লম্বিনী বহাননটিকে বরের কড়ি দিয়া বিনাশ করা।

যদিও রূপকথার যেখানে দেখানো 'অপেক্ষিত রাজ্য' ও এর কজার কথা ক্রান্তিত
পাই, তবুপি আমার বোধ হয় যে সেট যেহেতু (Optional) যৌতুক ও
সম্পত্তির সঙ্গের অবশ্য দেয় (compulsory) লগণ সঙ্গের বিভিন্ন
পদার্থ। লগণের লোকে ঘেঘেয়ে সাক্ষরে শুদ্ধি দেয় শুদ্ধি পাঠিয়ে
দিত হটে, কিন্তু তখন এত টাকা বা এতটাকার অলঙ্কার দিতে হইবে, ইত্যাদি
কমে তোমার মেয়ে লইব না, ইত্যাদি বাধা বাধকতার ভাব ছিল না।
যদিও ইংরাজী dowry শব্দটি যেহেতু (Optional) যৌতুক ও অবশ্য দেয় লগণ এই
তই অর্থেই প্রচলিত হয়, তবুপি এ দুইটি বস্তু এক বস্তুই মানিয়া লইতে
পারি না।

অনেকের মতে, এই বস্তুগণের প্রাচীনা বিলাস হইতে আমাদের দেশে
সংস্কৃত হইয়াছে। কপাটা নিত্যই মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না। কারণ,
প্রায়ই দেখা যায়, বিলাতে দরিদ্রের কজার বিবাহ হওয়া বড় বিষম ব্যাপার।
তৎকালী নাটক-নভেলও দেখিতে পাই যে মোটা dowry দিতে অক্ষম কজার
পিতা স্বীয় কজার জন্য যত্নোচিত পাত্র খুঁজিয়া পান না। আমাদের সমাজে
পূর্বে একজন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তখন লোকে আনন্দ করিয়া
কন্যার বিবাহে যৌতুক দিত, আর এখন বস্তুগণ দিতে কন্যার পিতামহের
জিন বাহির হইয়া যায়। তখন কন্যা রূপবান্ স্বামী পাইত, স্বাভাবিক পনবান্
জামাই পাইতেন, স্বস্তি বিধান জামতা প্রাপ্ত হইতেন, বহুবাক্যবদা কুলীন
জামাই সাবুর মর্শন-লোক করিতেন। (ইতর লোকে মিষ্টার জামে না পাইত
তাবা নহে।) এখন রূপ কুল, ধন ও বিদ্যা, ইত্যাদির 'এককমপানার্থ্য'
কিছুতর চতুষ্করণ। এখন জামাতাতে উপরিদিখিত চারটি অণের মধ্যে
একটি গুণ থাকিলেই তাঁহার বাজার-দর পাঁচ হাজারের কম নয়। সুতরাং
চতুষ্করণিত জামাতার হস্তে কন্যা সম্ভ্রমণ করিয়া চতুষ্করণকলপ্রাপ্তির আশা
কে করিবে?

বস্তুতঃই আজকাল বাজারের অন্যান্য জিনিসের ন্যায় বিবাহ-যোগ্য
বস্তুরও একটা বাজার-দরের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক স্থলে বিবাহের
প্রত্যেকটা সম্পূর্ণ দর-কথাকথিতে পরিণত হয়। তবে অন্যান্য জিনিসের
সহিত বস্তুর একটু প্রভেদ আছে। কারণ, প্রায় সকল জিনিসেরই দর
কখনও উঠে, কখনও নামে। কিন্তু বস্তুর দর ক্রমশঃ উঠিয়াই যাইতেছে।
উইয়া আর নামিবে বলিয়া বোধ হয় না। বর অনেক সময় উপযুক্ত পিতার

পুত্র হইয়াও বেওয়ারিশ সম্পত্তির মত নিয়মেই ডাকে বিক্রাইতেছে, ইত্যাদি ছাংয়ের ও লক্ষ্যের দিক। কন্যার বিবাহের জন্য দর বাড়াই করিয়া পাত্র অন্বেষণ করণ। আবক্ষণ ক্রিয়ণ যুগিত বাণ্যার তটয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় পল্লীগ্রামে পাত্রদেবী ব্যক্তিগ 'গুরু দু'জিতে বাচির দুইগাছি' এই কথাতই বেশ বুক: যায়। এখন যখন বেবি পরিবর্তনবানী বৈবাহিকগণ, এ ক্ষেত্রে 'পুত্রভনের পুনরাবর্তন' প্রার্থনীয় কি না? যাহা শুউক, যখন পুত্রপট্ট বনিমাত্রি ঐতিহাসিক আলোচনা করিব না, তখন আর এ বিষয় পুনঃ নাড়াচাড়া করিয়া অনর্থক দোষ (inconsistency) কেন?

কিন্তু আবার দুই একটা কথা না বলিলেও নহে। আবারের সময়কে এমন দিন সিদ্ধান্তে, যখন বঙ্গদেশে পণ বিবাহ পুত্রের বিবাহ বিত্তে হইত। পুত্রের বিবাহের সময় হইলে তাহার পিতামাতাকে তাগিয়া আতুল হইতে হইত। তাহার প্রবান 'ও যার পেটার বিয়ে তুচ্ছনা করে' ইত্যাদি গানে বিস্তারিত। এখন আর সে দিন নাই। এখন টিক তাহার বিপরীত অবস্থা হইয়াছে।* অবশ্য সে প্রবটাও যে ভাল ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ের 'এ পিঠ আর ও পিঠ' সমান নয়। 'ও পিঠে' চেয়ে এ পিঠ অনেক নিচুই 'ও নাড়ারজনক। পুত্রের বিবাহ দেওয়া কঠিন হইলে ততটা আসে যায় না, কন্যার বিবাহ দেওয়া কঠিন হইলে বটে। আসে যায়। কারণ হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের নিয়মে বিবাহের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে কন্যার, 'অগ্রকণ্ঠ্য' হয়, পুত্র কিন্তু অগ্রকণ্ঠ্য হয় না।

ঐক্যগোপন বন্দোপনোয়ার ।

* দুই এক স্থলে কন্যাকেও বরণক্ষেত্রে বিক্রয় হইতে পণ গ্রহণ করা দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহা এত বিরল যে বর্ণনায় বর্ণনাই নহে। আর তাহাতে ততটা গীড়াগীড়ি মতাবিধির প্রবণ নাই। বিবাহের পূর্বে প্রবটা পয়সার বিক্রয়বিধি প্রচলিত কাবুই বৈবাহিকের মধ্যে নাই বলিলেই হয়।

আর্য্যাবর্ত ।



বুদ্ধ দেবের গৃহত্যাগ ।

Digitized by srujanika@gmail.com



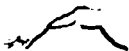
ঋতুরাণী ।

নিম্নাংশের ঘোর পিকলরূপ, বরিষার ঘননীল
 শরভের শোভা জ্যোৎস্না শীত শুভ্র পে অনাবিল
 জামল স্নিগ্ধ বেমস্তশোভা-শীতের আপীত রাগ
 মাধবের রূপ তাত্র যুগ—উড়ে ছল রেহু ফাগ ;—
 আত্র ঐশ্বর্যে কদম্ব, তিত্ত নিব্ব কুলে,
 অত্র আত্মপে, কটু লবকে, দাক্ষিণি তাম্বুলে,
 যুগ অধরে যমুদমারা কুস্তম পাঞ্জে সৌধ ;—
 নব বরষার আসারে সিক্ত গন্ধ সে মুহ মুহ,—
 টাপার বহুলে উগ্রমাদক, বৃষের গন্ধ পুত
 হরিচন্দন উল্লীতে স্নিগ্ধ পঙ্ক যা' অহরুত ;—
 দক্ষিণ অনিল অঙ্গে যা' আনে মঞ্জরী শিখরণ
 তরুছায়া আর জ্যোৎস্না যা' করে শ্রম জল নিদারণ
 সিক্ত পূর্ব পবনে কদম্ব সুটায় যা' এগে এগে
 অরুণ কিরণ, উত্তর-বায়-বেপথু আমায়ে আনে ;—
 গগনে 'ফটিক জল' কীর্ণ ডাক,—গুরু গুরু, মুহ মুহ,
 রুণু রুহু, শন শন, কল কল, যুগু যুগু, হুহু হুহু,
 লবে মিলি এগে, রচিয়াছে এক শোভন প্রতিমাখানি
 বরষ কল্লতরু জাত-জ্বল্য পরিয়াছে গরুরাণী
 চোখে বরীচিকা, চপলায় মালা মেখে রচা বেকীটেতে ।
 কাশের শুভ্র বসনে কুণ্ডিতা শালিত্রায কীচলীতে ।
 নভে পড়ে সন্নিবার কুলে হলুদ অকরাগ ।
 অশোক পলাশে নব কিসলয়ে চরণে আলতাদিয ।
 হস্তে তাহার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক পরে ।
 লোপের কুলে গঙে তাহার পাতুর শোভা ধরে,
 চুড়া পাশে তা'র নবকরবক কর্ণে শিরীশ ছল
 চাক্র দীপ্তে পুলকাকিত শোভিছে কদম্ব কুল ।
 রূপ রস যুগ গন্ধ পরশ বরষ-সরল বাণী
 লবে মিলি তার গড়িয়াছে ঐ যুগ মুগ্ধিত খানি ।

শ্রীকালিদাস রায় ।

গয়া ভ্রমণ ।

— — —



একাদশীর্থ দিন প্রকৃষ্টে উঠিল। সেইদিন গয়াক্রম্য করিতে হইবে। সূত্রগং মনে কেমন একটা ভাব জন্মিল। এ দিন আমি পর পর বাহা করি-
য়াছি বা দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা করিব না। কেনন এইমাত্র বলিয়া রাখি
যে কল্পতরুর বাহারা অপ্রলম্ব করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার যেন,—
কলিকাতা অথবা আপনাদের গ্রাম হইতে কালভূঁ খাল্যা খটী বা
পেলাস লইয়া আইসেন। গয়ায় ভাল মধু পাওয়া যায় না,—অথচ
পিতে মধু দেওয়া আবশ্যক। অতএব বাহারা গয়ায় ভ্রম
করিতে আসিবেন তাহার যেন সঙ্গে করিয়া একটু ভাল মধু লইয়া
আইসেন।

গয়ায় নানা স্থানে ভ্রম করিবার ব্যবস্থা আছে। বাহারা তাহার তালিকা
দেখিতে চাহেন, তাহার 'গয়ামাহাত্ম্য' দেখিবেন। গয়াতে উহার দ্বন্দ্বী ও
বাহালা দুই রকম সংক্রমণই পাওয়া যায়। আজকাল অধিকাংশ লোক তিন
স্থানে ভ্রম করিয়া থাকেন : (১) কল্পতরুর (২) বিষ্ণুপদে (৩) অক্ষয়
খটুপে। অনেকে প্রেতশিলায় পিতৃ দিয়া থাকেন। প্রেতশিলায় পিতৃ
দিলে প্রেতই মুচ্য হইয়া যায়। সূত্রগং এখানে পিতৃ দেওয়া যে একান্ত আব-
শ্যক, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু প্রেতশিলায় পিতৃ দিবার জন্য
যত্ন প্রদান আছে। সে দাক্ষিণ্য করি গয়ায় ভ্রমণদিগের হস্তগত হয়
না,—সেই জন্য তাহার বড় একটা প্রেতশিলায় বাইতে লোককে পরামর্শ
দেন না। তবে যে কেহ তাহারও প্রেত-প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিস্তার,
সে কেহ তাহার তাহার পিতৃদাতাকে প্রেতশিলায় বাইতে বলিয়া থাকেন।
কিন্তু কে প্রেত পাইয়াছে, তাহা যখন ঠিক জানা যায় না, তখন প্রেতশিলায়
বাইলেই ভাল হয়। কেহ কেহ বলেন, বিষ্ণু পাদপদ্মে প্রেতের অধিকার
নাই। কিন্তু বিষ্ণু পাদপদ্মে পিতৃদান করিলে যে প্রেতদোষপ্রাপ্ত আত্মার
মুক্তি হয় না, এরূপ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। প্রেত-
ভাবাপন্ন এক ব্যক্তি পুরাকালে বিশাল নামক কোনও বণিকের নিকট
বলিয়াছিল,—

যম নান্দা গয়া নীর্ধে পিত্ত নির্কলণং কুরু।

শ্রেততাবাদিহুত্যা ত্রাং বর্ণিতো বাতুরেব চ।

গরুড় পুত্রাণ পূর্ণবন্ত ৮৪৩২

আমার নাম করিয়া গয়ানীর্ধে পিত্তদান করিও শ্রেতের উদ্দেশে গয়ানীরে পিত্ত দিলে শ্রেত বৃক্ষিলাত করে, আর পিত্তদানকারী ব্যক্তিও বর্ণে যায়।

গয়ানীর্ধে তু যঃ পিত্তান্ নান্দা বেদান্ত নির্কপেৎ।

মতকৃত্য দিবং যাত্তি বর্ণিতা যোক্ষমাণু হুঃ (ঐ ২৭।)

গাতাদের নাম উল্লেখ করিয়া গয়ানীর্ধে পিত্ত প্রদত্ত হয় তাহারা মতকৃত্য থাকিলে বর্ণে যায়, আর বর্ণে থাকিলে যোক্ষ পাঠ।

সুতরাং বাহারা অর্থাভাবে বা সামর্থ্যের অভাবে শ্রেতশিলার বাইতে পারেন না, তাহাদের পক্ষে গয়ানীর্ধে, পিত্তদান করিলে পিত্তদান নিষ্ফল হয়, ইহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। তবে শ্রেতশিলার ভ্রাতৃ করাই প্রস্তুত।

শ্রেতশিলা গয়া হইতে প্রায় তিনকোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। বাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহারা হাঁটিয়া ঐ পর্বত মন করেন। ইহা তিন্ন ঐ স্থানে বাইবার জন্য ডাকি বা ডুলি পাওয়া যায়। বাতারাতির ভাড়া ময়দিকা হইতে আড়াই টাকা। ডুলিবাচকগণ যাত্রীদিগকে পাহাড়ের উপর তুলিয়া দেয়। এই পর্বতটি গয়ার প্রায় সমস্ত পাহাড় অপেক্ষা উচ্চ। ইহা উচ্চতায় ৪০১ ফিট। তবে ইহাতে উষ্ণিবার সিঁড়ি অতি স্থলর। রামশিলা হইতে শ্রেতশিলা পর্যন্ত একটি রাস্তা আঁকিয়া থাকিয়া দিয়াছে। কিন্তু-তথাপি এই পাহাড়ে উষ্ণিতে কষ্ট হয়। সেইজন্য বাহারা পারেন, তাহারা বেশ ডুলি করিয়াই ইহার উপর উঠেন। এখানে নিজে একটা হুত্তে স্থান করিয়া গবে পাহাড়ে উষ্ণিরা পিত্ত দিতে হয়। এখানকার ভ্রাতৃগণ বহুতর। তাহারা ১৮/০ দক্ষিণা লইয়া কাল করিয়া দেন। এখানে ভ্রাতৃগণ অগ্রদানীদিগের ন্যায় পতিত কনিলার। একথা কতদূর সত্য তাহা জানি না। শ্রাবীর জিনিষপত্র গয়া হইতে লইয়া আশা আবশ্যক।

বারপুত্রেণে লিখিত আছে যে পূর্বে এই শ্রেতপর্বত পাপময় ছিল, সেই জন্য ইহার নাম ছিল শ্রেতপর্বত। বর্ষরাজ বাস চরণ দ্বারা এই পর্বতটি দ্বারা নিকশিত করেন, বর্ষরাজের চরণস্পর্শে ইহা পবিত্র হইয়াছে। এই পাহাড়ের উপর শ্রেতপিত্ত দিবার সময় যে সমস্ত মন্ত্র পড়িতে হয় তাহাতে বর্ণ

যুগ্মিলে হিন্দুধর্মের উদারতা যে কত তাহার উপলব্ধি হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমি দুইটি মগ্ন উদ্ধৃত করিলাম—

বহুদূরগন্ত যে কেউগ্রামগোত্রনিবর্ত্তিতঃ ।

অগোত্রে পরগোত্রে বা গতির্থেবাং ন বিদাতে ।

তেদামুদ্রণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদামাহং ॥

জাতান্তর সমুদ্রেশু ভ্রমন্তে যেন কর্ণণা ।

যাজুবাং ত্বলভং যোবাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদামাহম্ ॥

“যাহারা আমাদের বহুদূরগন্ত, যাহাদের নামগোত্র প্রভৃতি হয় নাই, অগোত্রে বা পরগোত্রে জন্মিয়া মরিয়া যাহাদের গতি হয় নাই তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আমি পিণ্ড দিতেছি। * * * যাহারা আপন আপন কর্ণকলে সহস্র সত্ত্র যোমি পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু তথাপি যাহাদের মনুষ্যাক্স্ম লাভের সম্ভাবনা অল্প, তাহাদিগকেও আমি পিণ্ড দিতেছি।” হিন্দুর জাতিভেদ দেখিয়া য়াহারা নাসিকা কুণ্ডিত করেন,—সেই হিন্দু যখন অগোত্রীয় পরগোত্রীয় লোকের, এমন কি বাহারা কর্ণবিপাক তির্ণ্যগ্ধোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে ও যাহাদের মনুষ্যাক্স্ম লাভ অসম্ভব পরাহত, তাহাদেরও বাহ্যিক মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে, তখন হিন্দুকে সজীব বুদ্ধি বলিয়া দোষ দেওয়া যায় না। সর্কভূতের মঙ্গল কামনা করাই হিন্দুর কর্তব্য। ধর্ম্যকাণ্ডে হিন্দু তাহাই করিয়া থাকে। হিন্দুর পরলোকে বিশ্বাস আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ক্রোধের মনে হইতে পারে, কিন্তু এই সর্কভৌম প্রীতি ও মঙ্গলকামনায় হিন্দুর উদার ভাব প্রতিকলিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অনেকের বিশ্বাস প্রেতশিলায় সূর্য্য আছে। বিশেষজ্ঞগণেরও নাকি ঐরূপ ধারণা। ইহা যখন হিন্দুর মুক্তিক্ষেত্র তখন সে বিষয়ের আনোচনা বৃথা। সূর্য্য ব্যাকুল আর নাই পাতুল, হিন্দু নিকট উহা হেমকূট অপেক্ষাও কোটীশূন্য মূল্যবান। সর্কভূতটির যে অংশে পিণ্ডাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে সে অংশ বেশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। কিন্তু একটু দূরেই পাহাড় জঙ্গলে আকীর্ণ। ঐ জঙ্গলে বাঘ ও সাপ আছে তথা যায়। সর্কভূতের উপরে একটি মন্দির আছে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাণাই এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরে রোতরাজ অবস্থিত করেন।

কর্ত্তভীরে শ্রাদ্ধ করিয়া পরে প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যুক্তভীরে

ব্রাহ্মণগণ এক সঙ্গে অনেককে মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন। অনেক হিন্দুরাণী পণ্ডিতের উচ্চারণ শ্রবণ। দুই চারিজন বেশ অল্পর মন্ত্র পড়ান। পণ্ডিত দেবদাস ও তাঁহার দুই ভ্রাতা বিশেষতঃ কনিষ্ঠটি উচ্চারণ ভাল। দক্ষিণা কিছু অধিক দিলে ব্রাহ্মণগণ স্বতন্ত্র ভাবেও মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন। ক্ষুণ্ণতীরে ব্রাহ্ম করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মে অনেক পিণ্ড প্রদান করেন। ক্ষুণ্ণতীরেই এই মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি ধূসরবর্ণের গ্রানাইট প্রস্তরে নির্মিত। ইহার চুড়ায় সুবর্ণকলস ও হেমপতাকা শোভিত। মহারাষ্ট্রীয় রানী অহল্যা বাই বোল লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তদ্ব্যতীত মন্দির-নির্মাণ ব্যবসয় নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল,—অবশিষ্ট পাঁচ লক্ষ টাকা তিনি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। মন্দিরটি মূলতঃ কিত্ত বিগট নহে। মন্দিরের সম্মুখেই নটেন্দ্রিয়ার মন্দিরটি অষ্টকোণ, ইহার ব্যাস ৩৮ ফিট। মন্দিরভ্যন্তরে একটি বেদিকার মধ্যে গয়ামূরের মন্তক ও ত্রিবিম্বর পদচিহ্ন অঙ্কিত। পদচিহ্নটি অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক। মন্তক ও পদচিহ্ন উভয়ই গল্লরের মধ্যে। গল্লরটি ট্রিক শোল নহে। বোড়শ ভূজ বিশিষ্ট। বেদিকাটির চারি পাশে বসিয়া শত শত নরনারী আত্মীয় বন্ধু পারমৌকিক মঙ্গলের জন্য তন্ত্রপীড়িত শোকোচ্ছ্বসিত হৃদয় নরনরীয়ে সিক্ত করিয়া গয়ানীর বিষ্ণু-পাদপদ্মে পিণ্ড দান করিতেছেন। কত শত পতিবিরোগবিধুয়া পত্নী পতির উদ্দেশে,—কত শত পতি পত্নীর পরকালের মঙ্গলের জন্য, কত শত শোকহর্মজ্বরজনক জননী সন্তানের মঙ্গল কামনার, কত লক্ষ লক্ষ সন্তান জনক জননীর স্বর্গ কামনার এই মূর্তি কেত্রে একান্ত মনে গুঢ় তন্ত্র সহকারে পিণ্ডদান করিয়াছে ও করিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কত দুর্জল মানব আপনাদের পাপের কালিমা প্রক্ষালিত করিবার জন্য অশ্রুতাপের অশ্রুসেধে এই স্থান সিক্ত করিয়া ব্যাকুল হৃদয়ের গভীর বেদনা ভগবচ্চরণে দিবেদন করিয়াছে ও করিতেছে,—তাহা সেই অতর্ক্যমী ভিন্ন আর কে জানিবে? এই নিত্য-উচ্ছ্বসিত ভাবপ্রাণির কোনও শক্তিই নাই, ইহা স্বাভাবিক মনে করেন, তাহারা কেবল ভ্রান্ত নহেন, পরন্তু রূপার পাত্র। যিনি ভাবগ্রাহী তিনি ভাবের শক্তি জানেন, তাই ভাবের প্রভাবে তিনি ভক্তের নিকট আপনাকে ধীরা পেন। তাই ভাবপ্রাণের ভিতর দিয়া ভগবানের চরণ এই গয় নামক মহাত্মার মস্তকে স্তম্ভ। এই নিত্য উচ্ছ্বসিত ভাবের প্রবাহ পৌন্থী নিহত

নির্ধন মন্ডাকিনী দ্বারার দ্বার জ্ঞাত মানবের কলুবরূপী ঐরাবতকে উদ্বাও করিয়া ভাসাইয়া দিয়া যায়। এই ভাবই বিজ্ঞপাদপত্র হইতে বাহির হইয়া বিজ্ঞ-পাদপত্রেই বিলীন হয় ; বরং পদ্মাবত এই বেদনাভাজিত ভাবরাশি যত্নকে বারণ করেন,—তিনি ভিত্তি ইহার বেগ অস্ত্রে কেহ দ্বারপ কহিতে পারেন না। ইহার স্থান ভক্তের হৃদয়গ্রন্থ প্রসার কল্পনামতে। ইহা মিনিভেছে অনন্ত ভাবের সাগরে,—তথায় মিশিয়া এই ভাবগদা নিভা কপিনকোপদন্ত ঘটি সহস্র সাগরসম্মানকে উদ্ধার করিতেছে। আইস তাই পানী তানী। এইখানে আসিয়া বিজ্ঞপদে গড়াগড়ি দিয়া শে,কড়ক হৃদয়মন্ত্রপ্রাস্তরে শান্তির সুপাদেক কর, সব জালা ছুড়াইবে। আমি বড় বড় “পাতাড়ে নান্তিকের” মুখে শুনিয়াছি, এই স্থানে আসিয়া তাহাদের ভাবের বিপদায় হইয়াছে,—হৃদয়ে শান্তির দ্বারা বহিয়াছে।

মন্দিরের উপর শুভল। শুধু কটি উচ্চতার প্রায় আশী ফিট হইবে। মন্দিরের তল হইতে শুভলের চূড়া পর্যন্ত উচ্চতা এক শত ফিট হইতে পারে। নাটমন্দির সমেত মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৮২ ফিট ২ ইঞ্চি, প্রস্থ ৫৪ ফিট ৪ ইঞ্চি। সম্মুখে নাট মন্দিরে শুভল শ্রেণী, দুই কোড়া করিয়া বাম একত্রসম্বন্ধ। পূর্ণের পশ্চিমে আট সারি স্তম্ভ আছে। কেবল মধ্যখানে :৬ ফিট দীর্ঘ ও ১৬ ফিট প্রস্থে স্থান ফাঁকা, তাহাতে চতুর্ভুজ পঞ্চম শ্রেণীর স্তম্ভ তই কোড়া করিয়া বাম পড়িয়াছে। মন্দিরের সম্মুখেও দুইটি বণ্টা আছে। মন্দিরের ঠিক সম্মুখ বণ্টাটি নেপালদেশের মহারী রণজিৎ পাণ্ডে মহারীর দিয়াছেন। আর মন্দিরের প্রবেশপথেই “ঘে বণ্টাটি আছে, সেটি দিয়াছেন মিঃ ফ্রান্সিস্ গিল্যাভার্স।” উহা ১৭৯৮ খ্রষ্টাব্দের জামুয়ারী মাসে প্রদত্ত হয়। মিঃ গিল্যাভার্স অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই স্থানে রাজ্যদ্বিগের নিকট হইতে কত আদায় করিতেন। ঐ সময় যেতাকগণ দেশীয়দিগের সহিত ক্রিয়ণ মিশিতেন, ইহা তাহারই নিদর্শন।

বিজ্ঞপদে লোক বড়ির মত ছোট ছোট পিণ্ড দিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

“সমীপজ প্রমাণেন পিণ্ডং দত্তা গরাশিরে।

পিণ্ডগো ব্যস্তি দেবদং নাত্ম কাৰ্য্যা বিচারণা ॥”

হিন্দুস্থানীরা নাটমন্দিরের পাশে শালপাতার বড় বড় পিণ্ড রাখিয়া পিণ্ড

দেখ। পিতৃ দান হইলে তাহার। যন্দিরের ছাত্র উহা ফেলিয়া দিয়া থাকে। কারণ—

“পক্কোশং গয়াংকোজং ক্রোশনেকং গয়াশিৱঃ।”

সুতরাং একক্রোশের মধ্যে যত্ন তত্ৰ পিতৃ দেওয়া যায়।

বিষ্ণুপাদপদ্মমন্দিরের সান্নিধ্যেই নবাবের মন্দির ও গয়েবদীর মন্দির দর্শন যোগ্য। গয়েবদী অষ্ট ভূজা। কেহ কেহ বলেন ইনি গয়াস্তরের পত্নী,—কিন্তু ইনি আদ্যাপ্তি মতিবানিশিনী বলিয়াই মনে হইল।

নবাবের পাদপদ্মে পিতৃ দিয়া পিতৃদাতৃগণ অক্ষয় বটে শ্রদ্ধা করিতে গমন করেন। প্রকৃত অক্ষয়বট বিষ্ণুপদমন্দিরের দক্ষিণপশ্চিমে ব্রহ্মোনি পাহাড়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত; বিষ্ণুপদ মন্দির হইতে প্রকৃত অক্ষয় বটের দূর অঙ্কি বাইলেরও অধিক হইলে। পথের স্বচ্ছতা ধরিলে প্রায় দেড় পোয়া পথ। যে স্থানে অক্ষয় বট অবস্থিত তাহার নাম ব্রহ্মগয়া। তথায় একটি সুন্দর মন্দির আছে। তথায় একতমার ছাদে অক্ষয় বটের ছায়ার বসিয়া পিতৃ দিতে হয়। স্থানটি বড়ই মনোরম। কিন্তু অনেক বিষ্ণুপদে পিতৃ দিবার পর এত পথ আসিতে সমর্থ হন না বলিয়া পাভাগা এই অক্ষয়বটের একটি শাখা কাটিয়া বিষ্ণুপদ মন্দিরের ঠিক পূর্ব দক্ষিণ গায়েই রোপণ করিয়াছে। উহা এখন বড় বটরূপে পরিণত হইয়াছে। এই শাখা অক্ষয় বটটি যে স্থানে অবস্থিত সে স্থানটি নিম্ন ও ইষ্টকরচিত। যাত্রীবিশেষে আশ্রয়ভাপ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটু ছাদ আছে। অক্ষয় বটে, পিতৃদান করিয়া সুফল লইতে হয়।

বাহারা এত অর্থ ব্যয় করিয়া এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া বাৎসরিক পত্নী-জাঘ হইতে পিতৃকাধোর উদ্দেশে গয়ায় আগমন করেন, তাহারা যে কেন এই সামান্য পথটুকু বাইতে কষ্টবোধ করেন তাহা বুঝিতে পারি না। এক পোয়া দেড় পোয়া পথ বাইতে কি এতই কষ্ট? আমার মনে হয়, যদি কার্য্য করিতে হয়, তাহা স্বাভাবিক করা আবশ্যক। অক্ষয় বটের সান্নিধ্যে বটে-খর মহাদেবের মন্দির। বটেখর মহাদেবের উত্তরে পরপিতা মহেশ্বরের মন্দির ও কলিঙ্গী হুত অবস্থিত। এই স্থানগুলি দর্শনীয়।

বিষ্ণুপদ মন্দিরের পশ্চিমে কস্তুরী বায়নীঘাটের পাশেই মহাদেবের মন্দির ও অন্যান্য কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি বিরাজিত। উহার মধ্যে বঙ্গ-শালার একটি স্তম্ভে চৌহান বংশের পৃথ্বীরাজের নাম উৎকীর্ণ আছে। সময়-

ভাবে আদি এতলি সব ভাল করিয়া দেখিতে পারি নাই। গদ্যের প্রাচীন কাহিনী অস্বাভাবিক নাই। দেবগণও অনেক। বছদিন তথায় না থাকিলে সমস্ত দেখিয়া উঠা যায় না।

গদ্যের পাহাড়গুলির মধ্যে একটি পাহাড়ে বড় বিশ্বদ্রব্যের বাপার আছে। পাহাড়টি ক্ষুদ্র। কিন্তু উহার সর্ব্বাংশে গন্ধর পদ চিহ্ন খচিত। এত গন্ধর পায়েও চিহ্ন তথায় কি করিয়া আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এত গন্ধর খুঁরের চিহ্ন সমস্ত পক্ষত গায়ে কোদাও সহজ বাপার নহে। ছোট বড় সকল রকম গাভীর পদচিহ্ন তথায় দৃষ্ট হইল। পদচিহ্ন ডালি খুণ স্বাভাবিক; দেখিলে উহা কোন রকমেই কৃত্রিম বলিয়া মনে হয় না। কঠিন পাশাণে এত গন্ধর খুঁরের চিহ্ন কি প্রকারে নিখাত হইল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। প্রকাশ প্রকাশিত ব্রহ্মা এই স্থানে গো-দান করিয়াছিলেন তাই ঐ পাহাড়ে গাভীর চরণ চিহ্ন লাগিয়াছে। ব্রহ্মা যখন গো-দান করিয়াছিলেন, তখন ঐ পাহাড়ে পাতর কি কোমল ছিল? ইহাও বিবাস করা সহজ নহে। এই বিজ্ঞানের যুগে এ কথা বলিলে লোক যে লাগল বলিবে। ব্রহ্মা গাভী দান করিলে পর এ পাহাড়ে কি আর কোনও আনোয়ারা যায় নাই। তবে তাহাদের পদ চিহ্ন তাহার উপর পড়িল না কেন? এ সব বিবয় সম্ভব। আর যদি উহা পাথরের উপর ক্ষোদিত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে গো-ক্ষুর উৎকর্ষ করিতে যথেষ্ট প্রয়াস স্বীকার ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল। এতদপ আভাবিকভাবে পাহাড়ের গায়ে এত গাভীর চরণচিহ্ন ক্ষোদাই করা বিশ্বাসের বিষয় সন্দেহ নাই। আবার ভাবিতে পাই থাকিল সাটবেরিয়া প্রভৃতি জঙ্গল ত জুয়ারারত দুর্গম পক্ষেও প্রস্তরগারে জীবের এমন কি মাকুষের স্পষ্ট পদচিহ্ন দেখা যায়। এই সকল শিলাযুক্তিকা ভূপৃষ্ঠে উঠিয়াই কি কঠিন হয়? বাহা হউক গদ্যের এই পাহাড়ের পৌরাণিক নাম গো-প্রচার পক্ষত। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে ঘাইতে যে জলের কল হইয়াছে, তাহার সান্নিধ্যেই ইহা অবস্থিত।

এই গাভীর চরণচিহ্ন কতদিনের প্রাচীন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। মহাভারতে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে কামাক বনে যে সমস্ত তীর্থের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে গদ্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ পুলস্ত্যের বর্ণনারই আধারিত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গদ্যের কয়েকটি তীর্থের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে অক্ষরবট, ব্রহ্মলোচর, ব্রহ্মযোনি পক্ষত (উত্তম পক্ষত,) কল্ল, বেহুকতীর্থ ও বর্ষপৃষ্ঠই প্রধান। বিশ্বাসের বিষয় এই যে উহাতে গদ্যের

বা কিছু পাদপঙ্খের কোনও উল্লেখই নাই। দেখুক তীর্থ সবন্ধে পুনশ্চ এই বলিয়াছিলেন,—

তত্র চিত্রমহত্ৰাজপিতাং হি ন সংশয়ঃ।

কপিলা সর্ববন্দা বৈ পক্ষতে বিচরত্বাত।

সর্ববন্দায়াঃ পদাভ্যন্তা দৃষ্টত্বেহতাপি ভাবত।

তেনুপল্লভ্য রাঙ্কেষু পদেনু নুপসত্য।

যৎ কিঞ্চিদন্তঃ কর্ম তৎ প্রগুক্তি ভাবত।

“সেই দেখুক তীর্থের পক্ষিতে যে কপিলা বৎসের সহিত বিচরণ করিতেন তাহার চিত্র আজিও সর্বদাম আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যেহেতু সর্ববন্দা কপিলার চরণচিত্র তথায়, আজিও দেখা যায়। যে রাঙ্কেষু! সেই সকল পর-চিত্র উপলব্ধি করিলে যাহাদের অন্তঃ কর্মজনিত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।” ঐ সময় ঐ তীর্থের একরাত্রি বাণ করিয়া তৈল দেখু দান করিতে হইত। ইহার পর এই তীর্থের নাম হয় গো-প্রচার পক্ষিত। পুরাণে ইহার দেখুক তীর্থ নাম প্রায় নাই,—গো-প্রচার তীর্থই নাম হইয়াছে। নাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক সময়ে এই স্থানে কাণ্ডোও নৃত্যন ব্যবস্থা হইয়াছে। বাহু পুরাণ বলিতেছেন,—

গো-প্রচার সমীপস্থা আত্মা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ।

তেষাং পৈচনমাত্রেণ পিতরো যোক্ষণ্যমিনঃ।

গো-প্রচারের সমীপে ব্রহ্মকল্পিত আত্মব্রহ্ম সকল রহিয়াছে, তাহাদের মূলে জন-সেক করিলে পিতৃগণ যোক্ষণ্যাত করিয়া থাকেন। ইহা ভিন্ন, এখানে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। গুরু পুরাণ বলেন,—

শ্রাদ্ধী চ দেখুকারণো ব্রহ্মলোকং পিতৃনু নয়েৎ।

তৈল দেখু প্রদদায়া দৃষ্টা বেদ্য ন সংশয়ঃ।

যাহারা দেখুকারণো শ্রাদ্ধ, স্নান ও তৈলদেহু দান করিয়া দেখু দর্শন করেন, তাহাদের পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে গমন করেন। এখন ইহার নাম হইয়াছে গো-কুর পাহাড়।

মহাভারতের নানাস্থানে গয়ায় যে উল্লেখ আছে তাহা হইতে বুঝা যায় যে বৌদ্ধ যুগের পূর্বেও গয়া মহাতীর্থ ছিল এবং সেই সময় এই গো-কুর পাহাড়ে কপিলার চরণচিত্রও ছিল। মহাভারতের এই বিবরণকে প্রাক্কিত বলিবার কোনও কারণ নাই, এবং যদিও ইহা প্রাক্কিত হইয়া থাকে, তাহা

হইলে বৌদ্ধ যুগের পূর্বে ইহা প্রকৃষ্ট হইয়াছে,—ইহা যেন করিবারও,যথেষ্ট কারণ আছে। বর্ধমানগের (Buddha Gaya) অলোচনাকালে আমি গে কথা বিশেষভাবে বলিব। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এই চরণচিহ্ন অস্তুতঃ তিন ছায়ায় চারি ছায়ায় বঙ্গের পুরাতন ভাষাতে সন্বেদ্য নাই। কিন্তু—এত দিনেও ইহা মলিন হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ইহাৱা বলেন যে বৌদ্ধযুগের পূর্বে হিন্দু পাতয় কাটিতে জানিত না,—তাহাদের বৌদ্ধযুগের পূর্বেই এই হিন্দু কীটিটি দর্শন করা আবশ্যক।

নারদের বর্ণনার গহ্বর অক্ষর বটের কথা আছে। তিনি বলিয়াছেন :—

তত্রাক্ষরবটো নাম ত্রিলোকেশ্ব বিজ্ঞতঃ

তত্রসত্তং পিতৃভ্যস্তত্ত্বত্যাগ্যদৃশ্যতে ।

তথায় ত্রিলোকেশ্বিত অক্ষর বট নামে বৃক্ষ আছে, তথায় পিতৃগণের উদ্দেশে যাযা বেড়া যায়, তাহা অক্ষর হয়। বৌদ্ধ যুগের পূর্বে পিতৃগণের উদ্দেশে অক্ষর বটতলে দান করিবার অথবা শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা ছিল ইহা সঙ্গ্রহণ হইতেছে।

নারদের বর্ণনার ত্রয়োনি পাহাড়ের নাম উদ্ভূত পর্বত। তিনি বলিয়াছেন ;—

উত্তম্বক ততো গচ্ছৎ পর্বতং গীতনাদিতম্

সাবিত্র্যাস্ত পদং তত্র বৃক্কতে ভারতার্ঘতঃ ।

“হে ভারত্বে! তৎপরে আপনি গীতানুশ্রুতির উদ্ভূত পর্বতে যাইবেন, তথায় সাবিত্রী দেবীর পদচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।” ইহার পরই পুনস্ত বলিয়াছেন,—“সেই পাহাড়ে যোনিধার তীর্থ বর্ত্তমান, তথায় যাইলে মাহুৎ যোনিশব্দ হইতে উদ্ধার পায়।” এই উত্তম্বক পাহাড়ের নামই পর-বর্ত্তীকালে “কোলাহল পর্বত” হইয়াছিল। এই পর্বতেই গম্ভীর তপস্বী করিয়াছিলেন ইহাই পৌরাণিকী ব্যক্তি।* পর্বতস্থ যোনিধার তীর্থের নাম হয় ত্রয়োনি তীর্থ। মহাভারতের সময় তথায় সাবিত্রীর পদচিহ্ন ছিল, এখন তথায় সাবিত্রী বা গায়ত্রী দেবীর মন্দির হইয়াছে। পৌরাণিক সময়ে

• ঐ পাহাড়ে সাবিত্রী দেবীর বিগ্রহ ছিল। এখনও তথায় একটি মন্দির আছে। এ মন্দির অত পুরাতন নহে। বৌদ্ধ বিপ্লবে বধন গয়াতীর্থ প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল,—তখন এই মন্দির ও বিগ্রহ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে চীন পরিভ্রাজক কাহিগান ইহা একরূপ বিধ্বস্ত দেখিয়া গিয়াছিলেন। সেই বিধ্বস্তের পর সত্ত্বতঃ ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সম্মিহিত স্থান হইতে লোকালয় উদ্ভিয়া যায় এবং দক্ষিণ দিকের তীর্থগুলি জাঁকিয়া উঠে। আমি আরও কয়েকদিন সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম,—কিন্তু আয় কোম দিন উদয়ার শিখর দেখে উঠি নাই। কিছুদূর উদ্ভিয়া সন্ধ্যার পরও কিছুকণ তথায় বসিয়া থাকিতাম। অপরাকালে পাহাড়ে কেমন একটা শব্দ শুনা যায়। ক্রমে যত সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আইসে, ততই শব্দ যেন বাড়িতে থাকে। একদিন আমি, জনৈক লবঙ্গ ও জনৈক শ্রোত্র কনিয়াজ এই তিন জনে সন্ধ্যার সময় ঐ পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আমরা পক্ষাশ ষাট ষাপ উদ্ভিয়াই তথায় বসিলাম। কনিয়াজ মহাপুর কয়েক ষাপ অধিক উদ্ভিয়া বিপ্রায় গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি একটু পরে নামিয়া আসিয়া বলিলেন,—“উপরে কেমন একটা শব্দ হইতেছে,—তিনিয়া মনে ভয় হইল।” পাহাড়ের যত উর্দ্ধে উঠা যায়, শব্দ তত অধিক শুনা যায়। সেই জন্ত পাহাড়ের উপরে কেহ রাত্রিতে থাকিতে পারে না। এই শব্দের জন্তই গতিবতের নাম হইয়াছিল কোলাহল গিরি। আমি কয়েক দিন দেখিয়া শুনিয়া হির করিয়াছি, যে এই পাহাড়ের গায়ে অনেক-গুলি শুয়া আছে,—সেই শুয়ার বাতাস প্রবেশ করিয়া এই শব্দের সৃষ্টি করে। রাত্রিতে বাতাস যত ভোরে বহিতে আরম্ভ করে শব্দ তত বাড়িতে থাকে। শব্দ শুনিতে মন্দ নহে। নারদ ও পুলস্ত্যের বর্ষা-কাহিনীতে এই স্থানে চুতধর শিখর উল্লেখ আছে। ইহা সত্ত্বতঃ পরিশিতা মথের। গয়াপুরের উল্লেখ একেবারেই নাই।

ইহার দুই অব্যাহার পরেই ধৌম প্রহর তীর্থ-বিবরণে আবার গয়ায় বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। ইহা নারদের প্রহর বিবরণ হইতে একটু স্বতন্ত্র। ধৌম বলিয়াছেন,—গাজর্জিবেশিত গয় নামক একটী গিরি আছে। ঐ গিরিই গয়াশির পাহাড়, তথায় একটী বটবৃক্ষ আছে। বিপ্রগণ উহাকে অক্ষরবট বলিয়া থাকেন। কারণ ঐখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নদান করিলে তাহা অক্ষর হয়। যথা—

মহানদী চ ভট্টৈব শুভা গয়াশিরো নৃপ

যত্রাসৌ কীর্ত্ততে বিটৈশ্রবকা করণো বটঃ

বত্র দত্তং পিতৃভ্যাঃ চৈব মনুষ্যৈঃ তবতি প্রভো ॥

নাগদকথিত পুলস্ত্যপ্রদত্ত বিবরণের সহিত ধৌম্যের প্রদত্ত বিবরণের পার্থক্য এই যে, নাগদ ত্র্যম্বকোনিকে উত্তম পূর্ণিত বলিয়াছেন,—দৌম্য ঐ পাহাড়কে গয়বাকর্ষি সেবিত গয় নাগক গিরিশ্রেষ্ঠ ও গয়শির পাহাড় বলিয়াছেন। দৌম্য ঐস্থানে ত্র্যম্বক সর্বোত্তর আছে বলিয়াছেন। সম্ভবতঃ উহা ত্র্যম্বকোনিপাহাড়স্থিত ত্র্যম্বকুও। কিন্তু নাগদ ও ধৌম্যের প্রদত্ত বিবরণে কয়েকটি স্লেচ্ছ হবৎ একরূপ দেখা যায়। উহা এই—

এইবা বহবঃ পুত্রঃ যজ্ঞপোক্তো গয়াং ত্র্যম্বকং

যজ্ঞেত বা অশ্বমেধেন নীলং বা ব্রহ্মযজ্ঞেন ॥

এই স্লোকটিকেবল উভয়ের বিবরণে ঠিক একরূপ নহে,—বায়ুপুরাণে (১০৪।১০) গরুড় পুরাণে (পূর্ব ৮৪।৩১) লিখিত সংহিতায়, ও রামায়ণে এই একই স্লোক দুই হয়। রামায়ণে স্লোকটি একটু পরিবর্তিত করা আছে। কিন্তু রামায়ণে ও মহাভারতের এই দুই স্থলেই স্লোকটি ঠিক ষাণ খায় নাই। যেন জোর করিয়া উহাকে গয়ার কথায় প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা যেন প্রকৃষ্ট বলিয়াই মনে হয়। ধৌম্যের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণে এইটি ও উহার পরবর্তী স্লোকটি বাদ দিলে অর্থ বেশ পরিষ্কৃত হয়। পুলস্ত্যপ্রদত্ত বর্ণনায় ইহা শেষের স্লোকে প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে,—কিন্তু তথাপি ইহার ও ইহার পরবর্তী কতকগুলি স্লোকের রচনাভঙ্গী পূর্ববর্তী স্লোকের রচনাভঙ্গী হইতে যেন একটু ভিন্নরূপ। রামায়ণেও এই স্লোকটি একটু পরিবর্তিত করিয়া সন্নিবিষ্ট হইলেও অন্যান্য স্লোকের সহিত উহা যেন সনকসীকৃত হয় নাই। আর এক কথা, রাম ভরতকে ঐ কয় স্লোকে গয়ায় বাইতে অঙ্গরোধ করিলেন,—কিন্তু রামায়ণমতে ভরত চিত্রকূট হইতে সহ্যস্রি অযোধ্যায় চািয়া আগিলেন, গয়ায় গেলেন না। সুদীর্ঘ ও নাগদ ও ধৌম্যের মুখে দুইবার ঐ কথা শুনিলেন, তিনি জ্ঞাতাদিগের সহিত গয়াতেও গমন করিলেন,—তথায় তাহার চারিমাণ বাস করিয়া চাতুর্থাৎ করিলেন, উপবাস ও অশ্বযজ্ঞতলে দানাদি করিলেন, রাজর্ষি গয়ের কথা শুনিলেন, কিন্তু অশ্বমেধও করিলেন না, নীল ব্রহ্ম উৎসর্গ করিলেন না। গয়ায় সুদীর্ঘ গাইয়া কি দেখিলেন ?—

নাগো গল্পশিরো যজ্ঞ পুণ্য। টেক্স মহানন্দী ।

বানীগ্রমালিনী রম্যা নদী পুলিনশোভিতা ।

দিব্যং পবিত্রকূটক পবিত্রং বরনীষৎ ॥

কল্প এখন আর বানীগ্রমালিনী প্রম্যা নদী নাই। পাহাড়ের গাত্রবৌত
বালুকাগাশিতে উহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই গয়াশির পর্কিতে অক্ষরবটন্তলে
পাণ্ডবগণ বাস করিয়াছিলেন। এইখানে বিভ্রান্ত পবিত্র, চিরকুমার সম্বন্ধ
ও বি হুবিষ্টিরকে গয়াভ্রমণের কথা বলিয়াছিলেন। সম্বন্ধবিত্ত গয়াভ্রমণের
কাহিনী হইতে বাহুপুরণ ও গরুড়পুরণ বর্ণিত কাহিনীর প্রভেদ অনেক।
সম্বন্ধ বলেন, গর অমুগুগর রাজার পুত্র। গর রাজর্ষি ছিলেন। তিনি অসুর
বা দৈত্য ছিলেন,—এরূপ কথা সম্বন্ধ কবি বলেন নাই। মহাত্মারতে ও
রামায়ণে কোথাও এরূপ কথা নাই। গর ঐহানে অনেক বস্তু করিয়াছিলেন
তেনম যজ্ঞ আর কখনও কেহ করিতে পারে নাই। ইহাই সম্বন্ধের কবিত্ত
কাহিনীর সংক্ষিপ্ত মর্ম। গয়াভ্রমণের সেই একশত পঁচিশ যোজন দীর্ঘ, ষাট
যোজন স্থল ছিল,—একথাও সম্বন্ধ বলেন নাই। গয়াভ্রমণের তপস্বীর দেবগণ
সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন,—তাহার মন্তকোপরি পাহাড় কাশিয়াও দেবতারা
তাচাকে মিন্চন করিতে পারেন নাই,—বিক্ষু গদার দ্বারা তাহাকে মিন্চন
করিয়াছিলেন বা নিষত করিয়াছিলেন, * একথাও সম্বন্ধ বলেন নাই। সম-
বন্ধের কাহিনীতে গদ্যগদ্যের একেবারেই উল্লেখই নাই।

এখন একটু গোপ উপস্থিত। রামায়ণে একস্থানে গয়ায় উল্লেখ আছে।
মহাত্মারতের অন্তত তিন চারি স্থানে গয়ায় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
তন্মধ্যে পুণ্ড্র প্রদত্ত বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত; ধোমপ্রদত্ত বিবরণ
সংক্ষিপ্ত। উহা হইতে “এইব্যা বহবঃ পুত্রাঃ” ইত্যাদি যে লোকটি সর্কিত
দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি যে প্রাক্ষিপ্ত ইহা অসম্ভব করণীয় যথেষ্ট কারণ
আছে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে মহাত্মারতের প্রাক্ষিপ্তবাদ
কেহই স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ ব্যাসদেব যে ভ্রমত রচিয়াছিলেন,
তাহাতে উপাখ্যান ছিল না। মহাত্মারতেরই প্রথমে আছে;—

* কথাতিল্লিবপূর্বার্ধে কৌরবঃ কামানি চ

আনীর কীকটে সেনে পরমকারোবলী ॥

বিজুবারা বিমুচোহনৌ গদগা বিজুনা হতঃ ।

অন্তো পদ্যগদ্যে: বিজুর্বাংরা: মৃত্যু: ॥ বিস্ত: গরুড় চরিত্র ৮২। ৮১।

উপাখ্যানবিদ্যা ভাবদ্ভাগতঃ প্রোচাতে বৃত্তেঃ

মহাঃ, আদি, অহু । ১ ৩

উহাতে ২৪ ছায়াগের অনিচ্ছা প্রকাশিত ছিল না। পরে লোমহর্ষণ, বৈশম্পায়ন, সৌতি প্রভৃতি ইহাঙ্গ উপাখ্যান যোজনা করিয়াছেন। সে উপাখ্যান ভলি পরবর্ত্তীকালে যোজনা করা হইয়াছিল। ইহা বুদ্ধদেবের প্রাভুতাবের সহ পূর্ণস্বতী কথা। * সুতরাং আমার মনে বহু আদি ভাবতে যদি লম্বাষ্ট্র কঃপ্রিত গদ্য বাগ্ধির কাহিনী লেনব্যাঃসের যুথেনিঃস্বঃ না হয়, তাহা হইলে সম্ভবঃ উহা লোমহর্ষণ কর্তৃক প্রচিত হইয়াছিল। উহার রচনা অতি সরল ও স্বন্দর। বৃহত্তিরের গদ্যবালের কথা সম্ভবঃ আদি মহাভারতে কৃত্ত দৈপ্যায়নেরই রচনা। উহাতে গদ্যশির বা উদ্যাত্ত পাহাড়, অক্ষর বট ও কল্প নদী বাতীত আর কিছুই উল্লেখ নাই। আবার নারদ পুস্তক প্রদত্ত যে তীর্থ কাহিনীতে গদ্যর বর্ণনা করিয়াছেন,—তাহা অপেক্ষাকৃত বিত্তীর্ণ। তাহাতে গদ্যবিত্ত অনেক তীর্থের উল্লেখ আছে। সে ভলি সম্ভবই ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সন্নিহিত। এই পুস্তক কৃত্ত বর্ণনাও পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত বলিয়া অনেক মনে করেন। এক্ষণ মনে করিবার হেতুও আছে। যাহা হউক মহাভারতের ঐ তিন চারি স্থানের কোথাও গদ্যবের বা বিষ্ণুর উল্লেখই নাই। পিতাপিতামহের পিণ্ডদানের কথা নাই, প্রেতশিলার প্রসঙ্গই নাই, যে পয়তাল্লিখটি বেদিতে এখন আঙ্ক

* সুতরাংই বুদ্ধ দেব হইলে কলির আরম্ভ হয় ও কল্যান পণ্ডিত হইতে থাকে। ২২২৬ কল্যাণে বা কলিযুগে লাক্ষ্মিন্দেবর পক্ষ পণ্ডিত হইতে থাকে। বৃহৎ সংহিতার এই শ্লোকেরই উল্লেখ আছে। ইহা লাক্ষ্মিন্দেবর পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র। পৃঃ পৃঃ ৩১৪ অক্ষ হইতে ইহার গদ্য হইতে থাকে। বুদ্ধদেবের পক্ষের বংশের হইলে এই পক্ষ পণ্ডিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬১ পুটালে কলিযুগের আইন আশ্বমদীর যে সংস্করণ হইয়াছিল তাহাতেও দেখা আছে যে আশ্বমদীর মন্তব্যগুলি আশ্বমদীর পণ্ডিত ভাক্ষ্মিন্দেবর তাহা দ্বিগুণে কলির প্রথম রাজা কে তাহা লিখিয়া করেন। তাহারা সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য রচনা করিয়া প্রতিলিপ করেন যে দুর্বারের কলির প্রথম রাজা। তাহার প্রবর্ত্তিত সমস্তের ১০৪৪ বংশের অন্তীত হইলে বিষ্ণুর গদ্য আরম্ভ হয় এবং দুর্বারের অঙ্কই ছায়াগ বংশের পরে লাক্ষ্মিন্দেবর আবির্ভাব হইবে। লাক্ষ্মিন্দেবর পক্ষ ২২১ বংশের চলিয়াছিল। তাহার পর বিষ্ণুদেবের গদ্য প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিষ্ণুদেবিতাই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রাপ্ত এবং লাক্ষ্মিন্দেবর পক্ষের লোক করিয়া দিয়া গঙ্গেন।

করা হয়, তাহার মধ্যে অল্প বটর ও ফড়ির কবাই সকল স্থানেই দৃষ্ট হয় ।
বর্ষার সময় কবা কেবল পুণ্ডরিকখিত কাহিনীতে আছে । আবার দেখা যায়
যে দুর্ভিক্ষাদি গয়াতে আসিয়া উপবাস করিয়াছিলেন । কিন্তু বায়ু, বক্রি,
গরুড়, স্বক প্রভৃতি পুরাণে ল্পষ্টই বলা আছে যে, হু-কু-কু-কু, বিশালা, বিগল ও
গয়ায় উপবাস করিতে মাই । বিষ্ণুপাদ ও গয়াস্থরের পর্বমান প্রচলিত ব্রাহ্ম
পুরাণসম্বন্ধ কাহিনী বোধ বিপ্লবের পরপরী কালের দশনা ইহা যাব খীকার
করা যায়, তাহা হইলে শব্দকথিত মহাভারতোক্ত কাহিনী বোধ বিপ্লবের
পূর্ববর্তী ইহাও খীকার করিতে হয় । শাকামিংয়ের আবির্ভাবের পূর্বেও
গয়াতীর্থ ছিল এবং সে গয়া অশ্বখোনি পাহাড়ের অতি সান্নিধ্যই ছিল ।
বৌদ্ধদিগের সহিত মন বলে বলীয়ান হিন্দুগণের সে সংঘর্ষ হয়, তাহার ফলে
সেই গয়া (অশ্বগয়া) বিহীন হইয়াছিল । ফা বিদ্যান গয়ার সেই বিবস্ত্র অবস্থা
দেখিয়া গিয়াছিলেন । তাহার পর বর্তমান গয়ার অহাদয় । জগদ্বিশাং এই
গয়াই দেখিয়া গিয়াছিলেন ।

(ভ্রমণঃ)

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ।

আবার বিবাহ ।

মেদিনীপুর ।

৭ই আশ্বিন, ১৩১২ ।

অভিপ্রকাশ্যে—

প্রিয় ললিত । আবার আমার বিবাহ । শান্ত শরতের এই যে জোয়ার
সুন্দর কিরণে পৃথিবী ভরিয়া উঠিয়াছে,—আকাশে কোথাও একখানি মেঘ
নাই, নীল গগনগাত্রে সজ্জিত শত সহস্র দীপের আলোক, তাহাদের যোগে
সৌন্দর্যের আগার ঐ বজ্রম চন্দ্র,—এমন সুন্দর রজনী অনেকের জীবনে
অনেকবার এবং আমার বিবাহিত জীবনে একটবার মাত্র আসিয়াছিল ।
কিন্তু বাহা আসিয়াছিল তাহা গিয়াছে, এবং বাহা আসিবে তাহাও যাইবে,—
ইহা প্রকৃতির দুলভ্য বিধান ।

মনে পড়ে—বসন্তের সেই নিরবচ্ছিন্ন মিলন, লম্বাঃ প্রস্তুতিত পুষ্পের সহিত
মন্দমলয়ানিলের অগাধ ক্রীড়া, ভ্রমরের ললিত গঞ্জন, পিকের আকুল
আহ্বান ; তাহার পর নিদাঘের সেই অবসন্নতা,—সলিলের লিপাদা নিবারণে
অক্ষমতা, তৃষ্ণিতে অকৃত্রিম উদ্বেগ ।

আরও মনে পড়ে বর্ষার সেই করুণক্রন্দন,—প্রবল বহ্যাত্রোভে ভাসমান
জল কূপ একখানি ভেলা অকূলে তাসিয়া উদ্বেগহীন পথে ছুটিয়া ছুটিয়া ভূমিয়া
গেল !

তার পর আবার শরৎ আসিয়াছে, আবার আমার বিবাহ ।

বাড়ী আসিতে অত্যন্ত করিবে না ।

তোমার বেহের—

জ্ঞানদা ।

(২)

চন্দ্রনগর ।

বহুবরেহু—

১০ই আশ্বিন, ১৩১২ ।

প্রিয় জ্ঞানদা । বহুদিনের পর তোমার পত্র পাইলাম । আবার তোমার
বিবাহ !—দেখ ! তোমার পুরাতন ভেলাখানি ভূমিয়াছে, আবার তুমি নুতন

ভোগা নিশ্চয় মন দিয়েছে। দোষেতেছি, তুমি দেউলিয়া হইবার পাত্র নহ। একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি, রাগ করিবে না ত ?

পূর্ব এক বৎসর পরে—বরতের পুনঃপ্রায়শ্চিত্ত—বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন বছর স্থিতি তোমার মনে জাগিয়াছে ; কিন্তু ভাই, ঐ তিনটা বছর আমি প্রতিদিনের জীবনে উপলব্ধি করিতেছি। আমি ত বনহীন, বিছা হীন ও বুদ্ধিহীন আমি একজন কেরানী। কৰ্মক্ষেত্রে নিদাঘতপ্ত মজবানুকার স্তায় আশাম্বর অহুৎসাহ আমার এই প্রতি অনুপন্নমাগুতে গিলিও। বর্ষার সঙ্গততা ও অক্রেতে সাধনা আছে অশীকার করিতে পারি না, কিন্তু গিটে ইচ্ছাভেদে মত আমার এই অভাবজনীর্ণ দেহস্থানার অংশবিশেষে যে দুইটা চক্ষু আছে, তাহা যখন জলে ভরিয়া উঠে (জল নহে রক্তের কণাসমষ্টি) বল দেবি, ভাই। কেমন সেই পুত্র,—কেমন সেই বর্ষা ! ভবিষ্যতের কথা মনে হইলে শিরায় শিরায় বমনীতে বমনীতে বিহাদীপ্তি প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা ভিতরে। মনে করিও না বসন্ত আমার জীবনে নাই। যখন আমার দণ্ডযুগের কঠা, হস্তাকঠাবিধাতা উচ্ছাদনশোভিত প্রতিপালক গজীরভাবে বসিয়া থাকেন, আর তাঁহার সমুখে যুক্তকরে, স্মিতহাস্তে সঙ্গত বা অসঙ্গত আদেশ প্রতিপালনের জন্য আটাইডিওর পটের 'ঐরামচন্দ্রের সমুখে জাপুণানের' মত দাঁড়াইয়া থাকি, তখন কি আমার দিকে চাহিলে বসন্তদর্শন হয় না ?

যাহা তোমার পূর্বে ছিল এবং এখন নাই, এমন একটা জিমিস, হয় ত তাহা পরে থাকিবে না, কিন্তু এখন আমার আছে। সন্তান কিছু পূর্বে অক্লিষ্ট হইতে আসিয়া লামাক্ত আরাধ্য ও অনেকবানি জল উদ্বাহ করিয়া বাগার আরামকেন্দ্রার বসিয়া মিঠেকড়া একটা ছিলুয় তামাকুলেবলে বিস্তার হই, তখন মনে হয় সংসারটা পণ্ডীর রাজ্য,—দুঃখ-দৈন্ত-শোক-তাপ-ক্লেশ কিছুই নাই। আমি যেন অনন্তের মাহুত, অনন্তরাজ্যে অমন্তকাল বসিয়া অনন্তমুখ ভোগ করিতেছি।

যাউক ভাই। অফিসের বেলা হইয়াছে, আজ এই পর্য্যন্ত। দিন স্থির হইলে সংবাদ দিও, বাড়ী যাইবার চেষ্টা করিব। একটা প্রতি উপহার দিও কি ?

তোমার মেহের বন্ধু—
ললিত।

(৩)

যেদিনীপুর ।

অভিভাবকবহেদু—

১৩ই আশ্বিন, ১৩১৯ ।

প্রিয় ললিত ! তোমার পত্র পাইয়া স্তম্ভী হইলাম । না, ভাই ! নূতন ভেলার আমার মন নাই । পুরাতন মূল, নূতন তাহার অহুসার । নূতনে পুরাতনের দ্বারা পড়িতে পারে, কিন্তু নূতন কখনই পুরাতনের আদর্শ হইতে পারে না । বর্তমান ভবিষ্যতে মিশিবে, কিন্তু অতীত বর্তমানের দার দাসে না । অতীত যে পথ প্রদর্শিত করিয়াছে, বর্তমান তাহারই অহুসরণ করে । অতীত তরু, বর্তমান শিখা ; অতীত দেবতা, বর্তমান মনুষ্য । ভাই, নূতন ভেলায় আমার অনিচ্ছা, এবং পুরাতন নিষিদ্ধিত ভেলাখানিই আমার এই অসার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ।

সত্য বটে উল্লিখিত গুরুত্বের মাধ্যমে ভূমি দৈনন্দিন জীবনে উপভোগ করিতেছে, কিন্তু তোমার পিলাসী কি চাতকের মত ? বিলাসী উচ্ছ্বল ধনীর এবং উদ্বাসের অস্ত্র লালায়িত একজন ভিক্ষকের অভাববোধ কি ভূল্য বুল্য বহন করে ?

ভালকথা, বিহুপুরের অথবা রাধিকাপুরের সুখানিত তোমাকে পরীর স্বাক্ষর লইয়া বাইতে পারে ! তথায় ভূমি দেখিয়াছ হৃৎ-দৈব-শোক-তাপ-রূপে কিছু নাই । কিন্তু তথায় এমন সৌন্দর্য আছে, যাহা কল্পনার আইসে, কিন্তু তাহার আইসে না তাহা ত দেখিতে পাও নাই ! তথায় ভূমি কল্পনামাত্রের যে সুখ দেখিয়াছ তাহা হৃৎ-ধের অভাবজনিত, কিন্তু তাহাতে সুখের স্বকীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ কই ?

ভূমি তোমার কণ্ঠজীবনে হৃৎ-ধের একখানি চিত্র দেখিয়াছ । পরাধীন নযে কে ? অগতে কর্ণই প্রধান ও স্বাধীন এবং জীবনমাত্রের পরাধীন । প্রভেদ মাত্র প্রকারভেদ ।

বিবাহের দিনটির হইয়াছে কিনা জানি না, এবং জানিবার উপায় নাই । প্রীতি উপহার যদি পুরাতন করিতে পার, তবে দিও আশ্রয়ে মৃতকে ভূমিয়া লইব ।

পত্র দিতে ভুলিবে না ।

তোমার বহেদু—

জানদা

(৪)

চন্দ্রনগর।

১৬ই আশ্বিন, ১৩১৯।

বন্ধুবরেন্দ্র—

প্রিয় জ্ঞানদা। বাহা তাবিয়াজিলায়, ঠিক তাহাই হইয়াছে। কেবল-
তেছি, আমার পত্রখানি তুমি সমালোচনার তুল্যভেদে যাপিত্যছ। তোমার
মিকট অভীতের পুরাতন জিনিষটাই সুন্দর; আর সেই সৌন্দর্যের দ্বারা
পড়ে নৃতনের উপরে সত্য, কিন্তু ইহা তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে
যে, সেই দ্বারা বর্ণন ব্যতীত অভীতের গৌরব—পুরাতনের সৌন্দর্য—কল্পনা-
মাত্রে পূর্ণ প্রকাশ পায় না। এই শরৎ আবার আসিয়াছে বলিয়াই তোমার
মনোবর্ণনে পূর্ণস্বতির প্রতি স্রষ্টা প্রদর্শন করিতে পার, কিন্তু নৃতনকে অবজ্ঞা
করিতে পার না।

প্রকৃতি এই শরৎকে কত শতবার হারাইয়াও আবার পাইয়াছে বলিয়া
কি তুমি তোমার পুরাতন জিনিষ, বর্তমানে যাহার স্বত্বপের চিহ্ন পর্যন্ত নাই,
তাহা পাইবার আশা করিতে পার? প্রকৃতির ক্ষেত্র অনন্ত, কিন্তু তোমার
জীবনকাল যে নির্দিষ্ট।

কর্ষক্ষেত্রে আসিয়া বুঝা সময় অতিবাহিত করা কি ভাল? জীবনের
অনেক কাল এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আবার বিবাহ কর,—তপস্বান
তোমাকে সুখী করিবে না।

তোমার স্নেহের বন্ধ—

ললিত।

(৪)

বেদিনীপুর।

২২ শে আশ্বিন, ১৩১৯।

অভিরামবরেন্দ্র—

প্রিয় ললিত! পত্র দিতে বিলম্ব হইল। মনে করিয়াছিলাম তুমি ৮পুজার
সময়ে বাড়ী আসিবে। কিন্তু তুমিও আসিলে না, এবং আমিও তোমাকে
দিনদ্বয়ের সংসার দিতে পারি নাই।

নৃতনকে অবজ্ঞা করা চলে না বটে, কিন্তু পুরাতনকে যদি নৃতনের বৃষ্টিতে
দেখিতে পারা যায়, তবে পুরাতন আর পুরাতন রহিল কই? সৌন্দর্যের

বিকাশ লইয়াই কথা । মাধুণ্য-উপভোগের ভূসাবণে নৃতন-পুণ্যভনের বিচিত্রতা শুক-শাগীর স্বপ্নের ছায় ।

যাহা হারাইয়াছি তাহা আর পাইব না ভাবিয়া আশা ত্যাগ করিব এতটা হৃদয়ের বল আমার নাই । স্বস্তির জ্বলে না হইলে আশাকে নিসর্জন দিতে আমার মত মানুষ পারে না । আমার মনের ভিতরে স্বস্তির যে তীক্ষ্ণ আলোক অহরহঃ জ্বলিতেছে, সেই আলোকেই সম্মুখে যে একটা করুণ দৃশ্য অঙ্কিত রহিয়াছে, সেই আলোক নির্জাপিত করিয়া সেই দৃশ্যের অন্তরালে আসিতে বল ! পারিব না ।

নূতন বিবাহ করিয়া সুখী হইব না, কেন—ভনিযে ?

গতরাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি । যাহাকে হারাইয়াছিলাম,—মনে করিয়াছিলাম যে হারিয়াছে, যাহার আগ্র অস্তিত্ব নাই,—তাহাকেই দেখিয়াছি । তেমনই দেখ, তেমনই লাভণ্য, এমন কি মুগের হাসি পর্য্যন্ত ঠিক তেমনই ! দেখিলাম, অভিমান এখনও তাহার যায় নাই । চিত্তের আগুন ভাবাকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছে যাত্রা,—সে এখনও বাঁচিয়া আছে !

বীরে বীরে সে যেন আমার প্রতি নিকটে লম্বা পার্শ্বে আনিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পরিচিত অভিমানভরে বলিল, “আর কত কষ্ট দিবে আমাকে ? কতদিন তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি আর তুমি—”

তাহার কথায় বাধ্য দিয়া আমি বলিলাম, “তুমি এখন কোথায় আছ ?”

সে অক্লান্তি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিল—উর্ধ্বে ।

দেখিলাম সে একটা বিতীবিকামর অন্ধকারের রাজ্য, বলিলাম, “কি আঁধার !—পূর্ণ দেখা যায় না, না—আমি ও দেশে যাইব না ।”

সে হাসিয়া বলিল, “এমন উজ্জ্বল দেশকে তুমি বল আঁধার ! তুমি অন্ধ !”

আমি বলিলাম, “না, না, আমি অন্ধ নহি । তুমি ফিরিয়া আইস ।”

“যাবে না”, সে যেন কিছু বাধিত হইয়া বলিল, “যাবে না, আমি তোমাকে ছেড়ে আর থাকিতে না পেরে কতদূর হ’তে এসেছি, আর তুমি • যাবে না !”

আমার মত পরিবর্তিত হইল । আমি বলিলাম, “তবে যাই—দাঁড়াও ।”

“আজ নহে, আর একদিন” বলিতে বলিতে সে অন্তত হইয়া গেল, এবং আমার নিদ্রাতপ হইল । প্রত্যন্ত সমীরণ শুধন ঘরে ঘরে আমার দেহের

উপর দিয়া বহিয়া বৃষ্টি সেই ঘোষের উদ্দেশে গাইতেছিল । পাক্কুল প্রভাও-
সদীতে মাতিয়া বৃষ্টি আমাদেরই লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার
মুখের প্রভাত অপুরে ।"

তুমি কি বয়স সত্য বয়স বলিয়া বিশ্বাস কর না ? যাহুদ কি কখন মরে ?

তোমার স্নেহের—

জাননা ।

(৬)

চন্দ্রনগর ।

২৪ কাৰ্ত্তিক, ১৩১১ ।

বন্ধবরেন্দ্র—

প্রিয় জাননা । একি পত্র না প্রেরণ !—বিবাহ না বাতুলতা ! স্ত্রী
বিয়োগে হৃৎকান্দন হয় না ? কিন্তু তোমার মত জীবনতরীর হাল ছাড়িতে
ত অজ্ঞকে দেবা যায় না । শোকোচ্ছ্বাস, পদো পদো অনেক দেখিয়াছি,
কিন্তু অতীতের চিত্রে অবিকাংশ হলেই দেবা যায়, সেওলা সাময়িক উত্তে-
জনাশূলক,—মিস্কল যোগজ্ঞানের মত ।

বয়স কি কখন সত্য হয় ? এই দেখ না, আমি কতদিন বয়স দেখিয়াছি—
আমি উচ্চতর পদে অবস্থিত হইয়াছি । কিন্তু সব মিথ্যা । তুমি মিথ্যাজ্ঞি
যে এতটী বিবয়ের চিন্তায় রত রহিয়াছ, আয়বিক দৌর্ভাগ্যে সেই বিবয়ের
স্বপ্নকর বা অস্বপ্নকর একটা বয়স দেখিবে, ইহাতে বিনিমিত হইবার কিছুই
নাই ।

তোমার অহুকুলে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভালবাসা কি তাহা
তুমি বুঝিয়াছ, কিন্তু তোমার প্রতিকূলে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, তোমার
ভালবাসা সীমাবদ্ধ ।

তোমার মতে যাহুদ অমর হয় হউক, কিন্তু কোন সুভাবান্তিকে কখন
কিরিয়া আসিতে দেখিয়াছে কি ?

কাণ্ডের কঁকাটে লুপ্তগোঁসবের সময়ে বাড়ী যাইতে পারি নাই ।

আজিকার মত বিদায় ।

তোমার স্নেহের বন্ধ—

ললিত ।

(৬)

মেদিনীপুর ।

২৮শে কাশিক ১৩১২ ।

অভিপ্রায়ঃ—

প্রিয় মণিত । শুভসংবাদ শুনিবে ? অনেক দিন হইতে অনুরোধে জ্বলিতেছি, তাহার পর এই একমাসকাল এক প্রকার ল্যাগাত অবস্থায় আছি । আজি সকালে ডাক্তার আসিয়া বলিয়া গেলেন । “বাইসিন হইয়াছে, ঔষধে কল ফলিবার সম্ভাবনা নাই, বারু পরিবর্তনে কিছু উপকার হইলেও হইতে পারে ।”

এখন বুঝিতে পারিলে—আমার বিবাহের দিন অতি নিকটে ?

দেখি দিবিবার সামর্থ্য নাই, শরীর বড় দুর্বল । এ সময়ে একবার আসিবে না ?

তোমার ভেতর—

জামদা ।

ঐকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পাপ ।

(সংক্ষেপে হইতে)

পদে পদে বাহুবোঝা করে ফেলে পাপ,
পাশেওরা তাই লয়ে থাকে নিশিদিন,
সহ্য পাপের তরে করে অহুতাপ,
এক। তবু ভগবান্ পাপ লেশ ছীন ।

ঐবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ।

বর-পণ ।

(২)

বরপণের অত্যাচার ।

বাস্তবিকই, আজকাল অনেক সময় বরকষ্ঠাদের পীড়নে কস্তার বিবাহ দেখা যায়। বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের হই পয়সার সংস্থান আছে, হই ভিনটি কস্তা পার করিতে হইবেই তাঁহারা সর্বস্বাত্ত হইয়া পড়েন ; দরিদ্রের ত কবাই নাই। অনেক স্থলে একটি কস্তাতেই পিতা-মাতার তিটাবাটি উজ্জিন্ন হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। কোন সময়ে এক জমীদার—জন্য যায় এটা সভা ঘটনা—আপনার চেয়ে ধনী অথচ এক জমীদারের পুত্রের সহিত খাঁর পোজার বিবাহের প্রস্তাব করেন। কিন্তু পুত্রের পিতা বলেন যে, তাঁহার চেয়ে ছোট বর হইতে তিনি কস্তা গ্রহণ করিতে পারিবেন না, আর সেই সঙ্গে হই একটি মিস্ট্রী বুলও যে না কাড়েন তাহা নহে। ফলে কস্তার পিতামহ তত্ত্বদানে বাতী করিয়া আই.সন। কিন্তু এই অপমানের বোকা আর তাঁহার বুক হইতে নামিল না। সেই হুগেই তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল ; তিনি যুহুমুখে পতিত হইলেন। কিন্তু তিনি যুহুমুখ স্বস্থায় খাঁর পুত্রকে (কন্যার পিতাকে) নিকটে ডাকিয়া এই শপথ করাইয়া করেন যে, তিনি যদি তাঁহার পুত্র হইলেন তাহা হইলে সর্বস্বাত্ত হইয়াও যেন কোলাণীভিমানী জমীদারের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ফলে অনেক সাধ্য সাধনার পর পঞ্চাশ হাজার টাকা মুগে বরকস্তা কোলাণী বিক্রয় করিতে দ্বাঙ্গী হইলেন। কন্যার পিতা কয়েকখানি তালুক বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিলেন। বিবাহ হইয়া গেল। কন্যা স্বত্তরবাড়ী গেল। কয়েক দিন পরে (সামাজিক প্রথামত) কন্যা পিতাগণে ফিরিয়া আসিল ; কিন্তু জামাই বাবু 'ঘোড়ে' আসিলেন না। কন্যার পিতা আবার ছুটিয়া গিয়া টৈবাবিক মহালয়ের পান-বন্দনা করিতে লাগিলেন ; বলিলেন, কি করিলে বাবাজী একবার এই অথমেই বাড়ীতে পায়েয় ধূলা দিবেন ?" এবারও টাকায় যান ভাঙ্গিল। পঁচিশ হাজার টাকা পাইলে তবে বাবাজী স্বত্তরবাড়ী বাইবেন। কন্যার পিতা, তাঁহার ঘাষা কিছু সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া বা বন্ধক দিয়া ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া জামাতাকে নিম্ন বাতীতে লইয়া আসিলেন।

এবং জনবাহার দিয়া তাহার নিকট এসবানি খালয় ঐ টাকা রাখিয়া দিলেন। জামাই বাবু চাঁদপানি ঘূষ করিয়া (এপটাঙ্গের ঘূষ দেখিয়া ?) জনযোগ করিলেন। তাহার পর অল্পদিন পরেই জামাই বাবুর শেখডাক পাড়িয়া তিনি ভবণীলা সাক্ষ করিলেন। ঐ পঁচাত্তর হাজার টাকার তাহার পিতারই পেট ভরিল। ইহা অপেক্ষা মোচনীয়, ঘৃণিত, শৈশাচিক ব্যাপার সমাজে আর কি ঘটিতে পারে ? *

এায় অর্দ্ধশতাব্দী পুঙ্কে ধানবন্ধু কবি দীনী নীলাবতীর প্রাণের বাষাষ ব্যথিত হইয়া পাঁছিয়াছিলেন,—

“কৌলীজ-অশান-কালী-জ্বর তুঘিতে ।

দিবেন হুহিতা বলি অপাত্রে অসিতে ॥”

কিন্তু কৌলীজের কঠোর শাসনে শাসিত সমাজের কত নীলাবতী যে প্রকৃত পক্ষেই মদের টাঙ্গের জায় “লক্ষ্যনের শেখ” ‘সোবরগণেশ’র হাতে পাড়িয়া চিরজীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ?

আজকাল, ইংরাজী শিকার ফলেই হউক বা সুগর্ভে মানসমনের অলঙ্ঘনীয় পরিবর্তন বশতঃই হউক, অথবা অজ যে কোন কারণেই হউক, কৌলীজের কড়াফড়ি কতকটা কমিয়াছে ; কিন্তু অজদিকে আবার বরপণের অভ্যাচার বেজায় পড়িয়াছে। ইহার করালকবলে পতিত হইয়া নত নত নিরীহ দরিদ্র গৃহস্থ একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে,—একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। পঞ্চদশ বম্বীয়া কুমারী বেহলতা দেবীর আত্মপ্রাণ-বিসর্জন ও বরবর্তীর এই রক্তশোষণ-স্মৃতির ফল।

অবশ্য বেহলতাই যে বরপণের অভ্যাচারে বাগিকা-বলির একমাত্র উদাহরণ তাহা বলিতে পারি না। কেন না ‘কালো হুং নিঃসর্পিণীপুলা চ পৃথী।’ সমস্ত পৃথিবীর কথা সূরে থাকুক, আমাদের এই বঙ্গদেশের মধ্যেই যে প্রতিদিন এইরূপ কত লোমহর্ষণকর ঘটনা ঘটিতেছে তাহা কে জানে ? আর আজকাল অর্ধগুরু বরকর্তা মহাপ্রদর্শনের অনুপ্রাণে যে প্রত্যাহই এরূপ

* একেত্রে অথবা কতকর্তা একেবারে নির্দোষ নহেন, কেন না তিনি সেই বরকেই কতাদান করিবার জিব না করিলেই পারিতেন। সত্য কথা। কিন্তু বরকর্তা মহাপ্রদর্শনের কাখটা যে নিতান্ত অর্থলালসা প্রণোদিত এবং তাহার পুঙ্কর বস্ত্রবাড়ী,খাওয়ার লক্ষ্যটা যে আরও নির্দোষ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

হুই একটা ঘটনা না ঘটিতেছে তাহাই বা কে বলিতে পারে? তবে স্বৈহলতার বৃত্তান্তই এত আন্দোলন কেন? কেহ কেহ বলিতেছেন, এইটাই সমাজের পক্ষে 'শেষ তর্ক'। সমাজ অনেক সহিষ্ণুছে, আর সহিবে না। ঈশ্বর করুন, তাহাদের পরিবাসাণীই সফল হউক।

সরপণের অধিকার-বিচার।

বর্তমান প্রবন্ধের 'মোরচন্দ্রিকা'তেই বলিয়াছি, সরপণ-প্রবাস সমালোচক দুইটি দল আছেন। একদল উহার স্বপক্ষে, অপর দল বিপক্ষে। হুই দলই নিজ নিজ মতের সমর্থনের জন্য যুক্তি-তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই আমাদের যখন কোন একটা কাহ করিবার মতলব করি, তখন আমাদের মনের মত মত মত যুক্তি আপনাই আনিয়া উপস্থিত হয়। তবে অবশ্য সব যুক্তিগুলিই যে সমান বাঁটি একথা বলিতে পারি না। অতএব এক্ষেত্রে আমার কর্তব্য উত্তরপক্ষের যুক্তিগুলিই নিরপেক্ষভাবে বিচার করা। তাহাই করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কতদূর কৃতকার্য হইব জানি না।

সরপণের সমর্থনকারীদের মধ্যে যাহার যখন যেরূপ দরকার তখন সেইরূপেই প্রমাণের ব্যাখ্যা করেন। ফলে কিছু ট্যাক সই (আধুনিক মত্যা-তার পকেট সই) হইলেই হইল। 'যেন তেন প্রকারেণ কার্যাসিদ্ধির্গরীয়সী'; অনেক সময় বরবর্তাদের ক্ষুণ্ণ এত বেশী হয় যে, শুধু পণের টাকাতে তাহাদের পেট ভরে না। তাহারা আরও কিছু চাহেন। কারণ কান্ডনে গগনে ফেনে বর্ষারেরা নয় ইচ্ছা করুক আর মাই করুক, আবির্ভাব পৌঁছে নৈার্চে বরকর্তার চিত্রকালই তত্ব ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আর যৌতুক বা তত্ব দ্রুতিমত না পাইলে বধু বেচারার নির্ঘাতন করিয়া তাহার প্রতিশোধ লয়েন। যাউক, এইবার কায়ের কথা পাড়ি।

কোন সামাজিক প্রবাস স্ত্রাস্ত্রায় বিচার করিতে গেলে সর্বপ্রথমে আশ্রয় লইতে হয় শাস্ত্রের, তৎপরে দেশাচারের। এক্ষেত্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে চলিবে না। শাস্ত্রে বলে, স্ত্রীবিক্রয় স্হাপাপ। অনেকের মতে পুত্রের বিবাহে টাকা লওয়া পুত্র বিক্রয় করার সমান। কথাটা কিন্তু কেমন কেমন লাগে। এটা কস্তার বেলায় বেশ বাটে, কিন্তু পুত্রের বেলায় বাটে না। কারণ কস্তার বিবাহ দেওয়ার অর্থ কন্যাকে তাহার স্বামীর ও বস্ত্র খাত্তীর হস্তে সমর্পিত করা। কিন্তু পুত্রের বেলায় ত আর তাহা নহে? অতএব দেখিতেছি শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণের সীমাংসা হইল না। তবে ইহা

হইতে খেন কেহ মনে না করেন যে, শাস্ত্র বরণের পক্ষপাত।। কলন্তঃ শাস্ত্র এ বিষয়ে উদাসীন।

এখন দেশান্তরের কথা। প্রারম্ভে, ঐতিহাসিক আলোচনা করিব না বলিয়াও যতটা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, আমাদের দেশে এখনও প্রগাটার মৌরসী বয় জন্মায় নাই; উহা বিদেশের হাল আমদানী। এই যুক্তিটি বরণের প্রতাপক হইয়াই দাঁড়ায়। অতঃপর অন্যান্য যুক্তির অবতারণা করা যাউক।

সাধারণ লোকের চক্ষুচক্ষুর দ্বারা অর্জিত জ্ঞান আর পণ্ডিতগণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-শক্তি জ্ঞান কখনই এক প্রকারের হইতে পারে না। আমরা যাহাকে বেগুন বড় জোর বার্ত্তাহু বলি, ঐতিহ্যবৈজ্ঞানিকগণ = আবার তাহাকেই সোলেনাম্‌ মেলান্‌জিনী, না সোলেনাম্‌ মুলান্‌জিনী এই রকম কি একটা বলিয়া থাকেন। সেইরূপ আমরা যাহাকে সাধারণের বরণ বলিয়া জানি, সমাজতত্ত্বগণ তাহারই মধ্যে দায়ভাগের ভাব দেখিতে পানেন। তাহার বলেন যে, এই পণ্টা আর কিছুই নহে। পিতার বিষয়ে পুত্রের যেমন অধিকার, কস্তারও তেমন অধিকার। কিন্তু কস্তা আর স্বত্তরবাড়ী হইতে পিতার বিষয়ে ভাগ বসাইতে আইসে না। তাই বিবাহের সময় তাহাকে (বা তাহার স্বামীকে, একই কথা) তাহার প্রাপ্য বিষয়ের মূল্যবস্তু কিছু টাকা দেওয়া হয়। স্বীকার করিলাম। কিন্তু দ্বিজ্ঞান করি, তাহার সম্পত্তির মূল্য এক শত টাকাও হইবে না, তাহাকেও বাধা হইয়া কন্যার বিবাহে হাকারের অধিক দিতে হয় কোন্‌ হিসাবে?

কেহ কেহ বলেন,—বরণক কখনই কস্তাপক্ষের নিকট হইতে জোর করিয়া টাকা লইতে পারেন না। অথবা বরণক যত টাকা চাহেন, কস্তাপক্ষ যদি তত টাকা দিতে না পারেন অথবা একেবারেই কিছু দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইলে, তাহা হইলে সেই বরণকেই যে কস্তা সম্প্রদান করিতে হইবে, এমন কি মাথার দিয়া দেওয়া আছে? কবাতা বলিতে খুবই সোজা, শুনিতে আরও সোজা। কিন্তু কায়ে তাহা হয় কই? সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, বহিষ্কৃত কস্তাকর্ত্তা সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার দ্বাৰা পারে ফেলিয়া এ গ্রাম ও গ্রাম, এ দেশ ও দেশ ঘুরিয়া কোথাও নিজের গুণ-মত

* এখানে কোন্‌ পনের ত্রুটি দৃষ্ট, বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বিচার করিবেন।

পাত্র খুঁজিয়া পায়েন না। তিনি যেখানেই যায়েন, পাত্র যেমনই হউক, তাহার পেট ভরাইবার উপযুক্ত খাদ্য কত্য়াকর্তার গৃহে নাই। তবে কি তাহাকে বলিব, হয় স্বেহপানিত কত্য়টিকে অন্নপণে বা বিনাপণে একটা কাণা বোঁড়া কুঁজোর হাতে দাও, আর না হয় তাহাকে চিরকুমারী করিয়া রাখ ?

আবার দেখুন, পাছে বরপণের বিরুদ্ধবাদিগণ লিজাসা করেন যে, বর বা বরকর্তার বিবাহে টাকা লইবার কি অধিকার আছে ? সেই লজ উহার সমর্থনকারিগণ আগে হইতেই একটা জবাব খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। জবাবটা এই ;—অনেকে নিজের অবস্থা খারাপ বলিয়া বিবাহ করিতে চায় না ; কিন্তু যদি সে বিবাহ করিয়া (স্বত্ত্বরের টাকার) অবস্থার উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে সে বিবাহে টাকা লইবে না কেন ? কি সন্দেহ যুক্তি ! যাহার উপার্জন করিয়া অবস্থার উন্নতি করিবার ক্ষমতা নাই, সে একটা পয়সার মধ্যে গলায় করে কোন্ লজ্জার ? পণের টাকা কয় দিন থাকিবে ?

ইহাদের মতে মনবান্ লোকও বিবাহে পণের দাবী করিতে পারে। কেন না, ধনতৃষ্ণা কাহার মিটে ? আর যখন ব্যবসার-বাণিজ্য করিয়া ধনবৃদ্ধি করা যোনের মধ্যে, তখন বিবাহ করিয়া ধনবৃদ্ধি করাই বা যোনের হইল কি করিয়া ? ঘটেই ত ; বিশেষতঃ যখন ব্যবসার-বাণিজ্যে পরিশ্রমও বিস্তর, আর দায়িত্বও বিস্তর ; পক্ষান্তরে বিবাহে খুশাল আনাই সুখ। লাভিয়া শুদ্ধিয়া পাকী চড়িয়া আমোদ আহলাদভূত করা হয়, আর মাঝে থেকে টাকাটাও পকেটে আসে। এই নহিলে আর বালাগীর বীরত্ব কোথায় ?

কেহ কেহ আবার এ বিষয়ে বরকর্তার বাহাদুরী বাহাল রাখিয়া কত্য়াকর্তাকেই কাপুরুষ কহিয়া থাকেন। কারণ, তিনি টাকা দেন কেন ? কিন্তু বায়। নিতুররা এটাও বুকে না যে, টাকা না দিয়া বেচারার করে কি ? বিনা টাকার তাহার ঘরে লইবে কে ? আর ভর্তুকাগীশগণের মুক্তির সামঞ্জস্যটাও একবার দেখিবেন। তাহার একমুখে বলিতেছেন যে, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকল বরেরই পণ লইবার ন্যায় অধিকার আছে, আবার অন্য মুখে বলিতেছেন যে, যে কন্যাকর্তা টাকা দিতে পারিবেন না, তিনি কেন নোনোঁত পাত্র ছাড়িয়া অন্য বরে কন্যা সম্প্রদান করন না।

কিন্তু অন্য বর তিনি পাইবেন কোথায় ? টাকা নইবার ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়ে কে ?

কেহ কেহ আবার বরপণের সাহায্যে সমাজের ও দেশের অশেষবিধ উন্নতিসাধন করিতে প্রয়াস পানেন । তাঁহাদের মতে বরপণ বিবাহিত-কীবন-মাত্রের উন্নতি ও জাতীয় মঙ্গল সাধিত করে । কিন্তু কি করিয়া যে সে উন্নতি সাধিত হয়, তাহা এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না । তাঁহারা আরও বলেন যে, বরপণ প্রথাগে প্রভাবে কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িয়াছে, * প্রত্যেক জাতির অন্তর্গত শ্রেণীবিভাগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, কোলোনিয় ঐচ্ছিক ক্রিয়া গিয়াছে এবং দুই দিন পরে বোধ হয় জাতিভেদও উঠিয়া যাইবে । তাঁহাদের মতে নীচের বরপণের কারণ, এই সকল সামাজিক পরিবর্তন বরপণ-প্রথাই ফল (কারণ, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে) । কিন্তু এই সকল পরিবর্তনে সমাজের উন্নতি হইতেছে, কি অবনতি হইতেছে, সমাজ-সংস্কারকগণ এখনও সে বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই । বিশেষতঃ কন্যার বিবাহ-বয়সের বৃদ্ধি যে হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বদা কল্যাণপ্রদ হয় না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

কেহ কেহ বা বলিতেছেন, বরপণ দিতে কৃত্যাকর্তার কষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহা উঠিয়া গেলে দেশ আরও দরিদ্র হইবে । অর্থাৎ ইহাদের মতে কৃষি-বাণিজ্যাদির দ্বারা বরপণও দেশের ধনবৃদ্ধির একটি উপাদান । অর্থনীতিতে কি অম্বল ব্যাপ্তি । বরপণে যে টাকাটা দেওয়া হয়, সেটা কি দেশেরই টাকা নহে ? না কি সেটা পূর্বে Unproductive capital ছিল, এখন productive হইল ?

অর্থনীতির আর একটি সূত্রপ্রয়োগ দেখুন । বরপণের উকীলেরা বলেন যে, যেমন সমাজ বা দেশে একটা সংস্কার হইয়া গেলে ব্যক্তিবিশেষকে বা শ্রেণীবিশেষকে দিনকতক একটু কষ্ট পাইতে হয়, সেইরূপ কৃত্যার বিবাহরূপ সংস্কারের পর তাহার অভিত্যাবকে দিনকতক (অর্থাভাবে) একটু কষ্ট পাইতে হয়—ইহা ত স্বাভাবিক । এ যে কালিদাসের উপমা আর Adam Smith-এর বুদ্ধি ! ব্যক্তিবিশেষের কষ্ট হউক, কিন্তু সমগ্র সমাজের ত

* কেন না, কৃত্য ছোট খাতিতে থাকিতে তাহার শিতা বরপণ সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না ; কৃত্য বড় হইলে তিনি তাহার নব্য উদ্যোগ সংগ্রহ করিতে পারেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকল ক্ষেত্রে এ বুদ্ধি খাটে না ।

উপকার হইল? Greatest good of the greatest number ত সাধিত হইল? কিন্তু এই প্রকম করিয়া উহা সাধিত করাই বুদ্ধি অর্থনীতির উদ্দেশ্য? আর আজকাল দরিদ্র কটাকটাদাদের সংখ্যা এত বাড়িতেছে যে, তাঁহারা ই বোধ হয় অচিরে দেশের majority হইয়া দাঁড়াইবেন।

ইঁহারা আরও বলেন, বরপণ-প্রথা থাকতে দরিদ্র কটাক পিতারা মিল-কণ শিকা পাইতেছেন যে, তাঁহাদের মত অর্থহীন লোকের বিবাহ করা উচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের দুর্দশা দেখিয়া আরও অনেক এই শিকা পাইবে। ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যাঁহাদের অবস্থা পূর্বে খুব ভাল ছিল, কিন্তু ষঠাৎ অল্প দিনের মধ্যে খারাপ হইয়া গিয়াছে—এরূপ ঘটনা বিরল নহে। তিনি এখন কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছেন না বলিয়া কি বলিব যে, তাঁহাদের বিবাহ করা উচিত হয় নাই?

কোন কোন মিতব্যয়ী মহাত্মা বলিতেছেন যে, বরপণের প্রভাবে দোলে, দুর্গোৎসবে, ব্রাহ্মে, বিবাহে ও এবং অন্যান্য অনেক কার্যে অপব্যয় কমিয়া যািতেছে। হিন্দুর এই সকল আচার অহুতানে যে টাকা খরচ করা হয় তাহা বাজে খরচ, আর সেই টাকায় বরের পেট ভরাইতে পারিলেই তাহার সম্ব্যয় হইল।

তাঁহার পর পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে যুদ্ধ মহোদয়গণ কি বলিতেছেন শুধুন,—“কোন ব্যক্তি যদি কৃষ্ণাঙ্গী, কুহপা, মুগ্ধা, অনাক্ষিতা বা বিকলাঙ্গী কন্যাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে গালাগালি দেওয়া যেরূপ সঙ্গত, কেহ যৌতুকবিহীন কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে গালাগালি দেওয়াও সেইরূপ সঙ্গত, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অহুচিত।” ইঁহাদের মতে রূপ, গুণ, সরলতা ও মিষ্টভাবিতা স্ত্রীতে যেরূপ বাঞ্ছনীয়, অর্থও সেইরূপ। স্মৃত্যায় দেখিতেছি, এখন হইতে স্ত্রীর রূপগুণাদির ন্যায় তাহার অর্থও দাম্পত্য জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদানরূপে গণ্য হইতে চলিল। বিবাহটা কি তবে ইঞ্জিয়-পরিতৃপ্তির একটা উপায় ছাড়া আর কিছুই নহে?

তাঁহার পর দেখুন, হুরোপের দোহাই দিয়া নিজ মত সমর্থন করিবার কি অহুত চেষ্টা! হুরোপে দরিদ্র-কন্যার বিবাহ হওয়া দায়, কিন্তু তথায়ও ত পূর্বরূপ আছে। অতএব আমাদের দেশেই বা তাহা না হইবে কেন? কিন্তু

ভাষাদের কি মনে নাই যে, যুরোপের সমাজ আর আখ্যাদের সমাজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন বাতুতে গঠিত ? যুরোপে রমণী স্বাধীন (পুরুষ ত স্বাধীনই), প্রেম স্বাধীন, বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র, তাহার পঠনে ও ভঙ্গে কোন বাধাবান্ধি নাই । আর আখাদের সমাজে বর ও কন্যা নিজ নিজ অতিভাব-কেরীঅনন, দিনাংটাও একবার গঠিত হইলে আর ভাঙ্গে না । যুরোপের পূর্করোগ সম্পূর্ণ স্বাধীন, অনেক স্থলে আবার স্থিতিস্থাপক (elastic) ; কিন্তু আখাদের শাস্ত্রের মতে পূর্করোগ বিবাহেরই সমান । স্মরণ্য এ স্থলে যুরোপের সমাজের আপোকে আখাদের সমাজকে দেখিতে গেলে তাহার কোন বড়ই ঠিক দেখা যাইবে না ।

এইবার পাঠকবর্গকে তর্কচূড়ামণিগণের তর্কিকতার পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিব । ভাষারা বলেন,—কত্যা অনেক সময়ে তাহার পিতার পক্ষে বিবম তার বলিয়া মনে হয় । তাহার বিবাহ দেওয়ার অর্থ সেই দুর্ভিক্ষ তার আর এক-জনের স্বত্বে চিরদিনের জন্ত চাপাইয়া দেওয়া । অতএব যখন সামাজ্য একটা ব্যাগ বহাইয়া দুটেকে দুইটা পরমা দিতে হয়, তখন কোন্ লজ্জার জামাতাকে বিনা পরমার চিরদিনের জন্ত কস্তার তার বহন করিতে বলিব ? কবাটাকে একটু বুঝাইয়া বলিলে এইরূপ দাঁড়ায়,—কত্যা একটি তারী মোট । তাহার পিতা সেই মোটের অধিকারী । জামাইটা একটা সুশিক্ষিত হোমরা চোমরা দুটে । বরপণটা সেই মোট বহার স্বত্ব । কবাটা এত বিকৃতমস্তিষ্কের পরিচায়ক হে, উহার সমালোচনা করিতে বাওয়াই অস্বচিত । কিন্তু পাছে আবার কেহ ভাবেন যে, প্রতিপক্ষের যুক্তির যতন করিতে পারিলাম না, সেই ভয়ে লজ্জা-সরমের মাথা বাইয়া দুই একটা কথা বলিব । যদি কুচি-বিগহিত হয়, পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন । কেন না,

পগনুজুংনু বিলোক্য মতিভ্রমঃ

সুক্রচরো বিকলা ইতি যে মতিঃ ॥

কবাটা এই ;—প্রথমতঃ মোটের সঙ্গে কস্তার তুলনাই হইতে পারে না । কেন না, মোটের অধিকারী দুটেকে পরমা দিয়া মোটটি তাহার নিকট হইতে ফিরাইয়া লন । কস্তার বেলায় এ নিয়ম থাকে কি ? মোটটি যদি দুটেকে ‘দান’ করা হইত, তাহা হইলে সে অন্নানবদনে তাহা চিরদিন বহন করিতে সম্মত হইত । দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ দুটেরা চিনিয় বলয় । কিন্তু জামাই-দুটে তাহা নহেন ।

ধরপূর্ণের সম্বন্ধকারীদিগের আরও কয়েকটি মুক্তি দেখাইতেছি। তবে সেগুলি অপেক্ষাকৃত নীতগ বক্তিকপ্রসূত ।

অনেকে পণ্ডিতগণটাকে স্মরণতঃ ধর্মতঃ ধারণা বলিয়াও কার্যক্ষেত্রে পুত্রের বিবাহে পণ লইতে বাধ্য করেন। তাঁহারা বলেন,—“আমাদের পুত্রও আছে, কন্যাও আছে। আমরা যদি পুত্রের বিবাহে এক পরমাণু না লইব, তাহা হইলে কন্যার বিবাহ দ্বিগুণ কোথা হইতে? যদি কেহ দয়া করিয়া আমাদের কন্যাটিকে বিনা পণে গ্রহণ করেন বা করিতে প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে আমরাও কিছু না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিতে পারি।” কণাটা মুক্তিগুরু বটে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, যদি তাঁহাদের পুত্র না থাকিয়া শুধু কন্যাই থাকিত, তাহা হইলে ঐ কন্যার বিবাহ দিতে তাঁহাদিগকে কিরূপ বেগ পাইতে হইত। একজন তাঁহার উপর যে অত্যাচার করিয়াছে বা করিবে, অপর একজনের উপর সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার তাঁহার কি অধিকার আছে? রাব আমাকে ছুই বা মারিয়া গেল, সে আমার চেয়ে বলবান, আমি তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না; সুতরাং আমার চেয়ে দুর্বল ক্রমান্বয়ে আমি চাপিয়া ধরিলাম। ইহাকে পাগলামি বই আর কি বলিব?*

কিন্তু কেহ কেহ আবার অর্থাভাবে নহে—মানের দায়ে—কন্যার বিবাহে যে টাকাটা খরচ করেন, পুত্রের বিবাহে তাহা চক্রবৃদ্ধি মতে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাদের ধারণা, টাকা খরচ করিয়া কন্যার বিবাহ দিলে সমাজে—বিশেষতঃ আত্মকুটুম্বের মধ্যে তাঁহাদের ভাগ্যে যেটুকু সম্মানলাভ খটিল, পুত্রের বিবাহে টাকা আদায় করিতে না পারিলে তাঁহাদের সে সম্মান বজায় থাকিবে না বটেই ত, লোক বলিবে কি? বাটার গৃহীন্তগণ এ বিষয়ে কর্তাদের চেয়ে এক পক্ষ। উহু করে গাছেন।† তাঁহারা বলেন,—“ও না! যা'ব কোথা গো? গোবরা'র বা বেটার বিয়েতে সর্ব্বকমে তিন হাজার ট্যাকা পেয়েছে, তবু গোবরা একটাও পাশ পায় নি; আর আমার ফেণু শত্ৰুরের মুখে ছাই দিলে দুটো পাশ পেয়েও অত ট্যাকা পাবে না?”

* তবে আবার একটা কথা না বলিলেও নহে। কয়েক গড়িয়া এমন পাগলামি অনেককে করিতে হয়। বহু দিন সমাজের সকলেই পরস্পরের দ্বন্দ্ব না হুজিবে, তত দিন ইহার সম্পূর্ণ অধিকার হইবে না। বনশালী ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে বিনা পণে দরিদ্রের কন্যা লইয়া একদিনেই এই বিপদের প্রতীকার করিতে পারেন।

† বাবা-বউ বলিয়া থাকি।

ইত্যাদি ইত্যাদি । কর্ত্তাও শিল্পীর কথায় সাগর দেন, “হ্যাঁ, তা ত বটেই, তা ত বটেই।” আর মাঝে পেকে তাঁহাদের বৈবাহিক খেচরা মারা যান । যানের কি অদ্ভুত মাপ-কাঠি !

অনেকে আবার কন্যার পিতার দারিদ্র্যে দয়া-পরবশ হইয়া অল্প টাকাত্তে বা বিনাপণে পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াও জ্ঞাতীদের নিকট বলেন যে, তিনি তিন চারি হাজার টাকা পাইবেন ; পাছে তাঁহার মান খাট হয় । কি নৈতিক সাহস (moral courage) ! তবে এটা মন্দের ভাল ।

অনেকে আবার অন্য রকমে মানের দোহাই দেন । তাঁহারা বলেন, “আমরা ছেলের বাপ, মেয়ের বাপের নিকট হইতে মান গ্রহণ করিব না ?” কেন, বৈবাহিকের রক্ত-শোষণ না করিলে কি মাংস লাগিয়া হয় না ? অবস্থা বুঝিয়া মানস্বরূপ একটা টাকা লইলেই ত যথেষ্ট হয় । কিন্তু সে কথা শুনি-তেছে কে ? তাঁহাদের মান রাখিতে গিয়া কত নিরীহ গৃহস্থের প্রাণ-পর্যন্ত ব্যর্গিত হইতেছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না ।

কেহ কেহ পুত্রকে তাহার স্বত্ত্বের দেওয়া টাকার বা পোষাকে বাবু সাজাইয়া পিতা পুত্রেই গর্ভ অদ্ভুতব করেন । কিন্তু আমি ত ইহাতে গর্ভ করিবার কিছুই দেখি না—বরং লাঞ্ছিত হইবার কারণ দেখি । নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে তাহা বেশ পরিস্ফুট হইবে।—এক ভদ্রলোক কন্যার বিবাহে অলঙ্কার ছাড়া অন্যান্য খোজকের সহিত জামাতাকে বাড়ি চেন দিতে প্রতি-জ্ঞাত হইয়াছিলেন । কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা যোগাড় করিতে পারেন নাই । বিবাহের সম্ভার বরকর্ত্তা ধরিয়া বসিলেন, বাড়ি চেন দিতেই হইবে, নতুবা তিনি বর উঠাইয়া লইয়া যাইবেন । কন্ডাকর্ত্তা প্রমত্ত গণিলেন । এমন সময় এক বৃদ্ধ মধ্যস্থ হইয়া বরকর্ত্তাকে অনেক বুঝাইলেন । কিন্তু কোন ফল হইল না । তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া খোঁজ বরকে বলিলেন, “কি হে বাপু, তোমার গলায় জুতার মালা দেখিতে তোমার পিতার এত সাধ কেন ?” স্বত্ত্বের দেওয়া চেন জুতার মালার সমান, এই বুঝিয়া বর মহা-শয় বাকিয়া দাঁড়াইলেন । অগত্যা তাঁহার পিতাকেও সে যাত্রা বাড়িচেনের আশা ত্যাগ করিতে হইল । অবশ্য স্বত্ত্বের দেওয়া জিনিসমাত্রেই যে জুতার মালার স্তায় অপমানজনক, তাহা নহে, তবে তাহা গারে চড়াইলেই যে গৌরব বাড়ি, এ কথা বোধ হয় কোন বিবেচক ব্যক্তিই বলিবেন না ।

অনেকে পুত্রকে লিখাপড়া শিখাইতে যে টাকাটা খরচ করেন, পুত্রের

বিবাহে সেট টাকাটা তাহার স্বত্ত্বের নিকট হইতে স্নেহ আসলে তুলিয়া লয়েন। যেন জামাতাকে লিখাপড়া শেখাইবার তার স্বত্ত্বেরই।

শেষ কথা, বরপণের প্রথাটা শাস্ত্রমত বা দেশাচার-সম্মত হউক আর নাই হউক, হিন্দুর বিবাহের সহিত যে উহার কোন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, এ কথা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আর সেজন্য সম্বন্ধ বা কা বাহুনিয়ও নহে। আমাদের হিন্দুসমাজে পতি-পত্নীর সম্বন্ধ যে পাবিত্র বন্ধনের উপর স্থাপিত, তাহার কাছে সামান্য টাকা-কড়ির আদর যেমন চন্দনের কাছে বিষ্ঠার আদর। যে হিন্দুর দেশে বিবাহের মূলমন্ত্র 'যদিহং জদয়ং যব তদন্ত জদয়ং তব'; যে দেশে স্ত্রী বামীকে 'তমেব ভক্তা ন চ বিপ্রায়োগঃ' বলিয়া দাম্পত্যের জগ্নাস্ত্রীণ অতিথি পোষিত করিয়া গিয়াছেন; যে হিন্দুর সমাজে প্রেমমুক্ত বালিকা সমাজের কঠোর শাসনে চিরবাঁহুতকে ধারাইয়া ভয়-জদয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে উচ্ছারিত 'পরজগ্নে প্রাণনাথ পাই যেন ভোমারে,' এই কয়টি কথাতে সন্তুষ্টসিক্ত প্রেমের অবিনশ্বর অলপ অক্ষরে জগৎকে জানাইয়াছিল; সেই দেশে, সেই সমাজে, আজকাল বিবাহের প্রাধান অল হইয়াছে যৌতুক—টাকাকড়ি! সমাজের ইহা অপেক্ষা অবগতন আর কি হইতে পারে?

একনিমিষে অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। কাহারও প্রাণে বাধা দিলাম কি না, জানি না। অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, আমি বিবাহে বরপক্ষদিগকে কন্যাপক্ষগণের নিকট হইতে যৌতুক লইতে একেবারে নিষেধ করিতেছি। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে হুই এক স্থলে বরপণ অপরিহার্য। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে, একজন অতি কষ্টে একটু লিখাপড়া শিখিয়া অর্থভাবে আর পড়িতে পারিতেছে না। অনেক চেষ্টা করিয়াও সে কিছুতেই কোনও উপায় স্থির করিতে পারিল না, এতদূর অবস্থায় যদি বিবাহ করিলে স্বত্ত্বের অর্থসাহায্যে তাহার বিদ্যালান্তের পথ শ্রুগম হয়, তাহা হইলে সে তাহা করিতে বাধ্য। তবে এ কথা যেন সর্বদা মনে থাকে যে, শিক্ষার্থীগণের যখন আর উপায়ান্তর না থাকিবে, তখনই এই উপায় অবলম্বনীয়। কথাচ তাহার পূর্বে নহে।

আর এক ক্ষেত্রে বর ন্যায়তঃ পণগ্রহণের অধিকারী। তাহার আর্থিক ক্ষমতা যদি এতদূর হয় যে, সে বিবাহ করিয়া স্বীয় উপাধানে স্ত্রীপুত্রের ভরণ-পোষণ করিতে পারে; কিন্তু তাহার বিবাহে সে টাকাটা ব্যয় হইবে,

তাহার সম্বন্ধান করিতে পারে না ; অথচ সামসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য অবশ্য অন্য কোন অলঙ্ঘনীয় কারণবশতঃ তাহার বিবাহ করায়ও একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ; তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে যে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে বিবাহের পরচরিত্র কিছু টংকা লইতে পারে । *

এইরূপ আরও দুই একটি স্থলে বরপণ ন্যায়তঃ চলিতে পারে । তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক । আসল কথাটা এই যে, পুত্রের বিবাহে কন্যার পিতার নিকট হইতে টাকাকড়ি বা গহনাপত্র লওয়াটা ততক্ষণ পর্য্যন্ত দোষের নহে, যতক্ষণ কন্যার পিতা অনায়াসে বা ঘেচ্ছাক্রমে তাহা দেন । পীড়নেই দোষ বিবাহ একটা মঙ্গলের কাষ । ইহাতে উত্তর পক্ষে- দুই হালিবার খেলিবার আশ্রয় করিবার কথা । কিন্তু সে ক্ষেত্রে কন্যাসম্মাননের উপযোগী পণ সংগ্রহ করিতে কন্যার পিতার বুকের রক্ত শুকাইয়া যায় ও চক্ষুতে জল পড়ে, সে ক্ষেত্রে মঙ্গল কোথায়, আশ্রয়ই বা কোথায় ? তাহার সেই দারুণ দীর্ঘশ্বাস শাপারূপে নববধূ-বরকে নিরন্তর দণ্ড করিতে থাকে । তাই বলি, ইহার যেমন অবস্থা, তাহার নিকট হইতে সেইরূপ পণ বা ঘোড়ক পাইলেই তাহার বৈবাহিকের সম্বন্ধ থাকা উচিত । ইহা অপেক্ষা বাড়াবাড়ি কোন দিকেই ভাল নহে । অনেক স্থলে দেখা যায়, কন্যা মনের মত হইল, বর মিলিল, কোঞ্জিও মিল হইল ; অথচ পণের জন্য স্তব্ধ ভাবিয়া গেল । এটা বড়ই দুঃখের বিষয় নহে কি ?

বরপণের সূত্রি-ভেদ ।

ভাল লোকের ভিতরে বাহিরে এক । কিন্তু ক্রুরের কথায় এক, কাষে আর । সে বহুতরঙ্গীয় ন্যায় ইচ্ছামত নানাপ্রকার বেশ ধারণ করিয়া লোককে প্রভাবিত করে । তনিতে পাওয়া যায়, সে কাণের মায়াবিনী । চাক্ষুশীরা দণ্ডে দণ্ডে সূত্রি পরিবর্তন করিতে পারিত । আমাদের এই বরপণটিও একটি চাক্ষুশীবিশেষ তাই, তিনি নানারূপে নানা স্থানে আবির্ভূত হইয়েন । তিনি কখন বা নগদ টাকা, কখন বা অলঙ্কার ; কখন বা বাটী বাগিচা, কখন বা জমিজমা, কখন বা আবার কোম্পানির কাগজ ; কখন কখন তাহাকে কোচ বা মোটরগাড়ী রূপেও উদ্রণমাণে ব্যতায়িত করিতে দেখিতে পাই ।

* তবে সোভেন বশবর্তী হইয়া কতকগুলি বেশী টাকার দাবী করা এ ক্ষেত্রে অসম্ভব ।

(দিনকতক পরে যে তিনি খণ্ডিত * হইয়া আকাশে উঠিবেন না, এ কথা কে বলিতে পারে ?) আবার আজকাল না কি তিনি (পেট ঘোটা করিবার জন্য কি না, কে জানে ?) পাচক-পাচিকারূপে জামাই বাবুর অক্ষর-মহলে এতৎ কৃত্যরূপে তাঁহাদের বৈঠকখানায় আবিস্কৃত হইতেছেন । † আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি যে, শীঘ্রই এমন দিন আসিবে, যখন পরস্পর অভাবে জামাই বাবুর জন্য বেতন দিয়া পাচক ও কৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিতে না পারিয়া কন্যার মাতা স্বয়ং পাচিকা-বেশে ও কন্যার পিতা কৃত্যবেশে জামাতার গৃহে অবস্থান করিবেন । ‡ সেই দিনই হিন্দুসমাজের চরম উন্নতির দিন !

প্রতীকার ।

সমাজের এই নিত্য বর্জনশীল ঘোর অনিষ্টের কি কোনও প্রতিকার নাই ? হিন্দু-সমাজ কি এমনই নিপুঞ্জ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই নিষ্ঠুর অর্থগুরুদের যথেষ্টাচার অবনতমস্তকে সন্ম করিবে ? দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতেছি যে, সন্ম এখনও অনেক করিতে হইবে—অবনতমস্তকে না হউক, বড় জোর উন্নত-মস্তকে । আজকাল রেলপথের আশ্চর্যসুর্গে আমাদের সমাজে একটা হগলুল পড়িয়া গিয়াছে । কি করিয়া বরপণের প্রথাটা উঠাইয়া দেওয়া যায়, সমাজ-সংস্কারকগণের মধ্যে তাহারই জন্য একটা আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু দেখিতেছি, আজকাল সমাজের নেতাদিগের চক্র আছে, বিষ নাই ; গর্জন আছে, ধ্বংস নাই । ইহারা গলাবাজিতে ডিম্বাছিনিস্, কিন্তু কাজের কৈহই নহেন । কেহ সপ্তাহে দুইটা করিয়া সভা করিতেছেন, কেহ বা প্রতিজ্ঞাপত্রে (Resobusienএ) নাম লিখাইয়া লইতেছেন । কেহ কেহ বলিতেছেন, বাহারা পুস্ত্রের বিবাহে পণ লইবে, তাহাদিগকে বয়কট কর । কিন্তু ম্যাও ধরে কে ? বাহারা লণা চণ্ডা বকুতা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেই বোম্ব ছয় অনেকে পুস্ত্রের বিবাহে সাড়েবার হাত লণা এক এক ফর্দ করিয়া বসিবেন । স্তূতবাং কাহাকে কি বলিব ? গলাপাজি ছাড়িয়া বিশেষে কার্য্য করিবার

* Aeroplane—‘কপোত’ মতে ।

† অবশ্য এ পাচক ও কৃত্যের বেতন কতদূর পিতাকে দিতে হয়, এ কথা বলাই বাহুল্য

—‡ অবশ্য বধব কত্যা ও জামাতার সুপেয় জল তাহারা গ্রহণ করিতেছেন, তখন আত্ম ইহাতে লগ্নমতের বিষয় কি আছে ?

জন্য কৌণ অসুযোগটা গভীর, গলাবাঞ্জির যথোই মিশাইয়া বাইতেছে। কে তাহা ভুলিতে পাইবে ?

কিন্তু আর না ভুলিলেই নহে। আমাদের সমাজে এখন আর ‘পরাণপদেপে পাতিতায়’ ফলাইবার দিন নাই। এখন প্রাণপণে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সময় আসিয়াছে। সত্য বটে, আমরা আলকাল এত নিষ্কর্ষ হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদেরকে বোঁচা না দিলে আমাদের চৈতন্য হরণা, অপর কেহ চোকে আত্মল দিয়া দেখাইয়া না দিলে আমরা নিজ নিজ দোষ দেখিতে পাই না এবং ভৎসিত না হইলে আমরা আসলা পরিত্যাগ করি না। এ হিসাবে গলাবাঞ্জির কিছু কিছু প্রয়োজন আছে, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু আলকাল যেমন ধূমপান দেখিতেছি, তাহাতে কি সবটাই বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছে না ? এটুকু ছাড়িতে হইবে। উপদেশ যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে। এখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তবে যদি কিছু হয়।

সমাজ-সংস্কারকগণের যথো অনেকেই অর্থনীতির তাবাতাব-বাদের সাহায্যে প্রশস্তার সমাধান করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। * - কেহ বলিতেছেন, বর্ত্ত দিন পর্য্যন্ত কল্যায় বরষা না হয়, তত দিন তাহাদের বিবাহ দেওয়া সুগত রাখ; তাহা হইলে বর ও কল্যায় সরবরাহ সমান হইবে এবং ধরের দাষ কমিবে। †-তঃধের বিধর দুষ্টিটা বেশ বৃদ্ধা গেল না। আর হিন্দুশাস্ত্রের মতে ‡-বেদী বয়স পর্য্যন্ত কল্যাকে অনুচা রাখাও অসুচিত। কেহ-বা আবার ট্রিক ইহার উন্টানুরে গাছিয়া বলিতেছেন যে যদি সাত-আট বৎসরের বেলার মেহলতার বিবাহ হইত তাহা হইলে এ নারীহত্যা বড়িত না, এবং সেই সঙ্গে বালিকা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। নানা স্থানির নানা মত, কোন্ পথে বাই ?

কেহ আবার বলিতেছেন, যিনি পুস্ত্রে বিবাহে জোর করিয়া টাকা লইবেন, তাহাকে নিশ্চয়ই কখনও না কখনও বাগে পাওয়া যাইবে অর্থাৎ তাহার কল্যায় বিবাহের সময় তাহার উপর খুব বেশী টাকার দাবী করিয়া তাহাকে লজ্জা করা হইবে। † তাহা হইলেই লোকের * শিকা হইবে। কিন্তু এ পথে বিপদ অনেক। প্রথমতঃ এজন্য অযোগ

* Demand and Supply Theory.

† বলা বাহুল্য, এটা একবার কখনও, দলের।

আর পাওয়া যায় না । বিগীমতঃ, তাহা পাইলেও, একটা অন্যান্য কার্য বন্ধ করিবার জন্ত আঃ একটা একতর অন্যান্যের অপ্রিয় লওয়া কি উচিত ? বিবে বিদ্যায় (Similia Similibus curantur) সমাজের ব্যাবিগ পক্ষেও বাটবে কি ?

কাহারও কাহারও মতে বিবাহিত—তুচ্ছ ব্যাকরণে বুড় (বুড়ো নহে)—যুক্তগণকে বিবিদ্যালয়ের পরীক্ষাবন্ধিরে প্রবেশ করিতে না দিলেই সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে । তাঁহারা যে কি ভাবিয়া কপাটা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না । বোধ হয়, তাঁহারা এই মনে করিয়াছেন যে, বিবাহিত ছাত্রগণকে পরীক্ষা দিতে না দিলে অগত্যা ক্রমশঃ পরীক্ষাবন্ধনের মধ্যে অবিসংহিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং পরীক্ষাবন্ধন-বহির্গত অবিসংহিত বিবাহাবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার (অর্থনীতির নিয়মাত্মক) তাহাদের বাজারদরও কমিয়া যাইবে । কিন্তু কামে তাহা হইবে কি ? আমার মনে হয় যে, উহা তদন্তটাহাৎ তদন্তগতবরণ হইবে । কেন না, যখন বিএ, এম্ এগ হাতে কন্যা দেওয়াই আজকাল বেশী কঠিন, তখন ঐরূপ পাশ-করা বরের সংখ্যা বহু বাড়িলে, কনার পিতামাতার বিপদও তত বাড়িবে । এখন তবু অনেকে ‘অপাশ’ বা ‘অন্নপাশ’ পাত্র অপেক্ষাকৃত সস্তাদরে পাইতেছেন ।

কেহ কেহ ‘বরের বরের পিসী, ক’নের বরের মাসী’র মত দুই দিক্ই বাঁচাইয়া কথা বলিতেছেন । তাঁহারা কতক পিতাকে কতক, বিবাহের জন্ত প্রতি মাসে কিছু কিছু জমাইতে পরামর্শ দিতেছেন, আবার পুণ্য তর, আগত বিপদের দুরীকরণ অপেক্ষা অনাপত্ত বিবাহের নিবারণ ভাল (Prevention is better than cure), এই মতাব্যাক্য অরণ করিয়া বরপণের প্রপাটা একেবারে উঠাইয়া দিবার হস্তগত করিতেছেন । এ বুদ্ধিব্যয়ের প্রথমটা আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থার উপযোগী হইয়াছে । কেন না, বরপণ একেবারে উঠিয়া যাইবে, এ আশা করা বাতুলতা মাত্র ।

তাহার পর একজন সুপ্রসিদ্ধ সমাজ-সংস্কারক একখানি সুপরিচালিত জনসমগত সংবাদপত্রে সামাজিক সমস্যাটার একটা সুন্দর সূচিস্থিত সমাধান করিয়াছেন । সমাধানটা দর্শনবাদি-সম্মত বা সম্বন্ধন-সমাদৃত না হইলেও প্রচারণার সদ্ব্যবস্থার-সাথেই সমর্থ হইয়াছে । তিনি বলিতেছেন যে, বরপণপ্রচার সম্বন্ধে এইরূপ একটা আইন করা উচিত যে, যদি কেহ পুণ্যের

বিবাহ দিয়া টাকা লয়েন, তাহা হইলে সেই টাকা পুত্রের মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং তাহার পর হইতে সেই বিক্রীত পুত্রের উপাধিগত বনে তাহার পিতার আর কোনও অধিকার থাকিবে না। কথাটা প্রথমে একটু কঠোর এবং কুরুতিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু ভলাইয়া দেখিলে উহাতে অস্বাভাবিক কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, আত্মকাল অনেক বরকর্তার যেরূপ বাই, তাহাতে আইন ছাড়া, তাঁহাদের সংশোধনের অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া বোধ হয় না।

তবে যদি কন্যাকর্তারা একতা অবলম্বন করিয়া বরকর্তাদিগকে এরূপ কলে ফেলিতে পারেন যে, ইহারা পুত্রের বিবাহে অতিরিক্ত পণের দাবী করেন, তাঁহাদের পক্ষে কন্যা বেলা তার হইয়া উঠে, তাহা হইলে বোধ হয়, তাঁহাদের বিবাহে কতকটা তালিতে পারে। কিন্তু এ দৃশ্য সামাজিক সাধু আত্মাদের বিষয়ে আপোষে মিটমাট বতটা বাছনীর, আইনের কড়া-কড়ি বা বর্ষবটের ধ্বনাম ততটা নহে। সেটা যেন কেমন কেমন দেখায়। অতএব এ সমস্তার মীমাংসা বনবান্দ বরকর্তাদিগের ঘাতে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বিনাপণে দরিদ্রের কন্যাপক্ষকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। হুই এক হলে ধনী বরকর্তাকে দরিদ্র কন্যাকর্তার নিকট হইতে এক পরমাণু না লইয়া, এমন কি, নিজে উভয় পক্ষের সমস্ত খরচ করিয়া, পুত্রের বিবাহ দিয়া আনিতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের গৌরবের লাভবান হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই হইয়াছে। সমাজে এরূপ সম্ভব লোকের সংখ্যা বহু বেশী হইবে, ততই ভুল।

অনেক কথা বলিয়া, কিন্তু কায়ের কথা কিছু বলিয়া কি না, তাহা জানি না। প্রকৃতপক্ষে বরণপ্রথার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে এই উভয় দিকেই এত বেশী কথা বলিবার আছে যে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সে সমস্তগুলি বলিবার চেষ্টা করা বিকৃতমস্তিকের পরিচয় দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ফলকথা বরণ বা দৌহকের প্রথাটা যখন আমাদের সমাজে একরূপ চলিয়া গিয়াছে, তখন ইহা অল্পদিনেরই হটক আর বহুদিনেরই হটক, যদে-দ্যভাই-হটক আর বিদেশের আমদানীই হটক, ইহাকে সহণা একেবারে নির্মূল করিবার প্রস্তাবটা টিকিবে না। আর সেরূপ প্রস্তাব ন্যায়সঙ্গত হইবে না। কেন না, তাহা হইলে অলঙ্ঘ্য কন্যার সম্মানও উঠাইয়া

দিতে হয়, কারণ, অলঙ্কারকেও ঘোড়কের মধ্যে ধরিতে পারা যায় ত ? অগত্যা
শাস্ত্রে অলঙ্কার কন্যা দান করারই বিধি আছে । এমাণ বিবাহের মন্ত ।
তাৎ হাড়া ষাঁহার কন্যাকে সাঝাইয়া দিবার ক্ষমতা আছে, তিনি শুধু
শাখা-সিন্দুর দিয়া লঙ্কাই ওইবেন কেন ? সুতরাং ঘোড়কের এপাটা একে-
বারে উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা অপেক্ষা এ বিষয়ে কন্যাকর্তাকে কষ্টকট।
আধীনতা দেওয়াই সমীচীন মনে করি অর্থাৎ ষাঁহার যেমন ক্ষমতা, তিনি
ঐহার কন্যা ও আশ্রিতাকে ভ্রূপ ঘোড়ক দিগেন । ভ্রূপ দেওয়াটাকে
ঘোড়ক বলিতে হয় বলুন, পণ বলিতে হয় বলুন, তাহাতে আপত্তি নাই ।
আপত্তি কেবল কোর-জবাবজিতে । আজকালকার বরপণপ্রথার অর্থ
কোর-জবাবজি—কন্যার পিতার নিকট হইতে ঐহার ক্ষমতার প্রতিরুদ্ধ
আদায় করা,—এইটাই দোষের—এইটাই সর্বথা পরিবর্জনীয় । ষাঁহার
এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজসংস্কার করিতে যাইবেন, ঐহারাই
আজ না হয় দুই দিন পরে কৃতকার্য হইবেন । আর ষাঁহার চরমপন্থী
(extremist) সাজিয়া বিবাহে বরপণকে কন্যাপক্ষের নিকট হইতে (কন্যা-
পক্ষের ক্ষমতা-স্বত্ব) ‘এক পরসাগ লইতে দিব না’ বলিয়া জিদ করিয়া
বসিবে, ঐহাদের কৃতকার্যতা অদূরপর্যন্ত, আর তাহা বাহনীরও নহে ।

ঐকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বাক্সালার বিস্তার ।

(২)

কিছুদিন পূর্বে সহযোগী “ইন্ডিয়ান ওয়াল্ড” বাঙ্গালাকে ভারতের অন-
সাধারণের সাধারণ ভাষায় পরিণত করিবার যে প্রয়াস করিয়াছিলেন,
আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছিলাম । কিন্তু সমগ্র ভারতের কথা দূরে
বাক্য, যে বিহার অরণ্যভীত কাল হইতে বলের অঙ্গীকৃত—যে বিহারের
কিনীট বলের গৌরব-রাজ্যে সমুদ্র ছিল—যে বিহার হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান,
ইংরাজ শাসনের সুদীর্ঘকাল আপনায় স্বাভাবিক অত্যাচার করিতে চাহেও নাই,
সেই বিহারেও আজ বাক্সালা ভাষার সর্জনশীলের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে । বিদ্যা-
পতির পদাবলী বাক্সালার পট্টনীপথেও স্থানিত হয় ; বাক্সালী কবির কবিতাগুলি
বিহারে পঠিত হয় । ঐযুত সচ্চিদানন্দ সিংহ আজ বিহারকে বঙ্গ বিচ্ছিন্ন
করিয়া বাক্সালীর প্রাধান্য চূর্ণ করিবার জন্য বহুপারিকর ; সেই সচ্চিদানন্দও
বাক্সালী কবি হেমচন্দ্রের মৃত্যুর উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন,—হেমচন্দ্রের কবিতা
পাঠ করিলেই বাক্সালা শিক্ষার অম সার্থক হইবে । এই বিহারে আজ বাক্সালা
ভাষার চর্চা বহু হইতে বলিয়াছে ।

ঐযুত মধুগ্রানাব সিংহ বিহারের বাসন্দা, ঝাঁকপুরে ব্যবহারাকীৰ ।
মধুগ্রানাব বাবু এখন ব্যবস্থাপনায়ে বস্তায় সাহিত্য চাপা দিয়াছেন বটে ; কিন্তু
এককালে তিনি বাক্সালা ভাষার চর্চা করিয়াছিলেন ; পুরাতন মাসিক পত্রের
পৃষ্ঠার তাহার পরিচয় পাওয়া যায় । কিছুদিন পূর্বে তিনি কোন মাসিক
পত্রে “বলভাষীদের অস্ত্র বিহারে কলেক স্থাপন” বিষয়ে একটি প্রস্তাব লিপি-
বদ্ধ করেন ।

আমাদের মধ্যে অল্পবয়সে মৃত্যুর আবিষ্কার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়া-
ছিলেন,—আমরা “ত্রেপ হইতেই বুড়ো । ‘বার্জিক্যং অরসা বিনা’ না,
হইয়া ‘অরা বার্জিকোন বিনা’ উপস্থিত । বাক্সালার অনেক জেলায়
জালায় করা মৃত্যুর হার অল্পের চেয়ে বেশী অর্থাৎ সেই সব
• জেলা একেবারে উৎসাহ হইবার সময়-নির্ঘণ অকল্যাণের একটি অতি
দুর্ভাগ্য প্রমাণ ।”

কিন্তু উপায় কি ?—“বাক্সালার সর্জন্য ম্যালেরিয়ায় অধিকারিত—পঞ্চা-
বৎসর আগে দে মস স্থান আস্থানিবাস ছিল, সেখানেও এখন লোক উচ্চাভু

হইয়া গিয়াছে । সুতরাং বাঙ্গালার সমস্তলের বাহিরে আশ্রয় লইতে হইবে ; হয় পাদাড়ে (চারি হাথার ফীটের উপর), না হয় বিহারের অধিকায় । পাদাড়ের খরচ এত বেশী যে, সেটা এখন চিন্তার বাহিরে । কিন্তু বিহারের কয়েকটি বিশেষ স্থান আছে :—প্রথমতঃ বাদাণার সঙ্গে সংলগ্ন, রেলপথে কোন অংশই কনিষ্ঠতা হইতে দশ ঘণ্টার বেশী দূর নয় । দ্বিতীয়তঃ খাদ্য অথবা প্রচুর ও সস্তা । তৃতীয়তঃ চাকর ও ব্রাহ্মণের (পাচক ?) অভাব নাই । স্বাস্থ্যসম্বন্ধে নিহারে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই । যে অন্ন (জাড়া খুণার) হয়, তাহা খুব কম সময়ে সাগর এবং বাঙ্গালার জলের মত সর্জনজন্যাপী নহে এবং চিরদিনের তরে বাস্তুভজ করে না । তাহার পর আশ্বিন হইতে একেবারে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত এ দেশে (বিহারে) শুক বাতাস বয়, রাত্রিতে গায়ে কাপড় দিতে হয় । এই বাতাসে শরীর বৃদ্ধ করিয়া হুলে, পরিভ্রম স্বথ-কর বোধ হয় । বিহারে বাঙ্গালী কর্মচারীরা বলেন যে, এখানে সমস্ত দিন আফিসের কাম করিয়া ঠেকালে বাঙ্গার কিরিয়া ক্লান্তি বোধ হয় না । গ্রীষ্ম-কালের প্রারম্ভে যেন গা পুড়িয়া যায় নটে, কিন্তু তখনও বাতাস শুক, জৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত রাত্রিতে গা মাখে না ; সুতরাং ততদিন পর্য্যন্ত ঘার বদ্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে বেশ কায করা যায় । শুধু আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাস বড় খারাপ । * * * কিন্তু এদেশের বর্ষাকালের মহাব্যাধি ওলাউঠা-পানীয় জল ও আহার সম্বন্ধে সাবধান থাকিলে কাহাকেও ছুইতে পারে না ; সুতরাং ভয়লোকদের ইহাতে ভয় নাই । * * বাঙ্গালার সুক লোক দে দেশত্যাগী হইয়া বিহারে উপনিবেশ স্থাপন করিবে, এক্ষণ অসাধ্য প্রস্তাব আনি করিতেছি না । কিন্তু বাঙ্গালার সক্ষম-ঘরের ছেলের অল্প বিহারে জুল কলেজ করা সাধ্যায়ত্ত, কম খরচের বিষয় এবং বাদাণী জাতির পক্ষে পর্যম উপকারী । জুল কলেজে জীবনের যে অংশ কাটে, তাহা শরীর-গঠনের সময়, ইহার উপর সমস্ত জীবনের ভাল-মন্দ নির্ভর করে । এই সময়টা যদি বাহ্যিকর স্থানে থাকি ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া যায়, তবে শরীরের বৃদ্ধিমান পাকি হইয়া যায়, আয়ুঃসকার হয় । সেই বলে বদীয়ান হইলে, পরে আবাস্ত্যকর স্থানে বাস করিলেও দীর্ঘকাল ব্যারামের সহিত যুদ্ধ করা যায় । কিন্তু যে বাদাণী বালাকাল হঠতে প্রতি বৎসর পাঁচ ছয় মাস রোগে কাটাইয়াছে, সে কলেজ ছাড়িবার সময় আশঙ্কয়া হইয়া পড়ে, তাহার জীবন চলিা পার হইতে পারে না ।”

“বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীরা যথাসম্ভব এক প্রদেশে পালিত হইবে এবং অল্প প্রদেশে কার্যগত জীবন কাটাইবে,” “এইরূপ প্রস্তাব ‘য অস্বাভাবিক’” নহে, তাহাই বুঝাইবার জন্য মধুরানাপ বাবু বলিয়াছিলেন,—“বিহারে বাঙ্গাল ও কৈশোর কাটাইলে যে স্বাস্থ্যসঞ্চয় হয়, তাহাতে তাহারাই দেশী কণ্ঠ ও দীর্ঘ-জীবী হইবে, এটা কি লাভের বিষয় নয়? এই দেখুন, ইংরাজ জাতি যদি ভারতবর্ষে বসতি করিত, তবে তাহারাই ভিন পুরুষের মধ্যেই নির্ম্মাণ অথবা কিরিন্দিদের মত নিভেল ও অপার হইয়া পড়িত। কিন্তু ইংরাজ-শিক্তরা বিলাতে পালিত ও শিক্ষিত হয় বলিয়া প্রতি বৎসর সেবা হইতে অক্ষুণ্ণতাকে তেম্বরী, পূর্ণ যোগ্য যোগ্য নতন নতন ইংরাজ আদিত্য ভারতে ইংরাজ-প্রাধান্য অটুট রাখিতেছে। যখন বাঙ্গালার পাশে এমন একটা স্বাস্থ্যকর প্রদেশ আছে, তখন আমরা কেন তাহার সুবিধা ভোগ করি না? জীবন ও একটা সংগ্রাম, সে সংগ্রামের জন্য আমাদের ছেলেদিগকে বলিষ্ঠ ও সক্ষম করিতে আমরা কেন অবহেলা করি? • • • আমরা বাঙ্গালী, বুদ্ধিজীবী। যদি স্বাস্থ্যভাবের জন্য আমাদের শিক্ষার ও মানসিক উৎকর্ষে জাতীয় অবনতি প্রবেশ করে, তবে আমাদের আর গাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না।”

কিন্তু কেবল ইহাই নহে। অন্য কারণেও বিহারে বাঙ্গালীর বিজ্ঞানর সংস্থাপিত করা তখনই আবশ্যক হইয়াছিল। ঝাঁকিপুর এলিনিয়ারিং স্কুল, ঝাঁকিপুর টেক্সটিল মেডিকেল স্কুল, পাটনা গভর্নমেন্ট কলেজ ও পাটনা ল কলেজ—এই শিক্ষাগারগুলির নিয়মের আলোচনা করিয়া মধুরানাপ বাবু দেখাইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর পক্ষে বিহারের বিজ্ঞানায়ের দ্বার বন্ধ হইতেছে। তখন বিহারের সরকারী আর অপেক্ষা ব্যয় বৎসরে প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা অধিক এবং সেই ফাঙ্কিল ব্যয় বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে পূরণ করিতে হইত অর্থাৎ বাঙ্গালী তখনও বিহারকে পালন করিতেছে। অথচ বিজ্ঞানায়গুলির নিয়মে দেখা যায়—“যে সব বাঙ্গালী বিহারের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন, এখানে বাড়ী বস, জমি-জমা ব্যবসায় করিয়াছেন, (এমন কি) ভ্রাতাদের • ছেলেদিগকে বিহারীদের সঙ্গে সমান স্বত্ব দেওয়া হইতেছে না। অথচ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের লোক, এমন কি, গুজরাটী ব্রাহ্মণ ও পান্ডাবী মুসলমান পর্যন্ত উর্দ্ধ্ব বলায় ও টুপী পরায় অগ্রগৃহে যেমান্য বিহারী বলিয়া গণ্য হইতেছে।

মধুসূদন বাবু বলিয়াছিলেন,—“আমরা বিহারীদিগকে বঞ্চিত করিয়া চাকরী চাহিতেছি না; কিন্তু বিহারে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালীদিগকে (domiciled Bengalis) যে বিহারের অপরাপর অধিবাসীর নিকর সব হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে, ইহার কারণ কি?” কারণ, তাহারা বাঙ্গালী।

“বিহারে যারো হাজার বাঙ্গালী আছেন। ইহার সকলেই শিক্ষিত এবং বাবলা বা চাকরীতে নিযুক্ত। ইহার ছেলেদের লেখাপড়ার কি দশা হইবে, তাহা ভাবিয়া আকুল। সকলেই ত ছেলেকে কলিকাতায় পাঠাইতে পারেন না, এবং পারিলেও অনেক কারণে সেটা বাছনীর নয়। অতঃ ইহাদের জন্য বিহারে একটা ভাল Anglo Bengali কলেজ অত্যাৱশ্যক।”

আমরা বলিয়াছি, বাঙ্গালী বলিয়াই বিহারবাসী বাঙ্গালীদিগের এত দুর্দশা। মধুসূদন বাবু বলিয়াছেন,—“আমরা যে বাঙ্গালী ভাষা ও সাহিত্য ভাণ করিতে পারি না, তাই আমাদের এত কষ্ট, এত কতি, নইলে কোন্ দিন

হরে ছদ্মরূপী

বাঙ্গালীর সূচাত্ম মাধার প'রে টুপী,

এবং এই প্রদেশের লোকের সঙ্গে ভাষায়, আচারে ও সভ্যতার এক হইয়া যাউতাম, যেমন জয়পুরে মানসিংহের আনীত বাঙ্গালী সূত্রারী ব্রাহ্মণদিগের বংশধরেরা একেবারে খোঁটা হইয়া গিয়াছে।”

মধুসূদন বাবু যখন এই প্রস্তাব করেন, তখনও বাঙ্গালী বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ হয় নাই, তখনও বিহারে হাইকোর্ট কল্পিত হয় নাই—বিধবিভালয় সংস্থাপনের স্বপ্নও বিহারীরা দেখে নাই। তাহার পর একটা রাজনীতিক জুমিকল্লে যে ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, তাহাতে বিহারে বাঙ্গালীর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে—সরকারও তেমনই নিহাণী আচার হইতে বিহারী ভাষা পর্যন্ত কেবল বিহারীবিলাসেরই বাহন্য দেখাইতেছেন। ইহাতে কেবল যে বিহারবাসী বাঙ্গালীরাই বিপন্ন হইয়াছে—তাহা নহে, পরন্তু বিহারের বিভালয় হইতে বাঙ্গালী নির্বাসিত হওয়ার বাঙ্গালীর বিস্তারে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। অথচ সে প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা সামান্য নহে—বাঙ্গালীর প্রভাব অল্প নহে। বাস্তবিক বাঙ্গালীর “চরণ

দ্রব করিয়াই” বাকালীর পথে চলিয়াই বিহারী বড় হইয়াছে। তাই বর্তমান ব্যবহার প্রতীকার বাকালীকেই করিতে হইবে।

বর্তমান সময়ে বিহারে বাকালী স্ক্রিপ অন্যান্ত চইয়াছে, সে দিন ইকী-পুরবাসী “মধুনা উপনিবেশী” বাকালীরা “বিববিজ্ঞত পাটলিপুত্রের পথিত্র মনোনে”—“ভারতের অতীত স্থতির মৌর্য-নিকেতনে”—মহারাজ মনীন্দ্রেন্দ্র নন্দীকে স্ক্রিপ-পঠিবেশে অভিনন্দিত করিবার সময় তাহা বলিয়াছিলেন। সে দিনও মধুনাধ বাবু বিহারবাসী বাকালীদিগের হইয়া এই বিপদত্ব্য ধ্বনিত করিয়াছিলেন—যদি তাঁহাদের বিপদের বার্তায় তাঁহাদের বাকালী জাতারা তাহাদের সাহায্যার্থ আগ্রসর হন—যদি সকলের সমবেত চেষ্টায় সকল বিপদের অবসান হয়।

মধুনাধ বাবু বলিয়াছিলেন,—“বঙ্গবিযুক্ত বিহারের দুল কলেজে এখনও বঙ্গভাষার চর্কা চলিতেছে। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বিহারের সারস্বত-আয়তন-সমূহ হইতে আমাদের মাতৃভাষা নিভাশিত হইবার সম্ভাবনা ঘটয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি জেলার আদালত হইতে বঙ্গভাষা নির্ধারিত হইয়াছে। বিহারের কয়েকটি বঙ্গভাষী জেলা বাকালী হইতে বিযুক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণে এ অঞ্চলে বঙ্গভাষার প্রসার-সঙ্কোচ ঘটয়াছে। এখন হইতে প্রতীকারের উপায় না করিলে বিবিধকারণ-সমবায়ের ভবিষ্যতে বিহারে বঙ্গভাষার চর্কা লুপ্ত হইতে পারে। যে ভাষার প্রথমে ‘মা’ উচ্চারণ করিয়া ধস্ত হইয়াছি, সে ভাষা ভুলিলে প্রবাসী বাকালী থাকিতে পারে, কিন্তু আমরা আর বাকালী থাকিব না।” মধুনাধ বাবু ইহাকে “শোচনীয় জাতিগত বৃত্তা” বলিয়াছেন এবং প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহার প্রতিশোধকল্পে বিহারের স্থানে স্থানে—

(১) বঙ্গভাষীদের জন্ত বর্তমান সারস্বত-আয়তনসমূহের প্রতিষ্ঠা।

(২) বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার জন্ত,—প্রাচীন ও নব্যসাহিত্যের সহিত সংযোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠার স্থাপন।

(৩) বঙ্গভাষীদের পরস্পর মিলন, সামাজিক সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা সাধন প্রভৃতির জন্ত মিত্রগোষ্ঠী, আলোচনা সমিতি ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা।

(৪) এবং এইরূপ বিবিধ পথে উপনিবেশী বাকালীদের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির সৃষ্টি ও রক্ষা, জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও বিবর্তনের জন্য আম-
দের অবদান করা।

এই যে প্রস্তাব, ইহা কেবল বিহারী-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণের লক্ষ্য; যাহাতে বাঙ্গালী বালক বিহারে বাস করিয়া বাঙ্গালী ভুলিয়া বিহারী বনিয়া না যায়, তাহারই বাসনা। কিন্তু কেবল কি ইহাট ? আমরা বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালার বিস্তার করিতে চাই। মধুসূদন বাবু বলিয়াছেন,—“সুজলা” ‘সুফলা’ ‘লক্ষ্মীয়া’ ‘নদী-বেলগা’ ‘শিবগঞ্জ’ ‘মুন্সীগঞ্জ’ বাঙ্গালার বাহিরেও বাঙ্গালান্যে বিস্তার। Greater Britain এবং মত Greater Bengal অতীতের স্বপ্ন নহে, সত্য। আজ বাঙ্গালী অক্ষুণ্ণচারী মণ্ডলের সহিত উপমিত হইতেছে বটে, কিন্তু অতীত যুগে এই বাঙ্গালীর পূর্বপুরুষগণ ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ‘নীলসিঙ্ঘ-জল-বৌতচরণতল—অনিলাবিকম্পিত ভ্রামল-অকল’ কলিঙ্গের তমালতালী-বনরাজিনীলা’ বেলগা হইতে এই বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়ী বংশধরগণ অসুখ যবদীপ, সুখাত্মা, ভ্রাম প্রভৃতি দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিহারের সারস্বততীর্থ নালন্দার ইতিহাসপ্রণীত বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী বনীরা লগ-বাসীকে জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিতেন। অসুখ অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইংরেজ অধিকারের পূর্বেও বাঙ্গালীরা ভারতের প্রায় সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে বাঙ্গালীর প্রভাব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।”

সে সকালের কথা; কিন্তু আজও নানা দেশের সাহিত্য ও শিল্পে বাঙ্গালার প্রভাব পরিস্ফুট। বিহারের বাঙ্গালীদিগের কথায় মধুসূদন বাবু বলিয়াছেন—“আমরা প্রবাসী, বিহারের উপনিবেশী বটে, কিন্তু বিহারবাসীর সহিত আমাদের স্বাৰ্ভ অভিন্ন বলিলেও, বোণ করি, অভ্যুত্তী হইবে না। বিশ্বজননী প্রাকৃত্যব যে জাতির সভ্যতার একমাত্র উদ্ভিষ্ট—‘আত্মবৎ সর্গ-ভূতেশু’ যে জাতির বর্গের উপদেশ, সে জাতি কখনও প্রাকৃতিকোপে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বিহারের ও বিহারবাসীর উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির সহিত আমাদের ভাগ্য জড়িত হইয়াছে। আমরা—বিহারী ও বাঙ্গালী অধঃস্থের অংশী হইয়াছি, তাহাও সত্য। তথাপি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যরক্ষা আমাদের কর্তব্য। আমাদের পূর্বপুরুষগণের অবদানের উত্তরাধিকার আমরা বিশ্বস্তির কর্তব্যমায় বিসর্জন করিতে পারি না। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের জাতি-সমূহ মণিমালায় ভ্রাম এক হুত্রে প্রণীত। এই মোহন মালায় প্রত্যেক রত্নের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইবার নহে। আমরা প্রত্যেক জাতি—আমাদের জাতীয়তার রত্নটিকে লুপ্ত নাহাদ আশ্রয় সমুদ্র করিয়া তুলিব,—যালা ছিন্ন করিব না,—

সে গ্রন্থন যে অচ্ছেদ্য,—তাহাকে আরও দীপ্তিমান, সমৃদ্ধ, তুচ্ছ করিয়া দেশ-
নীতির চরণে উপহার দিব! অতএব যা বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য-রক্ষার চেষ্টা বিরো-
ধের হেতু না হইয়া মিলনের সেতুতে পরিণত হউক। • • • ভাষার
আদান প্রদান, মানসজগতে স্ব-ভ্রমের বিনিময়েই জাতিকে এক হুত্রে গ্রবিত
করে। বিহার প্রদেশেও এই একীকরণের হুত্রেপাত হইয়াছে। হিন্দী
ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি প্রতিবিম্বিত হইতেছে। অনেক লঙ্ঘপ্রতিষ্ঠ
অধুনিক বাঙ্গালী গ্রন্থকারের গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। হিন্দী
ভাষায় বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালার এই অংশের
অধিবাসীরাও হিন্দী ভাষার ও সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইতেছেন।
আশা করা যায়, বঙ্গসাহিত্যেও প্রাচীন হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি
অচিরে উপযুক্ত আসন লাভ করিবে। এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করিবার জন্য
হিন্দীভাষী বিহারী ও বঙ্গভাষী বাঙ্গালীর হৃদয়ের যোগ প্রতিষ্ঠিত করিবার
জন্য উভয়ের মধ্যে উভয়ের ভাষার অমূল্যলবের ব্যবস্থা উভয় সম্প্রদায়ের
অবস্থা কর্তব্য বলিয়া মনে হয়। আমরা যে পবমেন্টের অধীনে বাস করি,
হিন্দী সেই পবমেন্টের অমূল্যবীত ভাষা। অতএব তাহার স্বাভাবিক গুণটির
পথ প্রশস্ত। কিন্তু বিচারে বাঙ্গালা ভাষা সে দৌত্যগো বঞ্চিত। সুতরাং
বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের চর্চাকল্পে আমাদের পুরুষকারপ্রয়োগ অপরি-
হার্য বলিলেও যোগ করি অভ্যুক্তিভাবে হুই হইবে না। বাহ্যতে হিন্দী-
ভাষীদের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের প্রচার হয়, তাহা এই হিসাবে
আমাদের কর্তব্যের অন্ততম।”

মধুসূদন বাবু যে, Greater Bengal-এর সহিত বাঙ্গালার যোগের কথা
বলিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালা সাহিত্যের সাহায্যেই সে বিনিষ্ট যোগ
সংসাধিত হইবে, তাহাই স্বাভাবিক উপায়। বাঙ্গালা ভাষা সহজে শিক্ষা
করা যায়। আর বর্তমানে কোন ভারতীয় ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার মত সমৃদ্ধ
নহে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাব্য ও রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে
সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্ধিত করিয়াছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপজ্ঞান যে সাহিত্যের সমৃ-
দ্ধি অলঙ্কার, বাঙ্গালার আর কোন সাহিত্য সে সাহিত্যের মত উন্নতিলাভ
করিতে পারে নাই। বাঙ্গালী ভাইস্‌চ্যান্সেলার দার আভতোষ মুখোপাধ্যা-
য়ের বিশেষ চেষ্টায় বাঙ্গালা বাঙ্গালার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় পাঠ্য

নির্দিষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালা যে অচিরে পৃথিবীর যে কোন ভাষার

সহিত সমান ভাবে সর্গবিষয়ের সর্গভাব-প্রকাশকম হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনও এ দেশে কেহ কেহ বাঙ্গালার বাঙ্গালীর ছেলের শিক্ষালাভের ব্যবস্থায় সিহরিয়া উঠেন! ইহা দেখিয়া আমরা হাস্ত সংবরণ করিতে পারি না। তবে স্মৃতির বিষয়, এতদপ লোকের সংখ্যা বাঙ্গালার আর অধিক নাই।

বিহারে যেমন, ভারতের সর্বত্র তেমনই বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার ক্ষমতা অদৈ-
তনিক বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গলা প্রাথমিক শিক্ষাপুস্তক বিতরণ
করিয়া, বাঙ্গলা সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গলার
বিস্তার করিতে হইবে। তাহা হইলে বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী সমগ্র
ভারত বিজয় করিয়া ভারতের জাতীয় জীবন সংগঠনের—ভারতবাসীর উন্নতি-
সাধনের উপায় করিতে পারিবে। এ কায় বাঙ্গালীর। আজ যদি
বাঙ্গালী এ কালে অবহেলা কবে, তবে বাঙ্গালী হেলান যে স্মরণে
হারাইবে, পরে শত সাধনায় আর তাহা পাইবে কি না, সন্দেহ।

ব্যাদি ও তাহার প্রতিবেদ ।

(৪)

যক্ষ্মা বা ক্ষয়কাশ ।

সংক্রামক ব্যাদি সমূহের মধ্যে যক্ষ্মা অন্যতম । রোগশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহা রাজযক্ষ্মা উপাদি পাইয়াছে । কবিত আছে, দক্ষরাজের অভিষাগে চন্দ্রই প্রথমে যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন । দেব চিকিৎসক ধনন্তরীর উপদেশানুসারে রোগ শান্তির জন্য নিশাপতি দিব্যামিনীকে এক শশক ধারণ করিয়া থাকিতেন । এই জন্যই চন্দ্রের আর একটী নাম শশক । কোন সময়ে এই রোগ মহাশা সমাজে প্রথম প্রবেশ করে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ।

মহাতারতীয় যুগে প্রগদা-জন-মনোহারী ভূপতি বিচিত্রনীধা মহিবীৰ্য্যগুলের সহিত নিরন্তর প্রমত্ত থাকিয়া যৌবনারভেদেই যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন । খৃষ্ট জন্মাব্দের তিন চারি শত বৎসর পূর্বে পাল্চাত্যদেশবাসী পণ্ডিত Hippocrates তদীয় পুস্তকে এই রোগের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । আর্য্যদিগের সুপ্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র চরকগ্রন্থেও ইহার বিশদ বিবরণ বিবৃত আছে । বর্ত্তমান কালে প্রতি বৎসর জগতে যত লোকের মৃত্যু হয় তাহার সপ্তম অথবা অষ্টমাংশ যক্ষ্মারোগেই মরিয়া থাকে । কিন্তু পূৰ্ব্বকালে পূণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তে ইহার আদিপত্য অল্পই দৃষ্ট হইত । এখন আমাদের ভাগ্য দোষেই বলুন, অথবা কর্ত্ত্ব দোষেই বলুন, অনেক বাল-কিশোর-যুবা অল্পদিন ইহার কবলে পাড়য়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে । ইহার কারণ কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে হয়ত স্বাস্থ্য-হানির সমুদায় কারণ দেশের জল বায়ুর ক্লেদ চাপাইয়া নিশ্চিহ্ন হইবেন । কিন্তু আমি তাহাদের সহিত সম্মতাবলম্বী হইতে পারি না । আমাদের পূৰ্ব্বপুরুষগণ আহার বিহারাদির সুবিধানবারা স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া শতাব্দীতল্লবী হইয়া গিয়াছেন । আমরা সেই সকল মহা-
 • জ্ঞান পদাঙ্কানুসরণে উদ্যোগী হইয়া অকালে কালাগিতে জীবনকে আহতি প্রদান করিতে বলিয়াছি । যদিও বর্ত্তমান সময়ে এতদেবীয় জল বায়ু আমা-
 • দের স্বাস্থ্যের পক্ষে অক্ষুণ্ণ নহে, তথাপি আমরা যে স্বাভাৱ সলিলে ভুক্তি-
 • মন্নিতেছি তাহা অসীকার করিবার উপায় নাই । আমাদের পিতৃপিতামহ-

গণ ভ্রাক্ষবৃক্ষের গারোখান করিতেন, কাদিক পরিভ্রম করিতেন এবং ব্রাক্ষগাঁ-
তত পানন করিতেন । আনরা এ সকল কিছুই করি না । আনরা বেলা
ছয় দশ পর্য্যন্ত শবায় পড়িয়া থাকি, উই লগ্ন হাঁটিতে চইলে ট্রামগাড়ীর জন্য
এক ঘণ্টা অপেক্ষা করি এবং আহারবিহার সম্বন্ধে কোন নিয়মানীল থাকিতে
চাই না । ভর্জোজন, তুগালপ, তুগালনা ও ইল্লিগভোগ দাসনাই এমন আমা-
নের নিত্যকর্ম হইয়াছে । শাস্ত্র বলিতেছেন :-

“বৃক্ষাভারো যুক্তনিম্নো মিতবাহুঃ মিতমৈশ্বর্যম্ ।

বজ্রো নম্রঃ শুচির্দীক্ষো যুক্তঃস্তাৎ সর্ষকবৃক্ষ ই”

আমরা এই সকল অশুশাসন প্রলাপোক্তি মনে করিয়া মান্য করি না ।
বিশ্বশাস্ত্রে তিনিশকজাহ্নবীর খাঙ্কসবা এরূপ বজ্রনের বিধি নিষেধ
আছে । সেই অসাব্যবণ নীলজি সম্পন্ন মহাপুরুষগণের চিত্তপ্রসূত সকল
তত্ত্বই আজ এদেশবাসীর নিকট উপেক্ষণীয়, আনাদের কিসে কি হইতেছে
কেমন করিয়া বলিব !

কণকাল বীজাহুঘটিত ব্যাদি । কুসকুসই এই রোগ বীজাহুগণের শাস্তি-
ধান ; স্তম্ভরায় লগীরের অপরাপর যন্ত্র অপেক্ষা প্রাক্তন যন্ত্রটি উহাদের দ্বারা
অধিক প্রাক্তন হইয়া থাকে । রসগ্রন্থি (Lymphatic Glands), স্বরংগ্র
(Larynx), মেরুদণ্ড (Spinal Cord), অন্ত্র (Intestine) প্রভৃতি ভিন্ন
ভিন্ন লগীর যন্ত্রেও কণরোগ হইতে পারে । পাকস্থলী ও মাংসপেশী সমূহ
কিচিৎ এই রোগে প্রাক্তন হয় । ঐ সকল স্থানের কণরোগ প্রতিবেদক শক্তি
অপেক্ষাকৃত অধিক । পৃথিবীর স্থানেই যন্তা রোগের আবিপত্য আছে । তবে
দুঃশোণ ও আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যভাগেকদীপ্ত মহাদেশে ইহার সম্বন্ধে প্রাচ-
র্ভাব । অষ্ট্রেলিয়া ও প্রবাল মহাসাগর মণাঙ্কিত ষাঁপ সমূহে পূর্বে এই রোগ
ছিল না । অধুনা তদদেশবাসিগণ দুঃশোণীয়দিগের সহিত সাহচর্য্য করিয়া রোগ-
লক্ষণ বদলে আমদান করিয়াছেন । যে সকল অসভ্য জাতি সভ্যতার বাঁহরায়
পড়িয়া বিপর হইবেন নাই তাহাদের প্রতি যন্তার অসুগ্রহ দৃষ্টি অত্যাধি-
কব আছে । একদা পারিসের পাশ্চর চিকিৎসালয়ের অধ্যাপক প্রমিচ
বিজ্যাবিন্দ পণ্ডিত যেচ মিকফ (Matchinikoff) কোন্ দেশে
প্রাচুর্য্য কি প্রকার তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন
জাতি সভ্যদেশের যত উপকর্মে বসতি করে, তাহাদের যত

অসম্পত্তা তত অধিক । পরন্তু তাহাদের দেশে অত্যাধি সভ্যভাগেক প্রবেশ

করে নাই তাহাদের দেহ যক্ষ্মাণীজের পক্ষে অগ্রসর ক্ষেত্র । ক্যাস্‌পিয়ান্-সমুদ্র
কূলবর্তী পল্লীসমূহের অধিবাসী অসত্য কালযুগ জাতির (Kalmuk) মধ্যে
যক্ষ্মারোগ হইতে দেখা যায় না । তবে যে সকল কালযুগ নরনারী কর্ণোপ-
নকে অসত্য দেশে আসিয়া বসতি করে, তাহাদের মধ্যে এই রোগের প্রা-
চুর্য্য নাই । পূর্বে যেদিরা দেশেও যক্ষ্মারোগ ছিল না । এমন অনেক কয়-
রোণী দেশান্তর হইতে বাহু পরিবর্তনের জন্য এই স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া বাস
করায় সংস্পর্শ দোষে যেদিরাবাসীর মধ্যে যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পাইতেছে ।
তুতগবানী অপেক্ষা উত্তম শৈবাসিগণের ক্ষয়কাশ অল্পই হইয়া থাকে ।
ইহার কারণ, সমতল স্থানস্থিত ব্যক্তি অপেক্ষা তাহাদের সর্বদাই গভীর স্বাস
প্রবাস হইতে হয় ; সুতরাং পুনঃ পুনঃ গভীর স্বাস গ্রহণে স্বাসযন্ত্রের গঠন
সুদৃঢ় হইয়া তাহাদের যান্ত্রিক রোগ প্রবণতা বিনষ্ট হইয়া যায় । আশ্বিনের
নিত্যকর্ম স্বভাৱে আত্মিকের মধ্যে যে প্রাণাধার্যের বিধি আছে, তদ্বারাও সুদৃ-
ঢ়ত্বের পরিপূর্তি ও বর্মীভান হইতে পারে । কিন্তু আশ্বিনা সত্যতার উচ্চতরে
আগীন হইয়া অনেক দিন হইতে ত্রিশক্কা বর্জিত হইয়াছি ; যে দুই দশ জন
অভ্যর্থক দয়া করিয়া এই যোগিজনকামা অস্থগণটি রক্ষা করিতেছেন, তাহা-
রাও সাম্প্রতিক আশ্বিনাধার প্রাপ্তি হইয়া অশান্ত মনে নাসিকায় যত
প্রদান পূর্বক একবার মাত্র কয়েকটি উচ্চারণ করেন মাত্র । অধুনা বাজালা
দেশের কত লোক প্রতি বৎসর এক যক্ষ্মা রোগেই অকালে মহাপ্রাণ
করিতেছে । যে দেশে ব্রাহ্মযুগে গাজোখান করিয়া বহিঃশৌচ সমাপনান্তে
দেবোদ্দেশ্যে পুণ্যচয়ন করিয়া বেড়াইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে—যে দেশে ত্রিশক্কা
প্রাণাধার করিলে মানসিক, বাচিক ও কার্যিক পাপ সকল বিনষ্ট হয় বলিয়া
লোকের বিশ্বাস—যে দেশে দিব্যানিদ্ৰা মহাপাপ বলিয়া গণ্য—যে দেশে
সহজেন্দ্রা অগ্নি করিয়াও ব্রত হোজন করিবার উপদেশ দিয়াছেন—যে দেশে
ত্রিশক্কা ব্রতাহুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করিয়া দারপরিগ্রহ করিবার বিধি আছে,
সে দেশের লোক দাহুমান না হইবার কোন কারণ নাই । তথায় যক্ষ্মারোগের
এতাবশ্য প্রভাব থাকা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ।

অতি প্রাচীনকালের জ্ঞানবৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক যক্ষ্মাকে সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া
স্বীকার করিতেন । আয়ুর্কৌশে উক্ত আছে—

“অরঃ কুষ্ঠক শোথক নেত্রাতিথ্যানিগ্রেব চ ।

• • • • • সংক্রামণি মরণায়ং ॥”

এই রোগের কারণ নির্ণয়ের জন্য পুরাকালে হইতে পাশ্চাত্যদেশে অনেক চেষ্টা হইতেছিল। Celsus, Galen, Bayle প্রভৃতি লোকালের বিদ্বৎজন সমাজের মুখপাতিগণ ইহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে Villemin নামক জৈনিক ফরাসী চিকিৎসক যক্ষ্মারোগীর পরি-ভ্যক্ত কাশ শব্দসমূহে পিত্তকারী ব্যাধি প্রবিষ্ট করেন। ইহার ফলে ঐ সকল প্রাণী অত্যন্তকাল মধ্যে দৃঢ়াযুখে পতিত হয়। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর কাশে এমন কি বিষ পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাগ অন্য জীবের দেহে প্রবিষ্ট হইলে রোগানয়ন করিতে পারে, সে সম্ভাবনা তৎকালে কেহই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এই ঘটনার কিছুকাল পরে, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বীজাণুবিদ পণ্ডিত কক্ (Koch) অনেক পরীক্ষা ব্যাধি স্থির করিলেন যে, এক প্রকার উদ্ভি-জাণুই এই রোগের নিদান। এই উদ্ভিজ্জাণুগুলির আকার দৈর্ঘ্যে $\frac{3}{8}$ ইঞ্চি ও প্রস্থ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ইহাদের কোন প্রকার বর্ণ বৈচিত্র্য বা গতিশক্তি নাই। প্রক্রিয়া ব্যাধি ইহাদিগকে সঞ্চিত করিতে না পারিলে চক্ষুর চক্ষু অণুবীক্ষণের সাহায্যেও আমরা ইহাদিগকে নয়নগোচর করিতে পারি না। এই বীজাণুর দৈর্ঘ্যিক আবরণ এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ দ্বারা নিখিত। ভেদজাদি সহজে এই বীজাণুগণের দেহপ্রবিষ্ট হইতে পারে না বলিয়া; উদ্ভি-দিগকে বিনাশ করাও কষ্টসাধ্য। বহির্জগতে যন্ত্রার উদ্ভিজ্জাণু অনেক কাল জীবিত থাকিতে পারে। রোগীর শুষ্ক স্নেহায় মধ্যে ইহাদিগকে দুই মাসের ও অধিক কাল জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ফলে ও ভূগর্ভে ইহারা দীর্ঘকাল সজীব থাকে। এই অণুদেহী উদ্ভিজ্জ নিচয়ের শরীর এতাবশ্য জৈবনয়নশীল যে, বরফের মধ্যে রাখিয়া দিলেও ইহারা সহজে গতাহুঃ হয় না।

কক্‌রোগের বীজাণুর নাম “বাসিলিলাস্ টিউবার্‌কিউলোসিস্” (Bacillus Tuberculosis)। ঐ বীজাণু দৃশ্যদৃশ্যযোগে প্রবিষ্ট হইয়া স্থানীয় উত্তেজনা উৎপাদিত করে। পরে উত্তেজিত স্থানে গুটিকা বা “টিউবারকল্” জন্মিয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগের যে সকল লক্ষণ আছে এই গুটিকার উৎপত্তিই তদ্রূপে সঞ্চিত। যে সময়ে বীজাণুতত্ত্ব মানবের জানাভীত ছিল তখন এই গুটিকা দেখিয়াই যক্ষ্মা রোগ নির্ধারিত হইত। তৎকালে ডাক্তার Sylvius সর্বপ্রথমে এই গুটিকোৎপত্তির কথা জনসাধারণের জানগোচর করিয়াছিলেন। মুনব্বাভীত অন্যান্য জীবেরও যক্ষ্মা রোগ হইয়া থাকে। আমাদের দেশে

যে ক্ষয়রোগ জন্মে, যক্ষ্মাশীড়িত গণাতির বাৎস ভক্ষণ বা দুগ্ধ পানই তাহার কারণ। পাক-যন্ত্রের ব্যাধি সমূহের বীজ যেমন মল ও মিশ্রিত পদার্থাদির সহিত নির্গত হয়, এষ্ট অসাধা ব্যাধির বীজও তেমনিই রোগীর ক্ষেয়ার সহিত নির্গত হইয়া থাকে। যে কালে রোগীর কফ, কাশাদি নিক্শিপ্ত হয়, অথবা কফ, কাশাদি রক্ষা করিবার আহার দ্যৌত করা হয়, সেই জন পান করিয়া যতদূর এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। যক্ষ্মা রোগীর পরিতাক্ত ক্ষেয়া শুক হইয়া ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত থাকে এবং সচরাচর এই বিযাক্ত ধূলিকণা নিশ্বাসের সহিত দেহ প্রস্রবিত হইয়াই রোগানয়ন করে। *Tubercle* নামক জটিল অজস্ফারী এক সময়ে কতকগুলি কুহুরকে একটী গৃহে আবদ্ধ করিয়া তদ্ব্যবস্থা ক্ষয়কাশগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেয়া কোন উপায়ে যক্ষ্মাকারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি দেখিলেন গৃহ মধ্যস্থিত কয়েকটী কুহুর যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন কত সংযোগেও এই বীজগু মানবদেহে অস্থপ্রস্রবিত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণ ঘটনা বিরল। তবে যন্তে কত থাকিলে যক্ষ্মারোগীর মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ না করাই সমীচীন। অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যক্ষ্মা রোগীর সহিত একত্র বাস বা ভোজন করিলে এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে। রোগীর পরিতাক্ত গ্রন্থাস পার্শ্বচরের নিশ্বাস সংযোগে দেহপ্রস্রবিত হইয়া রোগানয়ন করিতে সমর্থ। *Metchinikoff*, *Marfan* প্রভৃতি অধ্যাপকগণ বলেন, যে সকল ব্যক্তি কোন একপ্রকার সহজসাধ্য ক্ষয়যোগ ভোগ করিয়া নিরাময় হইয়াছেন, তাঁহারা কখনই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হইবেন না। *Metchinikoff* এর প্রথম পত্নী যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করেন। *Metchinikoff* ঐ রোগগ্রস্তা স্ত্রীর সহিত বাস করিয়াও তিরদিন স্তম্ভ ছিলেন। ইহার কারণ জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে তিনি বলিতেন যে, বালাজীবনে তাঁহার গণমালা রোগ ছিল; ঐ রোগস্থির ক্ষয় রোগই তবিত্যন্তে তাঁহার শরীরে “টীকার” কার্য্য করিয়াছে। ক্ষয় রোগগ্রস্ত পিতা মাতার সন্তান প্রায়ই পৈতৃক সন্মতির সহিত তাঁহাদের রোগটিও উত্তরাধিকারি বশে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কটন নামক একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসক এক সমস্ত যক্ষ্মারোগীর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তদ্ব্যবস্থা ৩৬৭ জন পিতৃ-পিতামহ হইতে রোগ অর্জন করিয়াছে। আধুনিক চিকিৎসকগণের মধ্যে কেহ কেহ যক্ষ্মাকে বংশগত ব্যাধি বলিয়া খোকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সন্তান জন্মকাল হইতে এই

রোগীকে বধন করে না; তবে সাধারণ লোক অপেক্ষা ঐ সংলগ্ন দাউ-
লগের এই রোগ প্রবণতা অধিক থাকে। যক্ষ্মারোগ দৈনন্দিনই হইলেও
বতাবল ব্যাধি নিবারণক শক্তিশালী। যক্ষ্মারোগ তাহারিগকে পিনষ্ট করিয়া
ফেলে কিন্তু ক্রমশঃগীর বংশবরগণের এই ব্যাধির প্রতিবেদনক শক্তি থাকে না
বলিলেও অস্বস্তি হয় না। যেট কবা, “গ্রামেগবা রাবণেগবা” যক্ষ্মা-
রোগীর সন্তান সন্ততির জীবনের ভাবিফল উত্তর প্রকারেই সমান। এই জন্য
কল্যা পুত্রের বিবাহ নিবরণ কালে বংশপরিচয় জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে
তৎবেগে কাহারও যক্ষ্মারোগ হইয়াছিল কিনা, তাহা অগ্রসংগন করা
অত্যাবশ্যক।

অত্যধিক পরিভ্রম, শক্তির অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, অল্পপুষ্ক আহার,
বহুপ্রিয়গরণ, অবৈধ ইচ্ছাশ্রমেগবা, যক্ষ্মাপান, আর্জ কৃমিতে বাস, দূষিত বায়ু
সেবন, পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব প্রভৃতি যক্ষ্মারোগের পৌণ কারণ। যে
সকল ব্যক্তি কয়লাখনি, তুলা বা পাটের আড়তে কাৰ্যা করে,
তাঁহাদের এই রোগ হইবার অধিক সম্ভাবনা থাকে। পল্লীগামী অপেক্ষা
নগরবাসীদিগের মধ্যে ইহার প্রভাব সমধিক। ফলতঃ যে কোন
কারণে শরীরের অগ্রগোচ বা প্রতিকোচ কর হইতে আশ্রয় হইলে
ঐহই তদেবে যক্ষ্মারোগপ্রবণতা আসিয়া পড়ে। এতদেউয় দুবকগণের
মধ্যে অনেকে অবিদ্যাকারিতার বশবর্তী হইয়া শারীরিক অত্যাচারের
বিনিময়ে এই রোগ ক্রম করিয়া থাকে। এই কালব্যাধির আক্রমণ হইতে
আত্মরক্ষা করিতে হইলে যনীচী প্রণীত ব্যাধ্যবিধি সঙ্গল মাত্র করা
একান্ত আবশ্যক। প্রহ্মবে গাত্রোখান ও নিম্নলি বাহু সেগন এই
রোগের প্রতিবেদনক। অক্রমোদয়ের পূর্বে শয্যাভাগ করিয়া সমরোগ-
যোগী বেশভূষা ব্যাধা শরীর আত্ম করতঃ কিছুকাল মুক্ত বাহুত
ক্ষিপ্ৰমে পরিভ্রমণ করিলে শারীরবহুগুলি শুদ্ধ হয়। অগতে যে
সকল লোক দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রহ্মবে গাত্রো-
খান করিতেন। “Early to bed, early to rise, makes a man
healthy, wealthy and wise”—ইহা অমূল্য উপদেশ। বিচারণতি
মান্দিষ্টের ধর্ম্মাধিকরণে যে সকল বৃদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত হইতেন,
তিনি তাঁহাদের নিকট অগ্রসংগন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে,
প্রাতঃকুখানই তাঁহাদের দীর্ঘজীবন লাভের অকৃতম কারণ। তাঁহাদের

কুসকুসে স্বভাবতঃ চর্কল, তাঁহার দুলিমল পরিপূত কোন এক বাস্তব
স্থানে ঝাঁড়াইয়া এতাব কিছুক্ষণ গভীর খাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবেন।
এই প্রক্রিয়ার পরিমিত অনুশীলন করিলে ঐ বস্ত্র ঝাঁড়াই সৰল হইয়া উঠে ;
অপিচ ইহা বারা চিত্ত প্রশস্ত হয়। কুসকুসের বারানাম অভ্যাস করিবার
সময় মনকে চিত্তাশুভ রাখা উচিত। তখন মনে এই বারণা করিতে হইবে
যে, প্রতি খাসপ্রশ্বাসে বাহু হইতে “জীবনী শক্তি” গ্রহণ করিতেছি। ইচ্ছা-
বৃত্তি স্বাভাবিকের একটু উপায়। “আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িলাম”—এই চিন্তা
সতত মনোমধ্যে উদ্ভিত হইলে শীঘ্রই বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। “আমার
যৌবনোচিত শক্তি অক্ষুর আছে”—এই বারণা সদা সঙ্গীত মনে রাখিতে
পারিলে যৌবন দীর্ঘায়ী হইতে পারে। বিশুদ্ধ পূর্ণশুকবাচেরিত প্রাণাধার
ক্রিয়া ও কুসকুসের আরম্ভন বৃদ্ধির পক্ষে উৎকৃষ্ট। সঙ্গতর উপ-
দেশানুসারে এই নিভা কণ্ঠটি প্রতিদিন অনুষ্ঠান করিলে দেহস্থ লজ্জাবী
শক্তি বৃদ্ধি হয়। এইরূপ ক্রমতাপন্ন শরীরে যোগবীজ প্রাণসঃ অনুপ্রিত হইতে
পারে না।

অষ্টম ইঞ্জিয়সেবীর মধ্যে যক্ষ্মারোগের প্রারম্ভিক অধিক। শাস্ত্র
কলিতোছেন—“যরণং বিশূপাতেন, জীবনং বিশূষাচরণাৎ।” শরীরে শুষ্কবাহু
অবস্থিত থাকিলে চিত্তপ্রসাদ আসিয়া উপস্থিত হয় ;—দেহে দিবা জ্যোতিঃ
প্রকাশ পায়। এই জ্যোতির সমুদীন হইলে সকল জীবাত্ম ভবীভূত হইয়া
হয়। সাবিক আহার, সঙ্গ্রহ পাঠ, সাধুসঙ্গ ও সর্জন্য ভগনজিত্য করিয়া
সংযতেন্দ্রিয় থাকিতে অভ্যাস করিলে আমরা অনেক যোগের হস্ত হইতে
নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারি। ঞ্জ করিয়াও মৃত ভোজন করিবে ; কিন্তু
তাঁহা বলিয়া বাজারের দূষিত মৃত ভোজনে অপকার ভিন্ন উপকার নাই।
আমরা নির্লিপ্ততা বশতঃ একান্ত অসার বিলাসিতার অথবা অর্থব্যয় করিয়া
থাকি ; কিন্তু অনেক সময়ে আত্মবর্ধ শরীর চর্চার কপর্দক ব্যয়েও কুণ্ঠিত
হই। ইহা বারা আমাদের লাভের শুদ্ধ যে পিপীলিকার বাইতেছে তাঁহা
একবারও চিন্তা করি না। “বৃত্তং আত্মঃ”—পণ্ডিত গদ্যবৃত্তই শ্রেষ্ঠ রসায়ন।
এই বৃত্ত সামগ্রী আজ দুলভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বাবুগিরির সাজ কামিজ,
ক্রোট, ক্রমাল এসেন্স প্রভৃতির ব্যয় সংকোপ করিয়া তদবর্ধে পরম্বিনী গাতী
পুথিলে এ অতাব এখনও দূর হইতে পারে। গাতীর খাতিয়ার প্রতি বিশেষ
লক্ষ্য রাখা উচিত। পূর্ণকালে গৃহস্থগণ নিজহস্তে গো-সেবা করিতেন।

এই প্রতিষেধে গোচর মাঠ ছিল। গাভী সকল মাঠে নব নব তৃণ ভোজন করিয়া, দৌড়া দৌড়ি করিয়া ছুট, পুট ও বলিত দাকিত। অধুনা আমরা গাভীকে অর্ধাশনে এক অক্ষুণ্ণ গৃহে দিবারাত্র আবদ্ধ রাখিয়া পোষ্যতার পাঠ্যী বহুতঃছি। গাভীর চুপ দেখিবার অবসর আমাদের নাই। এদিকে আমাদের বিলাসিনী গৃহলক্ষ্মীরা ত্রমসেও কখন গোশালার ত্রিসীমায় পদার্পণ করেন না। স্তত্রাং গৃহশালিত গাভীগুলির স্বাস্থ্য-হানি অবশ্যত্বাৰী। পীড়িত গাভীর চুচপানহেতু বেশে ক্ষর ও বক্রংগের উত্ত-রোত্তর জীৱন্তি হইতেছে। এ অবস্থার প্রতিকার না করিলে আমাদের কোন ক্রমেই মঙ্গল নাই।

অতি কষ্ট, অতি অমর, অতি ভীক, অর্ধপক, বিরসতাগ্রস্ত, পশু্যবিত পুত্তিগন্ধযুক্ত রাসল ও তামস আহার ঘণাসত্ত্ব বর্জন করিলে। পত্তমাংস স্পরিক্ত ও স্পন্দিত না হইলে আহার করা উচিত নহে। চুচ রীতিমত না চুটাইয়া পান করা অবিধি। মদ্য, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য বিবদৎ পরিত্যাগ্য। কাল মাহাত্ম্যে আলকাল বালকহিগের মধ্যেও চুচট, সিগা-য়েট ও বিড়ি বাইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। ধূমপানজনিত প্রদাহ থাকিলে ঘন্যাবীজাণু সহজেই তথায় বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। হুকায় তামাক খাইলে অপেক্ষাকৃত কম অপকার হয় বটে কিন্তু অনেক সময়ে অজ্ঞাতকুল-শীল ব্যক্তি-চুচিত হুকায় মুগ্ধপর্ণ করিয়া অনেকে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

দম্বারোগীর কাশসংস্থিত বীজাণু বায়ুতড়িত হইয়া উড়িতে থাকে। স্তত্রাং রোগীর গৃহে সর্বদা পতায়াত করা উচিত নহে। রোগীকে পৃথক এক বাতালোক পূর্ব বরে রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। গৃহে মধ্যে মধ্যে গন্ধক, লোবাণ প্রভৃতি পুড়াইলে বায়ুহ রোগবীজাণু বিনষ্ট হইতে পারে। রোগীর দেহ উষ্ণত্ব ব্যাৱ্য করিয়া গৃহের বায়ু-পবণগুলি উষ্ণত্ব রাখিবে। এই রোগগ্রস্তা মাতা শিশুকে অন্ত্রদান করিবেন না। পীড়িতার অন্ত্রপানে সন্তানের এই রোগ হইতে পারে। রোগীকে যত্র তত্র কাশ ফেলিতে দেওয়া অপ্রচিতি। কোন একটী স্তত্রিকাপাত্রে পরিশোধক জল রাখিয়া তত্রব্যে কফ, কানাদি নিক্ষেপ করাই সুব্যবস্থা। পরে ঐ সকল বিবাক্ত রোগ্য আধারসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করিলে রোগ বিত্বারের ভয় দূর হয়। স্তত্র রোগীষ্ট শয্যাবসনাদি দক্ষ করিয়া ফেলা কর্তব্য। ঘন্য রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত একত্রে ভোজন, একত্রে শয়ন বা একত্রে বসিয়া অধিকক্ষণ কথোপকথন করা

বিষের নহে। এমন কি মস্তক হইলে করোগীও সাহস একতরফে দাস না করিলেই ভাল হয়। আমার জনৈক আত্মীয় উত্তর পশ্চিমদেশে সরকারি ডাক্তার ছিলেন। তাঁহার বংশের মধ্যে কাহারও গম্মারোগ ছিল না। তিনি ঘটায় এই রোগে আক্রান্ত হইয়া অল্পকাল মধ্যে মৃত্যুব্রূষে পতিত হইলেন। তাঁহার শুভ্রবাকারী পিতা, মাতা ও অল্পবয়সী বলরোগে একে একে তাঁহার অঙ্গশমন করিয়াছিলেন। সুস্থদেহী, রোগীর উদ্ভিষ্ট বাধ্য গ্রহণ করিলে না। রোগীর ব্যবহৃত ভোজন পাত্রাদিও কার্শনিকলোষণ ও ছুটন্ত জলে স্নানকৃত না করিয়া ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। যক্ষ্মাবীজগুমিশ্রিত মূলিকণা উড়িয়া থাকায় লবিত পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হইলে রোগ হওয়া অসম্ভব নহে। অতএব বাড়ীর অন্যান্য জনগণ বাধ্য জ্বরের বিগড়তার প্রতি ধর্মসূচি রাখিবেন। মক্ষিকা বাগা সকল রোগবীজগু হানাতর নীত হইতে পারে। সুতরাং ভোজ্য সামগ্রীতে বাহাতে মক্ষিকা বসিতে না পারে তাবিধে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। রোগীর পরিচর্যাচারিগণ হল ও পরিধের বদন উত্তমরূপে পরিশোধক জলে ধৌত করিয়া অন্ন পানাদি গ্রহণ করিবে। যে গৃহে যক্ষ্মা রোগীর মৃত্যু কর তাহা কেনাইল অথবা কার্শনিকলোষণ বাগা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া চূর্ণকাম করিলে নিশ্চয় বাসোপযোগী হইতে পারে। কোন তাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্বে সেই বাড়ী এবিধ ভাবে সংস্কৃত করিয়া লওয়া সকলেরই অবশ্য কর্তব্য।

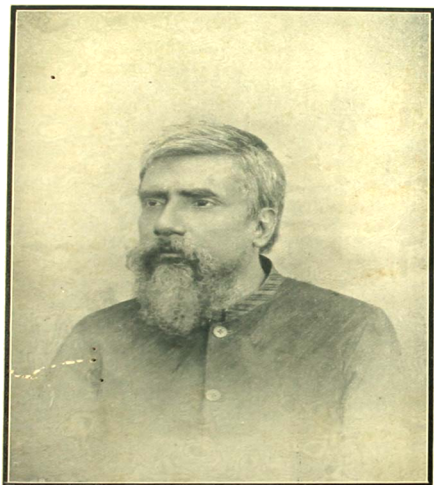
যক্ষ্মারোগগ্রস্ত পিতা মাতার সন্তানের দারপরিগ্রহ করা কোন ক্রমে সম্ভব নহে। তাহার আবালা প্রঅচর্য অহুষ্ঠান করিয়া পবিত্রভাবে কালযাপন করিবে।* গব্যদুত, কড়লিত্য প্রভল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করিবে। দিবসের অধিকাংশ ভাগ বাহিরে উম্মুক্ত স্থানে অবস্থান করিবে। অগ্ধহার কুলাইগে জনাকীর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া সমুদ্রকূলে অথবা নাতিশীতোক পার্শ্বভাগে প্রবেশে বাস করাই সুব্যবস্থা। এই সকল লোকের পক্ষে দুই পাঁচ বৎসর স্থিররূপে থাকাই যথেষ্ট নহে। রোগবীজ সময় ও সুযোগ পাইলেই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। মনে রাখিবে—

“দেবে বর্ষতাপি যথা ক্রমো বীজানিকানিচিৎ

শরদি প্রতিরোহতি, তথা ব্যাধি সমুদ্ভুতঃ।”

ক্রমশঃ।

ঐশ্বরেজ নাথ ভট্টাচার্য।



বগীর শরৎকুমার লাহিড়ী

শরৎ কুমার লাহিড়ী।

যিনি স্বনামে পরিচিত হয়েন, জগতে তিনি শত্রু। শরৎ কুমার লাহিড়ী মহাশয় এই সঙ্গ্রহাঘের লোক ছিলেন। এগির পুস্তক ব্যবসায়ী এস, কে, লাহিড়ী কোম্পানীর সংস্থাপক ও বঙ্গাবিকারী লাহিড়ী মহাশয়ের নাম দেশে সর্বত্র পরিচিত। এই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস উপস্তাসের মত বিবরণকর। আন্তরিক চেষ্টার সহিত অদ্বা উৎসাহের যোগ হইলে সে চেষ্টা কিঞ্চল অগ্রস্তুক হয় এই ব্যবসায়ের ইতিহাসে আমরা তাহা বুঝিতে পারি।

কর্মবীর শরৎ কুমার স্বনামে পরিচিত। কিন্তু তাঁহার পিতৃনামে পরিচিত হইবার সুযোগও যেনেই ছিল। তিনি পুণ্যত্রয় রামতত্ত্ব লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। দীনবন্ধুর কণায়—

“ঈশ্বর মাঝে একদিন করিলে বাগন

দশ দিন ভাল থাকে অবিপেক্ষী মন।”

সেই রামতত্ত্ব লাহিড়ী মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা কোন দিনই ভাল ছিল না। বাল্যকালে শরৎ কুমার কুচনগর এ, ডি, স্কুলে (ব্রজ বাবুর বিদ্যালয়ে) শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠ বন্ধ করিতে হয়। এদিকে রামতত্ত্ব বাবুও বৃদ্ধবয়সে অসুস্থতাভেদে কুচনগর হইতে কলিকাতার আসিলেন। সন্ধ্যা—সামান্ত পেন্সন্। কাছেই কলিকাতার বাসার গৃহও মিলিল না। শেষে ইন্ডিয়ান বিদ্যালয়গার একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার দুই সন্তান দেখিয়া বিনাভাড়া তাঁহাকে একটি পরিবার বাড়ীতে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শরৎ কুমারের পিতৃতত্ত্ব অসাধারণ ছিল। সে কথা আমরা পরে বলিব। পিতার কষ্ট দেখিয়া শরৎ কুমার অর্থোপার্জন্যের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, মাসিক ২০ কি ৩০ টাকা বেতনের চাকরীই জুটিতে পারে। শ্রেষ্ঠ চাকরীর অল্প পিতার পত্র লইয়া কাহারও কাছে যাইতে শরৎ কুমারের লজ্জা করিতে লাগিল। ইহা তাঁহার স্বাবলম্বন প্রেরিত্যই পরিচায়ক, তিনি চাকরীর অল্প দরখাস্ত লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্বত্র সেই একই কথা—কর্মবালি নাই।

• একদিন তিনি দরখাস্ত লইয়া ধর্মতলা অঞ্চলে ঘুরিতেছেন। দিবা অব-

সানপ্রায়—তিনি স্বয়ং প্রান্ত। এই সময় তিনি একজন যুরোপীয়ের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং গৃহবাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে “সেল্যাম বাজাইয়া” দরখাস্ত দিলেন। যুরোপীয় “কাথখালি নাই” বলিলেন না, পরন্তু হাসিমুখে দরখাস্তখানি পড়িতে লাগিলেন। ইহাতে শরৎ কুমারের হৃদয় আশায় পূর্ণ হইল। কিন্তু তিনি প্রকৃত ব্যাপার বৃত্তিতে পারেন নাই। গৃহবাসীর পদতলে একটী ব্রহ্মদাকার সারসের স্তম্ভস্বৰে যন্ত্র ছিল। উজ্জিত পাইয়া সে উঠিয়া শরৎ কুমারকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তিনি প্রাণতয়ে দৌড়াইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি রামচন্দ্রে আসিলে যুরোপীয় কুকুরটি ডাকিয়া ফিরাইলেন। শরৎ কুমার যুরোপীয়ের অধীনে চাকরীর আশা ত্যাগ করিলেন।

তাহার পর তাহার একটী চাকরী জুটিল, কিন্তু থাকিল না। শেণে ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাকে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে মেটপলিটান কলেজে একটী চাকরী করিয়া দিলেন। বেতন অতি সামান্য; কিন্তু শরৎ কুমারের আশার আশ্রয়তন সামান্য নহে। তিনি পিতামাতাকে সর্ববিধ স্তব্ধে রাখিয়া অন্য ব্যস্ত। তাই তিনি ব্যবসায়ের কথা মনে করিতে লাগিলেন। সুযোগও অত্যন্ত ভাবে উপস্থিত হইল।

শরৎ কুমারের মাফদেবী কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় একজনকে ২০০ টাকা স্বর্ণ দিয়াছিলেন। অধমর্ষের দারিদ্র্যাবেত্তে তিনি সে টাকা পাইবার আশা ত্যাগই করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা অবস্থার উন্নতি হওয়ার ধনী স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া সে টাকা পাঠাইয়াছেন। শরৎ কুমার ব্যবসা করিবেন বলিয়া মা'র নিকট হইতে সে টাকা লইলেন। কিন্তু কি ব্যবসা করিবেন?

ঐশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সব শুনিয়া তাঁহাকে পুস্তকের দোকান স্থলিতে বলিলেন। তিনি আশা দিলেন; তিনি সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে ধারে ১০০ টাকার পুস্তক দিলেন। এই বিষয়ে আর জুইজন হিঠৈতনী তাহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার পিতার প্রিয়ছাত্র কালীচরণ গোস্ব তাঁহাকে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বেঙ্গলী’ পত্রের বিনামূল্যে তাহার দোকানের বিজ্ঞাপন ছাপিয়া দিতেন। তখন কলিকাতায় বাঙ্গালীর দৈনিক সংবাদপত্র এত ছিল না, সুরেন্দ্রনাথের ‘বেঙ্গলী’ ও শিশির কুমারের ‘অমৃততরঙ্গ’ উভয়ই সাপ্তাহিক।

শরৎ কুমার গোপবিন্দ্যের উত্তর দিকে কলেজ স্ট্রীটে একটা ছোট ঘরে দোকান খুলিলেন ।

প্রায় ৬ মাস কাটিল ; বাবসায় শরৎ কুমার বিশেষ স্রুবিদ্যা বৃত্তিতে পারিলেন না । শেষে একদিন তিনি হিসাব নিকাশ করিলেন । কি সফলনাশ ! লাভ কিছুই হয় নাই ; এ অবস্থায় দোকান চলিলে অগ্রদিনে মা'র টাকা নষ্ট হইবে । তিনি চিন্তাশ্রম করিয়া স্থির করিলেন, পরদিন দোকান তুলিয়া দিয়া মা'র টাকা মা'কে দিবেন । বিষম চূড়াননা লইয়া শরৎকুমার গৃহে ফিরিলেন ।

পরদিন যথাকালে দোকান তুলিয়া শরৎ কুমার দেখিলেন ডাকহরকরা একখানি পত্র ফেলিয়া পিয়াছে—মফসল হইতে কোন ক্রেতা প্রায় ১০ টাকার পুস্তক পাঠাইতে লিখিয়াছেন । সে দিন আর দোকান তুলিয়া দেওয়া হইল না । তিনি পুস্তকগুলি ভিঃ, পিঃ, ডাকে পাঠাইলেন । পরদিন প্রায় ৫০ টাকার ও তৃতীয় দিন প্রায় ২০০ টাকার পুস্তক পাঠাইবার জন্য পত্র আসিল । ‘বেতন’ে বিজ্ঞাপনের ফল ফলিতে লাগিল । তাহার পর প্রত্যাহ ৪০০০০ টাকার পুস্তক বিক্রীত হইতে লাগিল । নদী যখন প্রথম পর্বতাদে শীর্ণ জলধারারূপে দেখা দেয় তখন তাহার পথ বিঘ্নবস্তল ; কিন্তু যখন সে উপলব্ধিম গিরিগাত্র হইতে নামিয়া আইসে তখন সে যতই অগ্রসর হয়, নানাদিক হইতে নানা জলধারায় তাহার প্রবাহ পুষ্ট ও পূর্ণ হয় । বাবসায়ও তাহাষ্ট, এখন নানাদিক হইতে ভট-নার স্রোতঃ আসিয়া শরৎ কুমারের বাবসায়ের উন্নতিপ্রবাহ পূর্ণ করিতে লাগিল ।

অদম্য উৎসাহের, আন্তরিক চেষ্টার, অনন্য সাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠার ফল ফলিল । কিন্তু দক্ষনিষ্ঠ শরৎ কুমার বলিতেন, ইহা তাঁহার পিতৃপুত্রের ফল—ঈশ্বরের দয়া । ঈশ্বরের দয়ার কথায় তিনি প্রায়ই পুত্র সন্তোষকুমারের জীবনে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেন । তখন শরৎ কুমার ছাত্রালয় বোডের ধারে বহুৎ বাড়ী নিৰ্ম্মিত করিয়া তথায় বাস করিতেছেন । সেই সময় একদিন—তিনি দোকানে বাইবার পর—তাঁহার পুত্র শিশু সন্তোষকুমার বিতলের বারান্দার রেলিং ধরিয়া উঠিয়া নিজে ব্রাশায় পড়িয়া গেল । ঘটনাক্রমে একজন সূটিয়া কাঁকায় কতকগুলি লেপ তোষক মইয়া বাইতে ছিল । সন্তোষকুমার সেই কাঁকায় পাড়ল । এই অত্যন্ত নিপনে বৃত্তি

হারাইয়া ভারবাহী তার ফেলিয়া পলাইল—সংজাহীন সন্তোষকুমার ফুটপাথের উপর পড়িয়া রহিল। আবার ঘটনাক্রমে শরৎ কুমারের গৃহের পার্শ্ববর্তী গৃহবাসী—প্রতিবেদী ডাক্তার নীলরতন সরকার তখন সেই পথে হাইতেছিলেন। তিনি সন্তোষকে জুগিয়া গৃহে লইয়া গেলেন এবং সে একটু সুস্থ হইলে তাহার বাড়ীতে সংবোধ দিলেন। শরৎকুমার বলিতেন লেপবাহী মুটিয়া গমন ও নীলরতন বাবুর আবির্ভাব অন্তর্কিত ঘটনামাত্র নহে; পরন্তু বিশ্বের ব্যবস্থা।

এই বিষয় বশতঃই তিনি স্মৃতি হুৎতে, সম্পদে বিপদে, উগ্রাশে শোকে কখনই বিচলিত হইতেন না। তাহার কথা প্রিয়তমার মৃত্যুর পর প্রথম যে দিন আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সে দিন তিনি সাক্ষাৎ হইলেই আমাকে যে কক্ষে লইয়া যাইলেন সে কক্ষে কক্ষাশে কাঁড়ুরা জননী কক্ষার স্মৃতিচিহ্ন পরিবেষ্টিত হইয়া শোকাক্র বর্ণন করিতেছিলেন। তিনি আমাকে কন্যার অদৃষ্টরচিত শিল্পকর্ম দেখাইলেন; সে দিন কেবল কন্যার কথাই বলিলেন। তাহার জ্বরে তখন অন্য চিন্তার স্থান নাই। কিন্তু তিনি হিংস্র—অচঞ্চল।

শরৎকুমারের পিতৃভক্তি ও বিনয় অসাধারণ ছিল। রামতনু বাবুর মত পিতা লাভ দুর্লভ সৌভাগ্য; কিন্তু শরৎ বাবুর মত পুত্র লাভও সুলভ নহে। শরৎকুমার সর্বদাই মনে করিতেন—“পিতরি প্রীতিবাগ্যে প্রিয়ন্তে সর্বং দেবতা”। পিতৃপ্রাণে তিনি আত্ম ও অনাত্ম সকল অতিথিকেই সমান করে—সুখানুভূতিভরে আহ্বান করিতেন; ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য, অনাত্ম ভক্তদের পক্ষী সন্ন্যাসী, বাণাবদ্ধ, ভারবাহী সকলকেই তিনি অকৃত্রিম যত্নে ভুট্ট করিতেন। তিনি পুণ্যবান পিতার প্রীতিকৃতি বিতরণ করিতেন। তিনি বহুবারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দিয়া পিতার যে চরিত্র রচিত করাইয়াছিলেন—তাৎক্ষণিক সমসাময়িক বাঙালার সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান সাক্ষ্য আছে। এই উপাদান সংগ্রহে তিনি ব্যয়ে সুকৃতি হয়েন নাই। আর সেই চরিত্রকথা ইংরাজীতে সার বোপার লেখকত্রি বিবৃত করিয়াছেন। সেও শরৎকুমারের চেষ্টায়। পিতার বন্ধুদিগকেও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন।

তাঁহার বিনয় এতই অধিক ছিল যে, তিনি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। একদিন আমি তাঁহার দোকানে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে

কথা কহিতেছি, এমন সময় কোন এককালের লোক আসিয়া টাকা চাহিলেন। তাঁহার হিসাব ও হিসাবমত প্রাপ্য টাকা ঠিক করিয়াই রাখা হইয়াছিল। তিনি চাহিলেই হিসাব ও টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি কিছু টাকা অগ্রিম চাহিলে শরৎকুমার বসিলেন, সে দিন আর টাকা দিতে হইলে তাঁহাকে অগ্রবিধায় পড়িতে হয়। ইহাতেই লোকটির বৈধাচারিতি ঘটিল এবং তিনি অকারণ অসহিষ্ণুতাব্যক্ত লোক প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শরৎকুমার বিশৃঙ্খল বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার মাথাটা বড় গরম হইয়াছে। দেখুন, আমি অগ্রবিধা সবেও আপনাকে কিছু টাকা দিতাম; কিন্তু আপনার ব্যবহারে আমার আর সে প্রবৃত্তি রহিল না।" শেষে লোকটি লোকান ভাগ করিয়া বাহির হইলে তিনি তাঁহাকে ডাকিয়া ফিরাইলেন ও অগ্রিম কিছু টাকা দিয়া দিলেন। বর্তমান লেখক তাঁহার পুস্তকানীতির স্বেচ্ছাভাজন হইলেও তিনি বীর প্রয়োজনে কোনদিন তাহাকে ডাকিয়া পাঠান নাই; বরং তাহার নিকট আসিয়াছেন, সাক্ষাৎ না পাইলে পুনরায় কখন আসিলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে নিশ্চয় করিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে কোন কাৰ্য্য করিতে অগ্ররোধ করিলে তিনি অগ্রবিধা অগ্রবিধা বিবেচনা না করিয়া সে অগ্ররোধ রক্ষা করিয়াছেন।

তিনি চিরদিনই সমান ছিলেন। যখন তিনি পিতার এক শিষ্ঠ রাজ্য প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় হাষ্টবারের ইতিহাস প্রকাশ করিবার অধিকার পান তখনও যেমন, যখন হাইকোর্টের হুজুরী ~~বিচারকগণ~~ তাঁহাকে পুস্তকের প্রকাশক করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন তখনও তেমনই; যখন তিনি কলেজ স্ট্রীটে অফিসের ক্ষুদ্র ঘরে লোকান খুলিয়াছিলেন তখনও যেমন যখন তাঁহার লোকান গৃহের প্রতিষ্ঠার হাইকোর্টের এগান বিচারপতি পর্যন্ত আসিয়াছিলেন তখনও তেমনই; যখন বালাবন্ধ আন্তঃতাব চৌধুরী (বিচারপতি এ, চৌধুরী) পুস্তক প্রকাশ করিয়া ভোলানাথ পালের বিরাম-ভাজন হইয়া তিনি বহুসং কালীচরণ ঘোষ * মহাপ্রেরণ পদার্থ চাহিয়া-ছিলেন তখনও যেমন, যখন তাঁহার গৃহে কলিকাতার সমস্ত ব্যক্তিগণের

* কালীচরণ বাবু রায়ভদ্র বাবু প্রিন্সিপাল ছিলেন। ছাত্রের বৃত্তি পর্যন্ত রায়ভদ্র বাবু মধ্যে মধ্যে শরৎকুমারের গৃহ হইতে আসিয়া তাহার গৃহে বাস করিতেন। কালীচরণ বাবুর বৃত্তিপত্রাধ্যক্ষও রায়ভদ্র বাবু উপস্থিত ছিলেন।—লেখক।

সম্মুখমুখ হইত তখনও তেমনই ; যখন তিনি বহু বহুনাথ ঘোষকে দিয়া পুস্তক রচনা করাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তখনও যেমন, যখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে পিতৃ স্বত্বিকার্থ পুস্তকের স্বত্বদান করিয়াছিলেন তখনও তেমনই— শরৎকুমার তখনও বিলাস বা অভিমান কাহাকে বলে জানিতেন না ।

আপনার ব্যবসায়ের প্রতি শরৎকুমারের স্ফূর্তি ছিল না । তাঁহার শিক্ষা ছিল, পুস্তক ব্যবসায়ীরা জ্ঞান বিজ্ঞানে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন ; কারণ, যে স্থানে বহু পুস্তক সংগৃহীত হয় তাহাই বিশ্ববিদ্যালয় । এই ব্যবসায়ই তাঁহাকে দারিদ্র্য হইতে সমৃদ্ধিতে উন্নীত করিয়াছিল এবং ব্যবসায়ের ফলেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একখানি সংগ্রহ পুস্তকের স্বত্ব দিয়া সেই আয় হইতে তাঁহার পিতামাতার নামে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ।

শরৎকুমারের বালাবদ্ধদিগের মধ্যে ঐচ্ছিক আন্তরিক গোঁহরী ও পরলোকগত বহুনাথ ঘোষের ও বিজ্ঞেন্দ্রলাল রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনিই বিজ্ঞেন্দ্রলালের প্রথম পুস্তকের প্রকাশক । বকীর সাহিত্য পরিষদের বিজ্ঞেন্দ্রলালের শোক সভায় তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠও করিয়াছিলেন ।

শরৎকুমারের জীবনের একটি বিষয় ব্যবসাবিষয় বাঙ্গালীর বিশেষভাবে লক্ষ্য করা কর্তব্য । অধ্যবসায় ও আর্থিকতা সাফল্যের উপাদান ; কিন্তু ব্যবসা শিক্ষাসাপেক্ষ । আমাদের দেশে যে অনেক ব্যবসা অল্পেই বিনষ্ট হয় শিক্ষার অভাবই তাহার কারণ । যুরোপে ও আমেরিকায় শিক্ষানবিশ রূপে ব্যবসায়ের শিক্ষালভ করিয়া তবে লোক ব্যবসায় করে—প্রথমে শিক্ষানবিশ, পরে সহকারী, তাহার পর অংশীদার, সর্বশেষে স্বত্বাধিকারী । ইহাই ব্যবসা প্রধান দেশের ব্যবসায়ীদের রীতি । এ দেশেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইরূপ রীতিই আছে । কিন্তু আজ কাল আমরা বিদেশী প্রকারে যে সব ব্যবসা কাঁদিতেছি তাহাতে শিক্ষার সেরূপ সুবিধা নাই । তাহাই অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায় সর্বনাশের কারণ । শরৎকুমার ইহা বুঝিয়াছিলেন । তিনি প্রথমে ছোট করিয়া কাব করিয়া কালে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ক্রমে ব্যবসা বাড়াইতেন । তাই তিনি কালে সাফল্যলাভ করিয়া গিয়াছেন । প্রথমে নতনি হেরার প্রেসে অংশীদার হইয়া ছাপাখানার কাব নেন । তখন সে ছাপাখানা ছোট । তাহার পর তিনি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটি ছাপাখানার অংশীদার হইয়া প্ৰথমে বয়ঃপ্রাপ্ত কটন প্রেস সাহায্যিত করেন । ছাপা

যানান্তেও যেমন পুস্তকের কারবারেও সেইরূপ—তিনি ছোট কায় আরও করিয়া কায় লিখিয়া তবে কায় বড় করিবেন—শিক্ষার মূলা ও মর্যাদা তিনি বিশেষ নৃক্ষিতেন। ইহাও তাঁহার ব্যবসারে সফলতার অন্যতম কারণ ।

গত ১লা জানুয়ারি, শুক্রবার অপরাহ্নে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালেও তিনি সুস্থ শরীরে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সেই দিন অপরাহ্নে তাঁহার মৃত্যু হয়। কর্তা পুস্তক কারবার শে। দিনও কায় করিয়া বনর সিংহাস নিদ্রিত হইয়াছিলেন।
